পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে বি. এড্., বি. টি. পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের (General Method, School Organisation and Health Education) পাঠ্যপুস্তক।

শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ

সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

রণজিৎ ঘোষ এম. এ., বি. টি.

সহযোগিতায়

অধ্যাপক সত্যগোপাল মিশ্র এম. এ. বি. টি

পাঁশকুড়া বনমালী বি. টি. কলেজ

পরিবেশনায়

স্বরাজ ভাণ্ডার

১২৭ এ, এস. পি. মুখার্জী রোড

কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়

৩০।১ বি কলেজ রো

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এডুকেশনাল বুক করপোরেশনের পক্ষে
শ্রীমতী শোভারাণী চক্রবর্ত্তী
১২৭এ, এস. পি. মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল, ১৯৬৭
দ্বিতীয় প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৬৮
তৃতীয় প্রকাশ :
১৫ আগস্ট, ১৯৭০
পরিমার্জ্জিত চতুর্থ প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৭২

মুদ্রক :
কালিপদ নাথ
নাথব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
চালতা বাগান
কলিকাতা

রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯-এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬।

জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বহুদিন পূর্বে শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশের উপর একখানা বই লিখবার সংকল্প করে কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম পরিবর্তন করায় পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হয়। নতুন করে শুরু করব কি না যখন এরূপ সংশয়ের মধ্যে ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় বনোয়ারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উৎসাহে নতুন পাঠক্রম অনুসারে বই লেখায় হাত দিই। তাই বহু পূর্বে বিজ্ঞাপিত হলেও বই বের হতে দেরী হ'ল।

আমি শিক্ষক। শিক্ষা পদ্ধতি কি ? শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি আমাকে শুধু বই পড়ে জানতে হয় নি। দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছি। পাঠক্রমের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজের কথা বলার অসুবিধা অনেক, তবু একজন শিক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বিষয়টা বুঝে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের যাঁরা পাঠক্রম রচনা করেন, তাঁরা অনেক সময় আমাদের শিক্ষার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম যেভাবে রচিত তা থেকে শিক্ষকগণ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানবার বেশী সুযোগ পান। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে ৪০।৫০টি ছেলেকে শিক্ষা দিতে হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের এক "শিক্ষাশিবিরে" আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে বলার পর শিক্ষকগণ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্যার ৪০।৫০টি ছেলেকে এক ক্লাসে কি এভাবে পড়ান সম্ভব।' আমার মনে হয় এ প্রশ্ন আমাদের সমস্ত শিক্ষকের। শ্রেণী শিক্ষার সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েই এ ব্যবস্থাকে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। পাঠক্রমের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি শ্রেণী শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হলে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে কথা বলতে।

বই লিখতে শিক্ষা নীতি, পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠন সম্পর্কে ইংরেজী বাংলায় বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে। আমি প্রয়োজন মত বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নিয়েছি। কারো কারো লেখার প্রভাব আমার লেখায় থাকা অসম্ভব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমকে অনুসরণ করে তৃতীয় পত্রের কোন বই লেখা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। সম্পূর্ণ নতুনভাবে গ্রন্থ পরিকল্পনায় শ্রদ্ধেয় বনোয়ারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরামর্শে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। শিক্ষা পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠনের নতুন পাঠক্রম আরো ব্যাপক হয়েছে। আমি নিষ্ঠার সাথে পাঠক্রম অনুসরণ করেছি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে যেখানে নতুন কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পাঠক্রমের সীমা ছাড়িয়ে যেতে কুণ্ঠিত হই নি।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব পর্বে পাঠক্রম বহির্ভূত দেহবিজ্ঞান প্রসঙ্গ লিখে পুস্তকের কলেবর স্ফীত করি নি।

শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের আমার পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকের নিকট আমি ঋণী। তাঁদের ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি। প্রীতিভাজনীয়া শ্রীমতী বিভা চৌধুরী, এম এ. বি. টি., সন্ধ্যা মজুমদার এম. এ. বি. টি., জ্যোৎস্না দাস এম. এ. বি. টি., তাঁদের পাঠপরিকল্পনা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রুফ দেখতে পারি না বলে দায়িত্বটা অন্যত্র চাপিয়েছিলাম। যাঁরা প্রুফ দেখেছেন তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল বহু রয়ে গেল, এ জন্য আমি লজ্জিত।

আমার শিক্ষক সহকর্মীগণ যদি এ বই পড়ে সামান্য উপকৃত হ'ন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে জানব। ইতি—

৯ই এপ্রিল, ১৯৬৭ বিনীত—

৪।২৯ নেতাজী নগর রণজিৎ ঘোষ

কলিকাতা-৪০

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশে'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বইখানি যে পাঠকবর্গের স্বীকৃতি পেয়েছে তার জন্য লেখক হিসেবে আনন্দ অনুভব করছি।

'শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ' চতুর্থ সংস্করণে নতুন কলেবরে প্রকাশিত হ'ল। অঙ্গ সজ্জা একই রকম থাকলেও বইটি আমূল পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত। সে হিসেবে এই সংস্করণ একটি পৃথক বই হিসেবে দাবী করতে পারে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্র এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। বিদ্যালয় সংগঠন ও স্বাস্থ্য তত্ত্ব অংশ পরিপূর্ণ ভাবে পরিবর্ধন করা হয়েছে; পদ্ধতি অংশের পরিবর্তনও যথেষ্ট। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও প্রশ্নপত্রের কথা চিন্তা করা হয়েছে, এই বইখানি তাই কলিকাতা, বর্ধমান, বিশ্বভারতী, কল্যাণী, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ ও উচ্চ বুনিয়াদী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগবে। আর যাঁরা শিক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন বইখানি তাঁদেরও কাজে লাগবে বলে আশা করি।

আমাদের শিক্ষকবন্ধুগণ ও শিক্ষানুরাগী পণ্ডিতবর্গ যদি বইখানি পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন তবে আমাদের শ্রম সার্থক হ'ল বলে মনে করব। ইতি—

বিনীত—

রণজিৎ ঘোষ

সত্যগোপাল মিশ্র

REVISED B. T. SYLLABUS

CALCUTTA UNIVERSITY

Paper III : General Methods, School Organisation & Health Education : 100 Marks

Significance of Methodology—Need for satisfactory Methods. Evolution of teaching methods—Logical and Psychological approaches. Progressive methods of teaching. Class-teaching—individualised instruction—activity method. Workshop and other Group Methods.

Factors involved in Methods. Criteria of a good methods Technique of instruction. Planning a lesson. Exposition and illustratien. Art of questioning. Teaching aids and appliances. Audio-visual aids. Correlations and integration of studies. Modern methods of evaluation : examinations and tests. Pupil progress and promotion. Cumulative Record Card. Measurement of teaching efficiency.

School plant—Building and equipment. Laboratory—library. Workshop—museum—subject-rooms. Gymnasium and Playground.

General organisation and administration. The Headmaster. Teachers' council. Time-table. Supervision.

Parent-teacher co-operation. Pupil-teacher relationship. School inspection.

Organisation of co-curricular activities. Physical education—Games and sports.

Health education—cardinal principles of community hygiene. Personal hygiene. School-health service—Medical inspection and treatment, follow-up service. School meal. School sanitation.

JADAVPUR UNIVERSITY

B. Ed. Course

Paper IV

General Method and Evaluation

Significance of methodology. Need for Satisfactory methods. Evaluation of teaching methods. Logical and Psychological approaches. Progressive methods of teaching. Class teaching individualised instruction. Activity methods. Project, Workshop and other group methods.

Factors involved in methods. Criteria of a good method. Techniques of instruction. Planning lesson. Lecture, exposition and illustration. Art of questioning. Teaching aids appliances. Audio-visual aids and communication. Correlation and integration of studies.

Need for a new approach to examination. The 'why'. 'how', 'what' and 'when' of evaluation. Evaluation in relation to educational objectives and learning experiences. Evaluation as means to measure and improve educational achievement.

Objectives of evaluation : (i) Knowledge. (ii) Application of knowledge and problem-solving, (iii) Improved performance and behaviour, (iv) Change in interests, character traites and attitudes.

Specific objectives of evaluation connected with different school subjects. Techniques of evaluation. Improved type of written examination. Oral tests and practical examination. New type tests. Objective-based objective tests. Diagnostic tests. Interest inventories, aptitude tests and rating scales. Questionnaires ; Internal assessment. Observation. Pupil-products.

Cumulative Record Card—its special value as an evaluation tool. Characteristics of good evaluation tools. Evaluation movement in India and abroad.

P. G. B. T. COURSE

Govt. of West Bengal

General methods of Education and Basic Education

1. General principles of method : factors which determine good teaching ; factors which facilitate learning and communication.

2. Methods of teaching ; Inductive and Deductive method ; Analytic and synthetic method , Problem-solving method , Supervised study techniques.

3. Media of teaching : Discussion, story-telling, dramatisation, reporting and reciting, questioning, audio-visual aids and blackboards, community resources.

4. Drill, review lessons.

5. Individualising instruction : Integrated Teaching techniques, Activity method, Project method, Unit Plan, Dalton Plan, Assignments.

6. Planning schemes of work and lesson units ; structure of a lesson for different age-groups and for different types of schools.

7. Method of Basic Education : Correlated teaching : how to prepare schemes of correlated lessons.

8. Teaching the 3-R's, Science, Social Studies, Art, Craft, etc. in the Junior Basic School.

9. Directing creative learning, creative teaching.

10. Group methods of teaching , socialised techniques.

11. Teaching in small schools, multiple class teaching.

12. Teaching gifted and backward children.

School Administration

1. The factors which determine educational administration—classification of schools—different types of schools in

West Bengal ; the concept of Basic Schools, the concept of a child-centred school—the concept of a community school.

2. Organisation of learning and teaching in Basie and Secondary Schools.

3. Organisation of different activities in Basic Schools, viz., community life, crafts, creative activities. festivals. etc., organisation of training for leadership and democratic living.

4. Time-table for different types of schools (Elementary and Secondary).

প্রথম পর্ব

বিদ্যালয় সংগঠন

(School Organisation)

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রন্থাগার (Libary) ৩৪-৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালনা (General Organisation and School Administration) ৪৮-৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

সময় তালিকা (Time-Table) ৭৬-৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক ৮৯-১০৭
(Parent Teacher Co-Operation)

সপ্তম অধ্যায়

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ১০৮-১২২
(Co-curricular Activities)

অষ্টম অধ্যায়

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসন ১২৩-১৩২
(School Self-Government)

দ্বিতীয় পর্ব

বিশেষ পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় ... পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

অনুবন্ধ প্রণালী ১৭৮-১৮৯
(Correlation of Studies)

নবম অধ্যায়

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ১৯০-২২৯
(Examination and Evaluation)

দশম অধ্যায়

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ২৩০-২৪২
(Cumulative Record Card)

তৃতীয় পর্ব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ১-৮৮
(Health Education)

বিষয়		পৃষ্ঠা

খাদ্য

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

শরীর শিক্ষা

শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ

প্রথম পর্ব

বিদ্যালয় সংগঠন

(SCHOOL ORGANISATION)

School Plant—Building and equipment.
Laboratory—Library.
Workshop—Museum, Subject-room, Gymnasium and Play ground.

General organisation and Administration. The Headmaster. Teacher's Council. Time-table supervision.

Parent—Teacher Co-operation. Pupil-teacher relationship. School Inspection.

Organisation of Co-curricular activities. Physical education—Games and sports.

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

(INTRODUCTION)

একদিনের অসভ্য, বর্বর মানুষ আজ শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য-কলা, সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। সেদিনের অরণ্যচারী মানুষ আজ তাই নভোচারী। মানুষের এত উন্নতির মূলে আছে শিক্ষা। শিক্ষাই মানবজীবনকে সর্বোত্তম বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষার সবচেয়ে বড় agency হ'ল বিদ্যালয় পৃথিবীর প্রতিদেশেই বিদ্যালয় শিক্ষাদানের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। সমাজের বুকে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যেন এক একটি জ্ঞান-বর্তিকা,—যার আলোকে নিকটবর্তী এলাকা জ্ঞান-প্লাবিত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় হ'ল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের বিভিন্ন মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান শিক্ষাগ্রহণের জন্য। শিক্ষাদানের পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলির। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের সাফল্যের উপর সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে। একদিন আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুগৃহে গিয়ে লেখাপড়া শিখতো। আজ আমাদের দেশেও অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছেলে-মেয়েরা আসে শিক্ষাগ্রহণের জন্য। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকে তাই সর্বাধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে সুন্দর ও মধুর পরিবেশে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে জ্ঞানার্জন করতে পারে তার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা বিদ্যালয়ে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের এত উন্নতির দিনে সকলেই সবকিছু কাজকর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এলোমেলো ও পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম উদ্দেশ্যহীন বিশৃংখল পথে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যালয় সংগঠনের (School Organisation) প্রয়োজন হয়। সমাজের বুকে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে যে চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, তদ্বির-তদারক ও মেহনত করতে হয় তা বিদ্যালয় সংগঠনের অন্তর্গত। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক

সংগঠন কি?

কাজকর্মকে 'সংগঠন' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, **Ryburn** তাঁর "*The Organisation of School*" গ্রন্থে বলেছেন,—"*Organisation is the embodiment of a spirit and of an ideal. According to aim that we have before us, so will the organisation of our institution.*" বিদ্যালয় সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলিকে মনে রাখতে হবে।

সমাজের বুকে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হয়। আমাদের মত অনগ্রসর ও অশিক্ষিত দেশে সে কাজ আরো কঠিন। বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, ঘরবাড়ী নির্মাণ, আসবাব পত্র সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করেও সরকারী অনুদানের জন্য ২।৩ বছর বা তারও অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সরকার যেখানে শিক্ষাসংকোচন নীতিতে বিশ্বাসী সেখানে বিদ্যালয় সংগঠন অতি দুরূহ কাজ। বিদ্যালয়ের জন্য জমি সংগ্রহ করতে কোন জমিদার বা লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকে অনেক তোষামোদ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ১।২ একর জমির জন্য তাঁদের মাতাপিতার নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়।

বিদ্যালয় সংগঠন

তারপর বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে ও আসবাব পত্র সংগ্রহে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যেতে হয়। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র সংগৃহীত হলে ছাত্র সংগ্রহ ও শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। শিক্ষকগণ প্রাথমিক অবস্থায় বিনা বেতনে কাজ করতে রাজী থাকেন। পরে সরকারী অনুদানের জন্য D. I, D. P. I. (Boord of Secondary Education)-এর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে হয়। অনেক সময় কিছু টাকা ঘুষ দিয়েও বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী আদায় করতে হয়। তারপর বিদ্যালয় চলে অনেকটা স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে অনেক সমস্যা মাথা নাড়া দিয়ে উঠে। সাংগঠনিক পথে তার সমাধান করতে হয়। ছাত্র বিশৃংখলা, আর্থিক সমস্যা তো আজকের বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের ঘটনা। বিদ্যালয়ের সংগঠন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় বিদ্যালয় সংগঠন (School Organisation) ও বিদ্যালয় প্রশাসনকে (School Administration) এক করে দেখা হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয় প্রশাসন বিদ্যালয় সংগঠনের একটি অংশ। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি (School Managing Committee) বিদ্যালয় সংগঠনের দায়িত্ব বহন করেন। আর বিদ্যালয় প্রশাসনের মুখ্যদায়িত্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনাকে কেন্দ্র করে যে সব কাজকর্ম পরিচালিত হয় তা হ'ল প্রশাসনিক ব্যাপার। আর বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পরিবেশ সৃষ্টি ও উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন বিদ্যালয় সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত। বিদ্যালয় সংগঠন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে পড়াশুনা করতে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে তাদের

ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বীজের মধ্যে যেমন বিরাট বনস্পতির অগাধ সম্ভাবনা থাকে। তেমনি একটি শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ নাগরিকের অনন্ত সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার কাজ হ'ল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তার সর্বোত্তম বিকাশে সহায়তা করা। বিদ্যালয় সংগঠন সেকাজে সাহায্য করে। বিদ্যালয় সংগঠন বিদ্যালয়ে এমন পরিস্থিতির সমাবেশ করবেন যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ;—যাতে প্রতিটি মানুষ ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। বিদ্যালয়ের কেন্দ্র বিন্দু হ'ল তার ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয় সংগঠন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজকর্ম পরিচালনা করবে।

বিদ্যালয় সংগঠন ও শিক্ষার্থী

সমাজের বুকে বিদ্যালয়গুলি হ'ল এক একটি জ্ঞান বর্তিকা। সমাজের মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠায় শিক্ষাগ্রহণ করতে। বিদ্যালয়ের কাছে সমাজের আশা তাই অনেক। কারণ বিদ্যালয়গুলিই সমাজকে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক উপহার দেয়। সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি তাই বিদ্যালয়গুলির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সমাজ তাই বিদ্যালয় সংগঠনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয় সংগঠনে, বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে সমাজের প্রতিনিধিত্ব ও কর্তৃত্ব থাকে। বিদ্যালয় সমাজ জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যালয়ের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবন সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যালয়ে যে সব উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয় তাতে সমাজজীবন অসহ্য দারিদ্র্য ও বেকার জীবনের জ্বালার মধ্যেও আনন্দ ও সৌন্দর্যের আস্বাদ পায়। বিদ্যালয় তাই সমাজের প্রাণকেন্দ্র।

বিদ্যালয় সংগঠন ও সমাজ জীবন

জাতীয় শিক্ষানীতি

(National Educational Policy)

জাতীয় শিক্ষানীতি বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয় সংগঠনকে তাই জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সম্পর্কিত রাখতে হয়। কারণ জাতির ভবিষ্যৎ এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক শৃংখলাবোধও বিদ্যালয়গুলি থেকে আসে। বর্তমানে ছাত্র বিশৃংখলাই সমাজ-জীবনকে চরমভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় নাগরিকের **গণতান্ত্রিক চেতনার (Democratic Sense)** উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা এই গণতান্ত্রিক চেতনা বিদ্যালয়গুলি থেকেই অর্জন করে। বিদ্যালয় সংগঠনে তাই গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বিদ্যালয়গুলি রক্ষা করে চলবে ; এবং সে বিষয়ে বিদ্যালয় সংগঠন সজাগ থাকবে। বিদ্যালয় সংগঠন তাই

জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিদ্যালয় সংগঠন

জাতীয় শিক্ষানীতি, শৃংখলা, গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখবে।

বিদ্যালয় গৃহ, আসবাব পত্র, ছাত্র ও শিক্ষক থাকলেই শিক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হয় না। সেগুলিকে সুসংগঠিত করে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ, পাঠ্যক্রম (curriculum) ইত্যাদিকে শিক্ষাদানের সময় যথাযথভাবে অন্বিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে। সেই পাঠ্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের নিকট পর্যন্ত পৌছে দেওয়া বিদ্যালয় সংগঠনের অন্যতম কাজ। বিদ্যালয় সংগঠন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (co-curricular Activities) ও স্বাস্থ্যশিক্ষার (Health Education) দিকেও সুতীব্র নজর রাখবে। বিদ্যালয় পরিচালনার উপরও বিদ্যালয় সংগঠন কর্তৃত্ব করবে। বিদ্যালয়ের সবকিছু বিষয় ও বস্তুকে যথাযথভাবে সম্পর্কযুক্ত করে

সমন্বয়-সাধনই বিদ্যালয় সংগঠনের মূলকথা।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে ব্যবহার করাই বিদ্যালয় সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় সংগঠনকে তাই সব কিছুকে সম্পর্কযুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কোন জায়গায় কি করলে, বা কাকে পাঠালে কোন কাজ সর্বোত্তম ভাবে সাধিত হবে বিদ্যালয় সংগঠন সেদিকে নজর রাখবে। বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল **বিদ্যালয় সংগঠন। P. C. Wren** তাই বলেছেন,—"*Organise the School to benefit the Scholar, to train his faculties, to widen his out look, to cultivate his mind, to form and strengthen his character, to develop and cultivate aesthetic faculty, to build up his body and give him health and strength, to teach his duty to himself, the community and the state organise the school for this end and not to prepare for Matrieulation Examination.*" শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানই হ'ল বিদ্যালয় সংগঠনের মূলকথা। বিদ্যালয় সংগঠন তাই সেদিকে জোর দেবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র থাকে। প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি আলাদা। ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual differences) কথা মনে রেখে বিদ্যালয় সংগঠন চলবে, ফলে ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হবে; সমাজ ও রাষ্ট্র উপযুক্ত ভবিষ্যৎ নাগরিক পেয়ে উপকৃত হবে।

বিদ্যালয় সংগঠন ও ব্যবস্থায় সংগঠন (Business Organisation) এক

অন্যান্য সংগঠন ও বিদ্যালয় সংগঠন

জিনিস নয়। ব্যবসায় সংগঠনে থাকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। হৃদয়ের সম্পর্ক অপেক্ষা পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বই সেখানে বড় কথা। কিন্তু বিদ্যালয়ে হৃদয়ের সম্পর্কই বড় কথা। সহানুভূতি, মানবিকতা, উদারতা, করুণা, প্রীতি, শুভেচ্ছা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিদ্যালয়

সংগঠন গড়ে উঠবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এক অকৃত্রিম হৃদয়ের সম্পর্কই বিদ্যালয় সংগঠনকে সাফল্য এনে দিতে পারে। বিদ্যালয় সংগঠনে তাই প্রীতি ও মানবিকতার উপরই জোর দিতে হবে। বিদ্যালয় সংগঠনের বিষয় ও পরিধি হ'ল বিশাল। অথচ এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হ'ল।

প্রশ্নাবলী

(1) Pupil, teacher, curriculum, and Community constitute the quartet of the School world. Disscuss the functional relationship of the four in the education of the child.

(K. U. B, T.—1968)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম

(SCHOOL PLANT BUILDING AND EQUIPMENT)

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপর্বের শুরু যেদিন থেকে সমাজে হয়েছিল সেদিন থেকেই শিক্ষার্থীর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় গুরু বা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন ভারতের বিদ্যার্থীকে তপোবনে গুরু গৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বোধ

প্রাচীন যুগের বিদ্যালয়

হয় প্রাচীন ভারতের আচার্যকুল নগরের কলকোলাহলের বাইরে শান্ত নির্জন পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন শুরু হয়। বৌদ্ধযুগে আমরা প্রথম আধুনিক অর্থে সংগঠিত বিদ্যালয় দেখতে পাই। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার বা মঠকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠেছে। সে যুগের ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা মন্দির, মঠ, বিহার, মসজিদ, গীর্জাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা গড়ে উঠেছে। ভারতের মসজিদ সংলগ্ন মক্তব আর চণ্ডী-মণ্ডপে প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ, সাজসরঞ্জাম ও আসবাব পত্রের ব্যবস্থা আধুনিক যুগের শিক্ষার অঙ্গরূপেই দেখা দিয়েছে। আধুনিক সমাজজীবন জটিল আকার ধারণ করেছে। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ মানুষের সমস্যাসংকুল জীবনকে প্রভাবিত করেছে। জ্ঞানের জীবন্ত আলোক-

আধুনিক শিক্ষায় বিদ্যালয় সমাজের বাহক

বর্তিকার মতো দিকে দিকে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিককালে বিদ্যালয় বলতেই আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এমন কিছু উপযুক্ত গৃহ যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে শিক্ষাগ্রহণ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় যেতে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীর জীবনের কত আনন্দ বেদনা এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত তা বলে শেষ করা যায় না। আধুনিক সমাজজীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে এই বিদ্যালয়গুলি।

মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়
(Open-air School)

বিদ্যালয় গৃহ যে একেবারে অপরিহার্য তা নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনে গাছের তলায় এবং খোলা জায়গায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শান্তিনিকেতনে উন্মুক্ত প্রান্তরে গাছের ছায়াতলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনকে সরস করে; শিক্ষাদান আকর্ষণীয় হয়। প্রচুর আলো ও বাতাসে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। প্রকৃতির স্পর্শে শিক্ষার্থীদের মনে প্রশান্তি, উদারতা ও আনন্দবোধ সঞ্চারিত হবে। তবে সব ঋতুতে এই মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে অসহ্য গরমে ও প্রবল বন্যায় মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয় সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কস প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তবে বিদ্যালয় গৃহের সঙ্গে কিছু কিছু পরিমাণে মুক্তাঙ্গন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। তাতে শিক্ষা বৈচিত্র্যময় হয়।

মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়

বিদ্যালয় পরিবেশ
(Environment of the School)

মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। বিদ্যালয়ে মানুষের জীবনের একটি বিশেষ সময় অতিবাহিত হয়—সে সময়টি হচ্ছে মানবজীবন গড়ে ওঠবার সময়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যায়। শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার দেহ ও মন বিদ্যালয় পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে আমাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না। বিদ্যালয়ে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির সময় আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসবে। বিভিন্ন পরিবারের পরিবেশ বিভিন্ন। আর্থিক ও শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্য পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় অসমান পরিবার সমূহের শিক্ষার্থীদের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় একই রূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যার প্রভাবে সবার মধ্যে যেন একই রূপ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে ও পারিবারিক আবহাওয়ার বাইরে কলুষতামুক্ত স্কুলের পবিত্র পরিবেশে সবাই যেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সমান সুযোগ পায়। বিদ্যালয়কে সমাজের আদর্শরূপ হিসেবে কল্পনা

বিদ্যালয় হচ্ছে Balanced Purified Society

করতে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন,—"*Balanced purified society.*" বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে এলে মানুষে মানুষে আমরা যে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করেছি সেকথা যেন শিক্ষার্থীর মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায়। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে একটা ঐক্য-বোধ সৃষ্টি হবার পরিবেশ হবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ। বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে আদর্শ সমাজের অনুরূপ, তবে সমাজের কলুষতা যেন সেখানে থাকে না। বিদ্যালয় সমাজের শান্ত পবিত্র পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনযাত্রা শুরু হবে।

লোকালয়ের অনতিদূরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। প্রচুর আলোবাতাস যুক্ত খোলা জায়গায় স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা এই সব বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে সুন্দর, মধুর ও পবিত্র। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হবে বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর করবার প্রাথমিক পর্যায়। বিদ্যালয়কে পুকুর, পার্ক (Park), বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করতে হবে। এই পরিবেশে শিক্ষার্থীর মন সর্বপ্রকার আবিলতা মুক্ত হবে। বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীদের কাছে আদরণীয় ও আকর্ষণীয়। আর সুন্দর ও সার্থক পরিবেশযুক্ত বিদ্যালয় হবে সমাজের প্রাণকেন্দ্র।

বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা

(Necessity of a School Building)

প্রাচীন যুগে মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ত ছিল। বর্তমান যুগে উন্মুক্ত স্থানে গাছের ছায়ায় শিক্ষার সম্পূর্ণ আয়োজন করা সব সময় সম্ভব নয়। জীবনের ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে। শিক্ষার আজ বহু দিক,—নানাবিধ শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন করতে হলে প্রয়োজন বহুবিধ সাজসরঞ্জাম, গবেষণাগার, পাঠাগার, বিষয়-কক্ষ প্রভৃতির। তাই আর মুক্তাঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসারের সাথে শহরে শহরে বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে—সেখানে গাছের ছায়া, উন্মুক্ত প্রান্তর কিছুই নেই। এছাড়া গ্রামেও উন্মুক্ত পরিবেশে বিদ্যালয় করার পথে ঝড় জলের অসুবিধা রয়েছে। স্থায়ী ভাবে মুক্তাঙ্গনে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন ও হরিদ্বার গুরুকুলের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে শান্তিনিকেতনে গাছের নীচে পড়াতে দেখেছি—বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রকম বাড়-বাড়ন্ত আর চারদিকে যেভাবে বড় বড় দালান উঠেছে তার ফলে পূর্ব ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় না।

নগর কেন্দ্রীক শিক্ষায় বিদ্যালয় গৃহের উদ্ভব

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব ঘর অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়গৃহে শিক্ষার্থীর জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত হবে। বিদ্যালয়ে ছেলেরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে। অপরিহার্যরূপে বিদ্যালয় পরিবেশের ছাপ শিক্ষার্থীদের মনে গাথা হয়ে রইবে। যে স্থানকে বা যে গৃহকে আমরা শিক্ষার পবিত্র আবাস বলে মনে করি সেই পবিত্র শিক্ষা-নিকেতন কিরূপ হওয়া উচিত, কোন পরিবেশে একটি আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে, সবদিক বিবেচনা করেই আমাদের বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করতে হবে। কোন রকমে একখানা বাড়ী যোগাড় করে স্কুলের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলে আজকাল ছাত্র যোগাড় করতে অসুবিধা নেই। যেখানে স্কুলের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি সেই পরিবেশে স্কুল খুললে তার প্রভাব ছাত্রদের পক্ষে কখনও শুভ হবে না।

আধুনিক শিক্ষার বিদ্যালয় গৃহ একটি অপরিহার্য অঙ্গ

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলেও বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি (National Educational Policy) রূপায়ণের জন্য বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার (School Administration) জন্যও বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন অপরিহার্য। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী প্রভৃতির জন্যও বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমও (curriculum) বিদ্যালয় গৃহের দিকে তাকিয়েই রচিত হয়। কাজেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যালয় গৃহ অপরিহার্য। এই সমস্ত বিদ্যালয় গৃহের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের ঐতিহ্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে, ***We first shape our building and then it shapes us.***

বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন

(Selection of a School Site)

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে শিক্ষকদের কোন হাত নেই, যারা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন তাঁরাই বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন করেন। বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচনকালে প্রথমেই দেখতে হবে স্থানটি খোলা ও আলো-হাওয়া যুক্ত কি না। বড় শহরে খোলা জায়গায় স্কুলের জন্য স্থান সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। ছোট শহরে একটু দূরে আলো-বাতাস যুক্ত খোলা জায়গা পাওয়া যায়। গ্রামের স্কুলের স্থান নির্বাচনকালে দেখতে হবে স্কুল যেন এমন জায়গায় হয় যে দু'তিন গ্রামের শিক্ষার্থীরা সেখানে সহজেই আসতে পারে। শুধু বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা থাকলেই হবে না।

আদর্শ বিদ্যালয় পরিবেশ

বিদ্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, বোর্ডিং-এর জন্য জায়গা, খেলার মাঠ, বাগান, পুকুর প্রভৃতির জন্যও স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের বাইরে বা গ্রামের প্রান্তেই অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ স্থান সংগ্রহ করা যায়। বেশ কিছু জায়গা পাওয়া গেলে দোতলা বা তেতলা বাড়ী বানাতে হবে না। উঁচু দালানের সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা নামা করা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। জনাকীর্ণ শহরের দূষিত আবহাওয়ার বাইরে স্কুল হলে স্বাস্থ্যের দিক থেকেও হিতকর। শিক্ষার্থীরা যদি বাড়ী থেকে একটু হেঁটে স্কুলে যায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালই হবে। মেয়েদের স্কুল যেন শহরের প্রান্তে বা গ্রামের বাইরে না হয়।

স্কুলের জমিতে ছায়াবান বৃক্ষ থাকলে ভাল হয়; যদি কোন গাছ না থাকে তবে গাছ লাগিয়ে, বাগান করে একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। ছেলেদের মনের দিক থেকে শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। গাছ লাগিয়ে ছায়া-ঘেরা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য গাছের ছায়ায় দু' একটি ক্লাস নিলে ছেলেদের ভালই লাগবে। স্কুলের জন্য যে জমি নির্বাচিত হবে তা যেন নীচু বা স্যাঁতস্যাঁতে না হয় বা কোন জলা জমির পাশে না হয়। উঁচু শুকনো জমিই স্কুলের পক্ষে উপযোগী। স্কুল ঠিক রাস্তার পাশে হওয়া ঠিক নয়, তাহলে গাড়ীর যাতায়াতের শব্দে স্কুলের শান্তি ভঙ্গ ও ছেলেদের মন বিক্ষিপ্ত হবে। ধুলার উপদ্রব স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। আবার রাস্তার থেকে খুব দূরে হলে যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা হবে। স্কুলের স্থান নির্বাচনে দেখতে হবে কলকারখানা, বস্তি, স্টেশন বা সিনেমাঘর যেন স্কুলের কাছে না থাকে। স্কুলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার পক্ষে এ সব স্থান অনুকূল নয়।

বিদ্যালয়ের জমি সংগ্রহে সাবধানতা

আমাদের দেশে এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেগুলির জায়গা স্থানীয় কোন জমিদার বা উৎসাহী ব্যক্তি তাঁর কোন আত্মীয়পরিজনের স্মৃতিরক্ষার্থে দান করেছেন। সেই জায়গার উপরই বিদ্যালয় গড়ে উঠে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচনের প্রশ্নই উঠে না। কারণ দাতাই নিজের পছন্দমত জায়গা দান করেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জায়গা কোন পোড়ো জায়গা বা নীচু জমি যা কৃষিকাযের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই এদেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহু বিদ্যালয় গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীর কর্তব্য আছে। কোন এক ব্যক্তির মহানুভবতা ও বদান্যতায় কোন বিদ্যালয় গড়ে উঠবে কেন?—বিশেষ করে তা যখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠছে। বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচনের উপর তাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। এবং সব সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এই

আমাদের দেশে বিদ্যালয় স্থান নির্বাচন

স্থানে বিদ্যালয় গড়ে উঠলে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত সম্ভাব পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতিকূল পরিবেশ পাবে।

বিদ্যালয় গৃহ

(School Building)

সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয় গৃহটি নির্মিত হবে। **বর্তমান প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসারের সম্ভাবনার** দিকে দৃষ্টি রেখে বিদ্যালয় গৃহের পরিকল্পনা করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহ জাঁকজমকপূর্ণ হবে না, কিন্তু শ্রী-সম্পন্ন হবে। সাধারণ ভাবে তৈরি হলেও তার একটা নিজস্ব আভিজাত্য থাকবে। শিক্ষার উচ্চাদর্শের কথা বিদ্যালয় গৃহের বৈশিষ্টপূর্ণ গঠনের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে। ছাত্র জীবনে বিদ্যালয় গৃহের প্রভাব সম্পর্কে *M. S, Mohiyuddin and M. Siddalingaiya* বলেছেন—"*A simple dignified and artistic building, suggestive of the purpose for which it is intended is a very desirable thing from many points of view. It's beauty and association help to make the scholars proud of their connection with the school, and they exercise a lasting influence upon the neighbourhood. In a certain measure it is a concrete manifestation of the ideals for which the school stands. It is a permanent material expression of spiritual thing.*"[১]

আদর্শ বিদ্যালয়গৃহ

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা **স্বাস্থ্যবিধি** মেনে করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহে যেন প্রচুর আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আলো প্রবেশ করলে তা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আলো যেন ঘরের ছাদে প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমাদের দেশে স্কুল ঘর দক্ষিণমুখী হলে ভাল হয়, তাহলে গরমের দিনে দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া আসার সুবিধা হয়।

বিদ্যালয় গৃহ কত বড় হবে তা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে ও অন্যান্য প্রয়োজন বিচার করে স্থির করা হবে। যে কোন পরিকল্পনায় যেন ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ রাখা হয়। বিদ্যালয়ের জন্য H, L, I, E, T অথবা U টাইপ বাড়ী প্রশস্ত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধা ও পছন্দ মত এর মধ্য থেকে বেছে নিয়ে যে কোন টাইপের বাড়ী করবেন। বিদ্যালয় গৃহ সম্ভব হলে একতলা

১। School Organisation and Management M. S. Mohiuddin and ddalingaiya.

হওয়াই সঙ্গত। দোতলা বা তেতলা বাড়ীতে বার বার ওঠানামা করা ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল নয়। আজকাল শহরে স্থানাভাবের জন্য দোতলা কি তেতলা স্কুল গৃহ তৈরী হচ্ছে। কলকাতায় চারতলা স্কুলগৃহও দেখা যায়। তবে কলকাতায় যা হচ্ছে তা নিয়মের ব্যতিক্রম। কলকাতায় এমন স্কুল বাড়ীও আছে যেখানে দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় এমন সমস্ত বাড়ীতে হয় যা সব দিক থেকে বিপজ্জনক। এ দিয়ে সাধারণ স্কুল গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত তার বিচার করা হবে না।

বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয় গৃহ

বিদ্যালয় গৃহগুলিকে নানাভাবে বিন্যস্ত করবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, H, L, I, E, T, U প্রভৃতি টাইপের যে বাড়ীগুলি তার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতিতে বাড়ীগুলি সারি সারি করে সাজানো থাকে বলে একে **সারিবদ্ধ ভঙ্গী (Row-type)** বলা হয়। বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করবার জন্য যদি অনেকগুলি জায়গা থাকে তবে ঘরগুলিকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **ছড়ানো পদ্ধতি (Scattered design)**। এই পদ্ধতি বিদ্যালয় গৃহগুলি বিভিন্ন Block-এ ছড়ানো থাকে। যাতায়াতের রাস্তা টিনের Shade দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে ঘরগুলিতে প্রচুর আলো-বাতাস পাওয়া যায়। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি হ'ল **হল্ কেন্দ্রিক পদ্ধতি (Central Hall Type)**। এই পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রিয় Hall থাকে, এবং তার পাশে অন্যান্য ঘরগুলি সাজানো থাকে। এই পদ্ধতিতে বড় হল ঘরটিতে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রিয় জমায়েত সম্ভব হয়। আর তার পাশাপাশিই থাকে বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট আলো-বাতাসের অসুবিধা হলেও বিদ্যালয় পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের সুবিধা হয়। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের অন্য একটি পদ্ধতি হ'ল **চতুষ্কোণ ভঙ্গী (Quadrangle Type)**। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের ঘরগুলি বর্গাকারে সাজানো থাকে এবং মাঝখানে থাকে এই বৃহৎ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সম্মিলিত হয়। কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে এই প্রাঙ্গণটিকে ত্রীপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের গৃহগুলিকে ঘন সন্নিবিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও জায়গা অনুসারে এই পদ্ধতিগুলিকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা ছাড়াও লাইব্রেরী, কমনরুম, পরীক্ষণাগার, বিভিন্ন বিষয়কক্ষ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ, অফিস, সাধারণ সম্মেলন বা সভাকক্ষের ব্যবস্থা থাকবে। যদি সম্ভব হয় অভিভাবক, যারা বাইরের থেকে স্কুলে কোন কাজে প্রধান বা অন্যান্য শিক্ষকের সাথে দেখা করতে আসবেন তাদের বসবার জন্য ঘর রাখা হবে। স্কুলের আসবাব-পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘর থাকবে। বিদ্যালয়ের কক্ষ

সংখ্যা বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার আনুপাতিক হবে। বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকে, বা যে সব সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয় সেদিক বিবেচনা করেও বিদ্যালয়ের কক্ষগুলি নির্মাণ করা উচিত।

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের সময় সবকিছুর দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয় গৃহের গাঁথুনি হবে সুদৃঢ় ও স্বাস্থ্যসম্মত। ঘরের ভিত হবে খুবই শক্ত। দেওয়াল মজবুত করে নির্মাণ করতে হবে। ঘরের ছাদ এমন হবে যাতে রোদের উত্তাপ আসতে না পারে। ঘরের মেঝে পরিষ্কার রাখবার ও ধোওয়া-মোছার জন্য জল-নিষ্কাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে দরজা-জানলা যথাযথভাবে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রাখতে হবে। কক্ষগুলিতে যেন যথেষ্ট আলো-বাতাস আসতে পারে। দেওয়ালের রং স্বল্প নীল মিশ্রিত সাদা হওয়াই ভাল। তবে দরজা-জানালার রং সবুজ করলে তা চোখের পক্ষে উপকারী হয়। ঘরগুলিতে আধুনিক উপায়ে বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেওয়ালে Black Board যথাযোগ্য স্থানে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ঘরগুলিতে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের (Future Expansion) সুযোগ রাখতে হবে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিতে শব্দ-নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে শিক্ষক মহাশয় যখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করবেন তখন তাঁর ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত না হয়। বাইরের বিভিন্ন শব্দ ও কোলাহল যাতে শিক্ষাকার্যকে ব্যাহত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের গৃহগুলিতে আলোক নিয়ন্ত্রণ ও বায়ু সঞ্চালনের (Ventilation) যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এইরূপ একটি বিদ্যালয় গৃহ শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে সহায়ক হবে।

বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, সহপাঠ্যক্রম, স্থান, পরিচালন ব্যবস্থা, ছাত্রসংখ্যা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কক্ষসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তবে একটি আদর্শ school plant-এ নিম্নলিখিত কক্ষগুলি থাকা প্রয়োজন—

১। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ (Class Room)
২। অফিস ঘর (Office Room)
৩। শিক্ষকদের বসবার ঘর (Staff Room)
৪। প্রধান শিক্ষকের ঘর (Headmaster's Room)
৫। সম্মেলন কক্ষ (Assembly Hall)
৬। পাঠাগার ও পড়বার ঘর (Library and Reading Room)
৭। পরীক্ষণাগার (Laboratory)
৮। গুদাম ঘর (Store Room)
৯। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম (Common Room)

০। সাইকেল ঘর (Cycle Shed)
১। শিল্পকলা কক্ষ (Art and Craft Room)
২। সংগ্রহশালা (Museum)
৩। ব্যায়ামাগার (Games Room)
৪। টিফিন ঘর (Tiffin Room)
৫। পায়খানা ও প্রস্রাব কক্ষ (Water closets and Urinals)
৬। দর্শনার্থীদের কক্ষ (Visitor's Room)
৭। হোস্টেল (Hostel)

এ ছাড়াও আদর্শ বিদ্যালয়ে জলপানের জন্য আলাদা কক্ষ থাকবে। শিক্ষকদের থাকবার জন্য Family Quater থাকা প্রয়োজন। N. C. C. ও স্কাউট ইত্যাদির জন্যও পৃথক ঘর প্রয়োজন। Guidance ও Counselling-এর জন্য Career Master-এর একটি পৃথক Guidance room প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে এই ঘরগুলি থাকলেই চলবে না। সেগুলিকে যথাযথভাবে সজ্জিত করতে হবে। এবং দেখতে হবে যে কোন ঘরটির পাশে কোন ঘরটি থাকলে কি কি সুবিধা অসুবিধা হতে পারে।

আদর্শ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ

শ্রেণীকক্ষ
(Class Room)

শ্রেণী কক্ষের আয়তন কত বড় হবে তা প্রতি শ্রেণীতে কতজন শিক্ষার্থী হবে তা দিয়ে স্থির করতে হবে। ছোট একখানা ঘরে ৪০।৫০ জন ছাত্র পুরে দিলে সে শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে না, সেখানে চলাফেরার জায়গা থাকবে না, গণ্ডোগোল হবে পড়াশুনা হবে না। শ্রেণীকক্ষে ছাত্র পিছু কতটা জায়গা থাকবে মুদালিয়র কমিশন তা স্থির করে দিয়েছেন। কমিশন প্রতি ছাত্রের জন্য দশ বর্গফুট জায়গা রাখবার কথা বলেছেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আরো বেশী স্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইংলণ্ডে ছাত্র পিছু ১৪ বর্গফুট স্থান রাখতে হয়। আমাদের স্কুলগুলিতে এক একটি শ্রেণীতে ৪০টি, কি তার বেশী ছাত্রদের এক সাথে পড়ানো হয়। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, কোন শ্রেণীতে ৩০ জন খুব বেশী হলে ৪০ জনের বেশী ছাত্র কোন অবস্থায় নেওয়া হবে না। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ বা মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীতে বা শ্রেণীর বিভাগে (Section) ছাত্র-সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা বাস্তবে প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণী কক্ষগুলিতে ৪০।৪৫ জন ছাত্র এক সাথে বসে পড়তে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক শ্রেণীতে ৪০।৪৫টি ছাত্র থাকবে এ মোটেই আদর্শ ব্যবস্থা নয়—বাস্তবে যা ঘটছে তাই বলা

ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষ হবে

হ'ল মাত্র। একটি শ্রেণীতে নীচের দিকে যেখানে প্রতিটি ছাত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে সেখানে ২০।২৫ জন ও একটু উঁচু শ্রেণীতে ৩০।৩৫ জনের বেশী ছাত্র কখনও থাকা উচিত নয়—খুব বেশী হলে ৪০ পর্যন্ত ছাত্র উঁচু শ্রেণীতে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় অবস্থা বিচার করে কখনও চাপে পড়ে প্রধান-শিক্ষক এর চেয়ে বেশী ছাত্র নিতে বাধ্য হন; কিন্তু স্কুলের আর্থিক অসুবিধার জন্য বিভাগ খুলতে পারেন না।

শ্রেণীকক্ষ সমূহ বর্গাকার (Square) না হয়ে আয়তক্ষেত্রাকার (rectangular) হওয়া উচিত। শ্রেণীকক্ষ খুব লম্বা হলে শিক্ষকদের অযথা চিৎকার করতে হবে। পিছনের ছাত্রদের বোর্ডের লেখা দেখতে অসুবিধা হবে। তবে সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষের আয়তন ১৮´×২৪´ ফুটের কম হওয়া উচিত নয়। কিছু ছোট কক্ষেরও ব্যবস্থা থাকতে পারে। ঘরগুলি ১৬।১৭ ফুট উঁচু হবে এবং ছাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘরে একটির বেশী দরজা থাকবে না—এতে ছেলেরা শিক্ষকের অজানিতভাবে বাইরে যেতে পারবে না। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী হবে যাতে শ্রেণীর মধ্য দিয়ে আর একটি শ্রেণীতে যেতে না হয়। শ্রেণীকক্ষগুলি যদি পরিমাণ মত বড না হয় তাহলে বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড সব মিলিয়ে একটা গুদাম ঘরের অবস্থা হবে। ছাত্রদের চলতে ফিরতে অসুবিধা হবে। শিক্ষক যদি শ্রেণীতে চলাফেরা করতে না পারেন তা হলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি পরিমিত ঘর আর প্রচুর আলো হাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঘরে প্রচুর মুক্ত সূর্যালোক আসবার ব্যবস্থা থাকবে। আবছা আলোর মাঝে পড়লে ছাত্রদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। তার চেয়ে বড কথা প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকলেই ছাত্রদের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আলো হাওয়া যুক্ত ঘরে মনে যেমন একটা প্রফুল্লভাবের সৃষ্টি হয়, তেমনি প্রায়-অন্ধকার ঘরে মনটা দমে যায়। শ্রেণী কক্ষে কতটা আলো থাকবে তার পরীক্ষা হচ্ছে ঘরের যে কোন জায়গায় বসে একটি ছাত্র এক ফুট দূরে রেখে সাধারণ ছাপা বিনা কষ্টে পড়তে পারবে।

শ্রেণীকক্ষ কিরূপ হওয়া উচিৎ

প্রত্যেকটি কক্ষে প্রচুর জানালার ব্যবস্থা থাকবে। ঘরের মেঝের যে ক্ষেত্রফল তার $\frac{1}{5}$ বা $\frac{1}{6}$ অংশ হবে জানালার ক্ষেত্রফল। জানালা মেঝে থেকে ৩½ বা ৪ ফুট উঁচুতে বসান হবে। এতে ছাত্রদের দৃষ্টি বাইরের দিকে আকৃষ্ট হবার সুযোগ থাকবে না। আলো কোন দিক থেকে আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিছন দিক থেকে আলো আসলে সামনে যে বই বা খাতা থাকবে তার উপর ছায়া পড়বে। তাই সব চেয়ে ভাল যাতে বাঁ দিক থেকে আলো আসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আলোর সাথে হাওয়ার কথাও ভাবতে হবে। বন্ধ ঘরে ৩০।৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে

শ্রেণীকক্ষ আলো হাওয়া যুক্ত হবে

ক্লাস করলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ অবস্থায় ছাত্ররা সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর যদি বাতাস আসবার ব্যবস্থা না থাকে তবে অতি সহজেই তাদের মধ্যে অবসাদ দেখা দেবে। ঘর বড় হলেই হবে না, যাতে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস আসতে পারে ও দূষিত বাতাস বের করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বদ্ধ ঘরের গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে ছাত্ররা পড়ায় মনোযোগী হতে পারে না; তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ও নিস্তেজ ভাব দেখা দেয়। বাতাস সম্পর্কে বলা হয়—"*Air is food as truly as bread and meat*" একথা খুব সত্য।

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের দরজার সামনে ছাত্রদের দিকে মুখ করে বসবেন। তিনি যাতে একটু উঁচুতে বসতে পারেন সেজন্য প্ল্যাটফর্মের (platform) ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। শিক্ষকের সমগ্র ক্লাসের উপর নজর রাখতে হলে বড় ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ানই সঙ্গত। কিন্তু দেখা গিয়েছে সব সময় দাঁড়িয়ে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাই উঁচুতে বসবার ব্যবস্থা হলে সব ছাত্রদের উপর সাধারণভাবে নজর রাখা যায়। শিক্ষকের একপাশে দরজার বিপরীত দিকে ব্ল্যাক বোর্ড থাকবে, তাহলে বোর্ডে যথেষ্ট আলো পড়বে, ছাত্রদেরও দেখতে অসুবিধা হবে না। শ্রেণীকক্ষে যাতে মানচিত্র বা কোন চার্ট ঝুলান যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের বসার জায়গা

আসবাবপত্র

(Furniture)

জীবনে প্রথম যেদিন বিদ্যালয়ের সাথে পরিচিত হই সেদিন পাঠশালায় গিয়ে বসবার আসন নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। দিনের পর দিন শ্লেটের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে হয়েছে, আঁক কষতে হয়েছে। স্কুলের আসবাব পত্র বলতে ছিল গুরু মহাশয়ের বসবার একখানা জলচৌকি আর ছেলেদের নিয়ে যাওয়া চাটাই, ছেঁড়া চটের টুকরো ইত্যাদি। শিক্ষা সহায়ক একমাত্র সরঞ্জাম ছিল গুরুমহাশয়ের বেত। ৪০।৫০ বছর আগে এই ছিল পল্লী বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালার অবস্থা। এর অসুবিধা ও কুফল সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। শিশুর দৈহিক গঠনের পক্ষে মাদুরের উপর উবুড় হয়ে লেখা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া অসুবিধারও অন্ত নেই। এখনও বাংলার গ্রামে একটু ঘুরলেই এ চিত্রের সন্ধান মিলবে, এ ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই স্বাভাবিক বা শোভন ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া যায় না। যেখানে ছাত্রেরা পড়বে সেখানে বসবার জন্য প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্য-সম্মত আসবাব পত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বসবার আসন

চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র

এবং লিখবার ও বই রাখবার ডেস্ক খুব বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। ছেলেরা যেখানে দীর্ঘদিন বসে লেখাপড়া করবে তার সামান্য ত্রুটির জন্য দেহের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। তাই আসন ও ডেস্ক তৈরী করবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স ও দৈর্ঘ্য বিচার করে কাজ করতে হবে।

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আসন বা ডেস্কের উচ্চতা একরূপ হবে না। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য যে আসন ও ডেস্ক উপযোগী দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেই উচ্চতার ডেস্ক ও আসন চলবে না। আসন ও ডেস্ক বহু প্রকার হতে পারে, যেমন একজনের উপযুক্ত আসন ও ডেস্ক, দুজনের উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেস্ক, চারজনের উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেস্ক। সুবিধার বিচারে একক আসন সবচেয়ে ভাল। বসবার সুবিধা ও একজনে আরেকজনের অসুবিধা করতে পারে না। চলাফেরার সুবিধা—সহজেই উঠে যাওয়া যায় ও ফিরে এসে বসা যায়। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভাল, কারণ একজন আরেকজনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারে। তাই একজনের ছোঁয়াচে রোগ আরেকজনে সংক্রামিত হতে পারে না। একজনের লেখা আরেকজনে দেখতে পারে না। শিক্ষকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রদের কাছে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সহজ হয়। এর অসুবিধা হচ্ছে ক্লাসে জায়গা বেশী লাগে আর অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। যে দেশের স্কুলগুলিতে একই জায়গায় একই রকম বেঞ্চে বসে আর হাইবেঞ্চ সামনে দিয়ে সকালে প্রাথমিক স্কুল, দুপুরে মাধ্যমিক স্কুল কখনও আবার রাতে কলেজ হয় সেই দেশের স্কুলে একক আসনের ব্যবস্থা বাস্তবে সম্ভব নয়। দু'জনের উপযুক্ত আসন ও ডেস্ক সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য। তবে উপযোগীতার দিক থেকে বিচার করলে এ ব্যবস্থাও ভাল। কলকাতার কিছু স্কুলে একক বা দ্বি-আসনযুক্ত ডেস্কের ব্যবস্থা আছে। তবে তা হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। আমরা সাধারণভাবে চারজনের উপযোগী বেঞ্চই দেখি। এই আসনগুলি কখনও ডেস্কের সাথে জোড়া হয় কখনও পৃথক থাকে। চারজনের উপযুক্ত ডেস্ক ও বেঞ্চ খরচের দিক থেকে সুবিধাজনক কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে এর অসুবিধা অনেক। তবু বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে একেই যতটা সম্ভব স্বাস্থ্য সম্মতভাবে ব্যবহার যোগ্য করে নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের বসার আসন কিরূপ হওয়া উচিৎ

ছাত্রদের বয়সের ও উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে আসন ও ডেস্কের উচ্চতার পার্থক্য হওয়া উচিত। বসবার বেঞ্চও এমন হবে না যাতে ছাত্রদের পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। আসনের উচ্চতা স্থির করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে,—দেখতে হবে ছাত্রেরা বেঞ্চে বসলে পা ঠিক মাটি স্পর্শ করে। চারজন ছাত্র বসবার উপযোগী বেঞ্চগুলি ৬´ ফিট দীর্ঘ হবে। প্রতিটি ছাত্রের জন্য ১৮˝ ইঞ্চি স্থান ধরে এ হিসেব করা হয়েছে। আমাদের স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১২˝ ইঞ্চির বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না।

আসনের উচ্চতা

বেঞ্চের সামনে লিখবার জন্য ডেস্ক থাকে। ডেস্ক জোড়া বা পৃথক দু'রকমই হতে পারে। জোড়া ডেস্ক হলে একটু অসুবিধা হয়। ডেস্ক যদি জোড়া না থাকে তাহলে প্রয়োজনমত ডেস্ক কাছে আনা ও দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়। জোড়া ডেস্ক ও বেঞ্চের দূরত্ব সব সময় নির্দিষ্ট থাকবে বলে অসুবিধা হয়। লিখবার সময় বা দাঁড়িয়ে পড়া বলবার সময় আলগা ডেস্কে এই অসুবিধা হয় না। কারণ প্রয়োজনমত দূরত্ব কমিয়ে-বাড়িয়ে নেওয়া চলে।

বসবার বেঞ্চ যতটা বড হবে ডেস্ক ততটা বড় হবে। বেঞ্চে যতজন ছাত্র বসবে ডেস্কও ততজন ছাত্র ব্যবহার করবে। ডেস্কের উচ্চতা ছাত্রদের বয়সের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্নরূপে হবে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা কঠিন। স্কুলে বিভিন্ন সাইজের ডেস্ক থাকবে ছাত্রদের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে কোন শ্রেণীতে কি সাইজের ডেস্ক দেওয়া হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা ঠিক করবেন। একবার ক্লাস সাজিয়ে দিলে ছয় মাসের পর দরকার হলে আবার ক্লাস ঢেলে নতুন করে সাজাতে হবে। কারণ ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা ছয়মাসের মধ্যেই মাথায় অনেকটা বেড়ে যায় তাই নীচু ক্লাসে একবার বেঞ্চ ডেস্ক সাজিয়ে একবছর পর্যন্ত একই অবস্থায় রাখা ঠিক নয়। ক্লাস সাজাবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দু'সারি বেঞ্চের মধ্যে যেন বেশ ফাঁক থাকে যাতে ছাত্রেরা ঠিকমত চলতে পারে ও শিক্ষক যে কোন ছাত্রের কাছে যেতে পারেন। কোন ক্লাসে ছয় সারির বেশী ডেস্ক থাকা উচিত নয়।

বিদ্যালয়ে আরো কতকগুলি আসবাবপত্র খুবই প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হ'ল Black Board, বিদ্যালয়ের পাঠাগার ও অফিস ইত্যাদির জন্য কিছু আলমারী প্রয়োজন। অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবার জন্য দেওয়ালে বিভিন্ন Shelf রাখা যেতে পারে। মানচিত্র রাখবার জন্য Map stand প্রয়োজন। ছেঁড়া ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলবার জন্য Weste Paper Basket প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের practical-এর জন্য উপযুক্ত আসবাবপত্র প্রয়োজন, বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত teaching aids ও সেগুলি রাখবার উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন মহাপুরুষের ছবি, জাতীয় পতাকা, বিদ্যালয়ের পতাকা, ফুলদানী ধূপদানী ইত্যাদি আসবাবপত্রও প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাদানের সময় অনেক-সময় অনেক নতুন নতুন আসবাবপত্রের প্রয়োজন।

আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র

বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কিছু কিছু আসবাব-পত্র প্রয়োজন। খেলাধূলার জন্য বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম (জার্সি, বল, ব্যাট, নেট, বুট ইত্যাদি) প্রয়োজন। উৎসব অনুষ্ঠানের জন্যও বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রয়োজন। শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ক্যামেরা, তাঁবু ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। Craft-এর জন্যও নানাবিধ আসবাবপত্র প্রয়োজন। এই সমস্ত আসবাব ও সাজসরঞ্জাম

বিদ্যালয়ে প্রয়োজন, এবং সেগুলি রক্ষা ও সঞ্চিত রাখবার জন্য আলমারী, টেবিল, shelf, ইত্যাদিরও প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত News paper পড়তে পারে তার জন্য News paper stand প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করতে হলে এই রকম বিভিন্ন আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আসবাবপত্র

ব্ল্যাকবোর্ড

(Black Board)

শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। আবার ক্লাস সাজাবার সরঞ্জামের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড অবশ্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। প্রতি শ্রেণীতে একটি করে ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে। ব্ল্যাকবোর্ড নানা রকমের হতে পারে। যেসব ব্ল্যাকবোর্ড আমরা সচরাচর দেখি ও ব্যবহার করি তা হচ্ছে—ইজেলে হেলান দেওয়া ব্ল্যাকবোর্ড, (Easel Black Board); ফ্রেমে আঁটা ঘোরাবার উপযোগী বোর্ড (Rotating Black Board), ঝুলান ব্ল্যাকবোর্ড বা প্লাস্টার বোর্ড ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের Black Board

বোর্ডগুলির মধ্যে ইজেলে হেলান দেওয়া বোর্ড ও ফ্রেমে আঁটা বোর্ডই ব্যবহারের দিক থেকে সুবিধাজনক ও বহুল প্রচলিত। ইজেলের উপর রাখা বোর্ডগুলিকে ইচ্ছামত উপরে উঠান ও নীচে নামান যায় ও দু'পিঠ ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই। ফ্রেমে আঁটা বোর্ডে ইচ্ছামত ওঠান নামান না গেলেও ঘোরান খুবই সোজা তাই দু'পিঠ ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই। বোর্ডে দু'পিঠ ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে অনেক সময় অসুবিধা হয়। ইজেলে হেলান দেওয়া ও ফ্রেমে আঁটা বোর্ড ইচ্ছামত ক্লাসের যেখানে সুবিধা সেখানে রাখা যায়। সব দিক বিচার করে স্কুলে এই দু'রকমের বোর্ড ব্যবহার সঙ্গত।

ঝুলান বোর্ডের কোন ফ্রেম নেই। দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি বা তার দিয়ে একে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি আকারেও খুব বড় হয় না, দু'পিঠ ব্যবহারের সুবিধা নেই ও ইচ্ছামত উঁচু-নীচু করা যায় না। এ জাতীয় বোর্ডের ব্যবহার ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

পাকা দেওয়ালের গায়ে প্লাষ্টার দিয়ে তৈরী বোর্ড কোন কোন স্কুলে দেখা যায়। এগুলি খুব বড় হয়—একসাথে অনেক কথা লেখা যায়। অসুবিধা হ'ল,—ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করা যায় না ও শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয়, লিখবার সময় ক্লাসের উপর নজর রাখতে পারেন না।

১. গ্রাফবোর্ড (Graph Board)): ইজেল বোর্ড ফ্রেমে আঁটা বোর্ডের একপিঠে উপরে নীচে লম্বা ও শয়ান লাইন টেনে এক বর্গ ইঞ্চি মাপের ঘর কাটা

হয়। ছাত্রদের গ্রাফ শেখাতে, নক্সা, চিত্র প্রভৃতি আঁকতে এই জাতীয় বোর্ডের দরকার হয়।

ব্ল্যাকবোর্ড নামে ব্ল্যাক হলেও কালো ও সবুজ দু রংয়েরই হতে পারে। বোর্ডে লিখবার জন্য যে চক ব্যবহার করা হয় তার গুঁড়ো স্বাস্থ্যের দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বোর্ড পরিষ্কার করবার জন্য ভিজে কাটা কাপড় ব্যবহার করলে চকের গুঁড়ো উড়তে পারে না। স্কুলে যে ডাস্টার ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে মোছবার সময় চকের গুঁড়ো ওড়ে ও কিছুটা গুঁড়ো নীচে গিয়ে আটকে থাকতে পারে। দিনের শেষে জমা গুঁড়ো পরিষ্কার করে ফেলার অসুবিধে নেই। প্রয়োজনমত রঙিন চক ও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লাসের কোন জায়গায় বোর্ড রাখলে সব দিক থেকে সুবিধাজনক তা দেখে নিয়ে বোর্ড রাখতে হবে। ঝোলান বোর্ড ও প্লাষ্টার বোর্ড এমন ভাবে থাকে যার ফলে শিক্ষককে পিছন ফিরে লিখতে হয় ও ক্লাসের একদিক থাকলে সব দিক থেকে ছেলেরা বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না—এ অসুবিধা বাঞ্ছনীয় নয়। বোর্ড দরজার বিপরীত দিকে একটু কোণাকুনি করে রাখলে আলোর দিক থেকে সুবিধা হয়। দেখতে হবে বোর্ড যেন শিক্ষকের বাঁ দিকে থাকে তাহলে শিক্ষককে উঠে গিয়ে লিখতে ও ক্লাসের দিকে দৃষ্টি রাখতে কোন অসুবিধা হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীগুলিতে শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালের নীচুভাগের সমস্ত অংশই Black Board করে দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাদা ও রঙিন চক দিতে হবে। তারা তাদের খুসীমত ঐ বোর্ডে লিখবে ও ছবি আঁকবে, তাতে হাতের লেখার উন্নতি হয়, ভাবপ্রকাশ যথাযথভাবে হয়।

বিষয় কক্ষ

(Subject Room)

সাধারণভাবে একই শ্রেণীকক্ষে সেই শ্রেণীর নির্দিষ্ট বিষয় পঠনপাঠন চলবে এইছিল চিরাচরিত প্রথা। ক্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা জটিল হয়ে ওঠায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পাঠক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করায় সাধারণ শ্রেণী কক্ষে বসে সব বিষয়ের সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। সাধারণ বিজ্ঞান ও কয়েকটি জ্ঞানমূলক পাঠ (knowledge lesson) দিতে হলে বিভিন্ন রকম শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষক যা পড়ান তা যদি ক্লাসে পরীক্ষা করে না দেখান তাহলে পড়া সার্থক হয় না। শ্রেণীকক্ষে কোন একটি প্রক্রিয়া দেখাতে হলে বহু উপকরণ বয়ে নিয়ে

আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিষয় কক্ষের গুরুত্ব অনস্বীকার্য

যেতে হয়। কোন সময় একটি প্রক্রিয়ার জন্য উপকরণ নিয়ে যাবার পরও হয়তো দেখা গেল আর একটি জিনিসের অভাবে ক্লাসের কাজ বন্ধ রেখে ছুটতে হয় আবার সেই জিনিস আনতে। নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া এতে সময় নষ্ট, ভেঙ্গে যাবার ভয় আবার প্রয়োজনীয় জিনিস উপস্থিতমত হাতের কাছে না পেলে কাজ করেও সুখ নেই। এছাড়া প্রতিটি বিষয় পড়াবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিও সার্থক পাঠের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পড়াবার জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন রয়েছে।

কোন একটি বিষয় পড়াবার সময় যদি সে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে অনুরাগ সৃষ্টি করতে হয় তাহলে শ্রেণীকক্ষে সেই বিষয় উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বসে বিষয় উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিষয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হলে এক একটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আজকাল ম্যাজিকল্যানটার্ণ, এপিডায়স্কোপ প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে বহু কিছু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট কক্ষ না থাকলে এসব উপকরণের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে যেমন বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য বিষয় কক্ষের প্রয়োজন, তেমনি সময়ের দিক থেকে বিচার করলেও বিষয় কক্ষে পড়াবার সুযোগ থাকলে যথেষ্ট সময় বাঁচে।

বিষয়কক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়

বিষয় কক্ষে বিষয়টি শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোন বিষয়ের কক্ষে সেই বিষয়টি শিক্ষাদানের বিভিন্ন Teaching aids হাতের কাছে থাকবে। বিষয় কক্ষের দেওয়ালে ঐ বিষয়টির উপর বিভিন্ন মানচিত্র, ছবি, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে। বিষয় কক্ষে ঐ বিষয়ের কিছু *reference book* অভিধান ইত্যাদি রাখতে হবে। তাছাড়াও বিষয় পাঠাগার (*subject library*) বিষয়কক্ষে থাকতে পারে। ঐ বিষয়ের উপর বিভিন্ন *specimen copy (text book*-এর*)* নিয়ে একটি *subject library* শিক্ষার্থীদের পরিচালনাধীনে থাকবে। ফলে বিষয়কক্ষে কোন বিষয় পড়ানোর উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হবে।

ভূগোল কক্ষ

(Geography Room)

ভূগোলকক্ষ বিভিন্ন প্রকার বহু মানচিত্র দ্বারা শোভিত থাকবে। গ্লোব, রিলিফ, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, খনিজ দ্রব্যের নমুনা, মডেল, বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচয় সঙ্কলিত চিত্র, প্রয়োজনীয় বই ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম।

বিষয়কক্ষে প্রবেশ করলে ছাত্রেরা মনে করবে তারা যেন ভিন্ন জগতে এসে গিয়েছে। শিক্ষক পড়াতে বসে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মানচিত্র গ্লোব, চার্ট যখন যা দরকার তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। যে সমস্ত শিক্ষা সরঞ্জাম ভূগোল পড়াতে শিক্ষকের প্রয়োজন হয় যেমন মানচিত্র, গ্লোব; ম্যাজিকল্যানটার্ণ, এপিডায়স্কোপ প্রভৃতি প্রতিদিন ক্লাসে বয়ে নিয়ে যেতে সময় নষ্ট হয়, অযথা খাটুনী হয়। যদি একদিনে দুটি কি তিনটে ক্লাসে (ভূগোল পড়াতে হয় তাহলে বিভিন্ন উপকরণ (তিনটি ক্লাসে) নিয়ে যাবার অনেক অসুবিধা; কোন জিনিস ভেঙ্গেও যেতে পারে। একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকলে সে অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ভূগোলকক্ষ বিষয়টি শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ ও সাজ-সরঞ্জামে পূর্ণ থাকবে,

ইতিহাস কক্ষ

(History Room)

ইতিহাস পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক মানচিত্র, সময় রেখা, ঐতিহাসিক চিত্র প্রভৃতি দিয়ে কক্ষটি সাজিয়ে রাখলে ছাত্রদের চিত্তাকর্ষক হবে। এছাড়া বিভিন্ন যুগের মুদ্রার নমুনা, বিভিন্ন যুগের স্থাপত্য শিল্পের যে সব মডেল বাজারে পাওয়া যায়, ছাত্রদের হাতে আঁকা বা মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিস কক্ষে রাখা হলে ছাত্রদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হবে। ম্যাজিকল্যানটার্ণের সাহায্যে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, আরো বহু কাহিনী দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের অনুরাগ সৃষ্টি ও ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ দিতে হলে ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ইতিহাস কক্ষে অতীত যুগের উপকরণগুলি সন্নিবেশিত হবে

বিজ্ঞান কক্ষ

(Science Room)

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষণাগারের দরকার। এ ছাড়া সাধারণ-বিজ্ঞান পডাতে হলেও বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন। সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে বিজ্ঞানের কয়েকটি দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা আছে—তাই এজন্য খুব উঁচু-দরের বীক্ষণাগারের দরকার হয় না। তবুও বিজ্ঞানের বহু দিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য যে সব প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, চিত্র, চার্ট, ছোট-খাট পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উপকরণের দরকার তা শ্রেণীকক্ষে নিয়ে দেখান যায় না। বিজ্ঞান পাঠ

বিজ্ঞানকক্ষে ব্যবহারিক শিক্ষার উপযোগী উপকরণ থাকা প্রয়োজন

সুষ্ঠুভাবে দিতে হলে স্কুলে একটি সুসজ্জিত বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সাধারণ বিজ্ঞানে শুধুমাত্র রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যাই পড়ানো হয় না এর সাথে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, দেহবিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াতে হয়। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্য কি কি সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন পাঠক্রম পর্যালোচনা করে তার একটা তালিকা তৈরী করে জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানকক্ষ এমন ভাবে সুসজ্জিত হবে যে সাধারণ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় পড়াবার উপযোগী সব রকম শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যেন বিজ্ঞানকক্ষে বসেই পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বিষয় কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, কক্ষ সাজান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিষয় শিক্ষকের উপর ন্যাস্ত থাকবে। প্রধান শিক্ষক বিষয়কক্ষ গড়ে তুলতে ও সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠ রূপ দিতে যা দরকার বিষয় শিক্ষককে সেভাবে সাহায্য করবেন।

বিষয়কক্ষ কৃত্রিম ও যান্ত্রিকভাবে সজ্জিত হবে না,

বিষয়কক্ষ শুধুমাত্র বাজারে কেনা জিনিস দিয়ে সাজানো উচিত নয়। ছাত্রেরা যাতে নানারূপ হাতের কাজ দিয়ে কক্ষটি সমৃদ্ধ করে সেজন্য ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হবে। মানচিত্র আঁকতে সময় রেখা তৈরী করতে, ঐতিহাসিক ছবি আঁকতে, বিজ্ঞান বিষয়ক চার্ট তৈরী করতে, মাটির মডেল তৈরী করতে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের উৎসাহিত করবেন। মাঝে মাঝে স্কুলে ছাত্রদের তৈরী জিনিসের প্রদর্শনী হবে ও তার মধ্য থেকে বাছাই করা ভাল জিনিস বিভিন্ন বিষয় কক্ষে রক্ষিত হবে। এইভাবে ছাত্রদের কাজে উৎসাহ দিলে সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটবে।

পরীক্ষণাগার

(Laboratory)

প্রাক স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কলেজীয় শিক্ষা শুরু হ'বার পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান চর্চার কোন সুযোগ ছিল না বললেই চলে। যারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে তাদের প্রস্তুতিপর্বরূপে বিদ্যালয় স্তরে Additional Mathematics ও Mechanics পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু খুব কম স্কুলই ছাত্রদের এই সুযোগ দিতে পারত। স্কুল পর্যায়ে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা অতি অল্পদিন হ'ল হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে সে প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই বিজ্ঞানী-কুশলী-কর্মী। জাতি গঠনে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সামনে

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক

রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হবে না। তাই বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে তার মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন এত বেশী ও বিজ্ঞান আমাদের জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে যে, সর্বশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বস্তরে সাধারণ ও সমস্ত শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সাহিত্য, ইতিহাসের মত মুখে বলে বা বক্তৃতাতে ঠিকভাবে বোঝানো যায় না। শুধু বই পড়ে বিজ্ঞানী হতে পারে না। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, বা যে জ্ঞান সাধারণভাবে অর্জিত হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রয়োগ সিদ্ধ জ্ঞান। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাত্রেরা যদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ না পায় তাহলে কখনও তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না।

হাতে কলমে শিক্ষার পরিপূরক হয় না।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার যে সামান্য অংশ সাধারণ বিজ্ঞানে রয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের পড়তে হয়। যে সব বিষয় তাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে সব বিষয় পরীক্ষাগারে হাতে কলমে শেখার সুযোগ যদি না থাকে তাহলে তারা কিছুই শিখতে পারবে না। এছাড়া জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্যও যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে—তাকে বাদ দিয়ে শুধু বই পড়িয়ে শেখাবার চেষ্টা হলে ছাত্রদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ সৃষ্টি হবে না, তাদের পড়াও সার্থক হবে না।

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা জ্ঞানকে পূর্ণ করে

বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাগারের। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখে মুখে শিখিয়ে বা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানো যায় কিন্তু দেশের প্রয়োজন তাতে মেটানো যাবে না। যদি বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে হয় তাহলে প্রয়োজন সুসজ্জিত পরীক্ষাগার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত শিক্ষক। পাঠক্রম-নির্ধারিত বিষয়সমূহ যাতে ছাত্রেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারে পরীক্ষাগারে তার সুযোগ থাকবে। আমরা জানি বিজ্ঞান শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ইহার প্রয়োগ-ধর্মিতার মধ্যে পরীক্ষাগারে ছাত্রেরা সে সুযোগ

ব্যবহারিক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার অপরিহার্য অংগ

পাবে। পরীক্ষাগারে কি কি যন্ত্রপাতি থাকবে তা নির্ভর করে পাঠক্রমের উপর। যে সব বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তা পরীক্ষা করে দেখবার মত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম রাখতে হবে। শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করে দেখাবেন। ছাত্রদের কতকগুলি বিষয় নিজেদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ছাত্রদের নিজ হাতে কাজ করবার সুযোগ যতটা সম্ভব দিতে হবে।

পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন স্কুলের পক্ষে সে অর্থের সংস্থান করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার তৈরী করবার জন্য সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম কিনবার জন্য এককালীন অর্থের সাথে কাজ চালু রাখবার জন্য পৌনঃপুনিক খরচের দরকার আছে। সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের। বহু স্কুলে দেখা গিয়েছে পরীক্ষাগার রয়েছে, যন্ত্রপাতি রয়েছে, তবু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সুষ্ঠু পঠন ও পাঠন হচ্ছে না। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষাগার থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির সাহায্যেই বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শুধুমাত্র পরীক্ষাগার থাকলেই যে বিজ্ঞান-শিক্ষার আয়োজন করতে হবে,—এ মনোভাব যেন স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রবেশ না করে।

বিদ্যালযে পূর্ণাংগ পরীক্ষাগার স্থাপনের অসুবিধা

পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। অর্থের সংস্থান হলে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম কিনে আনা যায়। তার সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে একটি সুসজ্জিত মূল্যবান পরীক্ষাগার অল্পদিনেই অকেজো হয়ে পড়বে। পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিষয়ানুসারে বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হবে। তিনি তার রক্ষণাধীন সমস্ত জিনিসের তালিকা stock register-এ তুলে রাখবেন। বছরে একবার stock register মিলিয়ে দেখে নেবেন সমস্ত জিনিস আছে কি না। ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে গেলে নতুন জিনিস আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন। যে সব জিনিস ব্যবহারের জন্য বের করা হয়েছিল তা ঠিক মত উঠিয়ে রাখা হ'ল কি না সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখলেই কোন জিনিস হারাবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। বিষয়-শিক্ষক পাঠ্যসূচীতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনাবার ব্যবস্থা করবেন। প্রধান শিক্ষক যদি বিজ্ঞানের শিক্ষক না হন তাহলেও পরীক্ষাগার সুন্দর করে তুলতে ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষকদের পরামর্শ ও সাহায্য করবেন।

পরীক্ষাগার তত্ত্বাবধানে সতর্কতা

স্কুল ওয়ার্কশপ
(School Workshop)

শিল্প সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতা কল কারখানার সৃষ্টি প্রসারের মধ্য দিয়ে ধীর পদক্ষেপের সাহায্যে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। Workshop হ'ল এই যন্ত্র সভ্যতায় কলকারখানার দান। বড় বড় শিল্পে 'শ্রমবিভাগ' পদ্ধতি মেনে চলা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন এই 'শ্রমবিভাগ' পদ্ধতি মেনে চলা হয় তখন সেই পদ্ধতিকে 'Workshop Method' বলা হয়। ওয়ার্কশপ পদ্ধতির দু'টি ভাগ :—

বর্তমান যুগে ওয়ার্কশপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

(১) শারীরিক শ্রমযুক্ত ওয়ার্কশপ পদ্ধতি :—

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করতে হয়। বিদ্যালয়ে যে craft ও টেকনিকাল শিক্ষাব্যবস্থা আছে তা এই পদ্ধতির অন্তর্ভূ ত।

(২) বুদ্ধিবৃত্তি-যুক্ত ওয়ার্কশপ পদ্ধতি :—

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে।

Workshop পদ্ধতির রূপায়ণের জন্য বিদ্যালয়ে সুসজ্জিত পৃথক কক্ষের প্রয়োজন। এক কক্ষের মধ্যে ওয়ার্কশপ পদ্ধতির রূপায়ণ সম্ভব হবে।

স্কুল মিউজিয়াম
(School Museum)

আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পুঁথিনির্ভর শিক্ষাকে যতটা সম্ভব বাস্তবধর্মী করে তোলা। সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ বর্তমানে যথাসম্ভব শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে যাতে বাস্তব পরিচয় হতে পারে তার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থায় বহুবিধ আয়োজন করা হচ্ছে। জ্ঞানমূলক বিষয় শেখাবার সময় আজকাল আমরা শিক্ষা-সহায়ক বহুপ্রকার সাজসরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ করি। কানে শুনে ছাত্রেরা যা শেখে সেই সাথে জিনিসটি বা তার অনুকৃতি চোখে দেখবার ব্যবস্থা করতে পারলে ছাত্রদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক যাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন বিষয়ে শেখাবার জন্য বিষয়কক্ষে বিষয় উপযোগী বহু উপকরণ সমাবেশ করা হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যাতে ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয় তাদের

মধ্যে জ্ঞানপিপাসা জাগে সেজন্য বিষয়কক্ষের বাইরে এনেও সে সব জিনিস দেখাবার ব্যবস্থা করা দরকার। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচয় বা যোগস্থাপন করতে হলে পুঁথির বাইরে যে জগৎ তার মাঝে ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। অবাক হয়ে সে দেখবে তার চারিদিকে কত জানার আছে। কি করে ছাত্রদের জ্ঞানের সীমাকে তার স্কুল বইয়ের বাইরে বা তার পরিচিত পরিবেশের নাগালের বাইরে প্রসারিত করা যায় এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছুটা স্কুল মিউজিয়ামের মধ্যে পেতে পারি। স্কুল মিউজিয়ামের অর্থ যদি সরকার পরিচালিত সাধারণ যাদুঘরের ছোটখাট সংস্করণ বুঝি তাহলে ভুল করা হবে। স্কুল মিউজিয়ামে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন তা দিয়েই প্রথম শুরু করা যেতে পারে। বিষয় কক্ষ নিয়ে আলোচনা কালে আমরা দেখেছি জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহ ভালভাবে পড়াতে হলে সুসজ্জিত বিষয় কক্ষের প্রয়োজন। বিষয় কক্ষ সাজাবার জন্য স্কুল থেকে বহু সাজ সরঞ্জাম কেনা বা সংগ্রহ করা হয়। স্কুল মিউজিয়াম হবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের মত। মিউজিয়ামের বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সাজানো যেতে পারে। জ্ঞানমূলক বিষয় সমূহের সারা বছরের পড়া, কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিয়ে ঠিক করে নিতে হবে কখন কোন ইউনিট পড়ানো হবে। সেই ইউনিট পড়াতে যে সব সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে বিষয় কক্ষে সেই টার্মের সব সরঞ্জাম রেখে বাকী জিনিস স্কুল মিউজিয়ামে রাখা যেতে পারে। সারা বছর সব সরঞ্জামের দরকার হয় না তখন স্কুল মিউজিয়ামকে কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষ রূপে ব্যবহার করবার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। নানা রকম উপকরণ দিয়ে সাজানো মিউজিয়াম দেখে ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হবে। নানা বিষয় জানবার জন্য তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা-দানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন।

স্কুলের ছাত্রেরা অনেক রকম হাতের কাজ করে। তাদের তৈরী মাটির পুতুল, মডেল, ছবি, মেয়েদের সূচের কাজ প্রভৃতি দিয়ে প্রতি বছর স্কুলের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখান থেকে বাছাইকরা জিনিস মিউজিয়ামে রাখবার ব্যবস্থা করলে ছেলেদের মধ্যে কাজের উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

বিদ্যালয়ের যাদুঘরে শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ থাকতে পারে।

মিউজিয়ামের দুটি দিক থাকবে। একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের দিক, এটিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সাজান হবে, ; আরেকটি দিকে ছাত্রদেরই তৈরী নানা জিনিস ও বাইরে থেকে সংগ্রহ করা দ্রব্যসামগ্রী যা থেকে ছাত্রেরা পড়ার বাইরে নানা বিষয় সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।

মিউজিয়ামের উপকরণগুলি শিক্ষা-মূলক হবে।

স্কুল মিউজিয়াম দেখে বোঝা যাবে বিভিন্ন দিকে ছাত্রেরা কি জ্ঞান সঞ্চয় করছে। তাদের কাজের নমুনার মধ্য দিয়ে তাদের কাজের অগ্রগতির পরিচয় কিছুটা মিলবে। মিউজিয়ামে স্কুল সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত চার্ট, গ্রাফ বা মানচিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি থাকবে, যা দেখে ছাত্রদের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্ব, খেলাধূলায় ছাত্রদের তৎপরতা, গ্রন্থাগারের বই পড়ার আগ্রহ ইত্যাদি হিসেব ও তুলনামূলক তথ্যের সাহায্যে দেখিয়ে স্কুল মিউজিয়ামের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে। এসব তথ্য থেকে স্কুলের বিভিন্ন দিকের কার্যাবলীর একটা সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে।

মিউজিয়ামের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্কুল মিউজিয়াম প্রচলন আমাদের দেশে নাই। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ জাতীয় কাজ করবে এটাও দুরাশা। স্কুল মিউজিয়ামে শিক্ষামূল্য বিচার করে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নির্দেশ বা পরিচালনায় যদি কোন স্কুল মিউজিয়াম গড়ে তোলা যায় তাহলে সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্কুলে স্কলে মিউজিয়াম গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশে স্কুল মিউজিয়াম নাই।

বিদ্যালয় সংরক্ষণ শাখার শিক্ষামূলক গুরুত্ব অনেক বেশী। এই সংগ্রহশালায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা ছাত্রদের কর্তৃত্বাধীন থাকবে কি না তা হ'ল বিতর্কের বিষয়; তবে এই সংগ্রহশালায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতা যে থাকবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার্থীরা এই সংগ্রহশালার বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত করবে। কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ (Educational excursion) এমন অনেক উপাদান সরবরাহ দিতে পারে যা সংগ্রহশালায় খুবই মূল্যবান। শিক্ষার্থীরা অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেও বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করতে পারে।

বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতা থাকে। শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের কিছু কিছু মূল্যবান স্মৃতি এই সংগ্রহশালায় রেখে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা তাই শিক্ষার্থীদের পক্ষে রমনীয় ও আকর্ষনীয় হয়। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা সংগ্রহশালাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে। শিক্ষা তখন হয় আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

খেলার মাঠ

(Play Ground)

স্কুলের ছাত্রদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করা স্কুলকর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। লেখাপড়ার সাথে খেলাধূলার একটা অহিনকুল সম্পর্ক স্থাপন করে দু'টোকে পৃথক

করে দেখাই ছিল প্রচলিত রীতি। খেলাধূলার যে একটা শিক্ষামূল্য আছে একথা আমরা স্বীকার করতে চাই না। খেলাধূলা করা বা ব্যায়াম করার মধ্যে সময় নষ্ট হয় আর বখাটে ছাত্রেরাই এদিকে মন দেয়। সাধারণ অভিভাবক ছেলেকে স্কুলে পড়াতে পাঠান। খেলা যে পড়ার একটা অঙ্গ—শিক্ষার অর্থ দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন একথা স্কুলের কর্তাব্যক্তিরাও সব সময় বুঝতে চান না। মানুষের চরিত্রগঠনে খেলধূলার যে একটা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে একথা আধুনিক সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেছেন। ক্লাসের শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা নয়—খেলার মাঠেও আমরা অনেক কিছু শিখি। মানুষের পৌরুষ সচেতনতার প্রথম সঞ্চার হয় খেলার মাঠে। ওয়াটারলু যুদ্ধ বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন বলে ছিলেন *The battle of Waterloo was won on the playing field of Eaton.* নেতৃত্বের শিক্ষা খেলার মাঠেই তিনি লাভ করেছিলেন। খেলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় দলগত মনোভাব, নেতৃত্বের শিক্ষা, নিয়মশৃঙ্খলার শিক্ষাও ছাত্রেরা খেলার মাঠে পেতে পারে। শুধু দেহগঠন, চরিত্রগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়াও খেলার মধ্যে রয়েছে একটা নির্দোষ আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই ছাত্রেরা খেলার দিকে এত আকৃষ্ট হয়।

শরীর শিক্ষার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন।

প্রত্যেক স্কুলেই খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ছাত্রদের জন্য outdoor ও indoor খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। outdoor খেলার জন্য দরকার খেলার মাঠের। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন কিন্তু সব স্কুলের পক্ষে বড় মাঠ যোগাড় করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যেখানে স্থানাভাব সেখানে স্কুলের খেলার মাঠ প্রায়ই থাকে না। এক্ষেত্রে স্কুলের সীমার মধ্যে যতটা খোলা জায়গা রয়েছে তার মধ্যে ভলিবল, বাস্কেটবল, কপাটি ও অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় খেলার আয়োজন করা সম্ভব। স্কুল ড্রিল ও যে সব স্কুল N. C. C. গঠিত হয়েছে সেখানে সামরিক কুচকাওয়াজ করলেও দেহ চর্চার কাজ হয়। সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন মাঠের। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের কাছে কোন পতিত জমি থাকলে মালিকের অনুমতি নিয়ে সেখানে ছাত্রদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যায়। গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষক একটু তৎপর হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলার মাঠের যোগাড় করতে পারেন। স্কুলে একজন খেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। খেলার মাঠে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা গেলে ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়। মাঝে মাঝে খেলার মাঠে যাওয়া প্রধান শিক্ষকদের একটা কর্তব্য বটে।

প্রতি বিদ্যালয়েই খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

ব্যায়াম

(Gymnasium)

খেলার মাঠের সাথে প্রত্যেক স্কুলে একটি ব্যায়ামাগারও থাকা প্রয়োজন। খেলাধূলা ও ব্যায়ামের মধ্যে কিছুটা লক্ষ্যের পার্থক্য আছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সুগঠিত পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলাই ব্যায়ামের লক্ষ্য; খেলার মধ্যে রয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদনের আয়োজন (pleasurable activity for the sake of recreation)। কিন্তু দুটি কাজের মধ্য দিয়েই দেহ সুগঠিত হয়। বর্ষাকালে মাঠে মাঠে যখন জল ওঠে কি কাদা হয় তখন খেলার ব্যবস্থা সম্ভব নয় তখনও ছাত্রেরা ব্যায়াম করতে পারে। কিশোর বয়সে দেহগঠনের সময়। অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের নির্দেশে নিয়মিত ব্যায়াম করলে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। লেখাপড়ায় মস্তিষ্কের চর্চা হয়, ব্যায়ামে হয় দেহের চর্চা। শরীর যার সুস্থ নয় তাকে দিয়ে কোন কাজই হয় না। তাই ছাত্রেরা যাতে নিয়মিত একটু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে সে বিষয়ে তাদের বোঝান দরকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার।

বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

ব্যায়ামের ব্যবস্থা খোলা জায়গায় হতে পারে। উপরে ছাউনী দেওয়া খোলা বড় ও উচ্চ ঘর ব্যায়ামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্যায়ামের জন্য কিছু সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন। যে কোন স্কুলের পক্ষে ব্যায়ামের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। এককালীন টাকা খরচ করে সরঞ্জাম কিনে রাখলে তা দিয়ে বহু দিন কাজ চলতে পারে।

খোলা জায়গায় ব্যায়াম

ব্যায়াম ও খেলাধূলার দায়িত্ব পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক স্কুলে একজন ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায় আমাদের দেশের ছেলেদের স্বাস্থ্যের সামগ্রিকভাবে অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থার প্রতিকার করতে হলে, একটা সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে ছাত্রদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীন থাকা চলবে না। সর্বাধিক পরিমাণে ছাত্রেরা যে সব খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে ব্যায়াম শিক্ষক সে সব খেলার ব্যবস্থা করবেন। যে স্কুলের পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করা সম্ভব নয় সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে বিশেষ ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনা যায়। খেলাধূলা পরিচালনা ও ব্যায়ামের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারবেন।

ব্যায়াম শিক্ষক

উপসংহার

(Conclusion)

এইভাবে বিদ্যালয় গৃহ সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে সুসজ্জিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হবে। বিদ্যালয়ে পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাধীন শিক্ষা গ্রহণে ও ব্যক্তিত্বের যথাযথ উন্নয়নে সক্ষম হয়। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ প্রয়োগে বিদ্যালয়গৃহ ও পরিবেশ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। কোন রকমে কতকগুলি ছাত্র জুটিয়ে কয়েকটি ঘরে একটি বিদ্যালয় সৃষ্টি করলেই হয় না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। অনেকে আজকাল বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার *(Need for expanding the school beyond the four walls)* কথা বলেছেন। কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীন শিক্ষা সম্ভব হবে। বিদ্যালয়গৃহ ও পরিবেশ সৃষ্টি ও রচনা করতে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে ছোটখাটো জিনিসের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই বিদ্যালয়েই তিন-চারশ ছাত্রের ভবিষ্যৎ প্রতিনিয়ত নিরূপিত হচ্ছে। অতএব, তা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখাশুনা করা উচিত।

বিদ্যালয়কে চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্নাবলী

1. A modern school is not merely a knowledge shop, it is the fostering ground of the total personality of the child. Describe the requistite equipments that school plant should have to achieve this ideal. C. U. B. T.—1965, C. U. B. Ed.—1970
2. In starting a new school what should be your estimate of an ideal school plant ? Give a detailed description of the various equipments and accessories that the different components of modern school must possess. C. U. B. T.—1966
3. It has been said that we first shape the school building and then it shapes us. Discuss the truth of this statement with refererce to all the educational factors operating inside the school building and in its surroundings. (North Bengal University, B. T.—1967)
4. Describe fully the requirements of a good school building. Jadavpur University, B. Ed. 1971
5. Write notes on the following —
   (a) School plant. C. U. B. T.—1967
   (b) Subject rooms. C. U B. T.—1968
   (c) An ideal primary school building as you visualize for urban or rural areas. P. G. B. T.—1971

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রন্থাগার

(LIBRARY)

শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগার। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করেছে গ্রন্থাগারে সেই সঞ্চিত জ্ঞানরাশি আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সন্ধানী ডুবুরী সেই জ্ঞান-সমুদ্র সন্ধান করে অমূল্য রত্নের সন্ধান পায়। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব থেকেই গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়—বাবিলন ও মিশরে গ্রন্থাগার অতি প্রাচীন যুগেই বর্তমান ছিল। ভারতে ব্রাহ্মণ্য যুগে আচার্যের কাছ থেকে মুখে মুখে বিদ্যাশিক্ষার রীতি ছিল। সে যুগের আচার্যরা ছিলেন এক একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার। বৌদ্ধ যুগে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তীপুরী প্রভৃতি মহাবিহারে বিশাল গ্রন্থশালা ছিল। মুদ্রণযন্ত্র প্রচলিত হবার পূর্বে পুঁথি সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কাজ। মিশনারীরা এদেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবার পর থেকে মুদ্রিত বই সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার আর মুষ্টিমেয়ের অধিকারের মধ্যে নেই। সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানের ভাণ্ডারের দ্বার আজ সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান ক্ষেত্র বিদ্যামন্দির, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-মন্দিরের রত্নভাণ্ডার গ্রন্থাগার থাকবে। জ্ঞানের জগৎ ছাত্রদের কাছে মুক্ত হবে গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে।

গ্রন্থাগার শিক্ষা-ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার

(School Library)

বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে একটা পাঠক্রম অনুসরণ করে ছাত্রদের পড়ানো হয়। নির্দিষ্ট পাঠক্রমের গণ্ডির মধ্যে যদি তাদের পাঠের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে শিক্ষা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কোন একটা বিষয় আয়ত্ত করতে হলে শ্রেণী-পাঠ্য বই ছাড়াও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রকে আরো বহু বই পড়তে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে দেওয়াও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হতে হলে নতুন নতুন বই পড়তে হবে—তা না হলে তার জ্ঞানের সীমা হবে

সংকীর্ণ। ছাত্রেরা যাতে পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় জানতে পারে,—তাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে পারে সে জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। কোন বিষয়ে পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু জানার প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কোন প্রশ্নের উত্তর যদি বিচার বিবেচনা করে যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হয়, তাহলে প্রয়োজন বহু রেফারেন্স বইয়ের। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকলে প্রয়োজনীয় বই ছাত্রদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে জ্ঞানের তৃষ্ণা সৃষ্টি করবেন সে তৃষ্ণা-ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই মেটানো সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নরূপ প্রবণতা রয়েছে,—তাদের রুচিও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন রুচির শিক্ষার্থীদের বইয়ের চাহিদা মেটাবার জন্যও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান অতি উচ্চে নির্দেশিত করেছেন। তাঁরা প্রতিটি বিদ্যালয়ে "an intelligent and effective Library service" থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, "*The importance of cultivating the habits of general reading, of reducing the stress placed on text books and making increasing use of the Library as a repository of reference books, standard books and books of general interest.*"

গ্রন্থাগার হ'ল জ্ঞানের ভাণ্ডার

ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলবার জন্য ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে এখনও এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা পাঠ্য বইয়ের পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চান না। তাঁদের সমস্ত পঠনপাঠন শ্রেণী নির্দিষ্ট বইখানাকে কেন্দ্র করেই চলে। তারা বুঝতে চান না যে, পড়াবার জন্য শ্রেণী-পাঠ্যের অতিরিক্ত বই পড়বার প্রয়োজন তাঁদেরও আছে। শিক্ষক যেখানে নিজেই পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চান না সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের যে সীমার বাইরে যেতে উৎসাহ দেবেন সে আশা করা যায় না। স্কুলে পড়ার সময় যদি শিক্ষার্থীরা বাইরের বই পড়ার অভ্যাস না করে, তাহলে স্কুল ছাড়ার সাথে সাথে বইয়ের সাথে তাদের আর কোন সম্পর্কই থাকে না। ছাত্র বয়সে একবার লাইব্রেরীতে বই ব্যবহারের অভ্যাস হলে সেই অভ্যাস আর কোন দিন বিদূরীত হয় না। এজন্য যদি প্রয়োজন হয় শুরুতে বাধ্যতামূলকভাবে ছাত্রদের হাতে বই ধরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে পড়ার অভ্যাস তৈরী হবে না।

শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস ও গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, শিক্ষকদের জন্যও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হলে শ্রেণীপাঠ্য বইখানা পড়ে গেলেই চলে না, তাঁকে আরো বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হয়। উৎসুক ছাত্রের সব

রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক ক্লাসে যাবেন। বিনা-প্রস্তুতিতে ক্লাসে যাওয়া যে কোন শিক্ষকের পক্ষে অনুচিত। প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। জ্ঞানমূলক বিষয়-সমূহ বদ্ধ জলাশয়ের মত নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র নিত্য নতুন দিকে প্রসারিত হচ্ছে,—জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষক যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথে সমান তালে চলতে চান তাহলে তাঁকে নতুন তথ্য সম্বলিত বই সমূহ পড়তে হবে। এজন্য তাঁর পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। শিক্ষককে হতে হবে আজীবন জ্ঞান তপস্বী। সার্থক শিক্ষক হতে হলে ছাত্রের মত তাঁকে জ্ঞানানুশীলন করতে হবে। তাই প্রতি বিদ্যালয়ে একটি ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার ছাত্র শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়।

শিক্ষকদের জন্যও গ্রন্থাগার প্রয়োজন

গ্রন্থাগার ও তার বর্তমান রূপ

(Library and its present position)

প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে। শিক্ষকদের বসবার ঘরে, প্রধান শিক্ষকের ঘরে কয়েকটি আলমারী বই যা পুরানো, তথ্যগত দিক থেকে অচল, এবং ছেলেদের পছন্দ-অপছন্দের সাথে সম্পর্ক-বিরহিত, মুদালিয়র কমিশনের ভাষায় —*The books are generally old, outdated, unsuitable, usually selected without reference to the student's tests and interest.*" এই হচ্ছে 'স্কুল লাইব্রেরী'। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী কোন পৃথক ঘর নেই। যে স্কুলে আছে তাও অতি সাধারণ ঘর; কয়েকটি আলমারীতে কিছু বহুদিনের পুরানো বই আর ততোধিক শোচনীয় কিছু আসবাবপত্র। লাইব্রেরীয়ান প্রায় স্কুলেই নেই। স্কুল কেরানীকে কিছু অতিরিক্ত ভাতা দিয়ে বা কোন একজন শিক্ষককে কিছু পিরিয়ড কাজ কমিয়ে দিয়ে লাইব্রেরীয়ানের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। নিজের কাজের অতিরিক্ত কাজে তাঁদের উৎসাহ থাকবে না এ খুব স্বাভাবিক। দায়সারা রকমে তাঁরা তাঁদের উপরি কর্তব্য পালন করেন। প্রধান শিক্ষক কি স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য খুব সচেষ্ট থাকেন না। সরকার থেকে কিছু টাকা পেলে নতুন বই কেনা হয়—[যেমন হালে সরকারী দাক্ষিণ্যে সব স্কুলেই কিছু বই কেনা হয়েছে শুনেছি]। এছাড়া নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বই কিনে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা খুব বেশী স্কুলে হয় না। বই কেনবার সময়ও ছাত্রদের পছন্দ আগ্রহ বিচার করে সব সময় বই কেনা হয় না। সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের খেয়াল খুশী ও পছন্দ-অপছন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই কেনার পিছনে কার্যকরী হয়। বিষয়-শিক্ষকগণও প্রয়োজনীয় Reference বই

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-গুলি অকেজো হয়ে পড়েছে

অপেক্ষা তাঁরা যদি কোন পরীক্ষা দেন তাহলে সেই পরীক্ষার উপযোগী বই কেনার দিকে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। সব দিক থেকে বিচার করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক একথা বলা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত

(An Expected Library)

বিদ্যালয়ের দিক থেকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার যাতে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে শোভাবর্ধন না করে সত্যিকারের শিক্ষা-সহায়ক হয়ে ওঠে আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। বিদ্যালয়ের একটি প্রশস্ত কক্ষে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হবে। দেখতে হবে কক্ষটি যেন রুচিসম্মত ভাবে সাজানো হয়। ছেলেরা যেখানে বসে পড়বে সে ঘর যেন আলো হাওয়া যুক্ত হয়—না হলে ছেলেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদি সম্ভব হয় মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘরখানা সাজান হবে। গ্রন্থাগারের সাথে পড়বার ব্যবস্থা থাকবে। মুদালিয়র কমিশন তাদের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত তার একটি মনোজ্ঞ চিত্র দিয়েছেন—"......*the library must be made the most attractive place in the school so that student will be naturally drawn to it. It should be housed in a spacious, well lit hall (or room) with walls suitably coloured and the rooms decorated with flowers and artistically framed pictures and prints of famous paintings. The furniture—bookselves, tables chairs, reading desks should be carefully designed with an eye to artistic effect as well as functional efficiency.*"

আদর্শ গ্রন্থাগারের রূপরেখা

কমিশনের কল্পনাকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য করে নিয়ে ছাত্রদের পড়বার জন্য লম্বা টেবিল ও দু'পাশে বেঞ্চের ব্যবস্থা করলে মনে হয় ছাত্রদের খুব আপত্তি হবে না। পাঠকক্ষে (Reading room) ছাত্রদের জন্য দৈনিক কাগজ ও তাদের উপযোগী সাময়িক পত্রিকা থাকবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বই ভিন্ন ভিন্ন আলমারীতে থাকবে। সম্ভব হলে খোলা সেলফে বই রাখা হবে। ছাত্রেরা সেখান থেকে ইচ্ছামত বই নিয়ে পড়তে পারবে। বইয়ের জন্য স্লিপ দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে হবে না। National Library ও British Council এর গ্রন্থাগার থেকে যাঁরা বই নিয়েছেন তাঁরাই জানেন স্লিপ দিয়ে বই নেওয়া আর ইচ্ছামত দরকারী বই সেলফের থেকে বেছে নেবার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা কোথায়। বই খোয়া যাবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু ছাত্রদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে

গ্রন্থাগারে বই লেন-দেনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

দায়িত্ব দিলে সব সময় ঠকতে হয় না। যদি স্বাধীনমত বই নেবার প্রথা চালু করা যায় তাহলে ছাত্রদের দায়িত্ব বোধ বাড়বে। প্রধান শিক্ষক যদি একটু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে অল্প কিছু বই নিয়ে এ প্রথা চালু করে দেখতে পারেন।

গ্রন্থ নির্বাচন
(Selection of Books)

গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাই এক কঠিন কাজ। আজকাল নানা রকম বইয়ে বাজার ছেয়ে গিয়েছে। অপাঠ্য কুপাঠ্য বইয়ের গাদা গাদা তালিকা প্রকাশকেরা স্কুলে পাঠাতে একটুও কার্পণ্য করেন না। তারপর চটকদার বিজ্ঞাপন তো আছেই। তাই বই বাছাই খুব সাবধান হয়ে করতে হবে। অসাবধানতার জন্য যদি দু'চার খানা কুপাঠ্য বই লাইব্রেরীতে স্থান পায় তার খারাপ প্রভাব ছাত্রদের বিপথগামী করতে পারে।

গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনে অসুবিধা

ছাত্রদের জন্য বই বাছাই করতে-হলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স, রুচি ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করে বই বাছাই করতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় Reference বইও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। বই বাছাইয়ের জন্য শিক্ষকদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি করে দেওয়া যায়—এই নির্বাচক কমিটিতে দু'একজন উপরের শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্র থাকতে পারে। বই কেনার আগে ছাত্রদের পছন্দমত বইয়ের নাম দিতে হবে। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে একখানা খাতা রাখলে ছাত্রেরা তাদের রুচিমত বইয়ের নাম দিতে পারে। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সেই তালিকা থেকে ও গ্রন্থাগারের জন্য কি কি বই প্রয়োজন আছে তা বিচার করে একটি তালিকা করবেন। নির্বাচক সমিতির শিক্ষকেরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন। বিষয়-শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বইয়ের তালিকা দেবেন। প্রধান শিক্ষক পুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্যদের সহযোগিতায় অর্থের সংস্থান অনুসারে প্রাথমিক তালিকা থেকে চূড়ান্ত ভাবে পুস্তক নির্বাচন করবেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের চূড়ান্ত বাছাইয়ের দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। যদি তিনি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে যে, যে দিকে তাঁর ব্যক্তিগত ঝোঁক আছে আজ তিনি অধিকাংশ টাকা সেদিকে খরচ করে বসে আছেন।

পুস্তক নির্বাচনের বৈজ্ঞানিক পথ

পুস্তক নির্বাচনে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়া উচিত—শিশুপাঠ্য, কিশোর পাঠ্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অভিযান মূলক কাহিনী,

ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান সহায়ক গ্রন্থ, রূপকথা, কিশোর উপন্যাস, ছাত্রদের উপযোগী অনুবাদ-গ্রন্থ, শিক্ষকদের সহায়ক গ্রন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের বই নির্বাচন করতে হবে।

পুস্তকগুলির শ্রেণী বিভাগ

এছাড়াও যদি দেখা যায় ছাত্রদের ডিটেকটিভ বা রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক আছে তাহলে সে বইও কেনা যেতে পারে। তবে দেখে নিতে হবে ছাত্রদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে কি না! মুদালিয়র কমিশনের অভিমত হচ্ছে—*The Guiding principle in selection should be not the teachers' own idea of what books the students must read but their natural and psychological interests. If they feel more attracted at a particular age, to stories of adventure or biographies or even detective and crime, there is no justification for forcing them to read poetry or classics or belle-letters."*

ছাত্রদের মধ্যে যদি বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ছাত্রদের আগ্রহ অনুসারে সব রকম বই রাখতে হবে। গ্রন্থাগারে একগাদা ধর্মগ্রন্থ কি মহাপুরুষের জীবনী রাখলেই ছাত্রেরা নীতিবাগীশ হয়ে উঠবে এমন কথা ঠিক নয়।

ছাত্রদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস তৈরী

রুচিমত বই না থাকলে ছাত্রদের বই পড়ার উৎসাহ কমে যায়। নানারকম বই দিয়ে যদি একবার পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা যায় তাহলে নীতিমূলক গ্রন্থ কি ধর্মগ্রন্থ পড়তে আপত্তি করবে না। কিন্তু শুরুতেই যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে গ্রন্থাগারের বই নিতে ছাত্রদের মধ্যে আর আগ্রহ থাকবে না। গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর ও দরকারী বই কেনার পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল টাকার অভাব। সরকার থেকে ঠিকমত প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া না গেলেও লাইব্রেরী ফি বাবদ যে টাকা প্রতি বছর ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা হয় সে টাকা দিয়ে প্রত্যেক বছরই কিছু বই কেনা চলে।

পরিচালনা
(Administration)

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন গ্রন্থাগারিক থাকা উচিত। গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রন্থাগারিক লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমাধারী হলেই ভাল হয়। তিনি বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকদের মত সমান বেতন ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনায় আধুনিক পদ্ধতি সমূহ তাঁর জানা থাকার জন্য সুষ্ঠু পরিচালনায় ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শুধুমাত্র স্কুলের সময়ই যদি গ্রন্থাগার খোলা থাকে তাহলে ছাত্রেরা টিফিনের সময়ে বাইরে বই পড়ার সুযোগ পায় না।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য স্কুলের সময় তালিকায় কোন নির্দিষ্ট পিরিয়ডের ব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগার থেকে শুধু বই ধার নেওয়া ছাড়াও যাতে ছাত্রেরা স্কুলে বসে বই পড়তে পারে সেজন্য স্কুলের আগে ও পরে গ্রন্থাগার খোলা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে সর্ব্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক থাকলেই তা সম্ভব। গ্রন্থাগারিকের জন্য সময় তালিকা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তিনি স্কুলের আগে ও পরে থাকতে পারেন। গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমাধারী হলেই হবে না, পুস্তক পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকবে। যখন যে বই বের হচ্ছে তার খোঁজ তাঁকে রাখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যে সব বই গ্রন্থাগারে আছে তার বিষয় বস্তুর সাথে তাঁর মোটামুটি পরিচয় থাকবে; যাতে তিনি প্রয়োজন মত ছাত্রদের বইয়ের সন্ধান দিতে পারেন। ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস তৈরী, তাদের রুচি পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক তৎপর হলে ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সর্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে। তিনি তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যই ব্যয় করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী স্কুল ও কয়েকটি বড় বড় স্কুল ছাড়া সর্বক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারিক কোন স্কুল নেই। এক্ষেত্রে কেরাণীবাবু বা একজন শিক্ষককে ভাতার বিনিময়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। তাঁরা বই দেওয়া আর ফেরৎ নেওয়া ছাড়া কিছুই করেন না। সেখানে ছাত্ররা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ পায় সে জন্য একটি সমিতি করে দিলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সমিতিতে শিক্ষক ও ছাত্র দুইই থাকবে। তারা যদি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেন তাহলে গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজের ভার কিছু লাঘব হতে পারে।

গ্রন্থাগারিক সর্বক্ষণের হবেন

গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি খাতাপত্র রাখা দরকার। গ্রন্থাগারিকের অফিস সংক্রান্ত কাজের মধ্যে খাতাপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ অন্যতম। যে সব খাতা রাখতে হবে তা হচ্ছে :—

পুস্তক-জমা বই

(Stock Register)

যে কোন বই কেনা হলে, দান বা উপহার রূপে পাওয়া গেলে জমার খাতায় বইটির নাম, দাতার নাম, মূল্য, জমা হ'বার তারিখ ইত্যাদি লিখতে হবে।

শ্রেণী বিভাগ করা পুস্তকের তালিকা (Classified Catalogue) : ছাত্রদের বই বেছে নেবার সুবিধার জন্য বিষয়ানুসারী একটি পুস্তক তালিকা তৈরী করতে হবে। এই তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বই বর্ণানুক্রমিক লেখকের নাম অনুসারে হলে নিজেদের প্রয়োজন মত বই খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় না। বইয়ে

পরিচয় সূচক বিষয়, নম্বর, পুস্তক সঙ্কেত এই খাতায় বইয়ের নামের সাথে থাকবে। বড় বড় লাইব্রেরীতে Index Card যে কাজ করে এই খাতা সেই কাজ করবে।

শ্রেণী পুস্তকাগারের পুস্তক তালিকা—কেন্দ্রীয় পুস্তকাগার থেকে যে সব বই শ্রেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে তার একটি তালিকা কেন্দ্রীয় পুস্তকাগারে থাকবে। শ্রেণীর জন্য তালিকায় বিষয়ানুসারে বই ভাগ করে দেবার দরকার নেই।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুস্তক ধার দেবার ক্ষমতা (Issue Register) : —ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা যে বই লাইব্রেরী থেকে ধার নেবে এই খাতায় লিখে তার সই নিয়ে বই দেওয়া হবে। যদি প্রত্যেক ছাত্রের জন্য Issue Register-এ একটি করে পাতা থাকে তাহলে বুঝাতে পারা যাবে কোন ছাত্র বছরে কয়খানা বই নিল ও কে কি জাতীয় বই পড়তে ভালবাসে। একটি মোটা খাতা দরকার হলেও বই ধার দেবার ক্ষেত্রে এই রীতি মেনে চলাই ভাল। প্রতিটি পাতা ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত হবে, ছেলেদের নাম বর্ণানুক্রমিক সূচীতে থাকবে, তাহলে আর পাতা খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

জমা খরচের বই :—গ্রন্থাগার খাতে যে টাকা আদায় হ'ল মূল জমা-খরচের বই থেকে হস্তান্তরিত করে গ্রন্থাগারের জমা-খরচের খাতায় দেখাতে হবে ও কোন খরচ হলে সেই খাতায় লিখে খরচ দেখাতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য ভিন্ন ভাবে Bank Account খুলতে হবে।

শ্রেণী পাঠাগার :
(Class Library)

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ কমাবার জন্য প্রতি শ্রেণীতে একটি শ্রেণী পুস্তকাগার খোলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় পুস্তকাগারে সমস্ত বয়সের ও সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী বই থাকে তা থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই শ্রেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সব সময় বই নেবার সুবিধা নেই। শ্রেণী পুস্তকাগার থেকে ছাত্রেরা রোজ বই নিতে পারবে। শ্রেণী পুস্তকাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে শ্রেণীর ছাত্রদের উপর। ছাত্রেরা একটি সমিতির সাহায্যে পুস্তকাগার পরিচালনা করবে। শ্রেণী শিক্ষক প্রয়োজন হলে উপদেশ বা পরামর্শ দেবেন। শ্রেণীর উপযোগী বই কেনবার সময় তাদের অভিমত নেওয়া হবে। যাতে তাদের পছন্দমত বই তারা পেতে পারে সেই সুযোগ তাদের দেওয়া হবে, চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে। যে সব বইয়ের চাহিদা বেশী সে সব বই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অদল বদল করে নিতে হবে, তাহলে নতুন বই পড়বার অনেক বেশী সুযোগ তারা পাবে। প্রতি শ্রেণীতে একটি করে পুস্তকাগার থাকার

শ্রেণী পাঠাগারের পরিচালনার ভার ছাত্রদের

ফলে সেখানে পড়ার পরিবেশের সৃষ্টি হবে। প্রথম অবস্থায় ছাত্রেরা যদি শুধু ছবি দেখে বা পাতা উলটিয়ে দেখেই বই ফিরিয়ে দেয় তবু তাদের বই দিতে হবে। পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হলে ধীরে ধীরে বই সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে তুলতে হবে। একবার পড়ার অভ্যাস তৈরী হলে নিজের তাগিদেই সে বই পড়বে। শ্রেণী পুস্তকাগারে বই দেখার খাতা দেখলেই বোঝা যাবে কে কয়খানা বই নিয়েছে ও তাদের রুচি বা আগ্রহ কোন জাতীয় বইয়ের দিকে।

প্রতিটি শ্রেণীতে এক একটি করে শ্রেণী পাঠাগার থাকবে। ঐ শ্রেণীর ছাত্রদের মতামত নিয়ে ঐ পাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রতি বছর যে সব specimen copy আছে সেগুলিকে দিয়েই প্রাথমিক অবস্থায় শ্রেণীপাঠাগার আরম্ভ করা যেতে পারে। এই জাতীয় পাঠগার হবে কতকটা Text book Library-এর মত। বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় প্রতিটি বিষয়ের উপর একটি করে বই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখকের বই পড়ে দেখবার আছে। অন্যান্য লেখকের মানসিকতা, চিন্তাশীলতা, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন বই-এ যে বিভিন্ন ছবি-মানচিত্র-চার্ট-গ্রাফ ইত্যাদি থাকে তাও বিশেষ সহায়ক হয়।

শ্রেণী পাঠাগারে পুস্তক নির্বাচন

শ্রেণী পাঠাগারে অন্যান্য বই-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্র আছে শ্রেণী পাঠাগারে অন্ততঃ ততগুলি বই থাকা প্রয়োজন। তাতে সব সময় এক একটি ছাত্রের কাছে এক একটি বই থাকতে পারে। শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি কমিটি নির্বাচন করে তাদের হাতে শ্রেণী পাঠাগার পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে। তাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলা হবে। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব জ্ঞানও বাড়বে।

শ্রেণী পাঠাগারের গুরুত্ব

বিষয় পাঠাগার
(Subject Library)

প্রত্যেকটি বিষয় তার স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও পৃথক পৃথক বিষয়ের জন্য বিষয় কক্ষের (subject room) কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়কক্ষে বিষয়টি শিক্ষাদানের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। আর সেই সঙ্গে থাকবে সেই বিষয়ের একটি বিষয়-পাঠাগার (Subject library)। শ্রেণী পাঠাগার ছাড়াও বিদ্যালয়ে বিষয় গ্রন্থাগার থাকবে। যে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিষয়কক্ষ আছে সেই বিষয়কক্ষে বিষয়ানুযায়ী সহায়ক পুস্তক

(reference book) রাখা যেতে পারে। সেখানে অভিধান ইত্যাদি পুস্তকও থাকবে। বিষয় শিক্ষক (Subject Teacher) গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার (Central library) থেকে বিভিন্ন বই নিয়ে বা প্রয়োজনমত বই কিনে বিষয় গ্রন্থাগার খোলবার ব্যবস্থা করবেন। বিষয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ বিষয় শিক্ষক হিসেবে তিনিই জানেন যে, কোন শ্রেণীতে কোন বই প্রয়োজন, কোন ছাত্রের কোন বই প্রয়োজন, ঐ বিষয়ের কি কি বই পাওয়া যায়, বইগুলিকে কেমনভাবে ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি। শ্রেণীকক্ষে শ্রেণী পাঠনের (class teaching) মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তার বাইরেও অনেক কিছু জানবার প্রয়োজন আছে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশে নানারকম বই-এর সাহায্যে তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতে পারে। কোন বিষয় শিক্ষক কোন topic পাঠদান করবার কালে সব সময় বিভিন্ন reference বইয়ের নাম বলে দেবেন, লেখকের নাম বলে দেবেন, এবং ঐ বইয়ের মধ্যে ঐ topic যে পৃষ্ঠায় আছে তাও উল্লেখ করবেন। তাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। বিষয় পাঠাগারের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব বিষয়-শিক্ষক নিজেই গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনমত তিনি ছাত্রদের সাহায্য নিতে পারেন। তাঁর বিষয়ের উপর যে সব নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে সে খোঁজ তিনি রাখবেন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক বই সংগ্রহ করবেন।

বিদ্যালয়ে বিষয় পাঠাগারের গুরুত্ব

বিষয়-পাঠাগারের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের (যে সব প্রাক্তন ছাত্র ঐ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত) যোগাযোগ থাকলে বিষয়-পাঠাগার আরো সমৃদ্ধ হয়। প্রাক্তন ছাত্রেরা ঐ পাঠাগারের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারেন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র বিষয় পাঠাগারের উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে পারেন, বা, ঐ বিষয়ের উপর কোন আলোচনা সভা, Seminer, বিতর্ক ইত্যাদিতে দেখা দিয়ে ছাত্রদের উপকৃত করতে পারেন। এ সমস্ত করা যদি সম্ভব হয় তবে বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর সমাজজীবন গড়ে উঠবে যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় পাঠাগারের গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না।

প্রাক্তন ছাত্রদের ভূমিকা

কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার
(Central Library)

শ্রেণী পাঠাগার ও বিষয় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও বিদ্যালয়ে কেন্দ্রিয় পাঠাগারের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার

পরিচালনার জন্য একজন গ্রন্থাগারিক (librarian) থাকবেন। তিনি পাঠাগার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান যথাযথভাবে জানবেন। পাঠাগারের বই কেনা, বই সাজানো, বইগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা, শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া, খাতাপত্র রক্ষা করা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আনা ও তা শিক্ষার্থীদের দেওয়া, শিক্ষকদের বই দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক সদাসতর্ক থাকবে। বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পরিবেশ গড়ে তুলতে ও ছাত্রদের মধ্যে পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করতে গ্রন্থাগারিকের একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকবে।

বিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় পাঠাগার

কেন্দ্রিয় পাঠাগার সুপরিচালনা করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় কেন্দ্রিয় পাঠাগার পরিচালিত হবে। গ্রন্থাগারিক তাঁর কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে এ কার্য সম্পন্ন করবেন। বই কেনা, বই তালিকাবদ্ধ করা, শিক্ষার্থীদের সে তালিকা দেখানো, তাদের পছন্দ মত বই দেওয়া, বই ফেরৎ নেওয়া, খাতাপত্র রক্ষা করা ইত্যাদি হ'ল পরিচালনা ব্যবস্থার অন্তর্গত।

পাঠাগার পরিচালনা

পাঠাগারে বইগুলিকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে আর্থিক অবস্থা এমন যে, এই বইপত্র একবার নষ্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তা সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। বইগুলি যাতে পোকায় কেটে না দেয় তার জন্য বিভিন্ন ঔষধ পত্র ব্যবহার করতে হবে। কোন বই খুব পুরাতন হয়ে গেলে তাকে বাঁধানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বইগুলির যত্ন

পাঠকক্ষ ও পাঠাভ্যাস

(Reading Room & Study Habit)

কেন্দ্রিয় পাঠাগারের অন্যতম প্রধান অংগ হ'ল এর পড়বার ঘর (reading room or study hall)। একটি বড় ঘর কেন্দ্রিয় পাঠাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। সেখানে বিশ্রামের সময় বা নির্দিষ্ট কোন period-এ শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশুনা করবে। বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার কিছু পরেও কিছু সময় শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য পাঠাগার খুলে রাখতে হবে।

এই Reading Room-এ পড়বার উপযোগী সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই কক্ষে নীরবতা ও শৃংখলা মেনে চলতে হবে। কক্ষটি বিভিন্ন মহাপুরুষ ও শিক্ষাবিদ্‌গণের ছবি দিয়ে সুসজ্জিত হবে। পাঠাগারে Study Hall কে কিছু ফুল ও ধূপ ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত রাখতে পারলে তা শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করে। Library Reading room, শিক্ষার্থীদের বসে পড়বার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঘরটি উপযুক্ত আলোবাতাসযুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এই কক্ষটিতে পড়াশুনার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

Study Hall

বিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **Study Hall**-এ অভিজ্ঞ শিক্ষকের

তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারিক ও এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। **পাঠের অভ্যাস (Study habit), পাঠশৈলী (Study Skill)** গড়ে তোলা শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে পড়ে. এই Study habit ও Study Skill শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সাহায্য করবে। পড়াশুনার অভ্যাস ব্যক্তিজীবনের একটি বিশেষ গুণ। পড়াশুনার প্রতি ঝোঁক সকলেরই থাকা দরকার। জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কাজেই পড়াশুনার কাজ সারা জীবন ধরে চলবে। তাই পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে শিক্ষাজীবন থেকেই। অবসর যাপনের একটি সুন্দর উপায় হ'ল বই পড়া। কাজেই পাঠের অভ্যাস জীবনে খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আর যখন পরীক্ষা, প্রমোশন Interview ইত্যাদির জন্য যখন পড়াশুনার চাপ আসে তখন পাঠাভ্যাসের গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের সাহায্যে বিদ্যালয়ের reading room-এ শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলবার প্রয়োজন আছে।

Study Skill

সেই সঙ্গে প্রয়োজন **Study skill** বা পাঠদক্ষতার। পাঠদক্ষতা অবশ্য পাঠাভ্যাস থেকেই আসে। পাঠাভ্যাস রপ্ত হলেই পাঠদক্ষতা গড়ে উঠে। অনেক সময় দেখা যায় যে একই শ্রেণীর দুটি ছাত্র একই বই-এর পৃষ্ঠা একসঙ্গে পড়া শুরু করে এক সঙ্গে শেষ করতে পারে না। তার কারণ হ'ল এই যে উভয়ের মধ্যে পাঠদক্ষতার অভাব আছে। পড়ে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ-দক্ষতার অর্থ হ'ল—দ্রুত পাঠ করা এবং পাঠ করে তা গ্রহণ করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই তাই পাঠদক্ষ হতে হবে। জ্ঞানভাণ্ডার বর্তমানে এমন সমৃদ্ধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যত কম সময়ে যত বেশী গ্রহণ করতে পারবে তার পক্ষে ততই লাভ। ব্যক্তিজীবনে তাই Study skill-এর প্রয়োজন আছে।

Study Habit

অবকাশকালীন ও বৃত্তিমূলক পাঠাগার

(Vacation and Vocation Library)

বিদ্যালয়ে ২টি বড় বড় ছুটি থাকে,—গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটি। গ্রামের বিদ্যালয় গুলিতে বর্ষার ছুটি বা চাষের ছুটিও থাকে। এই ধরনের ছুটিগুলিতে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন সময়েও পাঠাগার বন্ধ থাকে। বাৎসরিক পরীক্ষার পরেও result হওয়া ও নতুন session শুরু হওয়া পর্যন্ত পাঠাগার বন্ধ থাকে। বছরের এই সময়গুলিতে পাঠাগারকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। অনেকে বলেন যে ছুটিগুলিতে পাঠাগারকে অভিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। আমাদের দেশে অনেক বিদ্যালয় জনসাধারণের সে জন্য ত্যাগ ও দানের সাহায্যে

গড়ে উঠেছে। কাজেই বিদ্যালয় থেকে তারা যদি কিছু উপকৃত হয় তো ক্ষতি কি? তাছাড়া আর্থিক অসঙ্গতির জন্য বিদ্যালয়ের পাঠাগারগুলির উন্নতি সম্ভব হয় নাই। ছুটিগুলিতে পাঠাগার স্থানীয় জনসাধারণের জন্য খুলে রাখলে তার উপকৃত হবে। আমাদের গ্রাম বাংলায় ব্যক্তিজীবনে recrcation ব্যবস্থা নাই বললেও চলে। তাই তার জন্য এই সামান্য ও সং প্রচেষ্টা বিদ্যালয় থেকে করা যেতে পারে। তখন তাঁদের কাছে থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয়ের পাঠাগারকে উন্নত করা যেতে পারে। ফলে স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হবে। বিদ্যালয়ের পাঠাগার সম্বন্ধে হওয়ায় পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। সর্বোপরি সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠবে। বিদ্যালয়ে Vacation library-এর গুরুত্বের কথা তাই নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

পাঠাগারের অবকাশ কালীন

শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে আমরা জ্ঞানার্জনের কাথা বলে থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা লেখাপড়া শিখে কোন চাকুরী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। শিক্ষা হ'ল তাই বৃত্তিমূলক। বৃত্তিমূলক শিক্ষা আজ জনসমর্থন পেয়েছে, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা তার বৈজ্ঞানিক রূপ ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করবার জন্য বিভিন্ন বইপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে। যে সমস্ত বই পত্রের সাহায্যে বৃত্তিমূলক পাঠাগারের (Vocation Library) প্রয়োজনীয়তা আজ তাই অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য এবং শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করবার জন্য বিদ্যালয়ে Vocation Library গড়ে তুলতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পাঠাগার

উপসংহার
(Conclusion)

অনেক সময় দেখা যায় আলমারী বোঝাই বই রয়েছে কিন্তু বই দেবার ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের দিক থেকেও বই পডবার আগ্রহ নেই। যদি ছাত্ররা বই পড়ার সুযোগ না পেল তাহলে বই রাখার সার্থকতা কি? ছাত্রদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি একটা বড় কাজ। ছেলেবেলা থেকেই তাদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ছাত্রদের মন ভুলানো সুন্দর সুন্দর ছবির বই রাখতে হবে, আর যাতে সেই বই তারা পড়ে সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। একটু বড় হলে যখন নানা বিষয়ে জানতে আগ্রহ হবে তখন বিষয় শিক্ষক তাদের উৎসাহ দেবেন কি বই কোন বয়সে কোন স্তরে, পড়তে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। ছেলেদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি হবে ও ছেলেরা গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়লেই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রাখার সার্থক হবে। শিক্ষার্থীরাই ধীরে ধীরে অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে পরিচিত হবে।

পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে

প্রশ্নাবলী

1. "School library in West Bengal are at present almost useless."—Comment on the statement and indicate how you would improve their utility. (C. U., B. T.—1957)
2. Discuss the special role of the library in creative learning in the modern activity centred education of our schools. (N. B. U. B. T.—1968)
3. Bring out the grow importance of the school library in the changing educational programmes of progressive high schools of the day. Indicate your ideas for the better functional organization of the library. (Kalyani University, B. T.—1966)
4. How would you organise and run a class library? Explain in some detail (C. U., B. T.—1958)
5. Write notes on the following :—
   (a) Class Library. (C. U., B. Ed.—1968)
   (b) Library. (C. U., B. T.—1967

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ সংগঠন ও বিদ্যালয় পরিচালনা

(GENERAL ORGANISATION AND SCHOOL ADMINISTRATION)

শিক্ষার আলোক বিস্তারের জন্য সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যালয়গুলি। শিক্ষার্থীরা এখানে আসে শিক্ষা গ্রহণ করতে। সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন তা বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। মানুষের জীবনে যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা শিক্ষার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। বিদ্যালয়গুলি সে কার্য সাধন করে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই মানুষ ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির বিরাট এক ভূমিকা আছে। দেশ ও জাতির, সভ্যতা ও সংস্কৃতির, সমাজ ও ব্যক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর। আর এই শিক্ষাদানের পীঠস্থান হ'ল বিদ্যালয়গুলি। কাজেই বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে—সেগুলিকে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল করা প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয় পরিচালনার প্রয়োজন হয়।

দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবরকম উপায় ও উপকরণ থাকলেও সুপরিচালনার অভাবে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাকার্য ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে বিরাট অট্টালিকা, প্রচুর উপকরণ, যথেষ্ট শিক্ষক ও অনেক ছাত্র থাকলেই শিক্ষাদান কার্য যথাযথভাবে চলে না। তখন প্রয়োজন সুপরিচালনার। বিদ্যালয়ের সমস্ত কিছুকে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই সুপরিচালনার (Good Administration) লক্ষণ। একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষক, উপকরণ ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। ঠিক শ্রেণীতে ঠিক শিক্ষক যথাযথভাবে আদর্শ শিক্ষাদান যখন করতে পারেন তখন তাকে সুপরিচালনা বলে। কোন বিদ্যালয়ে আরো সমস্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সুপরিচালনার অভাবে শিক্ষাদান কার্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ে পরিচালনার প্রয়োজন

বিদ্যালয় সংগঠনেরও (School organisation) প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ নির্বাচন, Building ইত্যাদি নির্মাণ, সরকারী অনুমোদন

ও আর্থিক অনুদান আদায়, আসবাবপত্র সংগ্রহ, উপকরণ সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি বিদ্যালয় সংগঠনের মধ্যে পড়ে। বিদ্যালয় সংগঠন সাধারণভাবে সমাপ্ত হওয়ার পরই পরিচালনা কার্য শুরু হয়। তবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবস্থার পর বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার কাজ এক সঙ্গে চলে। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় সংগঠনের গুরুত্ব কম নয়। প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন, সরকারী সাহায্য আদায়, বিভিন্ন আসবাবপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে শিক্ষাদান কার্য ব্যহত হতে বাধ্য।

বিদ্যালয় সংগঠন

বিদ্যালয় পরিচালনাও (School Administration) কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে শিক্ষা গ্রহণ করতে। বিদ্যালয় পরিচালনা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বোত্তম বিকাশের চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা, Home task, পাঠক্রম রচনা, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, সময় তালিকা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, Class promotion, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃংখলারক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়গুলি বিদ্যালয় পরিচালনার অন্তর্গত। এই পরিচালনা কার্য যথাযথভাবে পালিত না হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজকর্মের রূপায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয় পরিচালনা

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালন, কলকারখানা পরিচালনা ও বিদ্যালয় পরিচালনা এক নয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক থাকে ;—একজন বা একা গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে ঐসব প্রতিষ্ঠান চলে। বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বও থাকে প্রধানতঃ প্রধান শিক্ষকের হাতে। কিন্তু তিনি বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক প্রভৃতির সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বোঝাপড়ায় এসে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সমবায়মূলক মনোভাব বিদ্যালয় পরিচালনার মূলকথা। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিচালনা কার্য সুসম্পন্ন করতে হবে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও বিদ্যালয় পরিচালনা এক নয়

বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি (School managing committee) ও প্রধান শিক্ষক মিলে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা কার্য সম্পন্ন করেন। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে অভিভাবক প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক ও একজন শিক্ষানুরাগী থাকেন। বিদ্যালয় সংগঠনের দায়িত্ব মূলতঃ পরিচালক সমিতির। বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য, তবে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সক্রিয় সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা। বিদ্যালয় একটি শিক্ষা

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক সমিতি ও প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠান। তার কিছু সরকারী ও বেসরকারী আইন-কানুন ও নিয়ম-শৃংখলা আছে। সব সময়েই তা রক্ষা করে চলতে হবে। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা শৃংখলা সহকারে শিক্ষাদান কার্য সুসম্পন্ন করা যায়।

বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Democratic) অনুসরণ করা প্রয়োজন। সবকিছু কাজকর্ম, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে হবে। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে প্রধান শিক্ষক ও সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলেই নির্বাচিত হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সভা (Teacher's council) নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ছাত্রসংসদের ভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে, সকলেরই মত প্রকাশের ক্ষমতা থাকবে। বিদ্যালয়ের কাজকর্মের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। যৌথ মনোভাব, সহযোগিতা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার প্রভৃতির ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। সকলের মধ্যে যাতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয় এবং বিভিন্ন কাজকর্ম যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সকলেই অনুভব করে যে বিদ্যালয় তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে শৃংখলা রক্ষা করা বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যতম প্রধান কথা। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আইন ও নিয়ম আছে। সে নিয়ম ও আইনের বাইরে গেলে ছাত্র ও শিক্ষককে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এই নিয়মগুলির কড়াকড়ি ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ে শৃংখলা রক্ষা করতে পারে না। মানবিক বোধ, মানসিক উদারতা, সুদৃঢ় সংকল্প ও সহযোগিতার মনোভাবেই বিদ্যালয়ে শৃংখলা রক্ষা করতে হবে। বিদ্যালয় পরিচালনায় খুব সতর্কভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শৃংখলা রক্ষা করতে হবে। শৃংখলা পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে তার সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।

বিদ্যালয় পরিচালনা ও শৃংখলা রক্ষা

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হ'ল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। কাজেই গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথ-ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনায় সবকিছু কাজকর্মই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কথা তাই সব সময় মনে রাখতে হবে।

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার কেন্দ্র-বিন্দু হ'ল শিক্ষাদান

প্রধান শিক্ষক
(Headmaster)

বিত্যালয়ে অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের পাঠান লেখাপড়া শিখতে। লেখাপড়া শেখাটাই বিত্যালয়ে আসবার মূল লক্ষ্য। এছাড়াও তাদের অনেক কিছু জানবার, শিখবার আছে। বিত্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। বিত্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি ছেলেমেয়েদের সব দিক থেকে উপযুক্ত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত করে দিতে হয় তাহলে সেখানে আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুপরিচালনার (Good Administration)। বিত্যালয় যদি সুপরিচালিত না হয় তা হলে ভাল বিত্যালয় গৃহ, মূল্যবান আসবাবপত্র, উপযুক্ত শিক্ষক থাকা সত্বেও কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না, শিক্ষকদের কাজে উৎসাহ থাকবে না। যেখানে শৃংখলার অভাব, সুপরিচালনার অভাব সেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা হতেই পারে না। স্কুলে ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পাবে কি না এটা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চেষ্টার ব্যাপার নয়,— এটা শিক্ষকদের সমষ্টিগত চেষ্টার ফল। দলগতভাবে কাজ করে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন একজন উপযুক্ত দলনেতা। দলনেতার নির্দেশ ও পরামর্শে দলগত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে যদি তাদের পশ্চাতে থাকেন একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরিচালক বা নেতা। বিত্যালয়ের **প্রধান শিক্ষকই এই নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। বিত্যালয়-তরণীর তিনিই হচ্ছেন কর্ণধার। তিনি শুধু পরিচালকই হবেন না,—তিনি তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, উত্তমশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, সহানুভূতি, সংগঠনী শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সহকারী শিক্ষকদের মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন; এবং বিত্যালয়কে সামগ্রিক সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন।**

প্রধান শিক্ষক হলেন বিদ্যালয় তরণীর কর্ণধার

আমরা জানি যেখানে নেতৃত্ব সেখানেই দায়িত্ব। স্কুল-নেতা প্রধান শিক্ষকের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। প্রধান শিক্ষক যাঁদের পরিচালনা করবেন তাঁরা বিত্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মশক্তিতে কোন অংশেই ন্যূন নন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় দু'চার জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষকের সমকক্ষ বা অধিকতর শিক্ষিত। সেক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব আরো কঠিন। কারখানা ম্যানেজারের মনোভাব নিয়ে বিত্যালয় পরিচালনা করা যায় না। বিত্যালয় পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্ত নিন্দা তাঁরই প্রাপ্য। প্রধান শিক্ষককে দিয়েই অনেক সময় বিত্যালয়ের বিচার করা হয়। তাই বলা হয়—*As is the Head Master,*

'As is the Headmaster, so is the School'

so is the school.) কোন বিদ্যালয়ে অনেক ভাল শিক্ষক থাকতে পারে, কিন্তু প্রধান শিক্ষক যদি সুপরিচালক না হন তাহলে সে বিদ্যালয় সুনাম অর্জন করতে পারে না। *P. C. Wren* বলেছেন—"*What the mainspring is to the watch, the fly-wheel to the machine, or the engine to the steam-shin, the Head-master is to the school.*"

(প্রধান শিক্ষকের নেতা হিসেবে স্বৈরাচারী মনোভাব থাকবে না।) ক্ষমতা আছে বলেই ক্ষমতার প্রয়োগ করে আনুগত্য আদায় করবেন,—একথা যদি কেউ মনে করেন তিনি তাহলে সুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক হতে পারবেন না। (সহকারী শিক্ষকদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতাই সর্বত্র কাম্য) প্রধান শিক্ষক কখনই মনে করবেন না বিদ্যালয় আমার এবং সহকারী শিক্ষকেরা আমার কর্মচারী। বিদ্যালয় আমাদের, বিদ্যালয়ের সমস্যা আমাদের সমস্যা, এর সুনাম, দুর্নাম, সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য আমরা সমভাবে দায়ী,—শিক্ষকদের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্বের অংশীদার করে নিতে হবে। তাহলে প্রধান শিক্ষকের সাথে তাঁরাও মনে করবেন যে, বিদ্যালয়ের কর্মনীতি নির্ধারণে আমার একটা দায়িত্ব আছে।—কার্যপদ্ধতি রূপায়ণে আমার একটা ভূমিকা আছে) এই মনোভাবের সৃষ্টি হলে শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজ-লভ্য হবে। এমন পরিস্থিতিও উদ্ভব হতে পারে যেখানে প্রধান শিক্ষকের সাথে সহকারী শিক্ষকদের মতবিরোধ হচ্ছে। তিনি সে ক্ষেত্রকে সংকোচিত করে আনবার চেষ্টা করবেন। (খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় মতবিরোধের অবসান ঘটে।) (প্রধান শিক্ষক মনে রাখবেন যে, সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে পারাটাই সর্বক্ষেত্রে কাম্য।) এজন্য তাকে tactful হতে হবে। (তবে যেখানে কোন মূলনীতির প্রশ্নে বিরোধ, যেখানে জোড়াতালি চলে না সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর কর্তব্য-কর্মে অবিচলিত থাকবেন।)

প্রধান শিক্ষকের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালন

(বিদ্যালয় পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ প্রধান শিক্ষককে করতে হয়।) তবে তিনি যেন কেবলমাত্র শিক্ষকের দোষ অনুসন্ধান করে না বেড়ান। কারণ এরূপ কাজের জন্য সহকারীদের মধ্যে যদি সহযোগিতার অভাব ঘটে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বিদ্যালয়ের কাজে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সহকারীদের সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রধান শিক্ষকের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রধান শিক্ষক হবেন কর্তব্যপরায়ণ সহকারীর সহৃদয় বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তিনি নিজে যদি পক্ষপাতশূন্য, ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন তাহলে তাঁর চরিত্র-প্রভাবে শিক্ষক ও ছাত্ররা সমভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে, তাঁর নেতৃত্ব বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে।

প্রধান শিক্ষকের কর্তব্যপরায়ণতা

প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলী

(Functions of the Headmaster)

প্রধান শিক্ষকের বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে। স্কুলের সর্ববিধ কাজেই তাঁর দৃষ্টি সজাগ থাকবে। তিনি যদি নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করেন, তাহলেই তাঁর স্কুল সুপরিচালিত হবে। প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায় ;—

(১) **শিক্ষাদান (Teaching).**

(২) **তত্ত্বাবধান (Supervision).**

(৩) **প্রশাসন (Administration).**

(৪) **সমন্বয় সাধন (Co-ordination).**

এগুলি সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ১ ॥ **শিক্ষাদান (Teaching)**—বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বহু কাজ প্রধান-শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন। এজন্য শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য তিনি খুব কম সময় পান, তবু তাঁকে শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য কিছু সময় রাখতে হবে। প্রধান-শিক্ষক যেন ভুলে না যান যে তিনিও একজন শিক্ষক। প্রতিদিন ২।৩টি পিরিয়ড তিনি ক্লাস নেবেন। সম্ভব হলে তিনি নীচের দিকের শ্রেণীগুলিতেও ক্লাস রাখার চেষ্টা করবেন। পরিদর্শন ও প্রশাসনিক কাজ দেখতে গিয়ে যদি তিনি পড়ানোর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন তাহলে তাঁর পক্ষে মস্ত ভুল হবে। পড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন। শিক্ষক-ছাত্রের প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষাকর্মের মধ্য দিয়ে যেভাবে গড়ে উঠবে অন্য কোনভাবে তা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই। অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করে আদর্শ প্রধান শিক্ষক হওয়া যায় না।

আদর্শ প্রধান শিক্ষক একজন সুযোগ্য শিক্ষক হবেন

শিক্ষাদান কার্যের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকদের আদর্শ স্থানীয় হবেন, ভাল পড়িয়ে ছেলেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হবেন। তিনি যদি শিক্ষাকার্য থেকে বিরত হন তাহলে পাঠদান পদ্ধতির সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবেন। শুধু বারান্দায় ঘুরে, আর শিক্ষকদের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলে কি পড়া হচ্ছে তার সঠিক হিসেব রাখতে পারবেন না। নিজের ক্লাস তিনি করবেন, এছাড়া মাঝে মাঝে অন্য শিক্ষকের ক্লাস তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে, বিভিন্ন বিষয় কিরূপ পড়ান হচ্ছে। সাধারণভাবে শ্রেণীর প্রগতির ধারাকে বুঝতে হলে মাঝে মাঝে রুটিনের বাইরে ক্লাস (supervision class) তাঁকে নিতে হবে।

স্কুলের পাঠ-প্রগতি ও শিক্ষার মানের যদি অবনতি লক্ষ্য করেন তাহলে শিক্ষকদের সাথে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও কি করে শিক্ষার মানের উন্নতি-সাধন হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন। একজন সুশিক্ষকই আদর্শ প্রধান শিক্ষক হতে পারেন। সপ্তাহের ছয় দিনে গড়ে প্রত্যহ দু'টি করে পিরিয়ড প্রধান শিক্ষক class নেবেন। তবে একজন বিষয় শিক্ষকের (subject teacher) গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে না দেওয়াই ভাল। তিনি পঞ্চম থেকে একাদশ পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীতেই ১/২টি করে class রাখবার চেষ্টা করবেন। তাতে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও শৃংখলা রক্ষার গুরু দায়িত্ব তিনি বহন করতে পারবেন।

॥ ২ ॥ **তত্ত্বাবধান (Supervision)**—তত্ত্বাবধানের কাজ বলতে সব রকম কাজ বোঝায়। কথাটা অত্যন্ত ব্যাপক। স্কুলের এমন একটি দিক নেই যে দিক সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন না।

যথাযথ তত্ত্বাবধান বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতিতে সাহায্য করে

শিক্ষকদের কাজ, ছেলেদের লেখাপড়া, ঘরের কাজ, খেলাধুলা, হোস্টেল পরিদর্শন, ছেলেদের নৈতিক, দৈহিক, মানসিক বিকাশের অগ্রগতির ধারা কোনটাই তাঁর নজর এড়িয়ে যাবে না। অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তিনি তত্ত্বাবধান করবেন। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানের কাজ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—হিসেব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্রাদি ঠিক ভাবে রাখা হচ্ছে কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা, শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পর্কীয় কাজের তদারকী ও স্কুলের সাধারণ উন্নতি।

॥ ক ॥ **খাতাপত্রাদি ও হিসাব (Registration works and Account) :**—বিদ্যালয়ের কাজের জন্য বহু প্রকার খাতা ও ফাইল রাখতে হয়। সে সব যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কেরাণীর। প্রধান শিক্ষক দেখবেন কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কি না। প্রধান শিক্ষক মাসে একবার শ্রেণীর হাজিরা বই দেখবেন।

খাতাপত্র পরিদর্শন

ছেলেদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে, —যাতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। বছরের শুরুতে যখন ভর্তি ও ট্রান্সফার হচ্ছে সে সময় তিনি নিয়মিত খোঁজ রাখবেন। কোন শ্রেণীতে কতজন নতুন ছাত্র নেওয়া হবে, কোন শ্রেণীতে কয়টি বিভাগ থাকবে ইত্যাদি স্থির করে তিনি ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন। বিদ্যালয়ের সমস্ত খাতাপত্র যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। অনেকগুলি ক্ষেত্রে সেইসব খাতাপত্রের গোপনীয়তা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় ও তথ্যের যথাযথ record রাখা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। সমস্ত অফিসের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ।

ক্যাস বই যাতে রোজ লেখা হয় তা দেখবেন। মাইনে আদায়ের রসিদ বইয়ের সাথে জমার টাকা মাঝে মাঝে মিলিয়ে চেক করে নেবেন। Acquintance roll মাইনা দিবার দিনই দেখে সই করবেন। P. F. এর টাকা নিয়মিত জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। *Games Fund, Library Fund, Examination Fund, Bnilding Fund* প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব রয়েছে। বিভিন্ন ফাণ্ডে যে জন্য টাকা আদায় করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যেই যাতে টাকা খরচ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রধান শিক্ষক নিজে টাকা জমা নিচ্ছেন না, হিসেব তিনি রাখছেন না, খরচ তাঁর ইচ্ছায় সব সময় হচ্ছে না;—তবু স্কুলের অর্থের যথাযথ হিসেব রাখা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে তাঁকে যথাযথ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থ সম্পর্কে সম্পাদকের সমান দায়িত্ব তাঁরা রয়েছে।

Cash Book তত্ত্বাবধান

যে স্কুলের সাথে ছাত্রদের হোস্টেল আছে তার পরিচালনার জন্য Hostel Superintendent থাকবে। হোস্টেলের দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে হোস্টেলের শৃংখলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখবেন, প্রয়োজন হলে হঠাৎ গিয়ে **(Surprise Visit)** ছাত্রেরা রাতে ঠিকমত আছে কি না, পড়ছে কি না তার তত্ত্বাবধান করবেন। তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনে প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ছাত্রেরা পাচ্ছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

হোস্টেল পরিদর্শন

বিদ্যালয়ে যে **পাঠাগার (Library)** থাকবে প্রধান শিক্ষক তা মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করবেন। গ্রন্থাগারিক ঠিকমত কাজ করছেন কি না, পাঠাগার শিক্ষার্থীদের কাজে লাগছে কি না, শিক্ষার্থীরা ঠিকমত পাঠাগার ব্যবহার করছে কি না তা তাঁর জানা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে কোন বছর কি কি বই কেনা হ'ল, সেগুলি ঠিকমত জমা করা হ'ল কি না, কি কি নতুন বই-এর অভাব থাকলো সে সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন। পাঠাগার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল থাকবেন। বিদ্যালয়ের **Reading Room** বা **Study Hall**-এ শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে পড়াশুনা করে কি না তাও তাঁর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে তাঁর মাঝে মাঝে Surprise Visit-এ যাওয়া প্রয়োজন।

পাঠাগার পরিদর্শন

॥ খ ॥ শিক্ষাকার্যের তত্ত্বাবধান (Supervision of Teaching) :— শ্রেণীর পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথম প্রয়োজন সময় তালিকা (Time Table) প্রণয়ন। কাজটি জটিল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ শিক্ষক কোন্ বিষয় কোন্

শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত তা বিচার করে শিক্ষকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। প্রবীণ বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সময়-তালিকা রচনা করলে অনেক অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সময় তালিকা অনুসারে কাজের প্রগতি কি ভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সময়তালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কর্মের কেন্দ্রবিন্দু সেকথা মনে রাখতে হবে। সময় তালিকার উপর ভিত্তি করেই যে শিক্ষাদানকর্ম তাতেই শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রগতি হয়। তাই যথাযথ ও বৈজ্ঞানিক সময় তালিকার প্রতি প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

সময়তালিকা

প্রতিদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে কি হচ্ছে, না-হচ্ছে তা ঘুরে দেখবেন। যা কিছু স্কুলে ঘটে তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। তাই ক্লাস পরিদর্শনের কাজ তিনি নিয়মিত করবেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের **ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical Works)** ঠিকমত হচ্ছে কি না তাও প্রধান শিক্ষককে তত্ত্বাবধান করতে হবে। এজন্য সব সময় ক্লাসে ঢুকতে হবে এমন কোন কথা নেই। বারান্দায় ঘুরে যদি কাজ হয়, কি বাইরে দাঁড়িয়ে যদি ক্লাসের কাজ লক্ষ্য করা যায় তাহলে সব সময় ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকের কাজের অসুবিধা করা উচিত না। পরিদর্শন কালে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা নোট করে রাখবেন এবং পরে শিক্ষকের সাথে সে সম্পর্কে আলাপ করবেন, তাঁকে উপদেশ দেবেন। কাজটি এমন ভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষক মনে করেন 'এটা তাঁর ভালোর জন্যই করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকগণ যেন মনে রাখেন যে প্রধান শিক্ষক যা করছেন তা স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই করছেন। সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব-মূলক মনোভাব নিয়ে প্রধান শিক্ষক যদি সহকারী শিক্ষকদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে অগ্রসর হন তাহলে গঠন-মূলক যে কোন পরামর্শ শিক্ষকগণ গ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস করি। তবে মনে রাখতে হবে যে কোন অবস্থায় শিক্ষককে ছাত্রদের সামনে এমন কিছু বলবেন না যাতে তিনি বিব্রত বোধ করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি বা যেই বিষয়েই হোক তা তিনি পরে আলোচনা করবেন। Class Supervision বর্তমান একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কারণ বিদ্যালয়ে কয়েকটি stream থাকে, অনেক বিষয় থাকে, এবং বিভিন্ন বিষয়ের Subject teacher থাকেন। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই অন্য বিষয়ের শিক্ষাদানের কার্যে তিনি তত্ত্বাবধান করবেন কি না, বা, করতে পারেন কি না তাই নিয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। ইংরাজীতে M. A. পাশ করা প্রধান শিক্ষক রসায়ন বিদ্যার class-এ শিক্ষণকার্য তত্ত্বাবধান করবেন কি না তা বিচার্য বিষয়। কিন্তু প্রধান

Class Supervision

শিক্ষককে অবশ্যই Trained Teacher হতে হবে। শিক্ষাদানের আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যথাযথভাবে অবহিত থাকবেন। তাই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ ধারণা থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিজে পড়াশুনা করে সাধারণ জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করতে পারেন। তাই বিভিন্ন শ্রেণী পরিদর্শনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে তাঁর নেই তা নয়। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের তিনিই হলেন নেতা। এ নেতৃত্ব তাঁকে নিজেকেই অর্জন করে নিতে হবে।

শিক্ষকদের সভায় শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে যদি সাধারণভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে সমস্ত শিক্ষক একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক সভা ও শ্রেণীপাঠন

শিক্ষকগণ পাঠটীকা রচনা করে পড়াচ্ছেন কি না, কি ভাবে পড়ালে বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রম পড়ান সম্ভব হবে, বাড়ীর কাজ দেওয়া (Home task) ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নিয়ে একটা নীতি নির্ধারণ করে নিলে প্রধান শিক্ষকের কাজের সুবিধা হয়। প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন। তারপর লক্ষ্য রাখবেন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হচ্ছে কি না।

শ্রেণী পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করবেন। কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের প্রশ্ন রচনা করবেন, কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের উত্তরপত্র পরীক্ষা করবেন। তিনি সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। প্রশ্ন পত্রের **গোপনীয়তা** যাতে রক্ষিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রশ্নপত্রগুলি তিনি যথাসম্ভব দেখে দেবেন। প্রশ্নের

পরীক্ষাকার্য তত্ত্বাবধান

মান রক্ষা অর্থাৎ অতি কঠিন বা অতি সহজ প্রশ্ন যাতে রচিত না হয় তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন। গতানুগতিক প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে প্রধান শিক্ষকের একটি ভূমিকা রয়েছে। প্রশ্ন পত্র রচনা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে তিনি শ্রেণী-পরীক্ষা পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি পরীক্ষিত উত্তর পত্রর মধ্যে বেছে নিয়ে কিছু খাতা দেখতে পারেন। উত্তর-পত্র (Answer Scripts) পরীক্ষায় ঠিক মত নম্বর দেওয়া হয়েছে কি না মোটামুটি একই মান রক্ষিত হচ্ছে কি না সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। ক্লাস প্রমোশন, প্রগতি পত্র প্রেরণ, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারেও দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। পরীক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকবেন। পুরাতন পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের মূল্যায়ণের (Evaluation) উপর তিনি লক্ষ্য রাখবেন। পরীক্ষা ও মূল্যায়ণের শৃংখলা তিনি যথেষ্ট মূল্য দিয়েও রক্ষা করবেন। আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী **বাৎসরিক পরীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা** (Objective Tests) ও **সর্বাত্মক পরিচয় লিপি**

(Cumulative Record card) ইত্যাদিরও প্রয়োগের উপর প্রধান শিক্ষকের নজর থাকবে।

প্রতি বছর শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন প্রধান শিক্ষকের আরেকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ সম্পর্কে তিনি প্রবীণ বিষয় শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। বছর শেষ হবার আগেই তিনি বিষয় শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যে, কোন বই সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি না। যদি কোন বিষয়ের কোন বই পরিবর্তন আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় তবে নমুনা কপি থেকে সে বিষয়ের বই পড়ে বিষয় শিক্ষককে তাঁর মতামত জানাতে বলবেন। সম্ভব হলে প্রধান শিক্ষক নিজেও সেই বই পড়ে দেখবেন। তারপর শিক্ষক সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত স্কুল পরিচালক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ। বই পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বই যেন ঘন ঘন পরিবর্তন না হয়। অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতি বিচার করে দেখতে হবে ; তাঁদের উপর যেন অযথা চাপ না পড়ে। অভিযোগ না থাকলে তিন বছরের আগে কোন বই পরিবর্তন করা উচিত নয়। বইয়ের লেখকের নাম দেখে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। সাধারণ স্তরের বইয়ের সাথেও অনেক সময় বড় বড় লেখকের নাম পাওয়া যায়। পুস্তক নির্বাচনের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধান শিক্ষকের, তবে তিনি বিষয় শিক্ষকের মতামত নিয়েই চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন

॥ গ ॥ **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান (Supervision of the co-curricular Activities :**—শিক্ষার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ নাই। শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর কাজের সন্ধানও আমাদের রাখতে হবে। মূল্যায়ণে শুধু বিষয়গত কৃতিত্বের কথা বিচার করা হবে না। সাধারণ বইয়ের পড়ার বাইরে শিক্ষার্থী বিভিন্ন দিকে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাও বিচার করে দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকার মধ্যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে আজ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে দিতে হবে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে পূর্বে পাঠক্রমের অতিরিক্ত কার্যাবলীর (Extra curricular Activity) বলা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে সে সব ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে এগুলিকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বলা হয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এগুলি মূলপাঠক্রমের পরিপূরক। শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলির একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে তাই খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, ছবি আঁকা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা থাকে। সেগুলোর উপর প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থাকবে। সেগুলি যথাযথ ভাবে

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান

পরিচালিত হচ্ছে কি না, বা সেগুলি সমস্ত ছাত্রছাত্রী সার্থকতার সাথে অংশগ্রহণ করছে কি না প্রধান শিক্ষক তা লক্ষ্য রাখবেন। বিদ্যালয়ে N. C. C, A. C. C., Boys Scouts, Girls guide ইত্যাদি থাকলে তার বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রতিও প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থাকবে।

॥ ঘ ॥ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য চর্চার তত্ত্বাবধান (Supervision of the School Hygiene and Health Education):—বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থাকবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তা তিনি লক্ষ্য রাখবেন। আলোবাতাস জল ইত্যাদি যাতে বিদ্যালয়ে যথাযথ রক্ষিত হয় তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষ, পায়খানা, প্রস্রাবখানা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কি না লক্ষ্য রাখবেন। বিদ্যালয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিকমত আছে কি না প্রধান শিক্ষক তার তত্ত্বাবধান করবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য Health Education-এর যথাযথ তত্ত্বাবধান প্রধান শিক্ষকের থাকবে। বাগান ইত্যাদি করে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর, স্বাস্থ্য সম্মত ও মনোরম করবার তত্ত্বাবধান প্রধান শিক্ষকেরই করতে হবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান

বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে দেহের পুষ্টির ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। খেলাধুলা, ব্যায়াম, ড্রিল সব কিছুই ছাত্ররা করবে। এজন্য ব্যায়াম শিক্ষক থাকবেন কিন্তু প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণও দূরে সরে থাকবেন না। প্রধান শিক্ষক খেলাধুলা সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাহ দেবেন এবং নিজে মাঝে মাঝে লেখাধুলার সময় উপস্থিত থাকবেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন। ছাত্রদের স্কুল থেকে বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ছাত্রের ক্রমাগত স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে লক্ষ্য করলে তা অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ও ডাক্তারের উপদেশ যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না দেখবেন।

শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও প্রধান শিক্ষকের আরো অনেকগুলি কাজ রয়েছে যার উপর সাধারণভাবে তাঁকে নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের সবরকম কাজকর্মের উপর প্রধান শিক্ষকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকবে। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় একটি পরিবারের মত সুস্থ সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজকর্ম করবে। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক এবং তাঁর সাফল্যের উপর বিদ্যালয়ের সাফল্য ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন নির্ভর করছে।

বিদ্যালয়ের সর্ববিধ কাজকর্মের উপর প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান

॥ ৩ ॥ **প্রশাসন (Administration)** :—প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে বড় গুণ হ'ল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতা। সুপ্রশাসনের উপরেই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান পর্যায়ে তাঁর প্রশাসন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সবরকম কাজকর্মের পিছনে থাকবে প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ প্রশাসন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল।

(ক) অফিস (Office) অফিস ঘর সাজানো, খাতাপত্র রাখা ইত্যাদি প্রধান শিক্ষকের নির্দেশেই চলবে। বিভিন্ন খাতাপত্র, হিসেব, ragister প্রধান শিক্ষকের নির্দেশেই পরিচালিত হবে। তিনি অফিসের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। বিদ্যালয়ের clerk, Bearer, Night guard ইত্যাদি তাঁর নির্দেশ মতই কাজকর্ম করবে।

(খ) সময় তালিকা (Time table)—প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের সময় তালিকা রচনা করবেন ; তার উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কর্ম পরিচালিত হবে।

(গ) পরীক্ষা (Examination)—প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত করবেন। প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পরীক্ষা, ফলাফল নির্ণয়, progress report ইত্যাদি তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হবে। তিনি পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

(ঘ) পাঠাগার (Library)—প্রধান শিক্ষক গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য সহকারীদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের পাঠাগারের প্রশাসন রক্ষা করবেন। নতুন বই কেনা, বই বাঁধানো বই তালিকাবদ্ধ করা, ছাত্র-শিক্ষকদের বই দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা এই প্রশাসনের অন্তর্গত। Reading room এর studyর ব্যবস্থা এই পরিচালনার অন্তর্গত।

(ঙ) ছাত্রাবাস (Hostel)—বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও প্রধান শিক্ষকের পরিচালনাধীন। Hostel-এ superintendent থাকলেও ছাত্রাবাসের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রধান শিক্ষকের।

(চ) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন (Text book selection)—বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন subject teacher এর সাহায্য নেন। কোন বই পরিবর্তন ও সংযোজনের সময় তিনি তার ব্যবস্থা করেন। বছরের প্রথমে একটি পাঠ্যপুস্তক তালিকা (Book list) তাঁর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ছ) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activities)—বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল, তিনি খেলাধুলা, ব্যায়াম, সাহিত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি যে সব সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন ও সহযোগিতা থাকে। যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে উৎসাহী ও আগ্রহী হন সে বিদ্যালয় এ গুলিতে অগ্রগতি লাভ করে।

(জ) পরীক্ষণাগার (Laboratory) বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical works) ও পরীক্ষণাগারের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। এ ব্যাপারে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক সহযোগিতা করেন: এ ব্যাপারে বিভিন্ন আর্থিক ঝুঁকিও তিনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নেন।

(ঝ) বিদ্যালয় পরিবেশ (School plant)—বিদ্যালয় পরিবেশ প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায় সুন্দর ও মনোরম ভাবে গড়ে উঠে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ, বারান্দা ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে বাগান ইত্যাদি করতে আগ্রহী হতে পারেন। বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর, স্বাস্থ্য-সম্মত ও মনোরম করবার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের।

(ঞ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)—বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। তিনি অন্যান্য শিক্ষক, ডাক্তার, Health officer, Nurse ইত্যাদির সাহায্যে সে কাজ করতে পারেন।

(ট) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি (Total Development of the School)—সুদক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। বিদ্যালয়কে সামগ্রিক উন্নতির পথে নিয়ে যেতে প্রধান শিক্ষক সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবেন। বর্তমান ছাত্রবিশৃংখলা (student unrest) বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমস্যা। প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা সেই সব সমস্যার যথাযথ সমাধানের উপযোগী হবে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণ ও উন্নতি বিদ্যালয় পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। প্রধানশিক্ষক তাই একজন সুদক্ষ সংগঠক ও সুযোগ্য পরিচালক এবং সার্থক প্রশাসক হবেন।

॥ ৪ ॥ সমন্বয় সাধন (Co-Ordination):—বিদ্যালয় সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এই বিদ্যালয়ই আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারের প্রধান স্থল। দেশ ও সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের তাই একটি মস্ত

বড় ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র ছাত্র ও শিক্ষকদের নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক আছে, স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্ক আছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক আছে, সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিকটবর্তী অন্যান্য বিদ্যালয়ের সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। প্রধান শিক্ষক ছাত্র, শিক্ষক, স্থানীয় অধিবাসী, সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সকলের সাহায্য ও পরামর্শে বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক সকলের কাছে দায়িত্বশীল। দ্রোপদীর যেমন পাঁচজন স্বামী ছিল, এবং তাঁকে যেমন পাঁচজন স্বামীর সন্তোষ সাধন করে চলতে হ'ত;—প্রধান শিক্ষককে তেমনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় অধিবাসী প্রভৃতির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনায় বহুলোক ও বিষয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে যোগাযোগ রাখতে হয়। সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে সবরকম অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলা কঠিন কাজ; কিন্তু এখানে ত্রুটি থাকলে প্রধান শিক্ষক দুর্নামের ভাগী হবেন।

ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় অধিবাসী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকার ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের

ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক (Relation with the students :— শিক্ষা জীবনের সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র শিক্ষকের প্রীতির সম্পর্কের উপর। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরুশিষ্যের মধুর সম্পর্ক। আচার্যের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের পবিত্র সম্পর্ক। বৈশ্যযুগে শিক্ষকতাকে আমরা ব্রত বলে মনে করি না,—এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তি। মানুষ গড়ার যে বৃত্তি শিক্ষকরা গ্রহণ করেছেন সেই বৃত্তিতে স্নেহ ভালবাসায় ছাত্রকে একান্ত আপন করে নিতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদি তাঁর ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখেন, তাদের কাছে নিজেকে ভীতির বা রহস্যের বস্তু করে তোলেন, তা হলে তিনি ভুল করবেন। প্রধান-শিক্ষক তাঁর পদোচিত গাম্ভীর্য বা মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তা ছাত্র-সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। তিনি যথা সম্ভব ছেলেদের সাথে মিশবেন—প্রত্যেক ছেলেকে তিনি জানবার চেষ্টা করবেন। তিনি হবেন ছেলেদের Friend, Philosopher and Guide. ছোট স্কুলে ছেলেদের চিনে রাখতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বড় স্কুলে যেখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক, সেখানে অসুবিধা

ছাত্রদের সাফল্য অনেক খানি নির্ভর করে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উপর

একটু বেশী। প্রধান শিক্ষক যদি নীচের দিকে ক্লাস নেন তাহলে সুবিধা হয়। তিনি শুরুতে ছাত্রদের চিনে রাখতে পারবেন। ছাত্রেরাও বুঝতে পারবে তাদের প্রধান শিক্ষক কি প্রকৃতির, তিনি কি চান, কি পছন্দ করেন, তারাও সেই ভাবে চলতে পারবে। ছোট ছাত্রদের জীবনে প্রধান-শিক্ষকের প্রভাব বেশী কার্যকরী হবে। এই প্রভাব সৃষ্টি হবে ভীতির মধ্য দিয়ে নয়, প্রীতির মধ্য দিয়ে—অবশ্য প্রীতির সাথে একটা শ্রদ্ধা মেশান থাকবে। ছাত্রেরা যেন বুঝতে শেখে যে স্কুলের নিয়ম শৃংখলা মেনে চললেই তারা শিক্ষকদের প্রীতিভাজন হবে, নচেৎ নয়।

ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শ্রেণীকক্ষের বাইরে খেলার মাঠে ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ উৎসাহী হবেন। প্রধান শিক্ষক অনেক সময় প্রবীণ বা বৃদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মনের দিক থেকে থাকবেন সতেজ, সদা প্রফুল্ল ও সর্ব-ব্যাপারে উৎসাহী।

ছাত্র সমাজে ক্রমবর্ধমান শৃংখলাহীনতার কারণ স্বরূপ অনেকে নির্দেশ করেছেন যে ছাত্র শিক্ষকদের যোগাযোগ বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণ তাই ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক যাতে নিবিড় হয়, আরো মধুর হয় সেদিকে সচেষ্ট হওয়া দরকার। প্রধান-শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব। ছাত্রদের যদি মনের মত করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে আদর্শবাদী শিক্ষক তাদের সাথে মিশবেন। ব্যক্তিগত ছাত্রের জীবনে যে সমস্যা তা জেনে তাকে উপদেশ দেবেন, শিক্ষায় তাকে সহায়তা করবেন সর্বভাবে; তিনি হবেন তার সুহৃদ্। মানুষ গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন—যাদের গড়ে তুলবেন তাদের দূরে সরিয়ে রাখলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাতে সৃষ্টি হয় সেজন্য প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—"*It should be borne in mind that every head teacher worthy of the name is generally regarded by his scholars an ideal personality, possessing extraordinary knowledge and gifted too, beyond the run of ordinary mortals. Honour, justice, truth are presumed to govern all his actions. This general and illimitable faith combined with the reality of his own powers, are forces which he can direct to perfect the organisation and control of his school. The greatest care and circumspection are of course necessary if scholars ideal is to remain unsullied and unshattered amidist the daily provocations to which he is*

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধান-শিক্ষকের

subjected. Self watch-fulness ought to be his constant sentinal" *(Bray :—School Organisation* .

প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে ছাত্র সংসদের (Student's Union) সভাপতি (President) হবেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ছাত্র সংসদে প্রধান শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তিনি সেই সংসদের president বা chairman। তাঁর নির্দেশ ও উপদেশে এই সংসদ তার কাজ কর্ম চালিয়ে যাবে। কাজেই ছাত্রসংসদের কাজকর্মের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে মধুর থেকে মধুরতর করে তুলবেন, ফলে বিদ্যালয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

ছাত্রসংসদ ও প্রধান শিক্ষক

সহকারী শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক (Relation with other Teachers) :—বিদ্যালয়-সমাজের নেতা প্রধান শিক্ষক,—তিনি তাঁর স্কুলের শিক্ষকদেরও নেতা। একজন ভাল নেতার যে সব গুণ থাকা দরকার তিনি সেই গুণের অধিকারী হবেন। সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতা ব্যতীত স্কুল চালানো যায় না। প্রধান-শিক্ষকের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নয়, তাঁদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে, তাঁদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। প্রধান-শিক্ষক যদি কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন তাহলে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে সহকারীরা অনুপ্রাণিত হবেন। ধমক দিয়ে বা আইন দেখিয়ে আজকাল কাজ পাওয়া খুবই কঠিন। বিদ্যালয়ের সব ব্যাপারে শিক্ষকদের সমান আগ্রহ রয়েছে বলে মনে করতে হবে। নিয়ম শৃংখলা রক্ষা, সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা ও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে স্থির করা সঙ্গত। কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে যথাসম্ভব বুঝিয়ে শিক্ষকদের স্বমতে আনবার চেষ্টা করবেন। সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কিছু চাপিয়ে দিলে তা কাযকরী করবার পথে শিক্ষকেরা পরোক্ষভাবে অসহযোগিতা করবেন। বুঝিয়ে যদি তাঁদের স্বমতে আনা যায় তাহলে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণে অসুবিধা হবার কথা নয়।

অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতার গুরুত্ব

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে কিছুটা সহযোগিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্র এর কারণ একই রকম নয়। তাই স্থানকালপাত্র ভেদে রোগের কারণ নির্ণয় করে প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় শিক্ষকদের এমন সব অভিযোগ থাকে যা প্রধান শিক্ষকের প্রতিকারের বাইরে। প্রধান শিক্ষক সেখানে খোলাখুলি ভাবে তার অসুবিধার কথা তাঁদের জানাবেন। স্কুল-সংক্রান্ত কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় আছে

প্রধানশিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অসহযোগিতা ও তার প্রতিকার

যা তিনি গোপন রাখবেন। এছাড়া স্কুল সম্পর্কীয় সব বিষয়ে অযথা গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ দেবেন, সেই সাথে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না দেখবেন। সঙ্গতিশীল শিক্ষকগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এই আশা করা উচিত কিন্তু তবু যদি কোথাও ভুল ত্রুটি থাকে প্রধান শিক্ষক তা দেখিয়ে দিয়ে, কি করে ভুল সংশোধন করা যায় সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। বাস্তব অবস্থা বিচার করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে শান্তি ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবেন।

বিভিন্ন শিক্ষকের স্বাধীনতা ও প্রধান শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ

প্রত্যেক স্কুলেই **শিক্ষকসভা (Teachers' Council)** রয়েছে। বর্তমানে Staff Council বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে, বর্তমানে তার সংখ্যা ও গুরুত্ব আরো বেড়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে থেকে **Finance Committee** ও **Academic Council** বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাদান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে Teachers' Council-এর সভাপতি। কাজেই শিক্ষক সভার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রেখে ইস্পাতদৃঢ় নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বিদ্যালয়কে সুপরিচালিত করতে পারেন। এই শিক্ষক সভাতেই বিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে। বিদ্যালয় পরিচালনার নানাবিধ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক শিক্ষক সভার সহযোগিতা ও পরামর্শ আহ্বান করবেন।

Teachers' Council ও প্রধানশিক্ষক

অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক (Relation with the Guardians) : --বিদ্যালয় কার্য পরিচালনার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ ঘণ্টা। বাকী ২২ ঘণ্টা শিক্ষার্থী তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের সান্নিধ্যেই থাকে। কাজেই শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য অভিভাবকদের একান্ত প্রয়োজন, অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রধান শিক্ষককে রাখতে হবে। প্রধান শিক্ষক অভিভাবক সমিতির (Guardians' Association) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এ কাজ করবেন। অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব নয়। কাজেই প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবেন।

বিদ্যালয় পরিচালনায় অভিভাবকদের গুরুত্ব

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক (Relation with the Local People) :—বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় অধিবাসীদেরও একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। আমাদের দেশের অনেক বিদ্যালয় স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় গড়ে উঠে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাজেই বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজকর্ম, সামগ্রিক উন্নতির ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রধান শিক্ষক স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিতে স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থান

সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক (Relation with the Government) :—সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপায়িত হয় বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে। বিদ্যালয়গুলিকে সরকার আর্থিক সাহায্য দেন। সরকারী নির্দেশেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়। কাজেই সরকারের সঙ্গে বিদ্যালয়কে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। এ দায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের।

সরকারের নির্দেশেই বিদ্যালয় চলে

অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক (Relation with other Schools) :—প্রধান শিক্ষক অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রধান শিক্ষক নিজের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারবেন। তা ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেশের শিক্ষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ

বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সহিত সম্পর্ক (Relation with the School Managing Committee) :—বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালক বা কার্যকরী সমিতির। কিন্তু কার্যতঃ বিদ্যালয় পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক। কার্যকরী সমিতি নীতি নির্ধারণ করেন ও নানারূপ নির্দেশ দেন; কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেন প্রধান শিক্ষক। পরিচালক সমিতির সহিত প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক হবে সহযোগিতামূলক। পরিচালক সমিতিকে নিরপেক্ষভাবে সঠিক তথ্য প্রধান শিক্ষক জানাবেন। তাঁর প্রয়োজন, সুবিধা অসুবিধা কার্যকরী সমিতির কাছে উপস্থাপন করবেন। প্রধান শিক্ষক ও কার্যকরী সমিতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে তা সমগ্র বিদ্যালয়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রধান শিক্ষক স্থানীয় রাজনীতি বা গ্রাম্য দলাদলির বাইরে থাকবার চেষ্টা করবেন। কার্যকরী সমিতিতে মতভেদ হলে তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর মতামত দেবেন। দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়লে তা বিদ্যালয়ের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হবে।

প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির Joint Secretary, কাজেই এই পরিচালক সমিতিতে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিচালক সমিতির সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে ছাত্র ও শিক্ষক স্বার্থে ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে কাজকর্ম করবেন। তিনি পরিচালক সমিতিকে বিভিন্ন বিষয়ে **তথ্য পরিবেশন** করবেন ও **আইন ঘটিত পরামর্শ** দিবেন। এই সমস্তের ভিত্তিতে পরিচালক সমিতি বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করবেন, এবং প্রধান শিক্ষক হলেন এইসব নীতির Executive Officer।

পরিচালক সমিতিতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব উপদেষ্টার

একজন আদর্শ প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী (Qualification of an ideal Headmaster) :—একজন সুশিক্ষকের গুণাবলী প্রধান শিক্ষকের থাকবে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষাদানে সমস্ত আধুনিক তত্ত্ব (Theory) ও পদ্ধতির (Methods) সঙ্গে পরিচিত হবেন। বিভিন্ন বিষয়ের Teaching Aids সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকবে। প্রধান শিক্ষক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে আগ্রহশীল হবেন। তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সমস্যা সমাধানের প্রকৃতিগত দক্ষতা প্রধান শিক্ষকের থাকবে। প্রধান শিক্ষক হবেন, একজন ভাল বাগ্মী। নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান গুণ। প্রত্যয়, বিশ্বাস, উদ্যম, আগ্রহ, ধৈর্য, শ্রমশীলতা, কর্মদক্ষতা, সহানুভূতি, সহযোগিতার মনোভাব, উদারতা, গাম্ভীর্য প্রভৃতি গুণাবলী প্রধান শিক্ষকের অপরিহার্য ভূষণ। সংযম, শৃংখলা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতির উপর প্রধান শিক্ষকের চরিত্রগত নির্ভরতা থাকবে। তবে প্রধান শিক্ষকের প্রধান গুণ হ'ল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সাফল্য এনে দিতে পারে।

প্রশাসনিক দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতা হ'ল প্রধান শিক্ষকের প্রধান গুণ

সহকারী শিক্ষক

(Assistant Teachers)

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করেন। শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ দেন। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে যে কার্যসূচী রচিত হয় তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলবার দায়িত্ব শিক্ষকদের। প্রধান-শিক্ষক সমগ্রভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সহকারী শিক্ষকদের সহায়তায়। বিদ্যালয়ের ভাল বাড়ী, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, সুচিন্তিত পাঠক্রম সবকিছু থাকবার পরও যদি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকেন তাহলে সে বিদ্যালয়ে শিক্ষার

শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকের অমোঘ প্রভাব

আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে না। শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয় a maker of men কথাটি খুব সত্য। একটা জাতিকে গড়ে তুলতে বা ধ্বংস করতে শিক্ষকগণ পারেন। শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রভাব সর্বাধিক। শিক্ষক নানাভাবে ছাত্র-জীবনকে প্রভাবিত করেন। ছাত্রেরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষককে অনুসরণ করেন। তাই Nunn বলেছেন :—*The teacher can no more prevent himself from acting on his pupils by suggestion, imitation, sympathy or other wise than he can himself invisible as he perambulates the class room.*

যে শিক্ষকের উপর আগামী যুগের মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই শিক্ষকদের কি কি গুণ থাকা উচিত তা শিক্ষনীতি (Principle of Education) বিষয়ভূত। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তার উল্লেখ করা হবে। শিক্ষক হবেন **সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।** তিনি হবেন সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু। সমস্ত কাজে তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী হবেন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্যমশীলতা আশা করা যায় না। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। সুদর্শন হওয়া ও শিক্ষকের অন্যতম গুণ।

সুদর্শন ও সুগঠিত দেহধারী শিক্ষক

শিক্ষক হবেন **অসীম ধৈর্যশীল।** সমস্ত অবস্থায় তাঁর মেজাজ ঠিক রাখতে হবে। যাদের নিয়ে তাঁকে চলতে হবে তারা অবোধ, অবুঝ, চঞ্চল, কোন সময়ে একগুঁয়ে। তাদের মানুষ করার কঠিন কাজে ধৈর্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। মেজাজ তাঁকে সব সময় প্রফুল্ল রাখতে হবে। তাঁর মন হবে **সহানুভূতিশীল**—শিশুদের মন জয় করতে হলে তাদের ভাল বাসতে হবে। স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতিতে তিনি হবেন পিতৃকল্প। তিনি সব কাজে নিরপেক্ষ হবেন। কোন সময় যেন ছাত্রেরা মনে করার সুযোগ না পায় শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব করছেন —তাহলে তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। সব রকম নীচতা বা হীনতার ঊর্ধ্বে থাকবেন শিক্ষক।

শিক্ষকের ধৈর্য উদারতা সহানুভূতি ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষক হবেন **কর্তব্যনিষ্ঠ।** শিক্ষকতায় তাঁর অনুরাগ থাকবে। যে কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে তা তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। যেখানে নিষ্ঠার বা অনুরাগের অভাব সেখানেই আগ্রহের অভাব। তিনি চাকুরী রক্ষার জন্যই চাকুরী করবেন। অন্যক্ষেত্রে তা সম্ভব কিন্তু শিক্ষক যদি তা করেন তাহলে তিনি আদর্শভ্রষ্ট হবেন। শিক্ষক হবেন বুদ্ধিমান, কিছু পরিমাণে উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। শিক্ষক মাত্রেই জানেন ক্লাসে বসেই তাঁকে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হবে। নিজের বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অধিকার থাকবে।

শিক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা

অন্য বিষয়েও তাঁর জ্ঞান থাকবে—তা না হলে ছাত্রদের কৌতূহল তিনি মেটাতে পারবেন না।

শিক্ষক হবেন সুদক্ষ কথাশিল্পী। বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তুলবেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হবে জোরাল উচ্চারণ হবে স্পষ্ট ও শুদ্ধ। তাঁর রসবোধ থাকবে। নীরস পাঠকে সরস করে তুলতে মাঝে মাঝে হাসবার সুযোগ দিতে হবে—কি করে শিক্ষা দিতে হয় সে কৌশল জানতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষক হবেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চরিত্রবান। তাঁর নীতিবোধ থাকবে প্রখর। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চরিত্রবান না হলে তিনি ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। 'আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে,'—এ কথাটি শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য। শিক্ষকতা একটা বৃত্তি, কিন্তু শুধু বৃত্তিরূপেই যে শিক্ষক তাকে গ্রহণ করবেন তিনি কোন দিনই আদর্শ শিক্ষক হতে পারবেন না। **শিক্ষকতা শুধু বৃত্তি নয়—শিক্ষক তাঁর কাজকে ব্রতরূপেই গ্রহণ করবেন।** তাহলেই শিক্ষক জীবনের বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে (পাবেন)।

সুবক্তা, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকই আদর্শ শিক্ষক

আদর্শ শিক্ষকের যে সব গুণের কথা বলা হ'ল একজন মানুষের পক্ষে কি সে সব গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব? বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বগুণ সমন্বিত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু গুণগুলি ইচ্ছা করলে সমস্ত শিক্ষকই আয়ত্ত করতে পারেন। আমাদের দেশের শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার মান উচ্চ নয়। তাই খুব কম লোকই শিক্ষকতাকে স্বেচ্ছায় বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। শিক্ষকতা গ্রহণ করবার পর যেন আমরা আদর্শ শিক্ষক হবার চেষ্টা করি। সমাজে শিক্ষকের যে উচ্চ স্থান ছিল তাকে আদর্শ শিক্ষকগণ ফিরিয়ে আনতে পারেন।

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা

শিক্ষক নির্বাচন করবেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী। প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষক নির্বাচন করা উচিত। তিনি শিক্ষককে দিয়ে কাজ করবেন, তাঁর কি প্রয়োজন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। সহকারী শিক্ষকের সহায়তায় প্রধান শিক্ষক স্কুলের সর্ববিধ কাজ পরিচালনা করেন। তাই সহকারী শিক্ষক নির্বাচনে প্রধান শিক্ষকের মতামত গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষক নির্বাচন

সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষিত হবেন, শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর যদি অভাব থাকে সে গুণ তিনি অর্জন করার চেষ্টা করবেন। শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া ও শ্রেণী শৃংখলা রক্ষা করা তাঁর প্রধান কাজ। তিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেবেন সে বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকবে। বিষয় শিক্ষক হলেন তাঁর নিজের বিষয়ে যে সব নতুন তত্ত্ব ও তথ্য যা প্রকাশিত হচ্ছে তার সাথে তিনি সংযোগ রক্ষা করবেন।

শিক্ষক বিষয়, পদ্ধতি ও উপকরণ সম্বন্ধে সচেতন হবেন,

তিনি যাতে ছাত্রদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন সে ভাবে তৈরী হয়ে ক্লাসে যাবেন। শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতির সাথে তিনি পরিচিত থাকবেন। নিজের বিষয় আয়ত্ব থাকাই বড কথা নয় কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তাঁর বক্তব্য ছাত্রেরা গ্রহণ করবে, তাদের কাছে সহজ বোধ্য করে বিষয়টি উপস্থাপন করবার কৌশল তিনি আয়ত্ব করবেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে জানবেন।

সময় তালিকা অনুসরণ করে পাঠক্রম অনুযায়ী শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়াই সহকারী শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়। স্কুল পরিচালনায় তিনি সর্বভাবে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করবেন। পডার বাইরে স্কুলের শৃংখলা রক্ষা একটা বড কথা। স্কুলের শৃংখলা রক্ষা করা ছাত্র শিক্ষক সবারই কর্তব্য। শিক্ষকগণ দেখবেন ছাত্রেরা শৃংখলা রক্ষা করছে কি না। শিক্ষকদের জন্যও কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে সহকারী শিক্ষকগণ তা মেনে চলবেন। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ তাঁরা মেনে চলবেন। যদি তাঁদের কিছু বক্তব্য থাকে তা প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। তাঁদের আচরণে যেন কোন অবস্থায় শৃংখলা ভঙ্গের ইংগিত না থাকে। স্কুল পরিচালনায় ও শৃংখলা রক্ষায় সহকারী শিক্ষকেরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। তিনিও শিক্ষক-সভার একজন দায়িত্বশীল সদস্য। প্রধান শিক্ষকের সাথে তার মালিক-কর্মচারীর সম্পর্ক নয়, তিনি তাঁর সহকারী। তাই সংযোগিতার মনোভাব নিয়েই তিনি কাজ করবেন। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনায় শিক্ষকদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক সহকারীদের সাথে পরামর্শ করে যে ভাবে কাজ ভাগ করে দেবেন তাঁরা সেই ভাবে কাজ করবেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে স্কুলের কাজে নানা রকম বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে।

বিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সবার পক্ষে ছাত্রদের জানার প্রয়োজন আছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে যাকে শিক্ষা দেবে তাকে না জেনে শিক্ষা দেওয়া যায় না। ছাত্র-জীবনে শিক্ষকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ছাত্ররা শিক্ষককে তাদের চলার পথে আদর্শ রূপেই দেখতে চায়। তাই তাদের সাথে মিশবার সময় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মিশতে হবে। শিক্ষকের আচরণে ও কথায় যেন এমন কিছু না থাকে যা ছাত্রদের সামনে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত করতে পারে। শিক্ষক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের সাথে মিশবেন। অনেকে মনে করেন যে ছাত্রদের সাথে মিশলে, তাদের সাথে খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করলে মর্যাদার হানি হবে। এ ধারণা ঠিক নয়। শিক্ষক অবশ্যই

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপনে শিক্ষকের ভূমিকা

তার মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন; সে জন্য ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে কেন? শিক্ষক যদি মনে করেন যে, শ্রেণী পঠনের বাইরে তাঁর কিছু করবার নেই তাহলে তিনি ভুল করবেন। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান সাধারণ পাঠকক্ষের পাঠ ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে কোন সীমারেখা টানতে চায় না। শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনে যদি যথাযথ সাহায্য করতে হয় তাহলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, শিক্ষার্থীর সবাঙ্গীন উন্নতি কেবলমাত্র শিক্ষকদের সহায়তাতেই হতে পারে। ভবিষ্যৎ ভারতের উপযুক্ত নাগরিক গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক একথা চিন্তা করেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক;—বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে প্রয়োজন মত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের **গৃহপরিদর্শন (Home visit)** করতে পারেন।

একজন আদর্শ শিক্ষক গণতান্ত্রিক (Democratic) ও সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হবেন। এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাধারা শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন; যাতে তারা ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। এরজন্য শিক্ষককে নিরপেক্ষ ও উদার মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের পক্ষপাতশূন্য সমান দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে, শিক্ষকের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপর বিদ্যালয়ের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

শিক্ষকের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তধারা

সহকারী শিক্ষকের মধ্যে অনেকেই **শ্রেণী শিক্ষক (class teacher)** থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীতে প্রায় প্রতি দিন যে শিক্ষকের class থাকে তিনি সেই শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক হন। তাঁর উপর **Roll call ও fees Callection**-এর দায়িত্বও থাকে। শ্রেণী-শিক্ষকের অনেক দায়িত্ব থাকে। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে থাকে। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পরিচয় বিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক কাজে লাগে। বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা (যথা ছাত্র বিশৃংখলা, অপরাধ প্রবণতা, পিছিয়ে পড়া ছাত্র, স্কুল-পালানো ছাত্র, পরীক্ষা ইত্যাদি) এই মধুর সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের সাহায্যে সুসম্পন্ন হতে পারে। শ্রেণী শিক্ষক সবসময় সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবেন, সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের শিক্ষাকার্য যথাযথভাবে সমাধা করতে পারে তার দায়িত্ব শ্রেণী শিক্ষককে পালন করতে হবে।

Class Teacher

বিদ্যালয়ে **বিষয় শিক্ষকের ও (subject teacher)** একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। বিষয় শিক্ষক হলেন ঐ বিষয়ের expert, ঐ বিষয়ের উপর তাঁর উচ্চতর

শিক্ষা (Higher education) আছে। কাজেই ঐ বিষয় শিক্ষাদানের সময় তাঁর content বা subject matter-এর অসুবিধা হয় না। ঐ বিষয়ের উপর আধুনিক চিন্তাধারা ও খবর তিনি রাখেন। বিষয় শিক্ষকের training degree থাকায় তিনি তাঁর বিষয় শিক্ষাদানের সবরকম তত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত। ঐ বিষয়ের সবরকম শিক্ষাসহায়ক উপকরণ (teaching aids) ব্যবহারের কৌশলও তিনি জানেন। কাজেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষককে দিয়ে বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে তার দায়িত্ব বিষয় শিক্ষকের।

Subject Teacher

শিক্ষক সভা

(Teachers' Council)

বিদ্যালয় পরিচালনার (School Administration) ক্ষেত্রে শিক্ষক সভার (Teacher council) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তাই প্রতি বিদ্যালয়েই বর্তমানে Staff council আছে, তাদের বিভিন্ন কার্যাবলী ও ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষক সভার দায়িত্ব অপরিসীম। পূর্বে বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষকসভার গুরুত্ব স্বীকার করা হত না। ক্রমশঃ, সে ধারণার পরিবর্তন হয়, বর্তমানে শিক্ষক সভা বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ।

বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক সভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষকসভার সদস্য হবেন। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে (ex-officio) এই সভার সভাপতি (President) হবেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক (Assistant Headmaster) এই সভার সহ সভাপতি (Vice-President) হতে পারেন। একজন নির্বাচিত শিক্ষক এই সংস্থায় এক বছরের জন্য সম্পাদক (secretary) হিসেবে কাজ করবেন। শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন কোষাধ্যক্ষকে (Treasurer) নির্বাচিত করা যেতে পারে। প্রতি শিক্ষক এই সংস্থাকে একটি নির্ধারিত হারে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা (Subscription) দিবেন। তাতে এই সংস্থার বিভিন্ন কাজকর্ম চলবে। সভাপতি, সহ-সভাপতি অথবা সম্পাদক প্রয়োজন অনুসারে এই সভার অধিবেশন (Meeting) ডাকবেন।

শিক্ষক সভার গঠন

শিক্ষকসভার অধিবেশনে প্রধান শিক্ষক সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-প্রধান শিক্ষক, অথবা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সভাপতিত্ব করতে পারেন। এই অধিবেশনে সভাপতি বা সম্পাদক নির্দিষ্ট Agenda-র ভিত্তিতে আহ্বান করবেন। বিভিন্ন শিক্ষক ঐ অধিবেশনে তাঁদের বক্তব্য ও মতামত রাখবেন। সকলকেই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার সুযোগ দিতে হবে। অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর থাকবে। এই অধিবেশনে যে সব সিদ্ধান্ত

শিক্ষক সভার কর্ম পদ্ধতি

(Resolution) গৃহীত হবে তা একটি ভালো খাতায় যথাযথ ভাবে লিখে রাখতে হবে। কোন সিদ্ধান্ত যদি সর্ববাদীসম্মত না হয়, তবে ভোটের মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতই সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে। প্রয়োজন মত বিদ্যালয় সম্পাদক, ছাত্রসম্পাদক প্রভৃতিকেও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। তবে শিক্ষকসভা শিক্ষকদেরই সংস্থা। এতে অন্য কারো ভোটাধিকার থাকবে না। শিক্ষকসভা প্রধান শিক্ষকের পরামর্শসভা। কাজেই কখনও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন মনে করলে প্রধান শিক্ষক এই সভার অধিবেশন আহ্বান করবেন। শিক্ষক সভার হিসাবপত্র যথাযথ ভাবে রাখতে হবে এবং বছরের শেষে একবার সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে (School Managing Committee) শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এই সমিতির Joint Secretary, পূর্বে ২ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে ছিলেন। এখন এই প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। প্রধান শিক্ষক ছাড়াও এখন তিনজন নির্বাচিত (তিন বছরের জন্য) প্রতিনিধি বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সদস্য। এই প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজ কর্মের জন্য শিক্ষক সভার কাছে দায়ী। শিক্ষক সভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তাঁরা পরিচালক সমিতিতে উপস্থাপিত করেন; এবং পরিচালক সমিতির শিক্ষকস্বার্থ বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মচারীর স্বার্থে লড়াই করেন ও দাবী আদায় করেন। শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা, বরখাস্ত, বেতন, মহার্ঘ ভাতা, ছুটি, অবসরকালীন পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকগণ প্রতিনিধিগণ বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে আলোচনা করেন। তবে শিক্ষক প্রতিনিধিগণ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে পরিচালক সমিতিতে তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাও এই সঙ্গে পালন করবেন। শিক্ষকসভা শিক্ষক ছাটাই, বেতন, ছুটি, পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি শিক্ষকস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। তারপর সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষক প্রতিনিধি মারফৎ পরিচালক সমিতিতে উপস্থাপিত হয়। ফলে শিক্ষকদের দাবী দাওয়া আদায়ের সুবিধা হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি ও শিক্ষকসভা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও শিক্ষক সভাতে উপস্থাপিত হয়ে আলোচিত হয়, ও শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,—

(১) প্রধান শিক্ষক শিক্ষকসভার সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের **সময় তালিকা (Time table)** প্রস্তুত করেন। পরে শিক্ষক সভা তা অনুমোদন করেন।

(২) প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার (Annual Examination) ফলাফল (Result) শিক্ষকসভার কাছে উপস্থিত করেন। শিক্ষকসভা তার উপর আলোচনা করে **class promotion** দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৩) **পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের (Text book selection)** এর সময় শিক্ষক সভার পরামর্শ গ্রহণ করেন। এবং প্রচলিত তালিকা থেকে কোন বই বাদ গেলে বা যুক্ত বা বিযুক্ত হলে তা শিক্ষক সভা অনুমোদন করেন।

(৪) শিক্ষক সভা বিভিন্ন সময় পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে **ছাত্র বিশৃংখলা (Students unrest)** সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে তাঁরা প্রধান শিক্ষককে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে পারেন।

(৫) **ছাত্র সংসদের (Students' union) বিভিন্ন কাজ কর্মে শিক্ষক সভা সাহায্য করেন**। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন শাখার ভার প্রাপ্ত শিক্ষক নির্ধারণের সময়েও প্রধান শিক্ষক শিক্ষক সভার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক সভা বিভিন্ন সময় ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কাজকর্মে সাহায্য ও পরামর্শ দিবেন।

(৬) বিদ্যালয়ের **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activitiy)** রূপায়নে শিক্ষকসভার দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, প্রধান শিক্ষক সে ব্যাপারে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা নিরূপন করেন। বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তনে শিক্ষক সভার এক বলিষ্ঠ ও কার্যকরী ভূমিকা আছে।

(৭) **School Hygiene ও Health Education**-এর ক্ষেত্রেও শিক্ষক সভার দায়িত্ব আছে। বিদ্যালয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে সমস্ত শিক্ষকেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষক সভা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই সিদ্ধান্ত পরামর্শের আকারে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিকে জানিয়ে দিতে পারেন।

(৮) **School guidance works**-এ শিক্ষক সভা অংশ গ্রহণ করবেন। নতুবা একা career master-এর পক্ষে তিন/চার শত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি মূলক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব নয়।

(৯) শিক্ষক সভা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থা কর্তৃক আহুত **শিক্ষা আন্দোলনে সমবেত ভাবে অংশ গ্রহণ** করতে পারেন। সরকারের পঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করা ছাড়া পথ নাই। সে সম্পর্কে শিক্ষক সভার সহিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে।

(১০) শিক্ষক সভা বিভিন্ন সময় **দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ঘটনা পর্যালোচনা** করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণ ও ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে শিক্ষক সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বর্তমানে বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাতে শিক্ষকদের কর্তৃত্ব অনেক বেড়েছে, পরিচালক সমিতিতে নির্বাচিত তিনজন প্রতি-

নিধির মধ্যে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্পাদক নিয়ে **Finance committee** গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বিদ্যালয়ের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করেন। বিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান, ছাত্রদের collection ইত্যাদি থেকে যে সমস্ত অর্থ সংগৃহীত হয় সেগুলি ব্যয়-সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে এই কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির অর্থ সংক্রান্ত নীতি শিক্ষক সভা তাঁর শিক্ষক প্রতিনিধি মারফৎ জানাতে পারে। ফলে সে সম্পর্কে শিক্ষক সভা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

Finance committee ও শিক্ষক সভা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির Higher Secondary section-এর মধ্য থেকে নির্ধারিত তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে বিদ্যালয়ে **Academic cauncil** গঠিত হয়। এই council বিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচনা, শিক্ষাদান পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্যের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। Academic council-এর নেতৃত্বে এই ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম পরিচালিত হয়।

Academic council ও শিক্ষক সভা

—শিক্ষক সভা এইভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন। বর্তমানে বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় শিক্ষক সভা একটি অপরিহার্য অংগ।

প্রশ্নাবলী

(1) What are the functions of a Headmaster ? How can he secure the co-operation of parents and teachers and ensure good pupil teacher relationship. (C. U. B. Ed. 1967, 1970)

(2) What are the duties of a Headmaster ? What improvements would you as headmaster, introduce in your School in the light of your training ? (North Bengal University— 968)

(3) "The Headmaster is a co-ordinating agent."—Discuss (C. U. B. T.—1964)

(4) Describe the major problems of School administration that a modern Headmaster has to face. (C. U., B. T.—1966

(5) Discuss critically the functions of the Teachers' council in a School. (C. U., B.Ed.—1971)

(6) Write notes on.

(a) Teachers' council—its Structure and purpose (C. U. B. T.—1965)

(b) School Government as practical training in democratic ways of life. (C., U., B. T.—1966)

(c) Teachers' council and headmaster. (C., U., B. T.—1969)

পঞ্চম অধ্যায়

সময়তালিকা

(TIME-TABLE)

কোন একটা কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য চাই পূর্ব পরিকল্পনা। পূর্ব পরিকল্পনা থাকলেই একটা নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য সুপরিচালনার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন

শ্রেণী শিক্ষায় আমরা অনেক শিক্ষার্থীকে এক সাথে পড়াই। তাদের বহু বিষয় পড়াতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রম রয়েছে। পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয়-সমূহ পূর্ব-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। পাঠক্রম রচনা, বিষয় নির্ধারণ ও সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের কোন হাত নেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পাঠক্রম শেষ করে দিতে হবে বিদ্যালয়কে। স্কুলের কাজ করার একটা বাঁধা সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বতম কোন কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান (স্কুলবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী শিক্ষা বিভাগ) রচিত পাঠক্রম কি করে পড়ান যায় তার জন্য একটা পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে কি ভাবে পড়ানো হবে সেই পরিকল্পনাকে আমরা বিদ্যালয়ের সময়তালিকা (time table) বলতে পারি।

সময় তালিকায় একটি চার্টে বিদ্যালয়ের পড়াবার নির্দিষ্ট সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে (period) ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রতি পিরিয়ডে একজন করে

Period ভিত্তিক শিক্ষাদান

শিক্ষককে পড়াবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ঘড়ির কাঁটার সাথে এগিয়ে চলে বলে এতে সময় ও শক্তির অপচয় হয় না ও স্কুলের কাজে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। সময় ও বিষয়ের সুষ্ঠু বিভাগ হওয়ায় এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় না। কোন একটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হয় না। শিক্ষকগণ এক সময়ে একটি বিষয়ে তাদের মন নিবিষ্ট রাখতে পারেন। এতে শৃংখলা বোধ, নিয়মানুবর্তিতা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজ কর্তব্যে মনোযোগী হওয়া প্রভৃতি অভ্যাস গঠিত হয়। সময় তালিকা অনুসারে কাজ করার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ পদ্ধতিকে মেনে চলবার মনোভাব গড়ে ওঠে।

সময় তালিকায় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তার উপর জোর দেওয়া হয়। কোন

বিভিন্ন period-এর ব্যাপ্তিকাল

বিষয়ের জন্য কতটা সময় দেওয়া হবে, সময় তালিকার কোন জায়গায় তার স্থান নির্দিষ্ট হবে তা বিষয় কাঠিন্য বিচার করে স্থির করা হয়। সময় তালিকায় কঠিন, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য Period-এর ব্যাপ্তিকাল বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার

সহজ ও হাল্কা বিষয়গুলির জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময় নির্দিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ে সমস্ত Period-এর ব্যাপ্তিকাল তাই সমান নয়।

সময় তালিকাকে বলা হয় "Second School Clock"। সময় তালিকায় স্কুলের কাজের সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে ভাগ করে দেখান হয়। কোন পিরিয়ডে কোন শ্রেণীতে কি পড়ান হচ্ছে তা দেখান হয়। কোন রুমে কি কাজ হচ্ছে তার নির্দেশ থাকে ও কোন শিক্ষক কখন কোথায় কি পড়াচ্ছেন তার উল্লেখ থাকে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরবার সাথে সাথে স্কুলের কাজ সময়-তালিকা অনুসারে এগিয়ে চলে। সময়-তালিকার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই সমস্ত স্কুলের কোথায় কি হচ্ছে তার একটা পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সময় তালিকার এক কপি শিক্ষকদের কক্ষে থাকে, এক কপি নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়, আর এককপি প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকে। প্রধান শিক্ষক সময়-তালিকা দেখে স্থির করেন কোন কোন শিক্ষক কি কি কাজ করছেন এবং কোন শিক্ষক বিশ্রাম উপভোগ করছেন। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হলে সময় তালিকা দেখে প্রধান শিক্ষক তার কাজ অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

Second School Clock

একটা স্কুলের সময় তালিকা রচনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ। সময় তালিকা তৈরী করতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক,—যিনি সময় তালিকা প্রস্তুত করেন তাঁকে সমস্ত অসুবিধা দূর করে একটি সময় তালিকা তৈরী করতে প্রচুর বিচার বিবেচনা ও পরিশ্রম করতে হয়। বাধাধরা সময়, অপ্রচুর শিক্ষক, সরঞ্জামের অসুবিধা, ঘরের অভাব সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য করে যখন একটি সময় তালিকা করা হ'ল তখনও দেখা যাবে প্রায় শিক্ষকের একটা না একটা অভিযোগ আছে।

সময়তালিকা প্রস্তুত করবার অসুবিধা

সময় তালিকা তৈরী করার প্রস্তুতি পর্বে দেখে নিতে হবে বছরে কয়টি School Day পাওয়া যাবে। মাধ্যমিক কি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজের সময় সমান। তারপর দেখতে হবে কতজন শিক্ষক আছে। সপ্তাহে স্কুলে কতগুলি মোট পিরিয়ড হবে ও কোন ক্লাসে কত পিরিয়ড হবে সেটাও স্থির করে নিতে হবে। তারপর বিষয় গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কতটা সময় দরকার ও কতটা দেওয়া যাবে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। কতকগুলি বিষয় আছে কঠিন, বুঝতে বেশী সময় প্রয়োজন। কোন বিষয় বুঝতে সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। বিষয়কাঠিন্য ও গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হয়।

School Day-গুলির গুরুত্ব

সময় তালিকার রচনারীতি

(Principles of time-table Construction)

বিদ্যালয়ে সময় তালিকার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। সময় তালিকা প্রণয়ন একটি জটিল ব্যাপার। বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা অপরিহার্য। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী কিভাবে রূপায়িত হবে তা সময় তালিকায় নির্দিষ্ট থাকবে। সময় তালিকা প্রণয়নের বিভিন্ন নীতি হ'ল,—

১) **ক্লান্তি (Fatigue) :**—কোন বিষয় পড়াতে গিয়ে কতকটা ক্লান্তি (Fatigue) উৎপাদিত হয় সময় তালিকায় সে কথাও বিচার করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীগণ উৎপাদনের ক্ষমতা অনুসারে বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন। শুধুমাত্র বিষয়েই ক্লান্তি উৎপাদন করে না। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ক্লান্তির তারতম্য হয়। গ্রীষ্মে যত সহজে ক্লান্তি আসে শীতের সময় তত সহজে ক্লান্তির সৃষ্টি হয় না। তাই শীতের পিরিয়ড দীর্ঘতর করা চলে। শিক্ষার্থীদের বয়স, শারীরিক শক্তি, প্রবণতা প্রভৃতির সাথে ক্লান্তির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। ক্লান্তিকর বিষয়গুলি সময় তালিকায় যাতে পর পর না দেওয়া হয় সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সময়তালিকায় ক্লান্তির উপর গুরুত্ব দিতে হবে

২) মনোযোগ প্রসঙ্গ

(On Attention)

দৈনিক (Daily) :—যে বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করতে অত্যধিক মনোযোগের প্রয়োজন সে বিষয়গুলি এমন সময় স্থাপন করতে হবে যখন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী থাকে। সেদিক থেকে বিচার করে ক্লান্তিকর বিষয়গুলিকে স্কুলের শুরুতে দেওয়া যেতে পারে। স্কুলের প্রথম দু'টি পিরিয়ডেই ছেলেদের মনোযোগ সর্বাধিক পরিমাণে পাঠে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব। প্রথম পিরিয়ডে সদ্য সদ্য ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে আসে তাই মন একটু চঞ্চল থাকে, দ্বিতীয় পিরিয়ডে পড়ায় সবচেয়ে বেশী মন বসে। শেষের দিকে শরীর ও মন ক্লান্ত থাকে তখন কঠিন বিষয়ে ছেলেমেয়েরা মন দিতে পারে না। টিফিনের সময় খেলাধুলা করে মনের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয় তাই বিরতির পর ছেলেমেয়েদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষের পিরিয়ডে অবসাদ এত বেশী করে দেখা দেয় যে তখন অতি সাধারণ বিষয়েও মন দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দিনের সব সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ একই রকম থাকে না।

সাপ্তাহিক (Weekly) :—একটা দিনের পিরিয়ডগুলিতে যেমন মনোযোগ

দেবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে সপ্তাহের দিনগুলিকেও ঠিক সেইভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম ঘণ্টায় যেমন মন একটু চঞ্চল থাকে তেমনি রবিবারের বিশ্রামের পর সোমবার পাঠে সহজে মন চলতে চায় না। ছুটি আমেজ কাটিয়ে পড়ায় মন বসতে সময় লাগে। মঙ্গলবার পড়ায় খুব মন বসে। দ্বিতীয় পিরিয়ডের মন সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে পড়ায় মন সংযোগ সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর আস্তে আস্তে ক্লান্তি জমতে থাকে। শনিবার দিন ছুটির জন্য মন উসখুস করতে থাকে, পড়ায় আর মন বসতে চায় না। কখন ছুটির ঘণ্টা বাজবে সেজন্য মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

সপ্তাহের সব দিন মনোযোগ সমান থাকে না।

৩ **ক্লান্তি ও তৃপ্তি (Fatigue and Satisfaction) :**—পাঠগ্রহণ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লান্তি আসে। এই ক্লান্তি শারীরিক ও মানসিক। ক্লান্তি যত বাড়ে মনোযোগ তত কমে। কিন্তু পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীর মনোযোগ প্রয়োজন। তাই নানা বিষয়েব উপর গুরুত্ব দিতে হয়। সময়তালিকায় যদি শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সব কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা যায় যাতে তার মানসিক তৃপ্তি পায় তাহলে তাদের ক্লান্তি কমে, মনোযোগ বাড়ে। সময়তালিকা তাই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, ব্যবহারিক শিক্ষা, হাতে কলমে শিক্ষা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতে হয়। শিক্ষাদান ব্যবস্থাকেও শিশু মনের তৃপ্তিকর করতে হয়।

ক্লান্তি বাড়লে, মনোযোগ কমে। কর্মে তৃপ্তি মানসিক অবসাদ দূর করে।

৪ **বিষয় গুরুত্ব (Importance of the Subject) :**—কঠিন বিষয়গুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে নিতে হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে অঙ্ক, ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস কি ভূগোল, হাতের কাজ, ড্রিল এইভাবে পরপর সময় তালিকায় সাজান চলে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কঠিন বিষয়গুলি রাখা উচিত। শনিবার কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাখতে হবে। অঙ্ক ও ইংরেজীকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টায় স্থাপন করা সঙ্গত।

সময়তালিকায় কঠিন বিষয়গুলির জ্ঞান

৫ **বিষয় বৈচিত্র্য (Variation of the subjects) :**—সময়-তালিকায় বিষয় স্থাপনে যেন একঘেঁয়েমির সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে না পারলে ছাত্রশিক্ষক উভয়ের মনেই ক্লান্তি দেখা দেবে। সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় পরপর স্থাপন করলে পড়ার ব্যাঘাত হবে। আবার ইংরাজী ব্যাকরণের পর সংস্কৃত ব্যাকরণ বা পাটীগণিতের পর জ্যামিতি বসিয়ে দিলে অবসাদ দেখা দেয়। সহজ ও কঠিন বিষয় পর পর স্থাপন করলে ছাত্রদের সুবিধা হয়। আবার একই বিষয়ের দুটি পাঠের (যেমন

সময়তালিকায় বিষয় বৈচিত্র্য গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে

সোমবার দিন ইতিহাস পড়ান হ'ল তারপর শুক্রবার আবার ইতিহাস) সময়ের ব্যবধান এত বেশী হওয়া উচিত নয় যাতে ছাত্ররা পূর্ব পাঠের বিষয় ভুলে যেতে পারে। কোন বিষয়ের দুটি তিনটি শাখা থাকতে পারে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি। সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা করা যায় যেমন দু'দিন পাটীগণিত, দু'দিন বীজগণিত, দু'দিন জ্যামিতি—একে spiral পদ্ধতি বলে। আবার একটি শাখাকে কয়েকটি অংশে (unit) ভাগ করে এক শাখার এক অংশ (unit) শেষ হলে অপর শাখার একটি অংশ শুরু হবে। যেমন পাটীগণিতের সুদকষা শুরু হ'ল, যতদিন সুদ কষা শেষ না হবে ততদিন পাটীগণিত চলবে তারপর বীজগণিতের একটা নিয়ম ধরা হবে এমনিভাবে পড়াবার পদ্ধতিকে Block system বলা হয়। উভয় পদ্ধতির পক্ষেই যুক্তি রয়েছে শিক্ষকদের এ সম্পর্কে স্বাধীনতা থাকবে, তাদের কাজের সুবিধা অনুসারে পদ্ধতি বেছে নেবেন।

বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান (Adjustment with the School plant and Equipments) :—সময় তালিকা বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাব পত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সময়-তালিকা প্রণয়নের সময় বিদ্যালয়ে যতগুলি শ্রেণীকক্ষ আছে সে হিসাব রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে সময় তালিকা রচনা করতে হবে। মানচিত্র ইত্যাদি যে সব শিক্ষাসহায়ক উপকরণ আছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সময় তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। বিদ্যালয়ে যে সাধারণ ঘরবাড়ী আছে ও সামান্য আসবাব পত্র আছে তাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। এবং সে কথা সময় তালিকা প্রণয়নের সময় ভাবতে হবে।

বিদ্যালয় গৃহ ও সাধারণ আসবাব পত্রের সর্বাত্মক ব্যবহারের কথা সময় তালিকা প্রণয়নের সময় ভাবতে হবে

পাঠক্রম (Curriculum) :—মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যে পাঠক্রমের নির্দেশ করে দেন তা যাতে যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয় সময়তালিকা রচনার সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতিটি বিষয়ের উপর এমন class দিতে হবে যাতে পাঠক্রম যথাযথ ভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়।

প্রতিটি শ্রেণীর পাঠক্রম যাতে যথাযথভাবে সমাপ্ত হয় তার সুযোগ সময়তালিকায় রাখতে হবে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activitiy) :—বর্তমানে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সময়তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সুযোগ রাখতে হবে। এ ব্যাপার শিক্ষকদেরও কাজে লাগাতে হবে।

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বাড়ীর কাজ (Hometask) :—সময় তালিকা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বাড়ীর কাজ সারা সপ্তাহ ছড়িয়ে থাকে। একই দিনে অঙ্ক, ইংরেজী অনুবাদ, বাংলা রচনা লিখে নিয়ে আসতে হবে সময় তালিকায় যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকে তাহলে ছেলেমেয়েরা বাড়ীর কাজ করে অন্য বিষয় আর পড়বার সময় পাবে না।

সময়তালিকা ও বাড়ীর কাজ

কার্যাবলার যথাযথ ও সমবণ্টন (Proper and equal Distribution of works) :—সময় তালিকায় বিভিন্ন শিক্ষকের কাজ কর্ম সমভাবে বণ্টন করা হবে। কোন শিক্ষকের উপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। আবার, এই কাজ কর্মকে এমন ভাবে বণ্টন কতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষক তাঁর যথাযথ কাজ পান। যে শিক্ষককে দিয়ে যে কাজ করালে সব থেকে বেশী ফল পাওয়া যাবে তাঁকে সেই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।

কাজকর্ম যথাযথ ও সমভাবে বণ্টন করতে হবে

প্রতি ঘণ্টার ব্যাপ্তি কাল (Duration of Periods) :—একটি পিরিয়ড কতটা সময়ব্যাপী হবে সে বিষয়েও চিন্তা করতে হবে। কঠিন বিষয়ে ছাত্রেরা দীর্ঘ মন সংযোগ করতে পারে না। ছোট ছেলেমেয়েদের মন একই বিষয়ে দীর্ঘ সময় আটকে রাখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সহজে কাজে ক্লান্তি আসে এরূপ নানা বিষয় বিচার করে একটা পিরিয়ড কতটা সময় ব্যাপী হবে তা স্থির করতে হবে। যদি ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টি রেখে পিরিয়ডের ব্যাপ্তি কাল নির্দেশ করা যায় তাহলে ৩০ মিঃ এর বেশী একটি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি হওয়া উচিত নয়। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ৪০।৫০ মিঃ একটি বিষয়ে মন নিবদ্ধ রাখতে পারে। উঁচু শ্রেণীতে কতকগুলো বিষয় আছে যা ৫০ মিঃ কমে বোঝান যায় না। প্রথম ঘণ্টায় নাম ডাকা, ছাত্রদের দরখাস্ত নেওয়া প্রভৃতিতে কিছুটা সময় যায় তাই এই পিরিয়ডটা একটু বেশী দীর্ঘ হওয়া দরকার। একই স্কুলে শ্রেণী ভেদে স্বল্প ও দীর্ঘ কাল ব্যাপী পিরিয়ড করা যায় না। তাই সব দিক বিবেচনা করে একই রকম পিরিয়ড হওয়া সঙ্গত। প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল একটু দীর্ঘ হওয়া দরকার কারণ নাম ডাকতে কিছুটা সময় যায়। তাই প্রথম পিরিয়ড হবে ৪৫ মিনিট। তারপর টিফিনের বিরতি পর্যন্ত ৪০ মিঃ পিরিয়ড করা যেতে পারে। টিফিনের বিরতির পর শেষের দিকে ছাত্রেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই পরের পিরিয়ডগুলি ৪০ মিঃ করে হবে। নীচের ক্লাসে ৩০ মিঃ বাদে যদি দেখা যায় ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, পড়ায় মন দিতে পারছে না, ক্লান্তি বোধ করছে তাহলে শিক্ষক বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করবেন, প্রসঙ্গ বদলে নতুনত্ব সৃষ্টি করবেন।

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন period-এর ব্যাপ্তি কাল বিভিন্ন হবে

বিরতি ঃ
(Recess)

সময় তালিকায় বিরতির ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় পিরিয়ড পার হবার পর একটু একটু করে অবসাদ জমতে থাকে। একটানা তিন ঘন্টা অর্থাৎ চার পিরিয়ড করার পর ছাত্রেরা আর মন দিতে পারে না। তখন দরকার বিশ্রামের। তাই চতুর্থ পিরিয়ডের পর ৩০ মিঃ বিরতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে এ সময়ে মনের ক্লান্তি দূর হয়। বিরতির পর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা একটু বেড়ে যায়, তবে দ্বিতীয় পিরিয়ডের সমান হয় না। দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর যাতে ক্লান্তি জমতে না পারে সে জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডের মাঝে ১০ মিঃ এর জন্য **স্বল্প কালীন বিরতির** ব্যবস্থা করলে তৃতীয় পিরিয়ডে মনোনিবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন বিরতি

শিক্ষকের বিশ্রাম (Teacher's Rest) :

সময় তালিকা রচনার আর একটি অসুবিধা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। হয়ত একটি স্কুলে দু'জন মাত্র অঙ্কের শিক্ষক রয়েছেন অথচ ক্লাসে ইউনিটের সংখ্যা ১০টি সেখানে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দ্বিতীয় কি তৃতীয় পিরিয়ডে অঙ্কের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। শিক্ষকদেরও পর পর অঙ্ক করাতে ভাল লাগবে না। সাধারণ স্কুলের সাজ সরঞ্জামের অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সময় তালিকার সময় খেয়াল রাখতে হয়। একই সাথে দু'টি ক্লাসে যেন একই সরঞ্জামের প্রয়োজন না হয়। হয়তঃ ইতিহাসের উপযুক্ত শিক্ষক একজন, পর পর তাঁকে বর্ণনা মূলক পাঠ দিতে হলে তিনি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সময় তালিকা রচনার সময় শিক্ষকের দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য দুটি পিরিয়ড বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশ্রামের সময় তিনি বাড়ীর কাজ দেখতে পারেন, পরের পিরিয়ডের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। সময় তালিকার বিষয় বণ্টনে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা দরকার। একই বিষয় পর পর পড়াতে হলে বিরক্তির সঞ্চার হয় ; মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখানে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা কষ্ট সাধ্য। আর একটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজের সময় যেন যতটা সম্ভব সমান হয়। বাস্তবে দেখা যায় কোন শিক্ষকের একটি পিরিয়ড বেশী হয়ে গেল সেখানে তাকে অসুবিধা বুঝিয়ে দিলে তিনি ব্যাপারটা সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন।

ক্লান্তি দূর করতে, খাতা দেখতে ও পাঠের প্রস্তুতি করতে শিক্ষকের বিশ্রাম প্রয়োজন

বিভিন্ন প্রকারের সময় তালিকা
(Different Types of Timetable) :

বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধার জন্য কয়েক প্রকার সময় তালিকা ব্যবহার করা হয়। সেগুলি হ'ল :—

॥১॥ সমন্বিত সময় তালিকা (Consolidated Time-table) :— এই জাতীয় সময় তালিকায় শ্রেণী ও শিক্ষকের বিভিন্ন কর্মসূচী একত্রিত করে দেখানো থাকে। এই জাতীয় সময় তালিকাগুলি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনকে কেন্দ্র করে হয়। তারপর কোন দিনের কোন ঘণ্টায় কোন শিক্ষক কোন শ্রেণীতে কি পড়াবেন তা উল্লিখিত থাকে। এ জাতীয় সময় তালিকা আবার হয় বৃহৎ, এবং স্বরূপ হয় জটিল। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হলে এই জাতীয় সময় তালিকা খুবই জটিল হয়। তবে এই জাতীয় সময় তালিকা থেকে এক নজরেই সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্ম সূচী জানা যায়। সময় তালিকাই বলে দেবে যে কোন নির্দিষ্ট সময় কোন শিক্ষক কোথায় কি করছেন, বা, কোন ছাত্র কোথায় কি করছে এবং তারা কতক্ষণ ঐ কাজে নিযুক্ত থাকবে।

সমন্বিত সময় তালিকা খুবই জটিল।

॥২॥ শিক্ষক ভিত্তিক সময় তালিকা (Teacher-Wise Time table) :—এইরূপ সময় তালিকা বিশেষ করে শিক্ষকদের পক্ষে খুবই কার্যকরী। এই ধরনের একটি সময় তালিকা Staff room-এ রাখা হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষকের নাম ক্রমান্বয়ে তুলে নেওয়া হয়। তারপর প্রতিটি শিক্ষকের প্রতিটি Period-এ বিভিন্ন কর্মসূচী নির্দেশ করে দেওয়া হয়। যে সব বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক আছেন সেখানে এই জাতীয় সময় তালিকা দীর্ঘ হয়, তবে সেখানে জটিলতা থাকে কম।

প্রতি শিক্ষকের সময় তালিকা

॥৩॥ শ্রেণী ভিত্তিক সময় তালিকা (Class-Wise Time table) :— এই জাতীয় সময় তালিকা প্রতিটি শ্রেণীর জন্য এক একটি করে তৈরী করতে হয়। প্রতিটি শ্রেণী ধরে বিভিন্ন Period এ বিভিন্ন বিষয় ও শিক্ষক যথাযথভাবে নির্দেশিত করতে হয়। এতে সহপাঠক্রমিক কর্মসূচীও নির্দিষ্ট থাকবে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তাদের শ্রেণীগত সময় তালিকা প্রয়োজন। এরূপ সময়তালিকা প্রতিটি শ্রেণীতে থাকবে। বিদ্যালয়ের একটি open place-এ সমস্ত শ্রেণীর শ্রেণী ভিত্তিক সময় তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবক সকলেরই সুবিধা হয়।

প্রতিটি শ্রেণীর সময় তালিকা

॥৪॥ সাময়িক সময় তালিকা (Provisional Time-table) : সাময়িক সময় তালিকা নিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও দ্বন্দ্বের

শেষ নাই। কোন দিন কোন শিক্ষক কোন কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে সেই জায়গায় অন্যান্য শিক্ষকদের সেই দিনের মত কর্মসূচী নতুন করে করতে হয়। কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কোন শ্রেণীর কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একই বিষয়ের শিক্ষককেই দায়িত্ব দেওয়া ভাল। সাময়িকভাবে সময় তালিকা প্রথম ঘণ্টাতেই করে নিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের জানিয়ে দিতে হয়। সাময়িক সময়তালিকায় কোন একজন বা ২জন শিক্ষক যাতে পর পর class না পান সে দিকে দেখতে হবে। সাময়িক কাজকর্ম গুলি সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। কারণ শিক্ষকদের কাজের চাপ এত বেশী থাকে যে, অতিরিক্ত চাপ রীতিমত বিরক্তিকর।

সাময়িক সময়-তালিকা শিক্ষকের পক্ষে বিরক্তিকর

॥৫॥ **অন্যান্য সময় তালিকা (Other Time-table) :** আরো কিছু সময় তালিকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হ'ল—

(ক) গৃহ কাজের সময় তালিকা—শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিনের Home task সমন্বিত এই সময় তালিকা প্রতি শ্রেণীর জন্য বিশেষ কার্যকরী।

(খ) বিষয় ভিত্তিক সময় তালিকা—Subject teacher তাঁর বিষয় কক্ষে সেই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর কাজকর্মকে কেন্দ্র করে সময়তালিকা প্রস্তুত করেন।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য সময় তালিকা

(গ) শ্রেণী শিক্ষকের সময় তালিকা :—class-teacher তাঁর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন পাঠক্রমিক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে সময় তালিকা রচনা করেন।

প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব
(Responsibility of the Head-master)

বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সময় তালিকাকে স্কুলের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা হয় তা ঠিক। সময় তালিকা অনুসারে স্কুলের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক বিচার বিবেচনা করে, বহু বার ছক কেটে যতটা সম্ভব শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করে সময় তালিকা তৈরীর পর অভিযোগ শোনা যায়। প্রধান-শিক্ষক মাত্রেই জানেন প্রতি বার সময়-তালিকা প্রকাশ হবার পর বহু শিক্ষক তাঁর অসুবিধা বা তাঁর উপর অবিচার করা হয়েছে এ অভিযোগ জানাতে আসেন। সবাইকে সন্তুষ্ট করে সময়-তালিকা তৈরী করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষক ও শিক্ষা-সরঞ্জামের প্রয়োজন অধিকাংশ স্কুলের তা নেই। যথা সম্ভব চেষ্টা করেও

সময়-তালিকা রচনার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের কথা শুনবেন।

কাজের ভার (Work load) সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব নয়। অপ্রধান বিষয় কেউ পড়াতে চান না। নীচের ক্লাসে বেশী পিরিয়ড দিলে সম্মান হানি হয় বলে অনেকে মনে করেন। প্রধান শিক্ষক যথাসম্ভব অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সময়-তালিকার রচনার বাস্তব অসুবিধার দিকটা বোঝালে শিক্ষকগণ নিশ্চয়ই বুঝবেন। নীচের ক্লাসে পড়াতে সব শিক্ষকেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। বিশেষ করে যারা ভাল শিক্ষক তাঁদের নীচের ক্লাসে ও সব চেয়ে উঁচু ক্লাসে দেওয়া সঙ্গত। প্রধান-শিক্ষক সর্বনিম্ন শ্রেণীতে কয়েকটি ক্লাস রাখবেন। যেখানে প্রধান শিক্ষক নীচের ক্লাসে পড়াচ্ছেন সেখানে অন্য শিক্ষকদের অভিযোগ করার কিছু থাকবে না। সময়-তালিকা অনুসারে শিক্ষকগণ কাজ করবেন তাই তাদের অসুবিধা বিচার করে যেখানে আবশ্যক সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত। সময়-তালিকা রচনায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক। সময়-তালিকা তাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্যও করে।

অসুবিধা ও প্রতিকার
(Defects and Remedies)

স্কুলের পক্ষে সময় তালিকা না হলে চলে না। একদিকে বিস্তৃত পাঠক্রম, আর একদিকে সীমাবদ্ধ সময়, অপর্যাপ্ত শিক্ষক, সামান্য সাজ সরঞ্জাম। সবদিকের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টার ফলে কাজ চালানো রকমের একটি সময়-তালিকা।

সময় তালিকা অনুকরণ যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট।

যতই বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সময় তালিকা রচনা করা হোক না কেন বর্তমান প্রচলিত সময় তালিকা অনুসারে কাজ করার ফলে শ্রেণী পাঠ কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। সময় তালিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারো আর ইচ্ছা মত কাজ করার স্বাধীনতা থাকে না। শিক্ষার্থী কাজের ব্যাপারে রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি যে সব কথা বলা হয় সময় তালিকা ঠিক ভাবে অনুসরণ করতে হলে তার অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়। ঘড়ির কাঁটার সাথে সময় তালিকার চাকা ঘুরতে থাকে তার সাথে আবর্তিত হয় একটির পর একটি বিষয়। সময় তালিকা অনুসারে ইচ্ছা না থাকলেও পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার্থীকে পড়তে হয়। মন অবসাদ গ্রস্ত হলে বিরতির পূর্ব পর্যন্ত মনকে অবসর দেওয়া যাবে না। অংকের পর ইংরেজী তারপর বাংলা কি সংস্কৃত ব্যাকরণ এই চক্র থেকে মুক্তি নেই কারণ স্কুলের দ্বিতীয় ঘড়িটির সাথে এগিয়ে চলতে না পারলে শেখার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে হবে। আবার ইংরেজী শিক্ষক একটি বিষয় পড়াচ্ছেন

সময় তালিকায় কৃত্রিমতার সঙ্গে শিশুমনের অনৈক্য।

ছাত্রেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। একটি বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক মুহূর্তে হয়ত নাটকীয় ভাবে স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছাত্রদের মন তখন সেই বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে চাইছে না তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করতে হয়।

তারপর আগ্রহের কথা। চল্লিশ মিনিটের একটি পিরিয়ডে সব ছাত্রই সমান ভাবে একই বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকে এ আশা করা যায় না। অনেক সময় আগের ঘণ্টার জের পরের ঘণ্টায় চলতে থাকে। জোর করে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় না। একটি বিষয় শেষ হবার তিন চার মিনিটের মধ্যে আর একটি বিষয়ে মন দেওয়া যায় কি না তাও বিচার করে দেখা দরকার। পরবর্তী বিষয়ের জন্য মন প্রস্তুত করতে যে সময়ের দরকার সময় তালিকা সে ভাবে তৈরী করা যায় না। কখনও দেখা যায় ৪০ মিঃ পিরিয়ডে যে পাঠটি দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের বোঝাবার পক্ষে সে সময় পর্যাপ্ত নয়। আরো কিছু বেশী সময় হলে বিষয়টি তারা ভাল করে বুঝতে পারত। কিন্তু স্কুলের ঘণ্টা ঠিক সময়ে বেজে উঠবে। বাঁধাধরা ছক মাফিক আমাদের এগিয়ে চলতে হয়। এই যান্ত্রিক পদ্ধতির হাত থেকে ছাত্রদের মুক্তি দেবার জন্য **মন্তেসরী, ডিউই** তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় তালিকা বলে কিছু রাখেন নি। **ডাল্টন** পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠ বলে কিছু নেই, তাই সময় তালিকাও নেই। ছাত্রেরা যার যে বিষয়ে যতক্ষণ খুশী পড়তে পারে। শ্রেণী-কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়ায় মন যেখানে সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছাত্রেরা স্বাধীন ভাবে যার যার পাঠ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বৈষম্য।

যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে সময় তালিকাকে বাদ দেবার কোন অসুবিধা নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শ্রেণী-শিক্ষার বিলোপ সাধন করা সম্ভব নয়। তাই সময় তালিকা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে থাকবেই। যতটা সম্ভব এর ত্রুটিগুলিকে আমরা দূর করতে চেষ্টা করব।

শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষা ও সময় তালিকা

সময় তালিকার নমনীয়তা (Flexibility of the Time-table): সময় তালিকাকে অচল অনড় বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজনে একে পরিবর্তন করতে হবে। সারা বছরের জন্য একটি সময় তালিকা রচিত হবে না। গ্রীষ্ম ও শীতের জন্য দু'টি পৃথক সময় পত্রিকা রচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের বিষয় স্বাধীনতা থাকা উচিত। সময় তালিকা তাই অনমনীয় হবে না। একটি সময় তালিকা দীর্ঘদিন অনুকরণ করবার পর দেখা যায় যে কোন কোন বিষয়ের পাঠক্রম বেশ এগিয়ে গেছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের পাঠক্রম তখনও বেশ পিছিয়ে। তখন

সময় তালিকা অপরিবর্তনীয় নয়।

সময় তালিকার পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার পূর্বে সময় তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের সময়তালিকা তাই পরিবর্তনযোগ্য। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ও শিক্ষাদানের তাগিদে সময় তালিকাকে প্রয়োজনমত অদল বদল করতে হবে।

অনিয়ন্ত্রিত পাঠ বা ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ সময় তালিকায় দেওয়া যায় কি না সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সপ্তাহে প্রতি শ্রেণীর জন্য যদি ২।৩টি পিরিয়ড আলাদা করে রাখা যায় তাহলে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রেরা ইচ্ছামত বিষয় পড়তে পারে।

সময় তালিকায় অনিয়ন্ত্রিত পাঠের সুযোগ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মাঝে ১০ মিঃ এর জন্য বিরতির ব্যবস্থা করা যায়। ছাত্রেরা শ্রেণী কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বাইরে এসে কিছুটা ছুটাছুটি করার সুযোগ পেলে এক ঘেঁয়েমির হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়। এতে অবসাদ জমতে পারে না ও পরবর্তী ঘণ্টায় পড়ায় মনোযোগ বাড়ে। এই স্বল্পকালীন বিরতি শিক্ষকদের পরবর্তী পিরিয়ডের প্রস্তুতির পক্ষে সহায়ক। সময় তালিকা ছাত্রদের সুবিধার জন্য। প্রধান শিক্ষক সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে যদি মনে করেন কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কাজের সুবিধা হবে তাহলে চিরাচরিত প্রথাকে পরিহার করে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন।

সময় তালিকায় স্বল্প-বিরতি খুবই কার্যকর

ব্লক পদ্ধতি ও স্প্যাইরাল পদ্ধতি

(Block System ও Spiral System):

সময় তালিকা প্রণয়নের দুটি পদ্ধতি আছে,—Block System ও Spiral System। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রমে গদ্য ও পদ্য দুই-ই থাকে। একটি গদ্য কয়েকদিন পরপর পড়িয়ে একটি পদ্য পড়াতে আরম্ভ করবার পদ্ধতিকে Block System বলা হয়। আর একদিন গদ্য, একদিন পদ্য, পড়ানোর পদ্ধতি Spiral System নামে পরিচিত। সময় তালিকায় দুটি পদ্ধতিকেই সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ দু'য়ের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সে স্বাধীনতা বিষয়-শিক্ষককে দেওয়া উচিত।

পদ্ধতি দুটি ব্যবহারে শিক্ষকের স্বাধীনতা।

সময় তালিকা ও শিক্ষক সভা

(Time-table and Teacher's council)

সময় তালিকা একটি জটিল ব্যাপার। সময় তালিকা প্রণয়ন করতে গেলে শিক্ষকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতেই হয়। সাধারণতঃ সহ-প্রধান শিক্ষক

শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ মত সময় তালিকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বিদ্যালয় গৃহ, আসবাবপত্র শিক্ষক প্রভৃতির অপ্রতুলতার জন্য সময় তালিকায় অনেক ত্রুটি থেকে যায়। তার জন্য অনেক সমালোচনা আসে। কিন্তু সেই সময় তালিকা যদি শিক্ষক সভায় উপস্থাপিত করে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় তবে সমস্ত শিক্ষকের পক্ষে তা মেনে নিতে অসুবিধা থাকে না। এ পদ্ধতি হ'ল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

সময় তালিকাকে শিক্ষক সভায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

সময় তালিকা সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। এর মাধ্যমে স্বাধীন শিক্ষা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সার্থক শিক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ও বিদ্যালয় পরিচালনায় সময় তালিকা অপরিহার্য। সময় তালিকাকে তাই যথাযথ, বৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। শুধু সময় তালিকা নয়, সেই অনুযায়ী যথাযথ কার্যকলাপই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে।

উপসংহার

প্রশ্নাবলী

(1) Show that the time-table is the bringing together of the pupil teacher curriculum, and to some extent the building into some extent the building in a harmoniously working whole. Discuss in this connection the sound principles of time-table construction. (C. U., B. T.—1969)

(2) Construction of a good time-table is the most essential thing in School administration. Discuss in this connection the sound principles of time-table construction. (N. B. U., B. T.—1968)

(3) What is the necessity of the school Time-table ? How does it reflect the organisation and the general aims of School ? (C. U., B. T.—1961)

(4) Show how the time table is bringing together of the pupil, teacher and curriculum in a harmoniously working whole. What are the practical difficulties encountered in the framing of an ideal time table.) (North Bengal University, B. T.—1967)

(5) Is a time table essential in a School ? Why ? What factors should be kept in view in preparing the time table ? What Should be included in it ? (C. U., B. T.—1967)

(6) Write notes on :—
Principles of time table construction. (C. U., B. Ed.—1970).

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক
(PARENT TEACHER CO-OPERATION)

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের যোগাযোগ খুব বেশী থাকতে. ...াঁরা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো। সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও শিক্ষক-অভিভাবকের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের ব্যবধান থেকেই গেছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের মধুর সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যবধান তাই দূর করতে হবে—স্থাপন করতে হবে মধুর সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তি।

প্রাচীন শিক্ষাবাবস্থায় শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ছিল না।

অভিভাবক ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে পাঠান, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে মানুষ করে তোলবার সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়, কিন্তু এ চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে অভিভাবক ও স্কুলের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে। কোন ছেলেমেয়ের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হলে তার পারিবারিক অবস্থা জানতে হবে, তার অভিভাবককে জানতে হবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব কত সুদূর প্রসারী। শিক্ষার্থীর জীবনে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাকে অনেক খানি নিয়ন্ত্রিত করে। অভিভাবক যদি ছেলেমেয়ের পড়া, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোঁজ না রাখেন, তাহলে শুধুমাত্র স্কুলের চেষ্টায় শিক্ষার্থীকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। অভিভাবক স্কুলে আসেন ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে—আর ছেলেমেয়ে যদি পরীক্ষায় ফেল করে তাকে যাতে উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া যায় সে জন্য অনুরোধ জানাতে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ছেলেমেয়ের উন্নতি অবনতির সম্পর্কে অভিভাবকের একটা দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে অভিভাবকেরও দায়িত্ব আছে

বিদ্যালয়ে যে সময় একটি শিক্ষার্থী থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় সে বাড়ীতে থাকে। দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে প্রতিদিন কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ৩/৪ ঘণ্টার বেশী থাকে না। বাকী ২০/২১ ঘণ্টা সে গৃহ পরিবেশে অভিভাবকের সান্নিধ্যে কাটায়। কাজেই বিদ্যালয়ের ৩/৪ ঘণ্টা সময় কোন শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের একমাত্র সুযোগ ও সময় হতে পারে না। জ্ঞান ভাণ্ডার দিন দিন সমৃদ্ধশালী হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে গৃহপরিবেশের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীর উপর পাঠক্রমের বোঝা দিন দিন বাড়ছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষা একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। কাজেই শিক্ষার্থীরা যদি গৃহ পরিবেশে জ্ঞানার্জন না করে তবে বিদ্যালয়ের সাধ্য নেই যে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সে সম্পূর্ণ করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে তাই অভিভাবকদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

বিদ্যালয়ের উন্নতিতে অভিভাবকদের সাহায্য

স্কুলের উন্নতি করতে হলে অভিভাবকগণ স্কুল সম্পর্কে যাতে উৎসাহ নেয় সে চেষ্টা করতে হবে। স্কুল থেকে ছাত্রদের উন্নতির জন্য কি করা হচ্ছে তার খবর অভিভাবকদের জানাতে হবে। স্কুলের ভাল মন্দের সাথে তাদের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ জড়িত আছে এ বোধ সৃষ্টি করতে পারলেই অভিভাবকগণ স্কুল সম্পর্কে মনোযোগী হবেন। স্কুলের বৈষয়িক উন্নতির জন্যও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখা দরকার। বিত্তবান অভিভাবকদের কাছ থেকে অনেক সময় স্কুলের উন্নতির জন্য দান পাওয়া যায়। বাংলা-দেশের শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী আর্থিক সাহায্য অনেক খানি সাহায্য করেছে।

অভিভাবকগণের সঙ্গে ভদ্র ও সহানুভূতি-মূলক ব্যবহার

কোন অভিভাবক এলে প্রধান শিক্ষক তাঁর সাথে ভদ্র ব্যবহার করবেন এইটা স্বাভাবিক। তবু কোন কোন সময় বিপরীত আচরণ করা হয়েছে এরূপ অভিযোগ শোনা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ; কিন্তু কোন অবস্থায় অভিভাবক ক্ষুব্ধ হতে পারেন এরূপ ব্যবহার করা চলবে না। গ্রামে অনেক দরিদ্র ছেলেমেয়েরা পড়ে। তাদের অভিভাবকগণ অনেক সময় তাঁদের আর্থিক অসুবিধার কথা জানাতে আসেন। প্রধান শিক্ষক সহানুভূতির সাথে তাঁদের কথা শুনবেন ও অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবেন। মর্যাদায় সকল অভিভাবকই প্রধান শিক্ষকের নিকট সমান। অভিভাবকের যে কোন রকম অভিযোগ থাকলে প্রধান শিক্ষক ধৈর্যসহকারে শুনবেন ও প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়ে অনেক সময় ধনী অভিভাবকদের অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দরিদ্র অভিভাবকদের অবহেলা করা হয়। এর মারাত্মক প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে। সামাজিক বৈষম্যের তীব্র বিষভার শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে ; যার ফলশ্রুতি কখনই ভাল হয় না।

শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাওয়ার কারণ

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের সম্পর্ক মধুর হওয়ার প্রয়োজন থাকলেও তাঁদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়েছে। এর কতকগুলি কারণও আছে। শিক্ষকের পাণ্ডিত্য অনেক সময় অভি-ভাবকদের সঙ্গে ব্যবধান গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষকের মর্যাদাবোধ ও আত্মাভিমান অভিভাবকগণ ছোট করে দেখেন। ফলে শিক্ষক-অভিভাবকগণের ব্যবধান বেড়ে যায়। এর জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও দায়ী। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ থেকে

বিচ্ছিন্ন। তার ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাচীন ধারণাও এর জন্যে দায়ী। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলসম্বন্ধ অনুযায়ী শিক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা-সংক্রান্ত মনোভাবের অভাব থেকেই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠে না, শিক্ষার পরীক্ষাধর্মীতাও শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে ওঠার অন্যতম অন্তরায়।

শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা

(Need for Co-operation of the Teachers and Parents)

শিশুর জীবনে পিতামাতা ও অভিভাবকদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্যগত ও চরিত্রগত বহু দোষগুণ শিশুদের উপর পড়ে। শিক্ষার্থীরা পিতামাতা ও অভিভাবকদের আচার ব্যবহার ও অভ্যেসগুলি নিজেদের মধ্যে অনুকরণ করে। তা-ছাড়াও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকগণই সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। তাই শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপন হলে সে সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হতে পারে। এই সম্পর্ক পিতামাতা ও অভিভাবকের বদভ্যাস ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণ থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করবে। অভিভাবকগণও তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সবসময়ই খোঁজ খবর পাবেন, তাতে শিক্ষার্থীর জীবন আরো সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অভিভাবকগণই বেশী উৎসাহী

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগ তাদের শিক্ষাজীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই সব শারীরিক ও মানসিক রোগগুলি সারানোর জন্য অভিভাবকদের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তি (Instinct) ও প্রক্ষোভ (Emotion) জনিত সমস্যা, অপসঙ্গতির সমস্যা (Problem of maladjustment) ও অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি সমস্যাগুলি রোধ করবার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক প্রয়োজন।

শারীরিক ও মানসিক রোগ প্রতিরোধ

শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা, চরিত্রগঠন, অভ্যেস নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক আচরণ, ব্যক্তিসত্তা গঠন ইত্যাদির জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক প্রয়োজন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টাই শিক্ষার্থীর জীবনে এইসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে।

বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বাড়ীতে পড়াশুনা, অনুশীলন ও গৃহকর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়ে কোন বিষয় সাধারণভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর ব্যাপক পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম ও অনুশীলন শিক্ষার্থীরা বাড়ীতেই করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের Home Task দেওয়া হয়, বাড়ীতে এইসব পড়াশুনা, অনুশীলন ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা গৃহ পরিবেশে অভিভাবকদের সান্নিধ্যেই করে। কাজেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক আবশ্যক।

Home Task

শিক্ষা এক অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা প্রবাহ। শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিদ্যালয় ও গৃহ পরিবেশ থেকে। জীবনের এই বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকদের এক বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জীবন ও সমাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা গৃহ পরিবেশেই অর্জন করে। সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা খুবই কার্যকরী। আর বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা এক অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা প্রবাহ

শিক্ষার্থীরা দিনের অধিকাংশ সময় গৃহ পরিবেশে থাকে। দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পরিবেশে কাটায়। বাকী ২০/২১ ঘণ্টা সময় তারা গৃহ পরিবেশে কাটায়। কাজেই শিক্ষাজীবনে গৃহ পরিবেশের গুরুত্বও কম নয়। গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীর এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক প্রয়োজন।

গৃহপরিবেশ ও শিক্ষা

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্যও অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক প্রয়োজন। বর্তমানে সমাজের থেকে বিদ্যালয়গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তা-ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলী ও গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তুলবার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।

বিদ্যালয় ও সমাজ

বিদ্যালয় সংগঠনের জন্য ও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে যে, সে সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে উঠবে? **নিম্নলিখিত উপায় ও পদ্ধতি গুলির মাধ্যমে শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক (Means and Methods for the establishment of Parent-Teacher Co-Operation) গড়ে তোলা যায়—**

শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় ও পদ্ধতি

॥১॥ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব (Responsiblity of the Head master) :—শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বই সর্বাধিক। কারণ প্রধান শিক্ষকের সঙ্গেই অভিভাবকদের সম্পর্ক বেশী। অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় প্রধান শিক্ষকের কাছে আসেন, বেতন পত্র দিতে প্রধান শিক্ষকের কাছে আসেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় প্রধান শিক্ষকের কাছে আসেন। তাছাড়া নানা সমস্যা ও অসুবিধার সময়ও অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষকের কাছে আসেন। এই সুযোগে প্রধান শিক্ষক ধীরে ধীরে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। প্রধান শিক্ষক সব অভিভাবকদের সঙ্গে মধুর ও সমান ব্যবহার করবেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন। অভিভাবকদের কথা মন দিয়ে শুনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করবেন। এই সুযোগে প্রধান শিক্ষক মহাশয় অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন।

প্রধান শিক্ষকের মধুর ব্যবহার ও সহানুভূতি শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে

॥২॥ সহ শিক্ষকদের ভূমিকা (Role of the Asstt. teachers) :—শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকদের নয়; এ দায়িত্ব সহশিক্ষকদেরও আছে। তাঁরাও ওই সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। প্রত্যেক **শ্রেণী শিক্ষক (class teacher)** সেই শ্রেণীর ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে পরিচয় রাখবেন। এ ছাড়াও সমস্ত শিক্ষককে সচেতন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। মধুর ও ভদ্র ব্যবহার, সহানুভূতি, উদারতা, শিষ্টাচার, সহৃদয়তা ইত্যাদির সাহায্যেই শিক্ষকগণ এ কাজ করতে পারেন, যখনই কোন শিক্ষক (যে কোন কারণ বা উপায়েই হোক) কোন অভিভাবকের সান্নিধ্যে আসবেন তখনই তিনি এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবেন, আলাপ আলোচনা করবেন।

যে কোন সূত্রেই হোক সহশিক্ষকগণ অভি-ভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন

॥৩॥ বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি (School Managing Committee) :—বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে অভিভাবকদের একাধিক প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই প্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁরা বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। অভিভাবকদের এই প্রতিনিধিরা শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। তাছাড়াও পরিচালক সমিতিও নিজেদের ক্ষমতাবলে এ ধরনের গঠনমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

পরিচালক সমিতির ভূমিকা

॥৪॥ অভিভাবকদের নিকট শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে বিবরণ প্রেরণ (Reporting to the parents about the Students) :—বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, আচরণ, শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক সমস্যা ও শৃংখলা ঘটিত বিভিন্ন বিবরণ অভিভাবকদের কাছে প্রেরণ করতে পারে। ফলে অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত হয়। এইসব সমস্যা সমাধানের পথ তখন প্রশস্ত হয়।

শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিবরণ প্রেরণ

॥৫॥ গৃহ পরিদর্শন (Home Visit) :—শিক্ষকগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের মাতাপিতা ও অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। তাতে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সমস্যা সমাধান হতে পারে।

শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বাড়ী যাবেন

॥৬॥ বিদ্যালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ (Invitation to the Parents for Attending the School Functions) :—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব হয় তাতে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ফলে অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে আসবার সুযোগ পাবেন। সেই সূত্রেই শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাঁদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের সমাজজীবনও মুখরিত হয়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ

অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হতে পারে সে উদ্দেশ্য W. M. Ryburn বিদ্যালয়ের **অভিভাবক দিবস (Parents' Day) প্রতিপালন** ও **অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (Parent-teacher Association) স্থাপনের** কথা বলেছেন।

॥৭॥ অভিভাবক দিবস (Parents' Day) :—বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনকে অভিভাবক দিবস হিসেবে ঘোষনা করতে হবে। ঐদিন সমস্ত অভিভাবককে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ধনী-গরীব কোনরূপ ভেদাভেদ করলে চলবে না। বছরের এই নির্দিষ্ট দিনটি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের আগমনে মুখর হয়ে উঠবে। অভিভাবক-দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিকে উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিতে হবে। সরস্বতী পুজোর সময় কয়েকদিন বিদ্যালয় উৎসব মুখর থাকে। তারই মধ্যে কোন একটি দিনকে অভিভাবক দিবস হিসেবে পালন করা যায়। এই দিবস প্রতিপালনের শিক্ষাগত উদ্দেশ্য থাকবে। সে উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে

অভিভাবক দিবস উদ্‌যাপনের শিক্ষাগত দিক

সাহায্য করা। এই ধরনের অভিভাবক দিবসকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী পালন করা যায় ;—

(ক) **অভ্যর্থনা (Reception)**:—অভিভাবক দিবসে নিমন্ত্রিত অভিভাবকদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এর জন্য পূর্ব থেকে একটি অভ্যর্থনা সমিতি তৈরী করা প্রয়োজন। এই অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ আন্তরিক হবে। অভ্যর্থনার সময় চা বা cold drinks ইত্যাদির সঙ্গে ফুল ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। অভ্যর্থনার সময় অভিভাবকদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভেদাভেদ করলে চলবে না। সমস্ত অভিভাবককেই পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে। অভিভাবকদের যথাযথ স্থানে বসতে দিতে হবে। অভ্যর্থনার সময় প্রচলিত সামাজিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য বোধ মেনে চলতে হবে। এই জাতীয় অভ্যর্থনার মধ্য দিয়েই শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

অভিভাবকদের অভ্যর্থনার সময় ধনী দরিদ্র বৈষম্য রাখা চলবে না

(খ) **প্রদর্শনী (Exhibition)**:—অভিভাবক দিবসে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের যোগ্যতার নিদর্শন সূচক তাদের নানারকম হাতের কাজ অভিভাবকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। ছাত্রদের আঁকা ছবি, ম্যাপ, গ্লোব, নানারকম মাটির পুতুল, মডেল প্রভৃতি দিয়ে প্রদর্শনীকে আকর্ষণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা হবে। এছাড়া চার্ট, পোস্টার ও পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে স্কুলের ক্রমোন্নতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, ছাত্রেরা যে সব সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তার সাথে অভিভাবকদের পরিচিত করান যায়। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিষয়ের (subject) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন Stall (যেমন, History Stall, Physics Stall ইত্যাদি) দিতে পারে। এই প্রদর্শনী ছাত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে অন্য দিকে তেমনি ছাত্রদের শিক্ষাগত উন্নয়নের পথও খুলে দেবে।

প্রদর্শনী ছাত্রদের পরিচালনাধীন থাকবে

(গ) **প্রীতিভোজ (Grand Feast)**:—অভিভাবক দিবসে একটি প্রীতিভোজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাতে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েই অংশগ্রহণ করবেন। শিক্ষক ও অভিভাবক যে একই সামাজিক মর্যাদার অধিকারী সেকথা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আছে। তাতে অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধা হবে।

(ঘ) **আলোচনা (Discussion)**:—অভিভাবক দিবসে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার্থীদের বিবিধ অভিযোগ ও সমস্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শৃংখলা, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে। আলোচনায় শিক্ষক, অভিভাবক ও বাইরের

কোন নিমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ (Expert) অংশ গ্রহণ করবেন। আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

(ঙ) **বিদ্যালয় গৃহ পরিদর্শন (Inspection of the School building)** ঃ—অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করবেন, এবং বিদ্যালয়ের সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে একাত্ম হবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকগণ তাঁদের সাহায্য করবেন। তাতে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

॥৮॥ **উৎসব অনুষ্ঠান (Social Functions)** ঃ—ঐ দিনেই বিকালের দিকে বিদ্যালয়ে প্রীতি খেলাধূলা ও উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকদের খেলাধূলাতে গান-বজনা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষামূলক হবে এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

॥৯॥ **শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা (Discussion with the Teachers)** ঃ—প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষকগণ সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষার সাফল্যের জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন। প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। স্কুলের সাথে অভিভাবকদের সম্পর্ক যাতে ঘনিষ্ঠ হয় তার সবরকম ব্যবস্থা করা হবে। ছেলে স্কুলে যায় আর আমি নিয়মিত মাইনে দিচ্ছি, এতেই আমার সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল অভিভাবক যেন এ ভাববার সুযোগ না পান। অভিভাবক দিবসে উপস্থিত থেকে সবাই স্কুলের কার্যধারার সাথে পরিচিত হবেন, স্কুলের উন্নতির কথা চিন্তা করবেন, সর্বোপরি ছেলের শিক্ষায় শিক্ষকের সাথে তাঁরও একটা বিরাট দায়িত্ব আছে এ সম্পর্কে সচেতন হবেন তাহলেই অভিভাবক দিবস পালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আলোচনার পর কিছু কিছু যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

॥১০॥ **অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (Parent-teacher Association)** —অভিভাবক দিবসে একদিনের জন্য স্কুলে এসে অভিভাবকগণ আনন্দ উৎসবের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা ও স্কুলের সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনা করেন। সেই স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতির মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন স্থায়ী সমিতির। অভিভাবকগণের প্রতিনিধি ও শিক্ষকগণকে নিয়ে যদি স্থায়ীভাবে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি স্থাপিত হয় তাহলে স্কুলের বহু সমস্যা সমাধানের সুবিধা হয়।

অভিভাবক সমিতির প্রয়োজনীয়তা

এরূপ সমিতিতে প্রধান শিক্ষকসহ সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদের সকলেই

সাধারণ সভ্য হবেন। সমিতির কার্যকরী সমিতিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবে। অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে না। একজন অভিভাবক সমিতির সভাপতি হবেন। প্রধান শিক্ষক হবেন সম্পাদক। প্রতি মাসে সমিতির একটি করে সভা হবে। প্রতি বছরই সমিতি নতুন করে গঠিত হবে। সমিতির একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবে। সমিতির আয় ব্যয়ের হিসেব থাকবে। বিভিন্ন খাতাপত্র যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। সমিতির একটি অফিস ঘর থাকবে। স্থানীয় সমস্যা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার সাথে স্কুলের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়েও আলোচনা হবে। স্কুলে শিক্ষক ফি পরীক্ষণ পদ্ধতি বা অন্য কোন বিষয়ে কোন নতুন প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত করার আগে এই সমিতিতে আলোচনা করে নিলে অভিভাবকদের সহযোগিতা লাভ সহজ হবে। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়েও এখানে আলোচনা করা হবে। স্কুলে শৃংখলা রক্ষার কোন অসুবিধা সৃষ্টি হলে অভিভাবক সমিতি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারেন।

সমিতির সংগঠন

Notice দিয়ে Meeting ডেকে সমিতির কার্যকরী সভা ও সাধারণ সভা কাজ করবে। বিভিন্ন সমস্যা অনুযায়ী সমিতির আলোচনা হবে। শিক্ষা বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন সমস্যাও আলোচনায় স্থান পাবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার নিয়েও এই সভা আলোচনা করতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক রোগ নিয়েও এই সমিতি কাজকর্ম করবে। ছাত্র বিশৃংখলার সময় অভিভাবক শিক্ষক সমিতির একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকবে। বর্তমানে পরীক্ষায় যে ব্যাপক নকল করা চলছে সে নিয়েও এই সমিতি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কোন দরিদ্র ছাত্রকে এই সমিতি অর্থ সাহায্য দিতে পারে। এই সমিতি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের কথাও এই সমিতি ভাববে।

সমিতির কার্যাবলী

স্কুল ও গৃহের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় অভিভাবক শিক্ষক সমিতি বিশেষ সহায়ক। শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ও তার পরিবেশ জানতে অভিভাবকের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। যেখানে অভিভাবক সমাজ শিক্ষিত ও সচেতন সেখানে এরূপ সমিতি শিক্ষক অভিভাবক উভয় পক্ষেরই উপকার সাধন সমর্থ। প্রধান শিক্ষক যতবেশী সংখ্যক সম্ভব অভিভাবকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করবেন। শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছেলের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। অভিভাবক শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থী সম্পর্কীত বহু সমস্যার সহজ মীমাংসা সম্ভব হবে। স্কুলের সাথে যোগ থাকায় স্কুলের কোন কাজ সম্পর্কে

বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন

অভিভাবকদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টির অভিযোগ থাকবে না। শিক্ষার্থীর সম্পর্কে বিদ্যালয় ও অভিভাবকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, এতে উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন।

শিক্ষা সমাবেশ

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সমাবেশ (Educational Conference) করতে পারেন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদকে এনে এই জাতীয় সমাবেশে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, দর্শন, পদ্ধতি, সংগঠন, শৃংখলা, পরীক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—এইভাবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাতে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি হবে; এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলবে।

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক

(Pupil-teacher Relationship)

আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মধুর ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। পাশ্চাত্য দেশের যন্ত্র সভ্যতার স্পর্শে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়। ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে যায়। বর্তমানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তাই খুব মধুর নয়। অথচ শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাদান পদ্ধতির বিচার করলে দেখা যায় যে, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষার্থীর যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অতি-আধিক্যের অমোঘ প্রভাব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর পড়েছে।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

বর্তমান যুগে সমাজ ব্যবস্থা জটিল হয়েছে। ফলে শিক্ষকের জীবনের সমস্যা ও জটিলতা অনেক বেড়েছে। তাই ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে সে সময় দেওয়া সম্ভব নয়। ছাত্রদের পক্ষেও এই জটিলতা সমান ভাবে কাজ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উগ্র আলোয় যৌথ মনোভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে বসেছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগ রাখে নাই। শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য, আত্মাভিমান ও অহংকারও এই সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণ। তাঁরা ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চান। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় তালিকার মধ্যেকার কাজ কোন ক্রমে সেরে তাঁরা বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন।

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণ

রাস্তাঘাটে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা অন্যদিকে মুখ করে চলে যান। এ সমস্ত কারণে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাই। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি এই সম্পর্ক গড়ে না ওঠার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণীপাঠনের (class teaching) উপর নির্ভরশীল। শ্রেণীশিক্ষাদানে ব্যক্তি উপেক্ষিত হয়। এক একটি শ্রেণীতে ৩০।৪০ জন ছাত্র থাকে। সময় তালিকায় শিক্ষক এক একটি শ্রেণীর জন্য ৩০।৪০ মিনিট সময় পান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করে ছাত্রদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্ব যেখানে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে সেখানে শ্রেণী পাঠন অন্তঃসার শূন্য। শিক্ষাদানকালে ব্যক্তিগত বৈষম্য যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রেণীপাঠন ও ব্যক্তিগত বৈষম্য

বর্তমানে ছাত্র বিশৃংখলা চরমে উঠেছে। এই বিশৃংখলার সমস্ত দায় দায়িত্ব কেবল মাত্র ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। ছাত্রদের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্যার কথা, জীবনের কথা ও মনের কথা জানতে হবে। তারপর গঠন মূলক পথে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেশের অগণিত যুবককে বেকার রেখে শৃংখলা বোধের বড় বড় কথা ও উপদেশ শুনিয়ে কোন লাভ নেই। ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের কথা জানতে হবে। প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসার পথই সে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ছাত্র বিশৃংখলা

বর্তমানে পরীক্ষার হলে ব্যাপক দুর্নীতি ছাত্রসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক চরম সংকটের মুখে ফেলেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক প্রয়োজন। দুর্নীতির বোঝা ছাত্রদের উপর চাপিয়ে লাভ নেই। যেখানে হাজার হাজার ইঞ্জিনীয়ার বেকার সেখানে হিতোপদেশ শুনিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার করে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক এই সমস্যা অনেক খানি কাটিয়ে উঠতে পারে। এই মধুর সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মনের কথা জানতে পারেন। তারপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও পরীক্ষাকে দুর্নীতি মুক্ত করা যায়।

পরীক্ষা হলে দুর্নীতি

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটি উত্তপ্ত পদার্থ যেমন তার পাশের পদার্থকেও উত্তপ্ত করে তুলে। তেমনি শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরাও তাঁর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সাহায্য করেন। তার জীবনের পথচলাকে সুগম করেন।

সামাজিকতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, স্বার্থত্যাগ, বিনয় ও ভদ্র ব্যবহার শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকেই অর্জন করে। শিক্ষার্থীর জীবনের অনেক সমস্যা শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে সমাধান করতে পারেন। শিক্ষকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক শিক্ষার্থীর শিক্ষা-গ্রহণকেও প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কের বলে দ্বিধাহীন চিত্তে শিক্ষকের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় জেনে নিতে পারে। উদারতা, নৈতিক শিক্ষা, আত্মপ্রত্যয়, যৌথমনোভাব, গণতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজ তান্ত্রিক চিন্তাধারা শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে লাভ করে। সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও সহযোগিতার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। আর শ্রদ্ধা, জিজ্ঞাসা, সদিচ্ছার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।/

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন

বিদ্যালয় পরিদর্শন

(School Inspection)

আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শনের ব্যবস্থা বহু পুরাতন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সঙ্গে Fear psychology জড়িয়ে আছে। কারণ পরিদর্শক এলে বিদ্যালয়ে ছাত্র, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, সমস্ত শিক্ষাকর্মী ও পরিচালক সমিতি—সকলেই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। বৃটিশ শাসনে ও বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিদর্শকের ভূমিকা মোটেই গঠনমূলক নয়। পরিদর্শক সবসময় বিদ্যালয়ের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। আর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তা চাপা দেওয়ার জন্য তোষামোদ, ভাল খাওয়া-দাওয়া, অনেক সময় উৎকোচ পর্যন্ত দেন। ফলে পরিদর্শনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়।

পরিদর্শকের আগমণে বিদ্যালয়ের ভীত সন্ত্রস্থ রূপ।

প্রতি প্রদেশে শিক্ষাপরিচালনার সর্বোচ্চ শিখরে আছে State Education Department। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে শিক্ষামন্ত্রীই তার নিয়ন্ত্রক। Education Secretariate শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করেন। আর Director of public Instruction তা বাস্তবে রূপায়ণ করেন। রাজ্যস্তরে পরিদর্শনের সর্বোচ্চ স্তরে আছে primary, secondary, Female education-এর জন্য এক একজন করে chief Inspector/Inspectress থাকেন। জেলাস্তরে একজন District Inspector থাকেন। তাঁকে সাহায্য করেন সহকারী জেলা পরিদর্শক (A. D. I.)। এছাড়াও Social Education, Physical Education, Technical Education ইত্যাদির জন্য এক একজন করে Chief Inspector থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি

বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শক

পরিদর্শনের জন্য থানা-মহকুমা ইত্যাদি স্তরে Sub-Inspector ও Deputy asst. Inspector থাকেন। এঁদের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা—(Need for Inspections) :—শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষক সমাজ। বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা সে কাজ করেন। রাষ্ট্র থেকে দেশের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। শিক্ষা-বিভাগ থেকে সাধারণ ভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সেই নীতি কার্যকরী করে তোলবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়গুলিতে ঠিকমত কাজ হচ্ছে কি না অনুসন্ধান করার একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সরকারের। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাহায্যে পালন করেন। দেশের শিক্ষার মান উন্নতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাবিভাগ পরিদর্শকের সহায়তায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে শিক্ষার মনোন্নয়ন ব্যবস্থা কার্যকরী করার চেষ্টা করে। পরিদর্শকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে *M.S. Moniyuddin and M. Siddalingaiya* মন্তব্য করেছেন—"*An Inspector may be thought of as the main co-ordinating authority in any school system. Hence, he has to take a large view of the education and bring the schools under his jurisdiction up to a certain level. He has to make changes in organisation and administration so as to facilitate the aims he has in view. He must enable the schools to understand him, his aims and to work towards their attainment.*

সরকারী দায়িত্ব ও পরিদর্শকের ভূমিকা

সরকার থেকে বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। স্কুল পরিচালনা কার্যাদিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না জানতে আসেন স্কুল পরিদর্শক। তিনি বিদ্যালয়ের দোষ ত্রুটিগুলি অনুসন্ধান করেন। তার রিপোর্টের উপর একটা স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই স্কুল পরিদর্শকের আগমন প্রধান শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কখনও প্রীতির চোখে দেখেন না। স্কুল পরিদর্শক আসবেন শুনলে একটা ত্রাসের সঞ্চার হ'ত। যেদিন সরকারী পরিদর্শক এলেন সেদিন স্কুলে একটা ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করত। প্রধান শিক্ষক তটস্থ এই বুঝি একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে স্কুলের দোষ ত্রুটি সব পরিদর্শকের চোখের আড়ালে রেখে তাঁকে বিদায় করতে পারাটাই ছিল প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। যার একটি কলমের আঁচড়ে স্কুলের ভবিষ্যৎ

পরিদর্শক এলে বিদ্যালয়ের ভীতির সঞ্চার হয়

নির্ভর করছে এবং যিনি দোষ ত্রুটি ধরতেই এসেছেন তাঁর কাছ থেকে দোষ আড়াল করে রাখা ছাড়া আর উপায় কি।

বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁর এলাকার শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী। চিরাচরিত ভাবে স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র স্কুলের খাতাপত্র আর সাধারণভাবে স্কুলের পঠন-পাঠন সম্পর্কে দু'টি একটি মন্তব্যের মধ্যেই তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বিদ্যালয়ের ত্রুটি সন্ধান করতে যাবেন না। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর নজরে পড়বে সে সম্পর্কে তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করবেন। প্রধান শিক্ষকও অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে তাঁদের অসুবিধা কি জেনে কি করে স্কুলের উন্নতি হতে পারে স্কুলের ত্রুটি দূর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। পরিদর্শক হবেন বন্ধু ও সহায়ক। যদি বিদ্যালয় পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে পরিদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা বিভাগ পরিদর্শক পাঠাচ্ছেন কি করে শিক্ষার উন্নতি হয়, বিদ্যালয়কে সাহায্য করা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়ে। দোষত্রুটি খুঁজে অনুমোদন বাতিল করা সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা পরিদর্শকের উদ্দেশ্য নয়। এই মনোভাব সৃষ্টি হলে পরিদর্শক সম্পর্কে যে একটা বিরাগ বা ত্রাসের মনোভাব রয়েছে তার পরিবর্তন হবে। পরিদর্শকের আগমন ভীতির না হয়ে প্রীতির কারণ হয়ে উঠবে। পরিদর্শকের কাজ হবে 'Encouragement to good work and removal of defects."

শিক্ষার উন্নতিতে পরিদর্শকেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

পরিদর্শকের কর্তব্য

(Duties of an Inspector)

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তদারকীর দায়িত্ব যাঁদের উপর দেওয়া হবে তাঁদের নিয়োগের সময় বিশেষ বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। শিক্ষাগত ও শাসনগত দুই দিকেই তার সমান দক্ষতা থাকবে। পরিদর্শক হবেন উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষা-বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকবে। স্কুলের পরীক্ষার ফল দেখেই তিনি দোষগুণ বিচার করবেন না। প্রগতিশীল শিক্ষা চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে সম্পর্কে তার উৎসাহ থাকবে। তাঁর দৃষ্টি হবে উদার। তিনি থাকবেন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। ক্ষমতা আছে বলেই ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করবেন না। যাই করবেন তাঁর একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে তা হচ্ছে শিক্ষার উন্নতি বিধান। কোন স্কুলের কাজের মধ্যে যদি নতুনত্বের সন্ধান পান

পরিদর্শকের কর্তব্য

তাহলে সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে তিনি সুযোগ দেবেন। কোন বিদ্যালয়ে কোন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে যদি সুফল পেতে থাকে সেই পদ্ধতি অন্য স্কুলে গ্রহণ করা যায় কি না সে সম্পর্কে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তাঁর এলাকার সমস্ত স্কুলের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তিনি করবেন।

পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্য নিয়ে অফিস ও খাতাপত্রাদি দেখবেন। সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না দেখবেন। অফিস আসবাবপত্র হিসেব পত্র সব দেখবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও পাঠাগার ইত্যাদি তদারকী করবেন। এসবের মধ্যে যে সব ভুল ত্রুটি বেরুবে তা দেখিয়ে দিয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

অফিস ইত্যাদির পরিদর্শন

পরিদর্শক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থাও পরিদর্শন করবেন। বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি দেখবেন। যে সব ভুল ত্রুটি চোখে পড়বে সে নিয়ে পরে আলাপ আলোচনা করবেন। পরিদর্শক শিক্ষকদের নতুন নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকগণকে পরামর্শ দিবেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষাদান কার্য কিভাবে উন্নত হয় তার জন্য সচেষ্ট হবে। পরিদর্শক সময় তালিকা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নিয়েও আলোচনা করবেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিদর্শকের আলোচনা ও পরামর্শ খুবই কার্যকরী।

শিক্ষাকার্য পরিদর্শন

পরিদর্শক বিদ্যালয় গুলিকে আর্থিক অনুমোদনের (recognition) সময় পরিদর্শন করেন। তাঁরই report-এর ভিত্তিতে সরকার কোন বিদ্যালয়কে অনুমোদন দান করেন। পরিদর্শকের report অনুসারেই বিভিন্ন বিদ্যালয়কে deficit grant ও lump grant হিসেবে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে পরিদর্শক কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও পূর্ব সূত্র গুলির যথাযথ রক্ষিত হয়েছে কি না তা দেখবেন। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের একটি স্বচ্ছ ও গঠন মূলক ভূমিকা আছে।

সরকারী অনুমোদন ও পরিদর্শকের ভূমিকা

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী

(Constructive out look) :

বিদ্যালয় পরিদর্শকের সমালোচনা একটা কাজ। এই সমালোচনা হবে গঠনমূলক (constructive)। কোন পরিদর্শক যদি ধ্বংসাত্মক (destructive) দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করেন তাহলে তাঁর সমালোচনায় স্কুলের কোন উপকারই হবে না। পরিদর্শক যদি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে আদর্শ পাঠ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শ্রেণীতে পাঠ দিয়ে দেখিয়ে

পরিদর্শকের সমালোচনা গঠনমূলক হবে।

দিতে পারেন। তিনি শিক্ষকদের কাছে কি চান শিক্ষকগণ তা বুঝে সেভাবে চলতে পারে। দু'মিনিট দেখেই শিক্ষকের পাঠ দেবার ক্ষমতা আছে কি না বিচার করা কষ্টসাধ্য।

পরিদর্শক সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে যদি স্কুল পরিদর্শন করেন তাহলে ত্রুটি বের করে সেই সাথে ত্রুটি দূর করার পথের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন।

পরিদর্শকের সহানুভূতিশীল মনোভাব

পরিদর্শকের সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেলে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁদের অসুবিধার কথা জানাতে দ্বিধা করবেন না। পরিদর্শক শিক্ষকদের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন। যদি সতর্ক করে দিতে হয় বা অপ্রীতিকর কিছু বলতে হয় তা তিনি শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে বলবেন। শিক্ষক যেন মনে করেন তাঁকে যা বলা হ'ল তার ভালর জন্যই বলা হ'ল।

পরিদর্শন ব্যবস্থার ত্রুটি

(Defects of the Inspection System) :

বর্তমান পরিদর্শন ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি আছে। সেগুলি হ'ল—

(১) **পরিদর্শকের স্বল্পতা**—সরকারী শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিদর্শকের সংখ্যা খুবই অল্প। একজন পরিদর্শককে বিশাল এক একটি এলাকা জুড়ে অবস্থিত অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক স্থানে যাতায়াতের অসুবিধাও আছে। পরিদর্শকের আরো অনেক কাজ কর্ম আছে, যা সেরে পরিদর্শনের কাজ তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই করতে পারেন না। বিদ্যালয় পরিদর্শন তো উঠেই গেছে।

(২) **আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা**—পরিদর্শনের কাজ সরকারী আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তিনি এক স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করেন। Ryburn-এর মতে, "*The inspector holds an extremely autocratic position.*" তিনি যেন বিদ্যালয়ে সবকিছুর ত্রুটি ধরতেই আসেন। তাঁর আগমনে বিদ্যালয়ের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন।

(৩) **শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি**—বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি আছে পরিদর্শনের মাধ্যমে তার সমাধান করা যায় কি না তা বিতর্কের বিষয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, যান্ত্রিক ও গতানুগতিক। এর মধ্যে কেবলমাত্র পরিদর্শন ব্যবস্থাকে উন্নত করলে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি হবে কি না তা বিচার্য বিষয়।

(৪) **কোঠারী কমিশনের বক্তব্য**:—১৯৬৪-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কোঠারী

কমিশন পরিদর্শন ব্যবস্থার (পৃষ্ঠা—262) তিনটি ত্রুটির কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল—

(i) Inadequacy of numbers (অর্থাৎ পরিদর্শকদের সংখ্যার স্বল্পতা)।

(ii) poor quality of personnel because of inadequate Scale of pay, (অর্থাৎ কম বেতনের জন্য উপযুক্ত লোকেরা এ কার্যে আসেন না)।

(iii) Lack of Specialization because most inspecting officers are generalists ; (অর্থাৎ পরিদর্শকগণ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয়)।

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য (Remarks of the Mudaliar Commission): পরিদর্শক নির্বাচন ও পরিদর্শকের কর্তব্য সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন, পরিদর্শক নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়। কোন কোন জায়গায় সরাসরি ভাবে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর যতটা জোর দেওয়া হয় অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণ সম্পর্কে সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

পরিদর্শকের যোগ্যতার মাপকাঠি

কমিশন সুপারিশ করেছেন, যারা পরিদর্শকরূপে নির্বাচিত হবেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি হবে অনার্স ডিগ্রী বা এম. এ ডিগ্রী। অভিজ্ঞতার দিক থেকে স্কুলে দশ বছর শিক্ষকতা বা প্রধান শিক্ষকরূপে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে। এইভাবে সরাসরি পরিদর্শক নিয়োগ ব্যবস্থা ছাড়াও দশ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ও ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে। স্থায়ীভাবে এঁদের নিয়োগ করা হবে না। তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাঁরা একাজ করবেন তারপর যার যার স্থায়ী পদে ফিরে যাবেন। পরিদর্শকের কর্তব্য সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—পরিদর্শকের কাজের দুটি ভাগ থাকবে, একটি প্রশাসনগত অপরটি শিক্ষাগত।

পরিদর্শক প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত দিকগুলি পরিদর্শন করবেন

প্রশাসনিক দিক হচ্ছে স্কুলের সারা বছরের হিসেব, প্রয়োজনীয় খাতাপত্র অফিসের বিভিন্ন কাজ প্রভৃতি দেখা। এজন্য পরিদর্শকের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত কর্মী থাকবে। স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ও প্রশাসনিক কাজে এত সময় যায় যে শিক্ষাগত কাজের দিকে পরিদর্শকের যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত তাঁর পক্ষে সে পরিমাণ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষাগত কাজ বর্তমানে এত জটিল হয়ে উঠেছে যে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষার সবদিক দেখে বিচার করা সম্ভব নয়। একজন পরিদর্শক যত বিদ্বানই হউন না কেন তিনি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মতামত বা উপদেশ দিতে পারেন না। এজন্য কমিশন প্রস্তাব করেছেন—বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হবে, পরিদর্শক হবেন এই বিশষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি।

এই প্যানেল থেকে সভ্যগণ তিন বছরে একবার স্কুলের শিক্ষাগত দিক পরিদর্শন করবেন। এই প্যানেলের সদস্যগণ যখন কোন স্কুলে যাবেন (এঁদের মধ্যে তিনজন সদস্য অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হবেন) তখন সেখানে তাঁরা ২।৩ দিন থাকবেন। সেখানে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। তাদের সাথে থাকার ফলে স্কুলের সবদিক থেকে স্কুলের কার্যপদ্ধতি দেখবার ও জানবার সুযোগ পাবেন। এইভাবে দেখা ও খোলাখুলিভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্কুলের উন্নতি বিষয়ে পরিদর্শক কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারবেন।

উপসংহার

(Conclusion)

বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। পরিদর্শক আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। তাঁর উদারতা, সহানুভূতি সহযোগিতা, দূরদৃষ্টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করবে। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের (Curriculum) সঙ্গে পরিচিত হবেন। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতেও (co-curricular Activities) সম্পর্কেও পরিদর্শক উৎসাহী হবেন। পরিদর্শকের সাংগঠনিক ও সৃজনশীল চিন্তাধারা থাকবে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় (expriments) উদ্বুদ্ধ হবে।

পরিদর্শকের গুণাবলী

এরজন্য শিক্ষার পুনর্গঠন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে ও তাঁদের বেতন হার বৃদ্ধি করতে হবে। পরিদর্শন কাজে বিশেষ শিক্ষাদানের পরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তাঁদের এ কার্যে নিয়োগ করতে হবে। পরিদর্শন সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে।

সরকারী ব্যবস্থা।

নিম্নলিখিত বৃত্তি জীবীদের মধ্যে পরস্পর পরিবর্তন সাপেক্ষে বিদ্যালয় গুলির পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে,—

(১) জেলা পরিদর্শক।

(২) বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক।

(৩) শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অভিজ্ঞ অধ্যাপক, তাহলে শিক্ষাতত্ত্ব, প্রশাসন ও পরিদর্শন এই ত্রিবিধ কার্যের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে। তখনই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বলিষ্ঠ রূপ নিতে পারবে।

শিক্ষাদর্শন বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিদর্শনের সমন্বয়

প্রশ্নাবলী

(1) Discuss the value of Co-Operation between parents and teachers in education. Draw up a Scheme for the formation of parent-teacher associations for the mutual benefit of the School and the Community. (C. U., B. T.—1968)

(2) write notes on :—

(a) Parent-teacher Co-Operation (C. U., B. T.—1965, 1967)

(b) Pupil-teacher relationship. (C. U., B. T.—1966)

(c) School Inspection—how it should be reformed. (C. U., B. T.—1966, 1968, 1970)

(d) Role of District Inspection of Schools in Primary Education,

(3) Point out the Significance of Parent-teacher Co-Operation in the Total development of the Community. Out line a Scheme for the effective organisation and Functioning of Parent-teacher Associations. (North Bengal University—1968)

সপ্তম অধ্যায়

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী
(CO-CURRICULAR ACTIVITIES)

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে। সেখানে তারা ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়াশুনা করে। কিন্তু কেবল-মাত্র কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞানই 'শিক্ষা' নয়। বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম (curriculum) দেওয়া থাকে তার উপর কিছু কিছু জানলেই জ্ঞান অর্জিত হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আরো কিছু কিছু কাজ-কর্ম করে। বিদ্যালয়ে স্বল্পবিরতি, দীর্ঘবিরতি, বিদ্যালয় বসবার আগে, বিদ্যালয় ছুটির পরে ইত্যাদি সময়ে তারা যে অবসর সময় পায় তাকে তারা কাজে লাগায়। এই সময় সাধারণতঃ ছুটাছুটি, চেঁচামেচি, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে কেটে যায়। সেই থেকেই সৃষ্টি হয় পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী বা Extra-curricular activities. এই সব কার্যাবলীকে শিক্ষার কাজে লাগানোর কথা ধীরে ধীরে চিন্তা করা হয়। বর্তমানে এই জাতীয় কার্যাবলীকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) বলা হয়। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশই যদি শিক্ষা হয় তবে কেবলমাত্র পাঠক্রমের মাধ্যমেই জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় না; সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বা গঠনের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে গ্রহণ করতে হয়। বর্তমানে তাই সকলেই শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শিশুর ব্যক্তি সত্ত্বা গঠনের পক্ষে কেবল পাঠক্রম যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

এই কার্যাবলীগুলি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কেন ?
(Why these Activities are Co-curricular Activities ?)

ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা,—এ শিক্ষাই আমারা ছাত্রদের দিয়ে এসেছি। লেখাপড়ার বাইরে যা কিছু—খেলাধূলা, ব্যায়াম, সমাজ, সেবামূলক কাজ, গান, অভিনয়, সাহিত্যবিষয়ক কাজ প্রভৃতি ছাত্রদের পক্ষে বর্জনীয় বলেই বিধান দেওয়া হয়েছিল। খেলাধূলায় সময় নষ্ট করবে খারাপ ছাত্রেরা। সুবোধ বালকদের উপদেশ দেওয়া হ'ত সে সব ছাত্রদের মন্দ স্বভাব পরিহার করতে। পুঁথিকেন্দ্রীক শিক্ষায় বইয়ের বাইরে যে জগৎ সেই জগতের সম্পর্কে কেউ উৎসাহ দেখালে কি অভিভাবক, কি শিক্ষক সেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

বই পড়ার বাইরের কোন কাজকর্ম নিন্দনীয় ছিল

পাঠ্যসূচীতে বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী বিষয়-বস্তুর বাইরে কোন বিষয়ের সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। দৈহিক বিকাশ, সমাজ সেবা-মূলক কাজ ও সামাজিক মনোভাব গড়ে ওঠবার মত শিক্ষা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মত শিক্ষা, একঘেঁয়ে নীরস পুঁথির জগতের বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হবার মত ও শুধুমাত্র আনন্দের কোন ব্যবস্থার কথাই চিন্তা করা হ'ত না।

পাঠ্যসূচীতে কতকগুলি বই-এর বাইরে কোন শিক্ষণীয় বস্তুর কথা স্বীকার করা হ'ত না

শিক্ষা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন শুরু হবার পর শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণের গবেষণার ফলে আমরা বুঝতে শিখলাম যে, শুধুমাত্র কয়েকখানা বই পড়ার মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত পাঠক্রমের বাইরেও আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, করার আছে, শেখার আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিশুর ব্যক্তিসত্বা ও সমাজসত্বার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতে হয় তাহলে তাকে সুযোগ দিতে হবে তার সামগ্রিক বিকাশের। তার সামগ্রিক বিকাশ শুধুমাত্র কয়েকখানা পুঁথি পড়েই হবে না। তার জন্য খেলাধূলা, সামাজিক কাজ, সংগঠন মূলক কাজ, বিতর্ক, গান, অভিনয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি বহু কিছুর আয়োজন করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তার বৌদ্ধিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকের সমান বিকাশ লাভ ঘটে। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে' জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার পাঠক্রমে তার সব ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিশুর সামগ্রিক বিকাশ শুধুমাত্র কয়েকখানা বই পড়ে হয় না

এক সময় ছিল যখন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রম বহির্ভূত বিষয় (extra-curricular activities) বলে গণ্য করা হ'ত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদগণের চেষ্টায় আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার সীমিত রূপ আজ বহু ব্যাপক হয়েছে। শিশুকে গ্রন্থকীট তৈরী করাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। তার দেহ ও মনকে গড়ে তুলতে হলে, তাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হলে পাঠক্রম বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা আজ আর কেহ অস্বীকার করতে পারেন না। তাই খেলাধুলা, সাহিত্য-কর্ম প্রভৃতিকে আজ আর পাঠক্রমবহির্ভূত বিষয় না বলে সহপাঠক্রমিক বিষয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এ সব কার্যাবলীকে আর অতিরিক্ত বলে মনে করা হয় না। স্কুলের কার্য তালিকার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে এই কাজ স্বীকৃত হয়েছে :—"*These activities*

এখন এগুলি আর Extra-curricular Activities নয়, Co-curricular Activities.

are no longer looked upon as mere extras but as an integral part of the school programe."

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সহপাঠক্রমিক পাঠ্যসূচির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য (to the development of their entire personality") সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর বাইরে সরিয়ে না রেখে বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন (as integral a part of activities of school as its curricular work"। সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তির অপচয় হয় না। তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে অন্যান্য বহু সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। *(……"by planning a coherent programme of different activities, rich in stimuli, the school will not fritering away either the time or the energy of the pupils but will be heightening their intellectual powers also side by side with training them in other fine qualities"—Reports of Mudaliar Commission.)*

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা

(Necessity for the co-curricular Activities)

শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়ে তুলতে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বহুদিক থেকে উপযোগিতা রয়েছে। শিক্ষার্থী যখন কৈশোরে উপনীত হয় তার মনোজগতে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। কিশোর বয়সে যূথবদ্ধতা সংস্কার অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেয়। এই সংস্কারের বশে বার বছর বয়স থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে যে শক্তিশালী তার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়। দলগতভাবে আজ আত্মপ্রকাশ করতে চায়। দলনেতা নির্দেশে তাদের চিন্তা ও কার্য সঙ্ঘবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়। তাদের অনিয়ন্ত্রিত কার্য অনেক সময় কার্যরূপে প্রকাশ পেতে পারে। কিশোর বয়সের সঙ্ঘচেতনা যাতে ব্যক্তির ঠিক কল্যাণে ও তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির পথে পরিচালিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। তাদের এমন সব কাজে নিয়োগ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের শক্তির প্রকাশই হবে না, তাদের সঙ্ঘশক্তি সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে। স্কুলের বহু সাংগঠনিক কাজ ও সভা সমিতির মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে কিশোর বয়সের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে। এই সব সংগঠনের ও নানাবিধ নিয়ন্ত্রিত কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক জীবন ও নৈতিক জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে।

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন

সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সমাজের কাজের মধ্য দিয়ে কিশোর বয়সে **সামাজিক গুণাবলীর** বিকাশ ঘটবে। সামাজিক কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে যে বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে তাই বেছে নিতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে তাকে তার পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের কাজের একটা সামাজিক দিক রয়েছে। স্কুল থেকে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজের ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা মূল্যবান শিক্ষালাভ করতে পারে। তাদের মধ্যে সামাজিক বোধসৃষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার ফলে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সাথে সমাজের ও সমাজের সাথে ব্যক্তির কি সম্পর্ক—বিভিন্ন সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভ হয়। সঙ্ঘবদ্ধ কাজের ফলে একই রকম মনোভাব (like mindedness) সৃষ্টি হয়। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে ও ভাবে তাদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার করার মনোবৃত্তি দেখা দেয়। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুসারে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিতর্ক সভা, অভিনয়ের জন্য সমিতি, ফুটবলের দল, স্কুল পত্রিকার জন্য সমিতি প্রভৃতি গঠন করে, সে আর ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করে না—নিজেকে সমাজের একজন রূপে ভাবতে শেখে। সে সর্বভাবে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষা পায়। সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার যে সামাজিক দিক রয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থীরা এখানেই সুনাগরিক হ'বার শিক্ষালাভ করে।

সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরজনিত সমস্যার সমাধানে ও প্রবৃত্তির অবদমনে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। শিশুর বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর যে সমস্যা দেখা দেয় তারও সমাধান সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে সম্ভব। শিক্ষার্থীদের কৌতূহল, যৌনচেতনা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি তাদের সমাজবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলে। কিন্তু এই সময় তাদের সহপাঠক্রমিক কাজে ব্যস্ত রাখলে তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর বিকাশ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, ব্যবহার, কর্তব্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ হয়। এই কার্যাবলীগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনা, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা লাভ করে যা আজকের সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অত্যাবশ্যক।

গণতান্ত্রিক চেতনা

সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষা লাভ হয়। তার চরিত্র গঠিত হয়। যে সমাজে সে বাস করবে সমাজ আশা করে সেই সমাজের

রীতিনীতিকে সে মেনে চলবে। সমাজের অপর দশজনের হিতাহিত সে চিন্তা করবে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সে দলের নেতৃত্ব ও ইচ্ছাকে মেনে চলতে শেখে। এই শিক্ষাই তাকে নিয়ম শৃংখলা ও আইনকানুন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার চরিত্র গঠিত হয়।

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃংখলাবোধ সৃষ্টি করে। খেলাধূলা, গানবাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি কাজকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শৃংখলাবোধ আয়ত্ব করে। বর্তমানে ছাত্র-বিশৃংখলা বিদ্যালয়গুলির এক চরম সমস্যা। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করতে সাহায্য করে। কারণ এই কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শৃংখলাবোধ আয়ত্ব করে।

শৃংখলাবোধ

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের মন ভাল থাকে, মন ভাল থাকলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, তাছাড়া খেলাধূলা প্রভৃতি এমন কতকগুলি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী আছে যেগুলির মাধ্যমে শরীরচর্চা হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ব দিতে হয় ;—এদের সেই নেতৃত্ব অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা মেনে চলে। এর মাধ্যমে তাই একদিকে যেমন নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়, অপরদিকে তেমনি নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও নেতৃত্বকে মেনে চলার প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমের পরিপূরক। পাঠক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয় না। পরীক্ষামূলক পরিভ্রমণ, খেলাধূলা, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়গুলির জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী তাই পাঠক্রমের পরিপূরক।

পাঠক্রমের পরিপূরক

সহপাঠক্রমিক কাজের আর একটি দিক হচ্ছে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। বহু রকমের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী রয়েছে। সবাই সব রকম কাজ পছন্দ করে না। সবার শারীরিক শক্তি বা মনের চাহিদা এক রকম নয়। একজন খেলাধূলা পছন্দ করবে, একজন অভিনয় করতে ভালবাসে। একজন আঁকা বা লেখার দিকে আকৃষ্ট হবে। কোন ছেলের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে সে কথা কেউ বলতে পারে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে

ব্যক্তিগত বৈষম্য, রুচি ও সামর্থ্য সমর্থিত হয়

পার্থক্য (individual difference) রয়েছে। তাই যেখানে বহু রকম কাজের সুযোগ আছে সেখানে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অনুসারে পছন্দ মত কাজ বেছে নিতে পারে। যার মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে সর্বাধিক পরিমাণে সে শক্তি বিকাশের সুযোগ দিলে সে তার নিজের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাবে। ছাত্রেরা মনের মত কাজ করার সুযোগ পেলে কাজকে আর কাজ মনে করবে না। এর মধ্যেই খেলার আনন্দ উপভোগ করবে।

সহপাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের সৃজনধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা অবসর বিনোদনের যে শিক্ষা পায় তার সুফল বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার পরও অনুভূত হয়। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে অবসর বিনোদনের শিক্ষা স্কুল পরবর্তী জীবনে আরো মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন আজ সহজতর হয়েছে। পূর্বে যে কাজে মানুষ যে সময় ব্যয় করত আজ আর সে সময় ব্যয় করতে হয় না। তার কাজের সময় কমেছে কিন্তু যন্ত্র যুগে মানুষ কাজের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্রের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষ যেন যন্ত্রেরই একটা অংশ। সেখানে তার কর্মশক্তি বা সৃজনী শক্তির প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। একঘেঁয়ে নীরস কাজের মধ্যে সে যতটুকু অবসর পায় তা সে হাল্কা আমোদ প্রমোদেই ব্যয় করে।

অবসর বিনোদনের শিক্ষা

আলস্যে সময় কাটান অপেক্ষা ক্ষণিকের চটুল আনন্দে জীবনের শূন্যতাকে ভরে তোলবার চেষ্টা হয়ত ভাল ; কিন্তু সামাজিক দিক থেকে, কি ব্যক্তির দিক থেকেও এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। অবসরের প্রয়োজন আছে, আর সেই সাথে প্রয়োজন আছে কি করে অবসর সময়কে সুন্দরভাবে ব্যয় করা যায় তার শিক্ষার। আর্থিক প্রয়োজনে যেমন বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন মনের খোরাক যোগাতে, তেমনি অবসর বিনোদনের শিক্ষার প্রয়োজন। অবসর ক্ষণকে আনন্দমুখর করে তুলতে মানুষ খেয়ালের বসে অনেক কাজ করে। স্কুল জীবনে সৃজন ধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে খেয়াল (hobby) চরিতার্থ করার শিক্ষা পেলে কর্মজীবনে সেই সব কাজের মধ্য দিয়েই সুন্দরভাবে সে অবসর বিনোদন করতে পারে।

Hobby

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সে বাস্তবের সাথে পরিচিত হয়। বৃহত্তর সমাজ জীবনের সংস্পর্শে আসে। শিক্ষার গতানুগতিকতার মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করতে হলে শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহপাঠক্রমিক কাজের গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেখানে স্কুলের সময় তালিকায় সহপাঠক্রমকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয় না। কি করে

বৃহত্তর সমাজ ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় সাধন

সুষ্ঠুভাবে নানারূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়তা করা যায় আধুনিক শিক্ষকদের তাই প্রধান লক্ষ্য।

সম্ভাবনা-বহুল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার পরও আমাদের বিদ্যালয় সমূহে লেখাপড়ার বাইরে কোন কাজে ছাত্রদের খুব বেশী উৎসাহ দেওয়া হয় না। এজন্য প্রথম প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। অর্থ ও সময় সম্পর্কে অসুবিধার কথা তুলে একে প্রায়ই সরিয়ে রাখতে হয়। যেখানে কিছু ব্যবস্থা আছে সেখানে স্কুলের দৈনিক কাজ শেষ হবার পর সহপাঠক্রমিক কার্যসূচীকে সময়-তালিকায় নিয়মিত স্থান দিতে হবে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে সম পর্যায় ভুক্ত না করলে এর শিক্ষামূল্য সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থী সচেতন হবে না। শুধু সময় তালিকায় স্থান দিলেই হবে না, রুচি, আগ্রহ, শক্তি অনুযায়ী যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মত বিষয় বেছে নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে সেইরূপ কাজের বহু রকম সুযোগ রাখতে হবে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর জন্য সময় তালিকায় নিয়মিত স্থান দিতে হবে

নানারূপ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে যেমন শিক্ষার্থীদের এসব কাজে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হবে। দেখতে হবে যাতে সব ছেলেমেয়েই যেন সহপাঠক্রমিক পাঠসূচীতে অংশ গ্রহণ করে। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য সহপাঠক্রমিক কাজে একটা নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সামগ্রিক মূল্যায়ণের সময় বিচার করা হবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে (Cumulative record card) পাঠ্য বিষয়ের বাইরে সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার সময় শ্রেণীতে যে কয়টি বিষয় পড়ান হয় তার বাইরে সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে উল্লেখিত বিষয় সমূহকে বিচারের মধ্যে আনা হয় না। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে একটা নির্দিষ্ট নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ণ যথাযথরূপে হয়, ছেলেমেয়েরা উৎসাহও পায়।

শিক্ষাগত মূল্যায়ণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে স্থান দিতে হবে

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠনের অসুবিধা

(Defects of organising co-curricular Activities)

সহপাঠক্রমিক বিষয় সমূহ স্কুলের সময় তালিকায় প্রবর্তন করার সাথে একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। অভিভাবক ও প্রাচীন পন্থী শিক্ষকেরা প্রথমেই অভিযোগ করবেন ছেলেমেয়েরা খেলায় মেতে উঠেছে, লেখা পড়ায় আর তাদের মন নেই। খেলাধুলা যে পড়ার অঙ্গ হতে পারে একথা তাঁদের বোঝান শক্ত।

ন্দিন পড়াকে ছেলেমেয়েরা অবহেলা করুক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নয়। বইয়ের পড়ায় তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়বে এই উদ্দেশ্য নিয়েই নানা রকম কাজ ছাত্রদের দেওয়া হয়। আমেরিকার সমীক্ষায় ফলে দেখা গিয়েছে যে সেখানের বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কাজ প্রবর্তনের ফলে সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহ আয়ত্ত করার যোগ্যতা একটুও হ্রাস পায় নি। যদি দেখা যায় অতি উৎসাহের বশে ছাত্ররা খেলাধুলায় বা বাইরের কাজে খুব বেশী সময় নিয়োগ করছে তখন তাদের সতর্ক করে দিতে হবে।

ঠক্রমিক
াবলী শিক্ষার্থীদের
ুনায় প্রবণতা
য় দেবে বলে
েকব ধারণা

স-তালিকায় সময় নির্দিষ্ট করে দিলে তারা দুই দিকেই পরিমিত সময় ব্যয় করতে রে, কোন দিক থেকে কোন অভিযোগ উঠবার আর সুযোগ থাকবে না।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি অনেক শিক্ষকের অনীহা আছে। শিক্ষকদের া অধিকাংশই গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তাঁদের মধ্যে সহপাঠক্রমিক র্যাবলীর অনুশীলন ও অনুরাগ নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সময় কেবল মাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করা হয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর কথা চিন্তা করা হয় না। সহপাঠক্রমিক াবলীর প্রচলন করলে শিক্ষকদের কাজ বেড়ে যাবে। কিন্তু তারা যে বেতন-মে প্রতিষ্ঠিত তাতে তা সম্ভব নয়। এই সমস্ত কারণে শিক্ষকদের মধ্যে সহপাঠ-িক কার্যাবলীর প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

কদের অনীহা

ছাত্রদের মধ্যেও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায়। লয়ে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবপ্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয়। ফলে অনেক ছাত্র এই কাজে বিমুখ হয়। পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব দেওয়া না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা তা অবহেলা করে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গরীব বাড়ী ক এসেছে, তাদের পক্ষে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর জন্য সামান্য কিছু কিছু চপত্র করাও সম্ভব নয়। অনেক ছেলেমেয়েকেই বাড়ীতে কঠোর পরিশ্রম করতে তখন বিদ্যালয়ে এসে আরো পরিশ্রম করা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত হয়। তাই পাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি ছাত্রদেরও একটা অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

ত্রদের অবহেলা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অনুকূল নয়। সরকার ব্যাপারে উৎসাহী নয়। বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অনটন এই জাতীয় কার্যাবলী রূপায়ণের বিরাট অন্তরায়। সরকার সে ব্যাপারে সচেষ্ট নয়। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারী মহলেও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি কটা অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে এর জন্য ঢেলে সাজাতে হবে।

লিত শিক্ষা ব্যবস্থা
পাঠক্রমিক
াবলীর উপযুক্ত নয়

সময় তালিকায় সহপাঠ্যসূচীকে স্থান দিলে আর একটি অসুবিধা হচ্ছে শিক্ষকদের কাজের সময় বেড়ে যায়। নানারূপ সহপাঠক্রমিক বিষয় সংযোজনের ফলে স্কুলের কাজের সময় দীর্ঘতর হবে, শিক্ষকদের বেশী সময় স্কুলে থাকতে হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম শিক্ষকগণ স্বেচ্ছায় করতে রাজী হবেন না। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে এ অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে। অর্থের সংস্থান করা সব স্কুলের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে এ ব্যবস্থায় আপত্তি উঠবে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে সহপাঠক্রমিক কার্যসূচীকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা বিচার করে শিক্ষা বিভাগ স্কুলগুলিকে কি করে সাহায্য করা যায় সে কথা চিন্তা করে পথ নির্দেশ করবেন।

শিক্ষকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি

আর একটি ভয় হচ্ছে লক্ষ্যচ্যুতি। গতানুগতিকতার বাইরে একটা শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব কাজ শুরু করা যায় প্রথমেই সে সম্পর্কে নানাদিক থেকে আপত্তি শুরু হয়। তারপরও যদি কাজটি শুরু করা যায় কিছু দিন বাদে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু হয়ে ছিল সে উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজটির শিক্ষা মূল্যের কথা ভুলে গিয়ে আনুষঙ্গিক বহিরঙ্গ দিকটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সহপাঠক্রমিক কাজগুলির পিছনে যেন একটা পূর্বপরিকল্পনা থাকে। কাজের পিছনে একটা পরিকল্পনা থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কম।

লক্ষ্যচ্যুতি

নানারূপ সহপাঠক্রমিক কাজ

(Various Co-curricular Activities)

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের কাজের আয়োজন করা হবে যার মধ্য থেকে ছাত্রেরা তাদের পছন্দ মত কাজ বেছে নেবে। কোন সময়ই স্কুল নির্ধারিত কাজ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সাধারণ ভাবে ছাত্রদের আগ্রহ ও প্রবণতা বিচার করে প্রত্যেকের একাধিক সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন করা হবে। কাজগুলি যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। স্কুলের সামর্থ্য ও স্থানীয় অবস্থা বিচার করে নানারূপ কাজের ব্যবস্থা করা হবে—এজন্য কোন নীতি নির্দেশ করা সম্ভব নয়। যে সব কাজে ছাত্রদের আগ্রহ কম বা বেশী ছাত্রের যে কাজে অংশ গ্রহণ করতে রাজী নয় সে সব কাজের ব্যবস্থা করতে নেই। সব ছেলেমেয়েই কোন একটা কাজে অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু একাধিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে কোন ছেলেমেয়েকে বাধ্য করা হবে না। অতিরিক্ত উৎসাহের বশে কেউ যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে অংশ নিতে চায় তাকে বুঝিয়ে বিরত করতে হবে।

স্থানীয় প্রয়োজন বুঝে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হবে

ছাত্রদের জন্য যে সব কাজের ব্যবস্থা করা হবে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ছাত্রদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজ সম্পর্কে ছাত্রদের মনে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে কোন কাজের পিছনে পূর্বপরিকল্পনা থাকবে। পরিকল্পনা আগেই শিক্ষকগণ করে রাখবেন না। ছাত্ররাই নিজেদের কাজের পরিকল্পনা নিজেরা করবে। ভুল যদি হয় নিজেদের ভুল নিজেরাই শুধরে নেবে। শিক্ষকের পরামর্শ বা সাহায্য চাইলে তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

পূর্বপরিকল্পনা

সহপাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনে যে সব কাজে ছাত্রদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে ও যে কাজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ হয় সে সব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন স্কুল কি কাজের আয়োজন করবে তা স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। সহপাঠ্যসূচী পরিচালনায় ও ছেলেদের পরামর্শ দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুল যে কাজের ব্যবস্থাই করুক না কেন দেখতে হবে সে কাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক আছে কি না। **যে সব সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন স্কুল থেকে করা যেতে পারে, তাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—**

বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর শ্রেণী বিভাগ

(১) সাহিত্য বিষয়ক কাজ কর্ম (Literary Activities)
(২) শারীরিক কাজ কর্ম (Physical Activities)
(৩) সমাজসেবামূলক কাজকর্ম (Community Activities)
(৪) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম (Cultural Activities)
(৫) পৌরশিক্ষণ কার্যাবলী (Civic Training Activities)
(৬) Hobbies.
(৭) সামাজিক কার্যাবলী (Social Activities)
(৮) বহুমুখী কার্যাবলী (Multipurpose Activities) ইত্যাদি।

(১) **সাহিত্য বিষয়ক কর্ম (Literary activities)**—সাহিত্য বিষয়ক কর্ম সব স্কুলে কম বেশী হয়ে থাকে। আলোচনা চক্র বা বিতর্ক সভার আয়োজন করা খুব কঠিন কিছু নয়। প্রত্যেক স্কুলেই সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতি থাকবে। ছাত্রদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হবে। একজন শিক্ষক থাকবেন উপদেষ্টা রূপে। যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে বা আলোচনা হবে তা পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। আলোচনা বা বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররা,

ছাত্র সম্পাদক বা শ্রেণী সদস্যের কাছে নাম দিবে। নির্ধারিত দিনে সব ছা
আলোচনায় উপস্থিত থাকবে। শিক্ষকদের একজন বিচারক বা সভাপতির আ
গ্রহণ করবেন। বক্তারা বিষয়টির পথে বা বিপথে তা
সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থিত করবে। বিতর্ক সভার মধ্য দি
ছাত্ররা সুশৃংখল ও ধারাবাহিকভাবে নিজেদের কথা যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন কর
শেখে। ধীর ভাবে চিন্তা করে অপরের যুক্তি খণ্ডন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শো
যায়। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস গঠিত হয়। পার্লামেন্টারী রীতি নীতির সা
পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

বিতর্ক সভা

বিদ্যালয় পত্রিকা বা স্কুল ম্যাগাজিন অনেক স্কুলে আছে। ছাত্রদের মধে
কোন কোন ছাত্রের লেখার আগ্রহ থাকে। প্রকাশের সুযোগ না থাকায় শক্তি
থাকা সত্ত্বেও তারা লিখতে উৎসাহ বোধ করেন। স্কুল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাদে
ভাব কল্পনা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। লেখক
জীবনের হাতে খড়ি বহু স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়েই শুরু
হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে লেখার মধ্য দিয়ে তাদের রচনা শক্তির বিকাশ লাভ
ঘটবে। স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের হাতেই থাকা উচিত।
উপদেষ্টা রূপে একজন শিক্ষক থাকবেন। আজকের স্কুল পত্রিকার সম্পাদক হয়ত
একদিন কোন কাগজের সম্পাদক রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিদ্যালয়ে দেওয়াল
পত্রিকাও থাকবে।

বিদ্যালয় পত্রিকা

সাহিত্য সভার আয়োজন হলে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ কবিতা,
গল্প পাঠ করে শোনাবার সুযোগ পাবে। স্কুলের সাহিত্য
সভায় বাইরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে আনা যায়।
তাদের কাছ থেকে ছাত্রেরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে।

সাহিত্য সভা

(২) শারীরিক কাজকর্ম (Physical Activities) :—কিশোর বয়সে
দৈহিক গঠনে খেলাধূলার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ১১।১২ বছর বয়সে যখন
ছাত্রদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় তখন
তাদের উৎসাহ ও শক্তিকে খেলাধূলার পথে পরিচালিত করলে কিশোর বাহিনী
বিপথে যাবার পথ থেকে রক্ষা পেতে পারে। খেলাধূলা
ছাত্রেরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে—এতে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায়
অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহজ মিলন ক্ষেত্র
খেলার মাঠ। খেলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের দলগত মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সঙ্ঘবদ্ধ
ভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা জন্মায়।
সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে দলনেতার নির্দেশ মানবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে
পারে। ছাত্রেরা খেলার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ও অর্থ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়।
সর্বোপরি সঙ্ঘ চেতনা (espirit de corps) গড়ে ওঠে।

খেলাধূলায় ছাত্রদের আগ্রহ বেশী

খেলায় শুধু দৈহিক উৎকর্ষ সাধন হয় না, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শারীরিব মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক সব রকম শিক্ষাই হতে পারে। একজন খেলোয়া বা এ্যাথলেট চিন্তা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সর্বদা সতর্ক থাকা নানারূপ কৌশ আয়ত্ব করা, কিছু সময়ের জন্য একটি মাত্র বিষয়ে সমগ্র ম নিবদ্ধ রাখার শক্তি অর্জন করা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হ হবে। এ সবের মধ্য দিয়ে মানসিক শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ ঘটে। দৈহিক মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন পরোক্ষে চরিত্র ও গঠিত হয়। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বা বেড়ে যায়, স্বাধীন ভাবে যে কোন কাজে এগিয়ে যেতে সে আর দ্বিধা বো করে না।

খেলাধূলার উপযোগিতা

খেলাধূলার বহুবিধ ব্যবস্থা স্কুল থেকে করা সম্ভব। ফুটবল প্রায় আমাদে জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে ফুটবল খেলা খুব ব্যয় সাধ্য নয়—অনেক ছেলে এব সাথে খেলতে পারে। অল্প ব্যয়ে ও অল্প জায়গায় খেলা মধ্যে ভলি বল খেলা। এই খেলায়ও ছাত্রেরা যথেষ্ট উৎসা বোধ করে। ব্যয় সাধ্য খেলার মধ্যে হকি, ক্রিকেট, ব্যাড মিণ্টান ও বহু স্কুলে খেলার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশীয় খেলায় কোন র খরচ নেই—গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে দেশীয় খেলায় উৎসাহ দেখা যায়। স্কুল থেকে দেশীয় খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন (atheletics) ব্যবস্থ করতে হবে। বহির্বিদ্যালয় খেলাধূলার (outdoor game) ব্যবস্থা ছাড়া ক্যারম, টেবি টেনিস প্রভৃতি অন্তর্বিদ্যালয় খেলার (indoor games) ব্যবস্থা ও স্কুলে করা যায় এ ছাড়া স্কুল থেকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলে ছাত্রেরা আনন্দে সাথে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। Drill ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে।

বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যবস্থা।

(৩) সমাজসেবামূলক কাজকর্ম (Community Activities) :— শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে সমাজ সেবা মূলক কাজ কর্ম থাকবে বিদ্যালয় সমাজেরই অঙ্গ। শিক্ষার্থীরা আসে সমাজ থেকেই। সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমাদের দেশের সমাজ যে অবস্থায় আছে তাতে সে সকলেরই দয়াদাক্ষিণ কামনা করে। শরৎ চন্দ্রের "পল্লী সমাজ"-এ এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা আছে রাস্তাঘাট ও পুকুর ইত্যাদি পরিষ্কার, মড়কের সময় সেবা, গৃহদাহে ত্রাণমূলব কাজকর্ম, দরিদ্র সেবা, রোগীর সুশ্রূষা ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে করবে তাতে তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে যাবে।

সেবামূলক কাজ।

(৪) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম (Cultural Activities) :— ছাত্রদে আনন্দ বিধানের জন্য মাঝে মাঝে গান, হাস্য কৌতুক কি নাটক অভিনয়ের

আয়োজন করা যেতে পারে। স্কুল প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, রবীন্দ্র উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছাত্রদের উপযোগী কবিগুরুর যে সব নাটক আছে তার অভিনয় হতে পারে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবেও নাটক, গান ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে ছাত্রেরা আনন্দের সাথে এতে অংশ গ্রহণ করবে। এ কাজের ভার ছাত্রদের উপর ছেড়ে দিলে স্টেজ বাঁধা থেকে সব রকম কাজ তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করবে। সৃষ্টি ধর্মী কিশোর মনের খোরাক যোগাতে এসব কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। অভিনয় সম্পর্কে ছাত্রদের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। একে শিক্ষার কাজে লাগান যেতে পারে। ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু নিয়ে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হলে বিষয়বস্তু তাদের কাছে সজীব হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণী অভিনয় পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া চলে। যেখানে দু'তিন জনের কথা বার্তার মধ্য দিয়ে কোন ঘটনার কথা বিবৃত করা হয়েছে সেখানে শিক্ষক অভিনয় পদ্ধতির সাহায্যে পড়াতে পারেন।

অভিনয়, উৎসব ও গানবাজনা।

কিশোর বয়সে মানসিক বিপর্যয়ের ফলে বয়স সন্ধিক্ষণেই কিশোর মনে স্বাভাবিক যৌনচেতনার সূত্রপাত হয়। খেলা ধূলা, সাহিত্য চর্চা ও অভিনয় ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার্থীর মন নানা ভাবে নিয়োজিত থাকায় তারা এসব সৃজনী ধর্মী কাজে নিজেদের প্রকাশের সুযোগ পায়। আনন্দময় পরিবেশে গঠনমূলক কাজে ও নতুন সৃষ্টির আনন্দে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহ তৃপ্তি হয় ও সমাজের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হয়।

শিক্ষার্থীদের যৌন অনুভূতির অবদমন।

শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকবে, মডেল ইত্যাদি তৈরী করবে। ফলে তাদের সৌন্দর্যানুভূতি বাড়বে। শিল্প চেতনা বৃদ্ধি হবে।

(৫) পৌরশিক্ষণ কার্যাবলী (Civic Training Activities) :— বিদ্যালয়ে এমন সব কার্যাবলী অনুসরণ করতে হবে যাতে পৌরশিক্ষণ সম্ভবপর হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে (Educational Excursion) যাবে। সেখানে গিয়ে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবে।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ।

শিক্ষার্থীরা সমবায়ের ভিত্তিতে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাতা, কাগজ পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে সমবায় বিপনি স্টল করতে পারে। স্কুলের পূর্বে ও টিফিনের সময় ছাত্রেরা এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করে। ক্রেতা, বিক্রেতা হিসেব রক্ষক ছাত্রদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত করা হয়। যদি সম্ভব হয় দোকানে কোন বিক্রেতা রাখা হবে না। জিনিসের পাশে দাম লিখে রাখা হবে, ছাত্রেরা দাম দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করবে। সমবায় বিপনি পরিচালনার মধ্য দিয়ে সমবায়

বিদ্যালয় সমবায় সমিতি।

সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও গঠন সম্পর্কে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করবে। বিে
হীন দোকানে জিনিস কিনবার মধ্য দিয়ে তারা সততার শিক্ষা পাবে।

(৬) **Hobbies** :—শিক্ষার্থীদের সংপাঠক্রমিক কাজ কর্মের মধ্যে f
Hobby-কে স্থান দিতে হবে। Photography, Penfriendship, St
collections, Coin collecting, Gardening, Wood work, Clay w
leather work ইত্যাদি কাজকর্ম শিক্ষার্থীরা করে শিক্ষাকার্যে সক্রিয় ভূ
গ্রহণ করবে, জীবনের অভিজ্ঞতা নিজেই অর্জন করবে।

(৭) **সামাজিক কার্যাবলী (Social works)** :—শিক্ষার্থীরা সহপাঠক্র
কার্যাবলীর মধ্যে সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে। মেলা-পার্বণে শিক্ষা
সেবামূলক কাজকর্ম করবে। তাছাড়া Junior Red cross, Social Edu
tion, Labour Squads ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে। জু
রেডক্রস সমিতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানারূপ সেবামূলক কাজকর্মে অংশ
করবে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন প্রচার করলে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। অসুস্থ ও দুস্থ জনের সেবা একটি মহৎ কাজ।
কাজের মধ্য দিয়ে জন সেবার মহৎ আদর্শ ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করা য
বিদ্যালয়ে Book Bank স্থাপন ও দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করে দে
দানের ভিত্তিতে একটা তহবিল সৃষ্টি করে গরীব ছাত্রদের বই দিয়ে পড়াশু
সাহায্য করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের উ
ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে সংগঠন মূলক কাজ সম্পর্কে তাদের অভি
হবে ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জিত হবে।

(৮) **বহুমুখী কার্যাবলী (Multipurpose Activities)** : শিক্ষা
Boys Scout, Girls guide, N. C. C., A C. C. শ্রমদান, অঞ্চল পরি
ইত্যাদি কাজকর্মে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হ
এ ব্যাপারে শিক্ষা সংস্কার করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠক্র
কার্যাবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারী আর্থিক অনুদান বাড়
হবে। শিক্ষকদের এ ব্যাপারে উৎসাহী ভূমিকা নিতে হবে। সহপাঠক্র
কার্যাবলীর সার্থক রূপায়ণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে এবং বিদ্যাল
সমাজ জীবন মুখরিত হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

(1) Why is so much stress laid on Co-Curricular activities now a days? Who would organise Co-Curricular activities in a Secondary School? Give reasons for your answer.

(C. U., B. T.—1967)

(2) What principles should guide you in the planning of extra curricular activities in your School? How do they influence the realisation of the major objectives of education.

(North Bengal University, B, T—1967)

(3) How does proper organisation of co-curricular activities in the school help the education of character.

(C. U., B, Ed.—1971)

(4) What is the place of co-curricular activities in education? How do they help in the Training of character? Out line plans for the organisation of two co-curricular activities that you consider most useful. (N. B. U. B T.—1969)

(5) Extra curricular activities that are now regarded as an intergral part of education.—discuss. Describe at least five such activities that can effectively be introduced in secondary schools of West Bengal. (C. U., B. T.—1966)

(6) Extra curricular activities are now more popularly regarded as "co-curricular"—Why? Describe the organisation of any one important co-curricular activity and Examine its Educational benefits. (C. U., B, Ed.—1969)

(7) Write notes on—

(a) co-curricular Activities (C. U B. Ed.—1970)

অষ্টম অধ্যায়

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসন
(SCHOOL SELF GOVERNMENT)

শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী· শিক্ষাগ্রহণ করতে। বিদ্যালয় পরিশাসনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য ও পরিচালক সমিতির। বিদ্যালয় পরিশাসনে ছাত্রদের ব্যবহারের কথা · বেশী করে চিন্তা করা হয় নাই। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের স শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তনও হয়েছে। পৃথিবীর ৩০০ মানুষের মধ্যে ১০০ কোটি মানুষ এখনই সমাজতান্ত্রি (Socialistic State) বসবাস করে; ২০০ কোটি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। গণতন্ত্র (Demc

গণতান্ত্রিক সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারা ও বিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন

সম্বন্ধে মোহমুক্তি এখনও ঘটে নাই, এখনও অনেকে গণতন্ত্রের কথা বলেন, · কথা ভাবেন, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার উপর। তাই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের কথা চিন্তা করা কোথাও কোথাও স্বায়ত্বশাসন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। ছাত্র-বি যে চরম রূপ এখন আমরা প্রত্যক্ষ করি তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার · অনেকখানি সমাধান করতে পারবে বলে অনেকে মনে করে। বিদ্যালয়ের কাজ কর্মে তাই শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অনেকে পরিচালক সমিতিতে বা ছাত্র প্রতিনিধিত্বের (Student's Represent কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হলে তারা কম বয়স তা বহন করতে অভ্যস্থ হবে, ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সমাজজীবন সমৃদ্ধ হবে।

বিদ্যালয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি-ক্ষেত্র ;—শিক্ষার্থীরা পরবর্তী যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবে, সমাজের সভ্য রূপে তাকে যে সব কর্তব্য স করতে হবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে তার জন্য প্রস্তুত হবে। শিক্ষা মানেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। জীবনের যাত্র নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নি গড়ে তুলবে, স্কুলে এসে শিক্ষকের নিকট পাঠ আর পড়া মুখস্থ বলাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; আ

শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলাই বিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনের মূল লক্ষ্য

শিশু ভবিষ্যৎ নাগরিক। প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা শিশুদের রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা। সক্রিয়ভাবে তারা যাতে ·

রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শিক্ষাকেও গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক সমাজে ছাত্রেরা বিদ্যালয় পরিচালনায় যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য স্কুলে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হতে পারে।

বিদ্যালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি

(School is the Miniature of the Society)

শিক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে

শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে যে সমাজের নাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেই সমাজের রূপটি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সে যাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই লাভ করে সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামনে এমন সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে যার মধ্য দিয়ে তারা এমন অভিজ্ঞতা লাভ করবে যাতে ভবিষ্যতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তাকে বিব্রত হতে না হয়। ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর শিক্ষা যদি বিদ্যালয় থেকে পাওয়া না যায় তাহলে বিদ্যালয়ে যাবার কোন সার্থকতাই থাকে না। অধ্যাপক **ফ্রাঙ্ক্‌লিন জোন্‌স্‌** বলেছেন :—"*The school is fundamentally an experience giving institution, and it it cannot give more vital exprience that the child can get anywhere else, in the world, it has no valid claim upon his thime.*"

বিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসন শিক্ষার্থীদের শৃংখলা-বোধ শিক্ষা দেবে

আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী। **গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী রূপে গড়ে তোলবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন শিশুদের শিক্ষার মধ্যে সে আয়োজন রাখতে হবে।** বিদ্যালয়ের কার্যাবলী এমন ভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে বিদ্যালয় একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ব্যবস্থা সে স্কুলের বই-পড়ার সাথে স্কুল পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে জানবে। **সে নিজেই আদর্শ গণতান্ত্রিক স্কুল-রাষ্ট্রের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে। কাজের মধ্য দিয়ে তার শৃংখলাবোধ জন্মাবে।** সে বুঝতে শিখবে জীবনে শৃংখলার কি প্রয়োজন। বাইরের থেকে চাপিয়ে শৃংখলার বোঝাকে শিশুরা নিপীড়ন বলে মনে করে। কিন্তু, **কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়ে যখন তাদের মনে শৃংখলা বোধ জন্মাবে,** বুঝতে পারবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃংখলার কি **প্রয়োজন,** তখন তারা স্বেচ্ছায় শৃংখলাকে মেনে নেবে। **অনেক তত্ত্ব কথা শুনিয়ে ও বহু উপদেশ ও নিপীড়নে** যে ফল পাওয়া যায় নি **প্রাত্যহিক জীবনের**

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা জীবন গঠনে ও সুষ্ঠু কর্ম-সম্পাদানে শৃংখলার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হবে। **স্বয়ং শাসিত স্কুল সমাজের নানা কাজে অংশ গ্রহণ ও সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে ও দায়িত্ব বোধ জন্মাবে।** সমাজ জীবনে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আমরা বাস করি। শিক্ষার একটা কাজ হচ্ছে শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলা। **সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মিলে মিশে কাজ করার ফলে তাদের সামাজিক বোধ জন্মায়, দলগত মনোভাব গড়ে উঠবে, সমাজে বাস করার পক্ষে সহনশীলতা, পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করবে।**

বিদ্যালয়ের প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিহাস (History of the Students Active Participation in School Administration)

বিদ্যালয় প্রশাসনের ইতিহাসে তিনটি প্রধান স্তর লক্ষ্য করা যায় :—

(১) **প্রধান শিক্ষকের স্বৈরাচার** :—বিদ্যালয় প্রশাসন ইতিহাসের প্রথম স্থান এর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল প্রধান শিক্ষকের হাতে। তিনি শাস্তি, প্রীতি ও পুরস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষা করতেন এবং বিদ্যালয় প্রশাসন করতেন।

(২) **প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের অভিজাততন্ত্র** :—পরবর্তী কালে প্রধান শিক্ষকের একক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। তার সঙ্গে যোগ দেয় অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকারী শিক্ষকবৃন্দ একই কায়দায় বিদ্যালয় প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করেন।

ইতিহাসের তিনটি স্তর

(৩) **শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা** :—রুশো প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন ও বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।

শিক্ষা ইতিহাসের পাতায় বিদ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের ভূমিকা প্রধান হলেও ভারতের শিক্ষা ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের চিত্র কিছুটা ভিন্নরূপ। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধযুগে, এমন কি মধ্যযুগেও বিদ্যালয় পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব ভালো ছাত্রদের উপর দেওয়া হ'ত।

মনিটর প্রথা (Monitorial System)ঃ—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে Dr. Andrew Bell দক্ষিণ ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে এই প্রথা লক্ষ্য করেন। এই পদ্ধতি 'সর্দার পড়ো' বলে পরিচিত। এই 'সর্দার পড়ো' শিক্ষক দ্বারা নিযুক্ত হ'ত, তারা দুষ্ট ছেলের নাম খাতায় তুলে রাখতো। Home task সংগ্রহ করতো, অন্যান্য ছাত্রদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিত, Black Board মুছে রাখতো, চক-ডাস্টার-মানচিত্র এনে রাখতো। শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখতো, বেঞ্চ-চেয়ার-টেবিল ঠিক মত সাজিয়ে রাখতো। পরবর্তীকালে তারা নীচু শ্রেণীতে কিছু কিছু পড়ানোর দায়িত্বও নিতো। এইভাবে তারা বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষাকর্মে অংশ গ্রহণ করতো।

সর্দার পড়োর দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রিফেক্ট প্রথা (Prefect System)ঃ—মনিটর বা 'সর্দার পড়ো' প্রথা ইংলণ্ডে অন্যভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল, **Dr. Thomas Arnold** রাগবির Public School-এ উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথাকেই প্রিফেক্ট প্রথা (Prefect System) নামে প্রচলিত করেন। তিনি উঁচু শ্রেণীগুলি থেকে ভাল ও যোগ্য ছাত্র বেছে নিয়ে তাদের উপর বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মনিটর প্রথা ও প্রিফেক্ট প্রথার অনেক ত্রুটি আছে। মনিটর বা প্রিফেক্ট প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন শিক্ষক দ্বারা মনোনীত, ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত নয়। শিক্ষকদের অনুগ্রহ ভাজন ঐ ছাত্রটির বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে। মনিটর বা প্রিফেক্ট শিক্ষকদের নির্দেশ পালন করে মাত্র। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা বা অধিকার নাই। মনিটর বা প্রিফেক্ট প্রথা তাই প্রধান শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষকদের পরোক্ষ শাসন, শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন নয়।

Dr. Thomas arnold

মনিটর ও প্রিফেক্ট প্রথার ত্রুটি

শিক্ষকের ভূমিকা

(Teacher's Role)

বিদ্যালয় সমাজে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করতে হলে ছাত্রদের নানা সমস্যা এসে ভীড় জমাবে, চলার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। শিক্ষক এখানে উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করবেন। নানাকাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে ছাত্রদের পরামর্শ দিয়ে উপদেশ দিয়ে ও উৎসাহ দিয়ে তিনি সাহায্য করবেন। প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি ছাত্রদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ছাত্ররা যেন মনে করার সুযোগ না পায় তাদের হাতে সত্যিকারের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তাদের সামনে রেখে শিক্ষকগণই কাজ চালাচ্ছে

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব

একথা ভাববার সুযোগ যেন তারা না পায়। কিন্তু শিক্ষকের সদা সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যাতে ছাত্ররা অপব্যবহার না করে। ছাত্রদের হাতে ক্ষমতা দিলে, দায়িত্ব চাপালে কর্তব্য সম্পাদনে প্রথম অবস্থায় অনেক ভ্রান্তি হতে পারে। প্রাথমিক ভুল ভ্রান্তিতে হতাশ হলে চলবে না। তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ঠিক পথে চালাবার দায়িত্ব শিক্ষক গ্রহণ করবেন।

ছাত্রদের দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে গড়ে তোলবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা রূপে ভারতে স্কুল স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাব প্রথম প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ। নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত শিক্ষা বিদ্যালয় জীবনের মধ্য দিয়েই শুরু হবে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ১৯০৫ খ্রীঃ স্কুল স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন।

রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তুতি (Preparation) :—স্কুলে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে প্রধান শিক্ষক এ বিষয় নিয়ে সহকারী শিক্ষকদের সাথে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ও কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন। সহকারী শিক্ষকদের সহযোগিতা ভিন্ন এ ব্যবস্থার সাফল্য সম্ভব নয়। শিক্ষকদের মনে এ বিষয়ে দ্বিধা থাকতে পারে, সংশয় থাকতে পারে, ছাত্রদের হাতে শৃংখলার দায়িত্ব দিলে তা তারা যথার্থরূপে পালন করতে পারবে কি না। তারপর তাঁরা মনে করতে পারেন এতে তাঁদের অধিকার সংকোচিত হবে, তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। ছাত্রদের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে, মর্যাদা কি অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকগণ প্রথম অবস্থায় উপদেষ্টা-রূপে থাকবেন। ছাত্রেরা ভুল করলে শিক্ষকগণ তা সংশোধন করবেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না, এ অবস্থার সৃষ্টি হলে তার প্রতিকারের ক্ষমতা শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সব সময়েই থাকবে। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ হলে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে স্কুল স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা অতি সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন হবে।

প্রথমে স্বায়ত্ব শাসন সংক্রান্ত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে

স্কুলে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে ছাত্রদের এ বিষয়টি সম্পর্কে ভাল করে বোঝাতে হবে। মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে তারা প্রথম থেকেই ভুল করতে পারে। ক্ষমতার সাথে তাদের যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। একে কার্যকরী রূপ দেবার পূর্বে পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি ও নিয়ম-কানুন পূর্বেই প্রস্তুত করে নিতে হবে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসনের বিভিন্ন রূপ
(Different Types of Student's Self-Government in the School)

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের বিভিন্ন রূপ আছে। সেগুলি হ'ল,—

॥১॥ মনিটর ও প্রিফেক্ট প্রথার সংস্কার সাধন (Reformation of the Monitorial and Prefect System) :—পুরাতন মনিটর ও প্রিফেক্ট প্রথাকে বর্তমানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কার সাধন করা যেতে পারে এবং তাকে বিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনের কাজে লাগানো যেতে পারে। মনিটর বা প্রিফেক্ট ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। এবং তাদের নেতৃত্বে একটি নির্বাচিত কমিটি শ্রেণী পরিচালনা করতে পারে।

নির্বাচনের মাধ্যমে

॥২॥ 'হাউস' প্রথা (House system) :—এই প্রথা বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব-শাসনের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। ইংলণ্ডে এই প্রথার প্রচলন খুব বেশী। এই প্রথাতে প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে ৪।৫টি 'হাউসে' (House) ভাগ করা হয়। সাধারণতঃ মনীষীদের নামে তাদের নাম করণ করা হয় (যেমন—রামমোহন হাউস, বিদ্যাসাগর হাউস, শিবাজী হাউস, তিলক হাউস ইত্যাদি। ফলে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রেরা ৩।৪টি House-এ বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি হাউসে সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সমসংখ্যায় থাকে। প্রতিটি 'হাউস' পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (নির্বাচিত) থাকে। প্রতি 'হাউসে' এক একজন House Leader থাকে। প্রতিটি হাউস বিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খেলাধূলা, বিদ্যালয় পত্রিকা, বিতর্ক সভা, অভিনয়, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে। বিভিন্ন হাউসের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। Health competition-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী বিকশিত হয়।

প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্র-বৃন্দ কয়েকটি হাউসে বিভক্ত হবেন

॥৩॥ পথিকৃত প্রথা (Pioneer system) :—শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী কয়েকজনকে নির্বাচিত করে তাদের উপর বিভিন্ন বিষয় তদারকীর ভার দেওয়া হয়। ২।৩ জন ভাল ছাত্র নীচের শ্রেণীগুলিতে শিক্ষাদান করবে। ২।৩ জন সংগীত-নাটক অভিজ্ঞ ছাত্র বিদ্যালয়ের উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে। ২।৩ জন নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধি বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখাশুনা করবে। ২।৩ জন ছাত্র প্রতিনিধি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির হিসেব রাখবে। তাদের নিয়ে একটি কমিটি হবে। এই কমিটি পরিকল্পনা করে বিভিন্ন প্রশাসনমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করবে। সোভিয়েট রাশিয়াতে এ ধরনের প্রথা আছে।

বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে স্বায়ত্ব শাসন

॥৪॥ **ছাত্র সংসদ (Students' Union) :**—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ছাত্র সংসদ গঠিত হবে। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এর সভাপতি হলেও অন্যান্য সকলেই ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে। একজন হবে সাধারণ সম্পাদক (General Secretary)। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন উপসমিতি থাকবে; যেমন,—সাহিত্য সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, সংস্কৃতি সমিতি, সমাজসেবা সমিতি, পত্রিকা সমিতি। দরিদ্রসেবা সমিতি ইত্যাদি। প্রতিটি উপসমিতির এক-একজন সম্পাদক থাকবে। ছাত্রসংসদের একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন হিসেব পরীক্ষকও থাকবে। এই সমিতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজকর্ম করবে। এবং বিভিন্ন কাজ-কর্মের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত ছাত্র সংসদ

॥৫॥ **শ্রেণী সমিতি (Class Committee) :** শ্রেণী সমিতির সদস্যদের শ্রেণীর ছাত্রেরা নির্বাচন করবে। এ নিবাচন সারা বছরের জন্য হতে পারে বা বছরে দু'বার হতে পারে। নির্বাচিত সদস্যেরা একজন সভাপতি নির্বাচিত করবেন। শ্রেণী শিক্ষক উপদেষ্টারূপে থাকবেন। শ্রেণী সমিতি শ্রেণী শৃংখলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রয়োজন হলে শৃংখলা ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান করবে। গুরুতর অপরাধ যেখানে দৈহিক শাস্তির প্রশ্ন জড়িত তা প্রধান শিক্ষককে জানাতে হবে। শ্রেণী সমিতি থেকে কোন শাস্তির সুপারিশ করা হলে তাদের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হবে কি না তা প্রধান শিক্ষক স্থির করবেন। বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে ছাত্র সমিতির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা উচিত নয়। ঘন ঘন ছাত্রদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা মনে করবে তাদের সত্যিকারের কোন ক্ষমতা নেই। শ্রেণী শৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও শ্রেণীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তারা দৃষ্টি রাখবে, শ্রেণীকক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকেও তারা দৃষ্টি রাখবে। শ্রেণী থেকে হাতের লেখা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ ব্যবস্থা ও শ্রেণী গ্রন্থাগার থাকলে সমিতি তার পরিচালনা করবে। শ্রেণীর খেলাধূলার ব্যবস্থাও সমিতি করবে।

শ্রেণী পরিচালনা

॥৬॥ **সংসদীয় পদ্ধতি (Council Type) :**—এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধিদের হাতে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসনের ভার তুলে দেওয়া হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের মত এতে একজন প্রধান মন্ত্রী, বিভিন্ন সমিতির মন্ত্রী ইত্যাদি থাকে। এদের কার্য ধারা নিয়ে কার্যকরী সমিতিতে পারিষদীয় পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিতর্ক করা হয়। কোথাও কোথাও **Sinior Student** প্রথাও প্রচলিত আছে। সেক্ষেত্রে সব থেকে যার বয়স বেশী তার অভিজ্ঞতাও বেশী,—একথা ধরে নিয়ে তাকে স্বায়ত্বশাসনের মূল নেতৃত্ব দেওয়া হয়।

পারিষদীয় গণতন্ত্র

৩। **কার্যকরী সমিতি (Executive Committee):** প্রতি শ্রেণী থেকে কয়েকজন করে সভ্য নিয়ে সমগ্র স্কুলের জন্য কার্যকরী সমিতি গঠিত হবে। সমিতির একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকবে। এদের সমিতি সভ্যরা নির্বাচিত করতে পারে। কিন্তু সমগ্র স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হলে ব্যবস্থাটি অধিক গণতন্ত্র সম্মত হবে। বিদ্যালয়ের সাধারণ শৃংখলা ছাড়া এই সমিতি খেলাধূলা পরিচালনা, স্কুল পত্রিকা, গ্রন্থাগার, সমবায় বিপনী প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। স্কুলে নাট্যানুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এরাই করবে। বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপ-সমিতি থাকবে। যার যেরূপ প্রবণতা ও যে যেই দিকে পারদর্শী তাকে সেই উপ-সমিতির সভ্য করা হবে। প্রধান শিক্ষক প্রধান উপদেষ্টারূপে থাকবেন। বিভিন্ন উপ-সমিতেতে শিক্ষক উপদেষ্টা থাকবেন। গুরুতর বিষয় ছাড়া তাঁরা ছাত্রদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ভুল ভ্রান্তির সংশোধনের দায়িত্ব শিক্ষকগণের। তাই বিভিন্ন উপসমিতি কিভাবে কাজ করছে তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

কার্যকরী সমিতি নির্বাচনের মাধ্যমে হবে

বিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে অনভিজ্ঞতার জন্য ছেলেমেয়েরা ভুল করবে। তবুও তাদের সুযোগ দিলে তারা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করবে। ছাত্রছাত্রীদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে দায়িত্ব দিলে তারা শৃংখলা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে। শিক্ষা পাবে যে, কি করে একটা সংগঠন গড়ে তুলতে হয়;—তাকে পরিচালনা করতে হয়। এই কার্যকরী ও সৃষ্টিধর্মী শিক্ষার মধ্য দিয়েই তারা দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ সুনাগরিক হয়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীদের ভুল বন্ধু ভাবে সংশোধন করে দিতে হবে

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসনের গুরুত্ব

(Importance of the School Self-Government):

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে;—

(১) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন তাদের মধ্যে শৃংখলা সৃষ্টি করে। ফলে ছাত্র-শৃংখলা কমে যায়। শিক্ষার্থীরা মনে করে যে, বিদ্যালয় তাদেরই। কাজেই সে ক্ষেত্রে শৃংখলা ভঙ্গ করার কোন যুক্তি থাকবে না। বিদ্যালয়ের উপর ছাত্রদের অধিকার তাদের সুশৃংখল করে।

ছাত্র শৃংখলা

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় হয়। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ হয়। যৌথ মনোভাব, দলীয় অনুভূতি, গোষ্ঠী চেতনা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গীগুলি গড়ে উঠে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হয়। মধুর ব্যবহার, শিষ্টাচার, অপরের প্রতি অনুভূতি প্রভৃতি সৃষ্ট হয়; এবং ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসামাজিক চিন্তাধারা গুলি বিদূরিত হয়।/

গণতান্ত্রিক চেতনা, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ

(৩) শিশু মনস্তত্ত্বের বিচারে স্বায়ত্বশাসন বিদ্যালয়ে কাম্য। পূর্বতন পদ্ধতিতে তাদের উপর যে সব শাস্তি, কর্ম ও চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া হ'ত তা থেকে তারা মুক্তি পায়। তাদের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ গুলি স্বাভাবিক ভাবে সামাজিক পথে পরিচালিত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

শিশু মনস্তত্ত্ব

(৪) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীরা তার মধ্য দিয়ে জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও পরিচালনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বহু কাজে আসে।

জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন

(৫) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের সঙ্গে সহপাঠক্রম ও জীবনের অভিজ্ঞতার মিলন হয়। স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।

পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনের যোগ

(৬) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতকগুলি গুণ অর্জন করে। সেগুলি হ'ল,—দায়িত্ব জ্ঞান, কর্তব্য নিষ্ঠা, বন্ধু প্রীতি, সংযম, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, নেতৃত্ব, আচরণ, ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, দলপ্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা, বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি।

বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনে কতকগুলি বাধা-বিপত্তি আছে। প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য সহকারী শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে এত ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী থাকেন না। তাতে তাঁদের মর্যাদার হানি হয় বলে তাঁরা মনে করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি ও অভিভাবকেরাও তার জন্য প্রস্তুত নয়। নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ নাও হতে পারে। তাদের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা নাও থাকতে পারে। অনেক সময় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা ছাত্র স্বার্থ ও বিদ্যালয়ের স্বার্থের পরীপন্থী। স্বায়ত্বশাসনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তা প্রবর্তন করা হচ্ছে ছাত্র প্রতিনিধিরা তা নস্যাৎ করে দিতে পারে।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসনের কি বাধা বিপত্তি

এত বাধা বিপত্তি ও অসুবিধা সত্বেও আধুনিক শিক্ষাতত্বে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসনকে মেনে নেওয়া হয়েছে। সুসংগঠিত ও পরিকল্পনাপূর্ণ স্বায়ত্বশাসনে ভুল ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের একটা সীমারেখা (Limitations) থাকবে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি রোধের জন্য প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে বিশেষ ক্ষমতা (veto power) দিতে হবে। দলীয় রাজনীতিকে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব-শাসন থেকে দূরে রাখতে হবে। যথাযথ ভাবে, সুপরিকল্পিত উপায়ে ও যথেষ্ট স্বাধীনতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করলে তা থেকে শিক্ষার্থীরা বহুল পরিমাণে উপকৃত হবে।

ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের সীমারেখা

প্রশ্নাবলী

1. Explain what is meant by 'Self Government in School', What step would you take to introduce and popularise it in your school ? (C. U., B. T.—1957, 1961)
2. Discuss the differert forms of self-government that can be worked in our schools and their influence upon thh healthy tone and discipline on the school. (K. U., B T.—1968)
3. Discuss fully the value of self-government in schools as an aid to Civic Training. (C. U., B. T.—1963)
4. Discuss the imporantance ef school self-government in schools as on aid to social education of the child. How and to what extent will you introduce it in your school ? (C. U., B. T.—1970)
5. Discuss the importance of School Government as an aid to the emotional and social education of the child. (C. U., B. T.—1965)
6. Write notes on ;—

   (a) School government as practical training in democratic works of life, (C. U., B. T.—1966)

শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান

(Significance of Methodology)

শিক্ষা ঃ—

বহুল পরিচিত এই ছোট কথাটি বোধ হয় সভ্যসমাজের সর্বাধিক ব্যবহৃত কথা। কিন্তু শিক্ষা শব্দটির সাথে আমরা যত পরিচিত ঠিক ততখানি অপরিচিত এর স্বরূপ ও তাৎপর্যের সাথে। অতি পরিচিতির ফলেই হয়ত আমরা বিরাট অর্থগর্ভ এই কথাটির তাৎপর্যকে বোঝবার চেষ্টা করি না। শিক্ষা কি, কবে কোন বিস্মৃত যুগে শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয়েছিল, কি করে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বর্তমান রূপ পেয়েছে সে এক জটিল প্রশ্ন। শিক্ষার ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন। আদিম মানুষ যেদিন সভ্যতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে সেদিন থেকেই শিক্ষার ইতিহাস শুরু।

সেই আদিপর্বে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আদিম মানুষ হিংস্র প্রকৃতির মাঝে ছিল একান্ত অসহায়। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। আদিম বন্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে—সমাজবদ্ধ হয়েছে, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবন-যাত্রাকে সরল করে তোলবার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা, এই যে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য পদক্ষেপ, এর মধ্যে মানুষ নিত্য নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে—এর মধ্য দিয়েই নিয়ত শিক্ষা লাভ করেছে। সে শিক্ষা হচ্ছে জীবন-যুদ্ধে বেঁচে থাকবার উপায় উদ্ভাবনের শিক্ষা। বন্য-প্রকৃতির মাঝে বাঁচবার প্রয়োজনে তাকে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় বন্য ফল কুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে—দেখেছে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। ভালকে গ্রহণ করেছে, মন্দকে বাতিল করে দিয়েছে। শিকারে গিয়ে লক্ষ্য করেছে তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডের উপযোগিতা সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা বেশী। এমনি ভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছে গোষ্ঠীভুক্ত উত্তর-পুরুষের জন্য। যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছ থেকে অনভিজ্ঞেরা নতুনের সন্ধান লাভ করেছে।

শিক্ষার ইতিহাস সভ্যতার সমকালীন

কর্মে, চিন্তায়, অনুভূতিতে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে অনাগত মানব-সমাজের জন্য। এই যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতার জয়যাত্রায় মানুষের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে নতুন দিগন্তে। তাই দেখি আদিম মানুষ শিক্ষার স্বরূপকে না জেনেই শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে।

মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ-ব্যবস্থা, আর তারই সাথে সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে বিকাশ লাভ করে শিক্ষা। বাইরের থেকে শিক্ষা নামক বস্তুটিকে সমাজের বুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের মধ্য থেকেই শিক্ষা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে একটা সুসংবদ্ধ রূপ নিয়েছে।

মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনেই শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বা নতুন কিছু উদ্ভাবনের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সজ্ঞান মনের স্বকৃত চেষ্টা ছিল না। কাজ করতে গিয়ে আকস্মিক ভাবে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সজ্ঞান চেষ্টায় মানুষ যা লাভ করেছে তাই তার বুদ্ধিতে বিধৃত হয়েছে। একজনের অভিজ্ঞতালব্ধ নতুন জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে।

মানব-শিশুর জীবনের দিকে তাকালেও দেখতে পাই শিক্ষা কি, না-জেনেই তার কাজের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভ করছে। সমাজের ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষা কি, তার স্বরূপ কি ইত্যাদি জেনে শিক্ষা শুরু হয় নি। এ সম্পর্কে ডিউই বলেছেন, "The process begins unconsciously at birth, and is continually shaping the individual power, saturating his conscience, forming his habits, training his ideas and arousing his feelings and emotions. Through this unconscious education the individual gradually comes to share in the intellectual and moral resources which humanity has succeeded in getting together. He becomes an inheritor of the funded capital of civilisation.

জন্মক্ষণ থেকেই শিক্ষার সুরু

মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রথম শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিল। তারপর সামাজিক চেতনা প্রবল হয়ে উঠবার সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপর্বের সূচনা হয়। জীবনের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় দেখা গেল মাত্র পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতাই সুষ্ঠু জীবনকে গড়ে তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। জীবন শুধু অতীত ও বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার দৃষ্টি প্রসারিত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে গড়ে

পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি

তুলতে হবে শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিক্ষা শুধু পুরাতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে বলতে পারি শিক্ষাই জীবন—জীবনই শিক্ষা।

শিক্ষা পদ্ধতি (Teaching Methods) ঃ—

অতি প্রাচীনকালেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে কি ভাবে গড়ে তোলা যায় সমাজে সে চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু যুগের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মিশ্র ইতিহাস জড়িত রয়েছে এর পিছনে। প্রতিটি যুগের একটি নিজস্ব যুগ-বৈশিষ্ট্য আছে। পরিবর্তিত সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, বহু দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-কল্যাণীর চিন্তায় ও কর্মে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি আজ বর্তমান রূপ নিয়েছে।

আমাদের দেশেব বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে জানতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দার্শনিকদের শিক্ষাসম্পর্কীয় মতবাদ আমাদের আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত ও যে শিক্ষাদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে তা পাশ্চাত্য শিক্ষাদার্শনিক ও শিক্ষাবিদের চিন্তা ও সাধনায় গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ পুরোহিত-শাসিত সমাজে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা কি করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে, সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকে অনুসরণ করলেই আমরা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞানের (Methodology) স্বরূপকে জানতে পারব।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বহু সাধনার ফল

শিক্ষাবিদরা শিক্ষার নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য প্রভৃতি স্থির করবার পরেও একটা কথা থেকে যায়, তা হচ্ছে কি করে শিক্ষার নির্দেশিত লক্ষ্যে পৌছান যাবে, আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে—কোন পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। রুশো তাঁর শিক্ষার আদর্শকে কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান তা বোঝাবার জন্ত তাঁর মানসপুত্র 'এমিল'কে স্বষ্টি করেছেন। পেস্টালৎসী তার শিক্ষাদান প্রণালী বোঝাবার জন্ত লিখলেন 'How Gertrude teaches her son'। ফ্রয়বেল শিশু উদ্যানের (Kindergarten) স্বষ্টি করলেন। এমনি ভাবে মন্তেসরী পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, ডালটন পদ্ধতি প্রভৃতি বহু শিক্ষাপদ্ধতির স্বষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শেখাতে হলে কি করে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ স্বষ্টি করতে হবে, কিভাবে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করতে

শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাদর্শের বাস্তবরূপ

হবে—শিশুর কোন কোন বিশেষ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে ইপ্সিত ফল পাওয়া যাবে—এসব নিয়েই পদ্ধতিবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ শিক্ষাদানের কৌশল। শিক্ষা দেবার কাজ সফল করবার জন্য বহু প্রকার শিক্ষাপ্রণালী রয়েছে—যেমন আরোহী প্রণালী, অবরোহী প্রণালী, বক্তৃতা প্রণালী, কার্যাগার (laboratory) পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি, খেলা-ভিত্তিক পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্যক্তিগত শিক্ষা ও শ্রেণীগত শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই এর কোন একটি বা একই সাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কোন্ পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞান সেই পথই নির্দেশ করে।

শিক্ষাদার্শনিকগণ নিজ নিজ শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে কি করে সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব তার পথ নির্দেশ করতে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কি কি বিষয় শেখাতে হবে বলে দিলেই শিক্ষাবিদের কাজ শেষ হয় না। কি করে শেখাতে হবে, শেখাবার সময় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে শেখালে সবচেয়ে সহজে ও ভালভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারবে, শিক্ষাপদ্ধতি সেই পথ নির্দেশ করে। শিক্ষাবিদদের নির্দেশিত পথ ধরেই শিক্ষক অগ্রসর হন তার শেখাবার কাজে। সার্থক শিক্ষক হতে হলে শিক্ষাদর্শের সাথে তার প্রয়োগ-পদ্ধতিকে জানতে হবে। সেই প্রয়োগপদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে ও বাস্তব শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে রূপ দিতে শিখতে হবে।

শিক্ষাদর্শের সার্থকতা তার সার্থক প্রয়োগে

বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ বর্তমান রূপ নিয়েছে। রুশোর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে সমস্ত শিক্ষা আয়োজনের মধ্যমণি বলে গ্রহণ করে অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি পরিকল্পনার পর থেকে বহু শিক্ষাবিদ ধীরে ধীরে শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলবার জন্য সাধনা করে গিয়েছেন। রুশোর পূর্ব থেকেই কুইন্টিলিয়াস, ইরাসমাস, কমেনিয়াস প্রভৃতির লেখায় চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। কমেনিয়াস মধ্যযুগীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

মধ্যযুগের শিক্ষাদর্শের প্রতিবাদে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি

পদ্ধতিবিজ্ঞানের ক্রম বিবর্তনের পথকে (Process of evolution of Methodology) সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রাচীন ও আধুনিক

যুগের শিক্ষাপদ্ধতির স্বরূপ ও তাৎপর্যকে সঠিকভাবে জানতে হবে। শিক্ষাদর্শ সফল রূপ পায় নির্ভুল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। শিক্ষাদর্শ যতক্ষণ তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার কোন বাস্তব মূল্য নেই। দর্শনের ভাবময় অবস্থা কায়া রূপ নেয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন ভারত ও গ্রীসে শিক্ষায় কি পদ্ধতি অনুসৃত হত, পাশ্চাত্য শিক্ষা দার্শনিকগণ আধুনিক কালে কোন পথ নির্দেশ করেছেন, প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয়ে নতুন কোন পথের সন্ধান মেলে কিনা, তা বিচার করে দেখবার জন্য সামগ্রিক ভাবে পদ্ধতি বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভাবময় শিক্ষাদর্শের কায়ারূপ শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Teaching Methods) ঃ—

শিক্ষাপদ্ধতি ঃ শিক্ষায় একটা পূর্ব নির্দিষ্ট পাঠক্রমের অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, রাষ্ট্রের প্রয়োজন, শিক্ষার লক্ষ্য সবদিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান পাঠক্রম নির্ধারণ করেন। শিক্ষক হচ্ছেন পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মধ্যবর্তী লোক (intermediary)। পাঠক্রম কতকগুলি unitএ ভাগ করে নেওয়া হয়। একটাunitএর জের পরবর্তী unitএ বর্তায়। শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর অগ্রগতির হারের উপর দৃষ্টি রেখে unitগুলি ভাগ করা হয়। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাতে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে সেই ভাবে unitগুলি একটির সাথে একটি বেধে দেওয়া আছে। শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক্রমের নানা উপাদান বেছে সাজিয়ে বিভিন্নভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করা।

শিক্ষাপদ্ধতি নানা রকম হতে পারে। খেলার মধ্যে, অনুকরণ ও মুখস্থের মাধ্যমে, মুখে বলে আর বোর্ডে এঁকে আর লিখে (chalk and talk), বক্তৃতার মাধ্যমে, শিক্ষা-উপকরণের সাহায্যে, বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, কর্মশালায়, স্কুলের বাগিচায়, কোন প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রভৃতি বহু ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। বিষয়-বস্তুকে আরোহী পদ্ধতিতে বিশেষ থেকে সাধারণ (Particular to General) বা অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে (General to Particular) সাজিয়ে বা দু'টিকে মিলিয়ে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। শিশুদের কিণ্ডারগার্টেন বা মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। আজকের দিনে সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষকরা মুখে বলার পরিবর্তে

শিক্ষার বহু পদ্ধতি

নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি unit-এ ভাগ করে দিয়ে শিক্ষার্থিদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দিতে পারেন। শিক্ষক পরামর্শ দিয়ে ভুল সংশোধন করে মাত্র সাহায্য করবেন। আজকাল চিঠিপত্রের মাধ্যমে এক নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

এখানে যে সব শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হল, সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষক ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে বা এককভাবে কাজের বা শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারেন। শিক্ষক পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য করে কাজে উৎসাহিত করেন, শিক্ষার মান বজায় রাখেন, পরীক্ষাব মাধ্যমে উন্নতি পরিমাপ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রক্রিয়া ও শিক্ষারীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতা

শিক্ষাপ্রণালী বা শিক্ষাপদ্ধতি তত্ত্বগত দিক দিয়ে বিচার করে তার উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সম্যক ধারণা সম্ভব নয়। শিক্ষাপ্রণালী ও পদ্ধতির বিচার হয় তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে। প্রতিদিনকার শিক্ষায় কোন একটি পদ্ধতিকে কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় তা দিয়েই সে পদ্ধতির উপযোগিতা বিচার হবে।

নতুন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেই তার সবদিক বিচার-বিবেচনা না করেই তাকে আঁকড়ে ধরা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ঋতুতে পোষাকের ফ্যাসান বদলানোর মত শিক্ষাপদ্ধতিকে নিত্য নতুন করে বদলান যায় না। পুরান হলেই মন্দ, আর নতুন হলেই ভাল—এ মনোভাব খুব স্বাস্থ্যকর নয়।' তাই বিভিন্ন পদ্ধতির উপযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে কোন একটা শিক্ষাপদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। কোন একটি পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে কে, কিভাবে, কাদের উপর, কোন অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে সে পদ্ধতির প্রয়োগ করবে তার উপর। যেখানে একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে প্রয়োগের আগে দেখতে হবে সেখানকার অবস্থা সবদিক দিয়ে সেই পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী কি না। খুব ভাল পদ্ধতিও উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সীমাবদ্ধ উপযোগিতা

কোন একটি পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা আছে। একজন শিক্ষক—তিনি যত ভাল শিক্ষকই হউন না কেন, তার কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। শিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির সাথে স্থান-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য বিধান করে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ। এই সামঞ্জস্য বিধানের (adjustment) কাজটি করতে হয় শিক্ষককে। তিনি

সামঞ্জস্য বিধান

ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন না। কারণ, প্রয়োগের সময় বিচার করতে হবে স্থান, কাল ও পাত্র। স্থানীয় বাধা ও অসুবিধা তার কার্যপদ্ধতি, দক্ষতা ও প্রয়োগ-কুশলতাকে অনেকটা সীমায়িত করে।

শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনায় আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি তার পারিবারিক পরিবেশ, গৃহের অবস্থা, চারপাশের পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পূর্ববর্তী স্কুলের অবস্থা, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, বিকাশের হার (rate of development) বয়ঃপ্রাপ্তির মাত্রা (levels of maturity) প্রভৃতি শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার ব্যাপারে বয়স (C.A.) খুব নির্ভরশীল মাপকাঠি নয়। মানসিক বয়স (M.A.) দিয়ে যদি শ্রেণী ভাগ করা হয়, তাহলেও অসুবিধা আছে। একই মানসিক বয়সের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পরবর্তী হার একই রকম নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষমতা সব বিষয়ে একই রকম হয় না। একই মানসিক বয়সের সব ছেলেমেয়েরা একটা বিষয় ঠিক এক ভাবে শিখবে, বা তা নিয়ে চিন্তা বা ধারণা এক ভাবে করবে সে কথা মনে করা ঠিক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের (individual difference) জন্য পরীক্ষার ফল ভিন্ন ভিন্ন রকম হচ্ছে। কোন পদ্ধতিই ব্যক্তিগত পার্থক্যজনিত বৈষম্যের সমাধান করতে পারে না। যুক্তিসিদ্ধ পথে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা গেল যে শিক্ষা এই নিয়মে অগ্রসর হবে—কারণ, সেইটাই যুক্তিপূর্ণ পথ, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যুক্তির পথ ধরে সব ছেলের উন্নতি সমানভাবে হচ্ছে না। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা প্রতিটি ছেলেমেয়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যার ফলে যুক্তিপূর্ণ নিয়মগুলির প্রতিক্রিয়া নানারূপ হচ্ছে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য

একই বয়সের (C.A.) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা প্রায়ই একই রকমের এই ধারণার উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। এতে কৃতিত্বের হারের পার্থক্যটা অত্যন্ত বেশী হয়। শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছেলের সাথে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ছেলের মধ্যে পার্থক্য দেখলেই এই সত্যটা ধরা পড়বে। মানসিক বয়স নিয়ে শ্রেণী বিভাগ করলে ব্যক্তিগত পার্থক্যজনিত অসুবিধা থেকে যাবে। প্রচলিত কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ধারণ করে প্রতিটি ছাত্রের রুচি, ইচ্ছা, ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। মানসিক বয়স ও শিক্ষাগত কৃতিত্বের হার নির্ণয় করে নানারূপ শাখার (streaming) ব্যবস্থা করে ও এক বছরের জায়গায় ছয় মাস অন্তর প্রমোশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তার ফলও সর্বক্ষেত্রে আশাপ্রদ নয়।

একই শ্রেণীতে পার্থক্য

ভারতের বিদ্যালয়গুলির অবস্থা (Condition of Indian Schools) ঃ—

অর্থনৈতিক অবস্থার উপর শিক্ষা অনেকটা নির্ভরশীল। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য, বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। বিদ্যালয়ের জন্য আমরা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারি, তার উপর বিদ্যালয় গৃহ, আসবাব পত্র, লাইব্রেরীর বই, ল্যাবরেটরী, ম্যাপ, চার্ট, ও অন্যান্য শিক্ষার সরঞ্জাম এমনকি শিক্ষকের সংখ্যা পর্যন্ত নির্ভর করে। যদি অল্প জায়গায় অল্প খরচে সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে একটি শ্রেণীতে বহু ছাত্রকে পুরে দেওয়া হয়েছে। আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকের চলাফেরা দূরের কথা ছাত্ররাই বসতে হলে বেঞ্চ ডিঙ্গিয়ে যায়। সামান্য শিক্ষা সরঞ্জাম, শিক্ষকের সংখ্যা ঠিক যে-কয়জন না হলে একেবারে চলে না তার বেশী একজনও নয়, সেই জায়গায় কর্মকেন্দ্রিক বা প্রজেক্ট বা অন্য কোন আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করা বাতুলতা নয় কি? এ সব জায়গায় chalk and talk পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি। তার মধ্যে কথাই বেশী চকের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অনেক সময় অপরিসর শ্রেণী-কক্ষে বোর্ডে গিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরেফিরে কাজ করার মত জায়গা থাকে না। যোগ্য শিক্ষক একসাথে একই শ্রেণীতে ৪০।৫০টি ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারেন, তবে সেজন্য তাকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ছোট একটি শ্রেণীকক্ষে ইচ্ছা থাকলেও প্রতিটি ছেলের কাছে যাবার উপায় নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সরঞ্জাম বা দরকারী বই নেই এ অবস্থায় শিক্ষক যত যোগ্যই হউন না কেন তিনি নিরুপায়। শিক্ষক বক্তৃতা করে কাজ সারেন আর ছেলেরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের চেষ্টা করে।

Chalk and talk একমাত্র পদ্ধতি

শিক্ষায় শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরুত্ব কমেনি, তাকে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। শিক্ষক যদি নিজের গুরুত্ব ও তার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না থাকেন, তাহলে শিক্ষার কোন পদ্ধতিই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষক এখনও আছেন যাঁরা মনে করেন ছাত্ররা শুধু শুনবে—তাদের করার বা বলার কিছু নেই। শিক্ষার্থী শুধু বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশই পালন করে যাবে, শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলার (mental discipline) জন্য না বুঝে কঠিন কঠিন বিষয় মুখস্থ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে কোন স্বাধীন চিন্তা বা মৌলিকতার পরিচয় দিলে তাকে 'ডেপো' বলে শাসন করতে হবে। এই শ্রেণীর খুদে ডিক্টেটরদের শাসনে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের যে কি অবস্থা হয়

চিরাচরিত পদ্ধতির প্রতি শিক্ষকদের অনুরাগ

তা সহজেই অনুমেয়। এই জাতীয় শিক্ষকেরা বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে মনে করেন পাগলামি। প্রজেক্ট পদ্ধতি, কর্মশালা বা কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিকে মনে করেন ছেলে ক্ষ্যাপাবার পদ্ধতি, এতে লেখাপড়ার নামে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। এরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পর্যন্ত অত্যন্ত করুণার চক্ষে দেখেন।

অনেক শিক্ষক আছেন তাঁরা নিজেরা যে পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখেছেন সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেন ও মনে করেন এটাই হচ্ছে সহজতম পদ্ধতি। নতুন কোন পদ্ধতিকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন। নতুন পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন। শিক্ষায় যারা যুক্তিবাদী তারা যুক্তিসদ্ধ পথ ধরতে চান। তাঁরা অনেক সময় বুঝতে চান না ছেলেদের মনের গতি সব সময় যুক্তির পথ ধরে চলে না। সব যুক্তির সূত্রে সব ছেলের উন্নতির পথ ছকে বেঁধে দেওয়া যায় না।

নতুনকে গ্রহণে শিক্ষক মন দ্বিধাগ্রস্থ

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকলেও সব সময় কাজের সুবিধা হয় না। পূর্ব স্থিরকৃত পরিক্রম মেনে নিয়ে শিক্ষককে চলতে হয়। সেখানে পরিচিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যের (adjustment) দরকার হয়। দৃঢ়ভাবে একটা পদ্ধতিতে আঁকড়ে থাকব—এই গোড়ামি নিয়ে চললে সুবিধা দেখা দিতে বাধ্য। শিক্ষাদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষামনোবিজ্ঞান জানা থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের কলাকৌশল তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। কোন অবস্থায় তিনি কি ভাবে অগ্রসর হবেন তা পুঁথি পড়ে স্থির করা যায় না। শিক্ষক তাঁর আয়ত্তাধীন বিদ্যা যদি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলেই তিনি সার্থক শিক্ষক পদ্ধতিবিজ্ঞানের আলোচনায় সুপ্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীসের পদ্ধতি থেকে শুরু করে অতি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করা হল। শিক্ষক শিক্ষার্থীর কল্যাণে একক বা মিশ্র ভাবে যে পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সুফল পাবেন বলে মনে করেন তিনি তার সাহায্য গ্রহণ করবেন। অতি পুরাতন বলেই কোন পদ্ধতিকে অপাংক্তেয় মনে করা উচিত নয়। আবার অতি আধুনিক বলেই পাগলামি মনে করা ঠিক নয়। দু'টি মনোভাবই শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়। সার্থক শিক্ষক সব সময় পুরানো পথ ধরেই চলবেন না। দরকার হলে নিজে পথ তৈরি করে নেবেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বার্থে যা প্রয়োজনীয় তাই গ্রহণীয়।

সার্থক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভরশীল

পদ্ধতি নির্ধারণে মনস্তত্ত্ব ও যুক্তি (Logical and Psychological Factors Involved in a good Method ঃ—

যাঁরা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন তাঁরা জানেন, যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে ঠিক মত তাকে শিক্ষা দিতে হলে সেই শিক্ষার্থীকে প্রথম জানতে হবে।

শিশুর শক্তি-সামর্থ্য, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরাগ, শিশুর আবেগ, সংস্কার, শিশুর বিশেষ প্রবণতা অর্থাৎ তার সব রকম বৈশিষ্ট্য জেনে বিশ্লেষণ করে শিশু-মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিসমূহ গড়ে উঠেছে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথা স্বীকার করতে হবে—শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-মনোবিজ্ঞানই শেষ কথা নয়। শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক ও বাস্তবে রূপায়ণের জন্য শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের পিছনে দুটি প্রভাব সক্রিয় —একটি শিক্ষার মনস্তত্ত্বের দিক, আরেকটি শিক্ষার যুক্তিসিদ্ধ দিক (psychological and logical approach)। শিক্ষককে দু'টি দিক সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষা পদ্ধতিকে বুঝতে হবে। শিক্ষক শিশুর প্রকৃতিকে জানবেন, আবার যা শিক্ষা দেওয়া হবে তার স্বরূপ ও তাৎপর্যকে জানবেন। শিশু-মনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের পরও দেখা গিয়েছে শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে একই পথ ধরে চলে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত যুক্তি-সিদ্ধ পথই শিক্ষক সেক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। "The teacher then must regard on one hand the nature of the child to be taught and on the other hand the nature of knowledge in general and of the special piece of knowledge to be imparted in particular. This is what is meant when it is said that the theory of teaching rests both on psychology and on logic" (J. Welton, Principles and Methods of Teaching).

যুক্তি ও মনস্তত্ত্বের সমন্বয়

শিক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব (Importance of Environment in Education) ঃ—

পরিবেশ—সাধারণ ভাবে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একটা বা কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এ শিক্ষা আমরা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই অর্জন করি। ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকাল বলে জীবনের কোন একটা সময়কে নির্দিষ্ট করে রাখা সম্ভব নয়। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। জীবনের প্রতিটি দিন আমরা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি—জন্ম থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত যে-কোন অভিজ্ঞতা অর্জনই হচ্ছে শিক্ষা। Raymont বলেছেন, In the wider and less definite sence, education means that process of development in which consists the passage of human being from infancy to maturity, the process whereby he gradu-

যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি

ally adapts himself in various ways to his physical, social and spiritual environment." (Principles of Education).

জন্মক্ষণ থেকেই শুরু হয় শিশুর শিক্ষাপর্ব। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"The real education begins from the conception as the mother begins to take up the responsibility of the child."

যে শিশুটি জগতে এল, তার দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্ণ সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী করে শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সার্থক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই আর্য ঋষিরা নাগরিক জীবনের কল-কোলাহলের বাইরে তপোবনের আদর্শ-পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ব্যয়িত হয়, সেই পরিবেশ অপরিহার্যরূপেই শিক্ষার্থীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তপোবনের পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সাথে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে—ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে, আবার মানুষের সাথে মানুষকে শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ।"

সার্থক শিক্ষায় প্রয়োজন আদর্শ পরিবেশ

শিক্ষা-পরিবেশ (Environment) ঃ—

শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি। শিশুর জন্ম থেকেই পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করে চলার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অনুকূল পরিবেশে শিশু তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহায্যেই অনেক কিছু শেখে। মানুষের পরিবেশ থেকে একটি শিশুকে জন্মক্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তার মুখে মানুষের ভাষা ফুটবে না। নেকড়ে পালিত মানবশিশু শুধু অবয়বেই মানুষ—আচরণ অভিজ্ঞতা তার নেকড়ের মতই হবে। এক একটি বিশেষ পরিবেশ শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। একই ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাবে উচ্চারণভঙ্গী বিভিন্নতর হয়, পূর্ববঙ্গের কথ্য বাংলাও পশ্চিমবঙ্গের কথ্য বাংলায় এই প্রভেদ সুস্পষ্ট। পরিবেশের প্রভাবে আচরণের পার্থক্য দেখা যায় ; উন্নততর সামাজিক পরিবেশে যেখানে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বেশী, ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু বড় হয়ে উঠে, সেখানে শিক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়। সুযোগ সুবিধা যেখানে কম, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে ফল ঠিক বিপরীত হয়। একটি শহরের ছেলে ও একটি পাড়াগাঁয়ের ছেলের মধ্যে পার্থক্য সহজে চোখে পড়ে। ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় একই বয়সের একই শ্রেণীর দু'টি ছেলের মধ্যে সহরের ছেলের

পরিবেশ শিক্ষার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে

ইংরেজী শব্দভাণ্ডার অনেক বেশী সমৃদ্ধ। দৈনন্দিন জীবনে সে বহু ইংরেজী শব্দ শুনে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। গ্রামের ছেলেরা যে পরিবেশ থেকে আসে, তা শিক্ষার দিক থেকে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর, তাই সহরের ছেলেরা যে সুযোগ পায় গ্রামের ছেলেরা সে সুযোগ পায় না। সামাজিক পরিবেশ ছাড়াও পারিবারিক পরিবেশ ও পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এবারডিন সহরে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রাথমিক স্তরের শেষে ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শুরুতে যে সব ছেলেকে বুদ্ধির পরীক্ষায় একই পর্য্যায়ভুক্ত বলে নির্ণয় করা হযেছে, পরবর্তী কালে যাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল অনুকূল পরিবেশ ও উন্নত স্কুলের শিক্ষায় তারা এগিয়ে গিয়েছে। অথচ একই বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q) ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবস্থা যাদের খারাপ তারা স্কুলে সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি।

পরিবেশ পরিবর্তনে শিক্ষার মান পরিবর্তন

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার্থীর উন্নতি বা অবনতি হয়েছে। উন্নততর স্কুল পরিবেশে আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম সমন্বিত বিদ্যালয়ে ছেলেদের উন্নতির হার যে ভাবে এগিয়ে চলে, সেখান থেকে সরিয়ে নিম্নমানের বিদ্যালয়ে সেই ছেলেদের নিয়ে এলে ছেলেদের উন্নতির গতি নিম্নমুখীন হবে। শিক্ষার অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে শিক্ষার যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। এমনকি পরিবারের আয়তনও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে ছোট ছোট পরিবার থেকে যে সব ছেলেরা আসে বুদ্ধির পরীক্ষায় তারা বড় পরিবারের ছেলেদের চেয়ে অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

সাধারণ পরিবেশে নিম্নগামী মান, উন্নততর পরিবেশে মানের উন্নতি

বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ শিক্ষায় কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে এ নিযে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে; ফলাফল সর্বত্র একই রকম না হলেও সর্বত্রই কতকগুলি নীতিগত বিষয়ে ঐক্য দেখা গিয়েছে। তবে পরিবেশ কোন ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে সে সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি; তবে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে, যে-সব ছেলেরা অতি সাধারণ পরিবেশ বা দূষিত পরিবেশে বাস করে, বড় হবার সাথে সাথে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে। উদ্দীপকের অভাব, শিক্ষা সম্পর্কীয় সুযোগের অভাব ও উৎসাহের অভাবের ফলে তাদের উন্নতি ব্যাহত হয়। উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে যে কাজের উৎসাহ দেখা যায়, সামাজিক দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে সেই সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ তাদের আত্মবিকাশের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি

করে। তাদের জীবন বৈচিত্র্যের অভাবে একটা একঘেয়ে পরিবেশে আনন্দ উৎসাহের অভাবে শিখবার যে ইচ্ছাটুকু তাদের থাকে সে উৎসাহ বা উদ্যম ধীরে ধীরে নিভে যায়।

শিক্ষায় উপযুক্ত পরিবেশ শিক্ষার্থীর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তা অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু মাত্র স্কুল পরিবেশকে আদর্শ পরিবেশ করে তুললেই ঈপ্সীত ফল পাওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, অর্থ নৈতিক অবস্থা – সব কিছুই শিক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে। তাই যে কোন আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য সবদিক থেকে পরিবেশকে শিক্ষার উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিক্ষামানের উন্নতি বা অবনতির বিচারে শুধু স্কুলের পরিবেশ বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় বা শুধুমাত্র স্কুল পরিবেশের পরিবর্তনের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষা ও গৃহ-পরিবেশ এ দু'টির সম্পর্ক অতি নিকট। শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশ ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার কথা বিশেষ করে বিচার করতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে কোন কথা ভাবতে হলে পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশের উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে।

গৃহ পরিবেশের প্রভাব

শিক্ষা ও বয়ঃপ্রাপ্তি (Education and Maturity)—উপযুক্ত ও অনুকূল শিক্ষা পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীর বয়ঃ প্রাপ্তির (maturation) প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বয়ঃ প্রাপ্তি অর্থে এখানে সাবালক (adult) বলা হচ্ছে না। বয়ঃ প্রাপ্তি বললে বুঝতে হবে বয়সের স্তর অনুসারে নিজস্ব পূর্ণতা প্রাপ্তি। যেমন ৮ বছরের ছেলের দৈহিক ও মানসিক গঠনের একটা নির্দিষ্ট মান রয়েছে। সেই বয়সের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। য শিশু দৈহিক ও মানসিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে বয়স অনুপাতিক পূর্ণতা লাভ করেছে সেই শিশুকে বয়ঃ প্রাপ্ত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যে সব দিক থেকে ৮ বছরের ছেলের পূর্ণতালাভ করেছে, না হলে এ ছেলেকে বলা হবে পশ্চাৎপদ।

পরিবেশ ও বয়ঃপ্রাপ্তি

বয়স অনুসারে শিশুর স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রাপ্তির উপর শিশুর শিক্ষার ক্রমোন্নতি নির্ভরশীল। যতই উদ্দীপনা বা উৎসাহ দেওয়া হোক না কেন, এক বছরের ছেলেকে দিয়ে লিখতে বা অঙ্ক করতে শেখান যাবে না। আবার যখন উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে ও শিক্ষকের চেষ্টায় সে এগুলি আয়ত্ত করতে পারবে। অপরিণত বয়সে বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে একটি শিশুকে দিয়ে তার বয়সের পক্ষে অস্বাভাবিক একটি বিষয় হয়ত শেখান যায়, কিন্তু তাতে শ্রম ও সময়ের যে অপচয় হয়, উপযুক্ত বয়সে তা শেখাবার চেষ্টা করলে অনেক অল্প সময়ে ও পরিশ্রমে সে কাজটি আরও ভালভাবে শেখান যায়।

Gasell ও Thompson ছুটি যমজ বোন নিয়ে এ সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটি বোনের বয়স যখন ৪৬ সপ্তাহ তখন তাকে দিয়ে ক্রমাগত ৬ সপ্তাহ ধরে প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন একটা সিড়ি বেয়ে ওঠা অভ্যাস করান হলে সে ২৬ সেকেণ্ডে সিঁড়িটিতে উঠতে পারত। পরে এই যমজ বোনের বয়স যখন ৫৩ সপ্তাহ, তখন তাকে দিয়ে চেষ্টা করান হলে সে প্রথম প্রচেষ্টায় ৪৫ সেকেণ্ডে সিঁড়িটিতে উঠে গেল। ছ'সপ্তাহের চেষ্টায় সে ১০ সেকেণ্ডে সিঁড়িটিতে উঠতে পারত। তাই দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত বয়সে ২ সপ্তাহের চেষ্টায় যে ফল পাওয়া যায়, পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ৬ সপ্তাহের চেষ্টায়ও সে ফল পাওয়া সম্ভব নয়। মানুষের উপর বহু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে উপযুক্ত সময়ে একটি স্বাভাবিক শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী কাজ দিলে সে যে ভাবে কাজটি করবে, তার পূর্বে তাকে দিয়ে সেই কাজ করাবার চেষ্টা হলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না।

আদর্শ শিক্ষায় পরিবেশ ও পদ্ধতির গুরুত্ব

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপরিবেশ ছুই-ই শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পদ্ধতি নির্ণয় ও পরিবেশ রচনা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ও হচ্ছে। শিক্ষার আদর্শ যত উন্নতই হোক না কেন, তার সাফল্য নির্ভর করে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ ও পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সেখানেই নিহিত। শিক্ষাদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন, ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করলে কখনই সে উচ্চাদর্শে পৌছান সম্ভব হবে না। যাঁরা শিক্ষার সাথে জড়িত, দেশের শিক্ষার গুরুদায়িত্ব যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ ও জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে উদ্ভাবিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ-কৌশল ও শিক্ষাপরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের জানা দরকার। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিতি অত্যাবশ্যক। যুগ পরিবর্তনের সাথে নতুন যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাধারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারাকে আমাদের সমগ্রভাবে জানতে হবে। আমাদের দেশের গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলতে হলে বিভিন্ন দেশের প্রয়োগ-সিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আধুনিক-অনাধুনিক ভেদ না করে খোলা মন নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শন আলোচনা করে আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে এ দেশের প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন
(Evolution of Teaching Methods)

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric Education) ঃ—

বর্তমান শতাব্দীকে আমরা বলি শিশুর যুগ। নবলব্ধ শিক্ষার নতুন আলোকে আমরা নিত্যকালের সেই চির পুরাতন শিশুকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। শিশুর মধ্যে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। তার দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ, তার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দানই হচ্ছে সার্থক শিক্ষার কাজ।

"The main object of education is not to teach but to develop"—(Pestalzzi).

সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ

বিকাশ (Develop) অর্থাৎ যে সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে শিশু জগতে এসেছে, সেই অনন্ত সম্ভাবনা বা শক্তির বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। স্বামীজির কথার মধ্যেও সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ (Perfect), এই পূর্ণতার বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা।

"Education is the manifestation of the perfection already in man"—(স্বামী বিবেকানন্দ)। শিশুর এই সম্ভাবনা বিকাশের মধ্যেই আজকের সমস্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুই হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার সব আয়োজনই শিশুকে নিয়ে। তাই আজকের শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child Centric Education)।

মধ্যযুগের মনোভাব (Mediaevel System of Education) ঃ—

শিশু সম্পর্কে মনোভাব চিরদিনই এরূপ ছিল না। মধ্য যুগে ভারতে ও ইউরোপে শিক্ষা ছিল জীবন নিরপেক্ষ। জীবনের পার্থিব প্রয়োজন থেকে

শিশু বয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ

বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা পুরোহিত-শাসিত সমাজে গড়ে উঠেছিল, সেখানে শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। নবীন শিক্ষার্থীর যে একটা স্বতন্ত্র স্বত্বা আছে, সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। শিশুকে মনে করা হত বয়স্কের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। শুধুমাত্র দেহের কাঠামো আর বয়সের দিক থেকেই শিশুকে পৃথক মনে করা হত।

একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, সে যুগে শিশুকে টেলিস্কোপের উল্টোদিক থেকে দেখা হত। বেশীদিনের কথা নয়, ভিক্টোরীয় যুগের একখানি শিশুর চিত্র দেখলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রক্ষোভ-বিক্ষোভ, আবেগ-সংস্কার, তার স্বভাব-আচরণ নিয়ে শিশুর যে স্বতন্ত্র জগৎ আছে একথা কেউ মনে করত না। শিশুর রুচি, আগ্রহ বা প্রবণতার সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা সে যুগের শিক্ষায় স্বীকৃতি পায়নি। শিশুর মন আর বয়স্কের মন একই রকম, এই ছিল সেদিনের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই পূর্ব-নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। যে শিক্ষাক্রম তাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে তা তার ভাল লাগছে কিনা, আয়ত্ত করবার মত শক্তি তার আছে কিনা—এসব কথা বিচার-বিবেচনা করার প্রশ্নই উঠত না। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগই ছিল না। তার ভালমন্দ অভিভাবক চিন্তা করবে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ক্ষমতা-অক্ষমতা—তাও অভিভাবকই স্থির করবে। শিশু অর্থাৎ যার জন্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন, মধ্যযুগে সে ছিল নিতান্ত কৃপার পাত্র। বয়স্কের ইচ্ছাই শিশুর শিক্ষায় প্রতিফলিত হোক, তাদের কতকগুলি ধারণা শিশুর জীবনে রূপ গ্রহণ করুক, এই ছিল শিশু সম্পর্কে সে যুগের মনোভাব।

শিশুশিক্ষায় অবহেলিত শিশু

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্টা বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রগতিশীল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ একদিনে বা কোন একজন শিক্ষাবিদের চেষ্টায় গৃহীত হয়নি। শিক্ষায় শিশুর গুরুত্বের স্বীকৃতি কুইন্টিলিয়ান, ইরাসমাস, কমেনিয়াস প্রভৃতির শিক্ষা-সম্পর্কীয় লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে শিশুকে প্রাচীন শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। ধর্মনির্ভর চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটার সংস্কার সাধনের জন্য তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে প্রথম-বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা সম্পর্কীয় রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচারের পর। এরপর থেকেই শিক্ষায় শিশুর বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা ইউরোপে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। রুশোর দার্শনিক মতবাদ বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে এগিয়ে আসেন পেস্টালৎসী। এরপর হার্বার্ট শিশুশিক্ষার একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি তৈরি করেন। ফ্রয়বেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনভাবে আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায়। পড়ার সাথে খেলা, গান, হাতের কাজ সব মিলিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব শিশু উদ্যান রচনা করলেন। বিংশ শতাব্দীতে মন্তেসরী, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন আনেন।

শৃঙ্খলমুক্তির তপস্যা

শিক্ষায় শিশুই কেন্দ্রবিন্দু এ আজ আর দার্শনিক তত্ত্ব নয়, শিশুশিক্ষায় শিশু মধ্যমণি এ আজ বাস্তব সত্য। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দেওয়াই বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য। কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখানে শিশুর স্বাভাবিক প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে না। শৃঙ্খলার নামে নিপীড়ন নেই। শিশু কাজ করে নিজের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণায়। শৃঙ্খলা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না; দায়িত্ববোধ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর মনে শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়, ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা ও সৃজনীস্পৃহাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির (প্রোজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি) সৃষ্টি হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এও এক বিশেষ রূপ। দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক—সবদিক থেকে সামগ্রিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দিয়ে সামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য।

শিশুশিক্ষায় মধ্যমণি শিশু

পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন (Evolution of Teaching Method) ঃ—

আধুনিক শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করে আমরা শিশুকে সমস্ত শিক্ষা আয়োজনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছি। শিশুর গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা বলি এ যুগ শিশুর যুগ। শিশু একদিনে এ স্থান লাভ করেনি। মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয় পৃথক সত্তার কোন স্বীকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল না। একটা পূর্ব স্থিরীকৃত পথে শিক্ষাকে পরিচালনা করা হত। সেই ছাঁচেঢালা শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগই থাকত না। পুরাতনের অনুবর্তন করাই ছিল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষাদার্শনিকগণের বহুদিনের চেষ্টায় এই অচল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষাবিদগণ তাদের শিক্ষাদর্শের সমর্থনে তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য তাদের আদর্শের পরিপোষক শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষাদর্শের এই প্রায়োগিক (empiric) দিক বিজ্ঞানসিদ্ধ হয়ে উঠেছে বহুদিনের চেষ্টায়। আধুনিক যুগের প্রথম অবস্থায় চলেছে পরীক্ষানিরীক্ষা (experiment & observation)। এক জনের ভুলভ্রান্তি আরেক জনের চেষ্টায় সংশোধিত হয়ে নির্ভুলতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধুমাত্র ভাববাদের উপর শিক্ষার ভিত্তি আজ প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাববাদী দার্শনিকগণের শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়ে শিক্ষা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

শিশুর যুগ এসেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে

উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যযুগের পরবর্তীকালীন শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, পদ্ধতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। ধাপে ধাপে শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ পরিমার্জিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মত রূপ লাভ করেছে।

ক্রমবিবর্তনের ধারা

প্রাচীন যুগ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এই বিবর্তনের পথ অনুসরণ করলে বহু ভ্রান্তি বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়বে। এই ভুলভ্রান্তির পথ ধরেই আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই, কি করে আরো নিখুঁত আরো সহজ পদ্ধতি খুঁজে বের করা যায় সেই পথের সন্ধান করে চলেছেন শিক্ষাবিজ্ঞানীরা।

শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক

আমাদের আলোচনার বিষয় শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তন। কি করে শিক্ষা-পদ্ধতিসমূহ বর্তমান রূপ পেল সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলেও শিক্ষাদর্শকে পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা যায় না। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি একটি অপরটির পরিপূরক। শুধুমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলে তা হবে অসম্পূর্ণ। শিক্ষাপদ্ধতিকে বুঝতে হবে শিক্ষাদর্শের পটভূমিকায়। অতি ব্যাপক বিষয়টিকে সংক্ষেপে আলোচনার প্রচেষ্টায় শিক্ষা-পদ্ধতির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হল বলে যদি মনে করা হয় শিক্ষায় দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা গৌণ, তাহলে ভুল করা হবে। শিক্ষাদর্শের বিবর্তন আর শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন অঙ্গাঙ্গী ভাবে একটি অপরটির সাথে জড়িত। আলোচনায় আমরা এই কালানুক্রমিক গতিপথেরই অনুসরণ করব।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি (Principle and Method of Ancient Indian Education) ঃ—

আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি বলতে আমরা পাশ্চাত্য নীতি-পদ্ধতিকেই বুঝে থাকি। আধুনিক পদ্ধতিবিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করতে হলে প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও আদর্শ কি ছিল সেখান থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে। আধুনিক শিক্ষাধারা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে দু'একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রাচীন ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু উপত্যকায় এক অতি উন্নত সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। সেই সভ্যতার বহু তথ্যই আজও আমাদের

নিকট অজ্ঞাত, তবুও সিন্ধু সভ্যতার যে সব নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা থেকে মনে হয় মহেঞ্জদড়োতে লিপির ব্যবহার ছিল। যারা লিপির ব্যবহার জানত তাদের একটা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একথা স্বাভাবিক। এরপর ভারতে এল আর্যরা। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা একান্ত ভাবে আর্য সভ্যতারই দান। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহকে। যতই পুরাতন হোক না কেন, আজও ভারতীয় হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি ও সমাজ-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের দ্বারা। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মূল্য আজও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র তপোবন

ভারতীয় জীবনের শেষ কথা মুক্তি বা মোক্ষ। অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিজের অমর সত্তার সন্ধান পাওয়া বা পূর্ণতালাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। পরিপূর্ণতা বা অমৃতত্ব লাভই জীবনের শেষ কথা হলেও আর্য-ঋষিরা জগতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় লৌকিক-শিক্ষার উপযোগিতার কথাও স্বীকার করেছেন। উপনিষদে বিদ্যাকে পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লৌকিক-বিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-বিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজনে জগতে বেঁচে থাকবার জন্য, কিন্তু ঋষিরা সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন, একেই যেন জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ না করি। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, মানুষের সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য লৌকিক বা অপরা-বিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে হবে। আদর্শ-মানুষ গড়ে তুলতে লৌকিক বিদ্যা ও শুদ্ধ-বিদ্যা দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। ভারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল। উপনিষদে বলা হয়েছে বিদ্যা (পরা-বিদ্যা) ও অবিদ্যা (অপরা-বিদ্যা) যারা যুক্ত করে দেখেন তাঁরাই সত্য দেখেন। নিজেকে জানা—আত্মানং বিদ্ধি—মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বকে উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের শিক্ষার শেষ কথা।

পরা ও অপরা-বিদ্যা

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল। গুরু মৌখিক রীতিতে শিক্ষা দিতেন। বক্তৃতাধর্মী শিক্ষা বৌদ্ধযুগে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তার ব্যাপক প্রয়োগ ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা (individualised instruction) ; আচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

মৌখিক শিক্ষা

সে যুগের পাঠপদ্ধতিকে কয়েকটি স্তরে (stage) ভাগ করা যায়। উপক্রম বা প্রস্তুতি—শিক্ষার্থীর মনে গুরুর কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থেকে পাঠ-প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হত। শ্রবণ—গুরু যা বলতেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। আবৃত্তি বা অভ্যাস করে আয়ত্ত করা। অর্থবাদ—যা শেখান হল তার অর্থ বোঝা। এরপর ফল ও উপপত্তি—অর্থাৎ আলোচনা করে যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার প্রয়োগ করা। মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত। গভীর ভাবে চিন্তা করাকে বলা হত মনন। নিদিধ্যাসনের অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করা। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে মেধা ও স্মৃতিশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল।

পাঠপদ্ধতির স্তরবিভাগ

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে দেখা যায় বৈদিকযুগ থেকেই একটি সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। দশম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় জড়ত্ব দেখা দেয়। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণশক্তি হারিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে এক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত হয়।

প্রাচীন চীন ও হিব্রুশিক্ষা পদ্ধতি (Method of Ancient Chinese and Hebrew Education) ঃ—

প্রাচীন চীনের শিক্ষায় মুখস্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষক বই থেকে কোন অংশ পড়তেন ছাত্ররা বার বার তা আবৃত্তি করে মুখস্থ করত। চীনদেশে লিপির ব্যবহার থাকলেও প্রাচীন চীনের শিক্ষারীতি ছিল প্রধানতঃ মুখস্থ ও অনুকরণ নির্ভর। কনফুসিয়াস এই স্মৃতি নির্ভর শিক্ষার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। চিন্তাহীন শিক্ষার কোন মূল্য নেই—এটা শুধুমাত্র পণ্ডশ্রম একথা বলে তিনি শুধুমাত্র স্মৃতিনির্ভর শিক্ষারীতির পরিবর্তনের কথাই বলেন।

হিব্রু বা ইহুদী শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল আবৃত্তি ও মুখস্থ নির্ভর। হিব্রু-শিক্ষার পাঠক্রমে মোজেসের আইন (Law of Moses) ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের বার বার আবৃত্তি করে মোজেসের আইন মুখস্থ করতে হত। ইহুদীদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত। এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেচ্ছ বেতের সাহায্য গ্রহণ করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য শাসনের কঠোরতা কিছুটা শিথিল করা হয়। ইহুদীদের একটি নীতি-গ্রন্থে মুখস্থের সাথে বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবুও দেখা যায় অনুধাবন ও উপলব্ধি অপেক্ষা প্রাচীন চীন ও হিব্রু শিক্ষা-পদ্ধতিতে মুখস্থ ও অনুকরণের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি (Principle and Method of European Education) ঃ—

গ্রীস ঃ ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা ও খৃষ্টান ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের একাধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি বলতে গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে বোঝান হত। দর্শন, রাজনীতি, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই গ্রীসের স্থান ছিল সবাগ্রে। গ্রীস ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার আদি লীলাভূমি। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের চিন্তাধারাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীসের সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী নাগরিকদের সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা ছিল বড়লোকের অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র। সোফিস্ট দার্শনিকেরা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন। আপামর জনসাধারণ শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। এমন কি সক্রেটিস পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাননি ; কারণ সোফিস্টদের দেবার মত অর্থ তাঁর ছিল না। অত্যন্ত দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন—

সোফিস্ট মতবাদ

"As for myself I am first to confess that I have never had a teacher ; although I have always from my earliest youth desired to have one. But I am too poor to give money to the Sophists, who are the only professors of moral improvement"—(As quoted by Robert R. Rusk in Doctrines of the Great Educators.)

সোফিস্ট শিক্ষাদর্শে কোন সুদূর প্রসারী উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না। তাদের শিক্ষাপদ্ধতিও কোন সুসংবদ্ধ প্রণালীকে অনুসরণ করত না। সোফিস্টরা শিক্ষাকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন মেটানোই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাঁরা মনে করতেন ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবকিছু বিচারের মাপকাঠি। শিক্ষার সার্বজনীন সংজ্ঞা দ্বারা ব্যক্তিগত মতবাদকে নিয়ন্ত্রণ তাঁরা স্বীকার করতেন না। এঁরা ছিলেন শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা মতবাদের সমর্থক। ব্যক্তির নিজস্ব শক্তির চরম বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। দেহের বিকাশের জন্য শরীর চর্চা (gymnastics) ও মনের বিকাশের জন্য সঙ্গীত চর্চাকে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

সক্রেটিস : সক্রেটিস, প্লেটো এঁরা শিক্ষা সম্পর্কে যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন তাতে দেখা যায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের কথা বললেও সোফিস্টদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র মতবাদের সমর্থন তাঁরা করেন নি। তাঁরা মনে করতেন শিক্ষা বাইরের থেকে চাপিয়ে দেবার মত বস্তু নয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তা আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। সক্রেটিস শিক্ষার কাজের সাথে ধাত্রীর কাজের তুলনা করেছেন। তিনি নিজেকে বলেছেন 'মনের ধাত্রী' ("a man-midwife for mind") – নতুন মনের সৃষ্টিতে সাহায্য করাই তাঁর একমাত্র কাজ।

সক্রেটিস গ্রীসের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সার্বজনীন সংজ্ঞা ও আরোহী পদ্ধতি (Inductive piscourse) সমাদর লাভ করে। কোন একটি বিষয়ের সূত্র নির্ধারণে তিনি আরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতেন। সক্রেটিস অনুসৃত পদ্ধতিতে তিনটি স্তর দেখা যায়।

প্রথম স্তর চিন্তন বা অনুমান, প্লেটো বলছেন opinion. এই স্তরে তিনি দেখিয়েছেন শিক্ষার্থী যা জানে বলে মনে করে তাকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণ করবার মত যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তার নেই। দ্বিতীয় স্তরে বিশ্লেষক (analytic or destructive stage) পদ্ধতিতে তিনি দেখান, সে যা জানে বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে তা সে জানে না। সর্বশেষ স্তরে সংশ্লেষক (Synthatic stage) পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার জানাকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অনুশাসনের গণ্ডি ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মানুষের চিন্তাধারাকে সক্রেটিস যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

একটি বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাই। আর্য ঋষিরা বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি'। সক্রেটিস বলেছেন "Know Thyself" নিজেকে জান। এই আত্মজ্ঞান বা নিজকে জানার সাধনাই ছিল আর্যঋষির পরমকাম্য। সক্রেটিসও এই বাণীই প্রচার করেছিলেন।

প্লেটো : শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্লেটো বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি Republic এবং Law গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার কাজ হচ্ছে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করা। "Education does not generate or infuse a new principle, it only guides and directs a principle already in existence") জোর করে শিশুর উপর শিক্ষাকে চাপিয়ে দেবার তিনি বিরোধিতা করেছেন। জোর করে চাপিয়ে দিলে তা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। প্রাথমিক

শিক্ষা হবে আনন্দময়। শিক্ষা আনন্দময় হ'লে শিশু-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার খোঁজ মিলবে—"Then do not use compulsion, but let early education be a sort of amusement, you will then be better able to find out the natural bent." (As quoted by Rusk in his Doctrines of the Great Educators).

Law গ্রন্থে তিনি শিক্ষায় খেলার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন। খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগকে আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ ভাবে কাজে লাগান হয়। প্লেটোর শিক্ষানীতির মধ্যে আমরা তার প্রথম সন্ধান পাই। তিনি ঐ গ্রন্থে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন। ছেলের বিদ্যালয়ে আসা পিতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হবেনা, দরকার হলে তাকে ছেলে পাঠাতে বাধ্য করা হবে। শিক্ষাকে তিনি কি চোখে দেখতেন Law গ্রন্থে তার আভাস পাই—শিক্ষা হচ্ছে "The first and fairest thing that the best of men can ever have." প্লেটোর শিক্ষা-ব্যবস্থায় সঙ্গীত ও দেহচর্চা দুই-ই স্থানলাভ করেছে। তিনি শিক্ষা সঙ্গীত দিয়ে শুরু করবার কথা বলেছেন; তারপর দেহচর্চা। মানসিক-শিক্ষার প্রাধান্য তিনি মেনে নিয়েছেন, দেহচর্চা ও সঙ্গীত দুই-ই আত্মার উন্নতি সাধন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

স্পার্টা : সোফিস্টদের শিক্ষাদর্শের বিপরীত আদর্শ দেখি স্পার্টায়। এখানে শিক্ষা ব্যক্তির প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হ'ত না—রাষ্ট্রের তথা সমাজের প্রয়োজনেই ব্যক্তিকে গড়ে তোলা হ'ত। শিক্ষাও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হ'ত। স্পার্টার শিক্ষায় পুঁথির কোন স্থান ছিল না। রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজনে শক্ত দেহ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তার বেশী শিক্ষা স্পার্টায় দেওয়া হ'ত না।

মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় শিক্ষাদর্শ (Principle of Mediaeval Christan Education) ঃ—

খ্রীষ্টধর্ম ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করবার সাথে সাথে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে যুগের শুরু হয় তাকে বলা হয় তিমিরাচ্ছন্ন যুগ। এ যুগে মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রাধান্য ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে। খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন মতবাদকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই যুক্তিবাদ বা চিন্তার স্বকীয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হ'ত। মধ্যযুগের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চার্চের কুক্ষিগত হয়—ব্যক্তি-সত্বার পূর্ণ বিকাশের আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লোপ পায়। খৃষ্টধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ধর্মীয় আচরণ ও রীতিনীতি শিক্ষাই ছিল সে যুগের শিক্ষার

আদর্শ। মধ্যযুগীয় খৃষ্টান শিক্ষাদর্শ প্রধানতঃ টমাস এ্যাকুইনাসের দান। তিনি বলেন, মানুষ আদিম পাপ (Original Sin) অঙ্গীকার করে জন্মেছে—তাই মানবশিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে। এই আদিম পাপের প্রতি আগ্রহের দমন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্যন্ত দেখি পিতাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—Break your child's will in order that it may not perish——Break its will as soon as it can speak plainly—or even before it can speak at all. It should be forced to do as it is told, even if you have to whip it ten times running.' (John Wesley).

মধ্যযুগে শিক্ষা প্রধানতঃ বক্তৃতাধর্মী ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে অধ্যাপক 'হাতে লেখা' বই থেকে বলতেন ছাত্ররা তা 'লিখে নিত' মুখস্থের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রাচীন সাহিত্য পাঠের রীতি চালু হওয়ায় ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হত।

নবজাগরণ (Reniessance) ঃ

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর ইউরোপে এক যুগ-পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবজাগরণে নতুন সাহিত্য নতুন শিল্পকলা, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন চিন্তাধারার জন্ম হল। তিমিরাচ্ছন্ন যুগের অবসানে মানুষ জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখল, সব বিষয় অনুসন্ধান করে যুক্তির আলোকে সত্যকে জানবার আগ্রহ তার মধ্যে দেখা দিল। শিক্ষাকে আর চার্চের কুক্ষিগত রাখা সম্ভব হল না। ধর্মক্ষেত্রেও সংস্কার আন্দোলন শুরু হল। সামগ্রিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে চর্চার একটা উদ্দীপনা সর্বত্র দেখা দিল। নব জাগরণের যুগে প্রাচীন গ্রীক প্রভাবে শিক্ষাদর্শে যে নতুন মতবাদ জন্ম নিল তা মানবতাবাদ (Humanism)।

মানবতাবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মের প্রভাবমুক্ত গ্রীক-রোমান সাহিত্য ও দর্শন, শিল্পকলা, চারুবিদ্যা প্রভৃতি মানবিক-বিদ্যা (Humanities) সমূহের চর্চা শুরু হয়। অন্ধ আনুগত্যের স্থানে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা স্বীকৃতি লাভ করে। শিক্ষায় মানবতাবাদের অন্যতম প্রচারক ইরাসমাস। মানবতাবাদীরা ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁরা গ্রীক ও রোমীয় আদর্শে শিক্ষায়-মানবিকবিষয়সমূহ (liberal subjects) প্রবর্তন করতে চাইলেন আর সেই সাথে যোগ করে দিলেন খৃষ্টান-মুক্তির আদর্শ। মানবতাবাদীরা শিক্ষাকে বাস্তবজীবনের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যুগ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারায় বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতি তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি।

ইরাসমাস

মানবতাবাদীদের আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টধর্মের গণ্ডিবদ্ধতা থেকে শিক্ষা মুক্তি লাভ করায় শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু মানবতাবাদিগণ পর্যবেক্ষণ-মূলক শিক্ষাধারা, জ্ঞানের ক্ষেত্রের বিস্তার, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেন নি। দর্শন, সাহিত্য, ভাষা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েই তাঁদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল। এই ত্রুটি দূর করতে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাদের শিক্ষায় বাস্তববাদী (realist) বলা হয়। স্পেনের লুই ভিভাসের সময় থেকে শিক্ষায় বাস্তববাদের (realism) গোড়াপত্তন হয়। সাহিত্য, দর্শনের সাথে সাথে তিনি তর্কবিদ্যা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন থেকে প্রসারিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রসারিত হয়। নতুন নতুন বিষয় শিক্ষার অন্তর্ভূত হওয়ায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

বাস্তববাদ

জন কোমেনিয়াস ঃ—

এই সময়ে ১৫৯২ খ্রীঃ মোরাভিয়ার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশিষ্ট সংস্কারব্রতী শিক্ষাবিদ জন কোমেনিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিতে আধুনিক যুগের প্রথম পথ প্রদর্শক কোমেনিয়াস। শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশের সাথে শিক্ষার স্তরবিভাগ ও সেই অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন উদাহরণের সাহায্যে ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিক্ষার ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শিক্ষা ঐহিক জীবনের সফলতা ও পারত্রিক জীবনের প্রস্তুতি উভয়ের জন্যই প্রয়োজন। শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপর কোমেনিয়াস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিশুর বয়সভেদে শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে শিশু ছয় বছর বয়স পর্যন্ত নার্শারী স্কুলে শিক্ষা পাবে। এই সময়ে গল্প, ছড়া, খেলাধূলা, হাতের কাজ, গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্তর ছয় থেকে বার বছর পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই সময় মাতৃভাষার সাহায্য নেওয়া হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মূর্ত বিষয়ের জ্ঞান ও ও ধীরে ধীরে কল্পনাশক্তি বিকাশের শিক্ষা দেওয়া হবে। এর পর মাধ্যমিক শিক্ষা। ক্রমবর্ধমান মানবদেহ ও মানবমনের বিকাশের ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোমেনিয়াস বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষার কথা বলেছেন।

শিশুর মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা শান্ত নির্জন পরিবেশে

বিদ্যালয় নির্মিত হবে। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু জ্ঞান লাভ করবে। যতটা সম্ভব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতে হবে। শিশুর শিক্ষা পুথিনির্ভর হবে না। প্রত্যক্ষ উদাহরণের মাধ্যমে সে যে শিক্ষালাভ করবে তাই তার মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

জন লক ঃ—

নবজাগরণের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে যে বিপ্লব দেখা দেয়, তার ফলে যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করে। মানুষ বহুদিনের অন্ধ সংস্কার ও যাজক সম্প্রদায়ের আরোপিত বাধা নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্তি প্রয়াসী হয়ে উঠে ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। কোমেনিয়াসের শিক্ষাসংস্কার মূলক প্রয়াস এই সামগ্রিক সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব-প্রচেষ্টারই অঙ্গ। কোমেনিয়াস শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন ও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আমরা মনো-বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রচেষ্টার সন্ধান পাই। সেদিক থেকে তিনি নতুন যুগের অগ্রদূত।

কোমেনিয়াসের পর ইংলণ্ডের দার্শনিক **জন লকের** শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-ধারা পরবর্তী শিক্ষাবিদদের প্রভাবিত করেছিল। তার মতামত বহুল পরিমাণে কোমেনিয়াসের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিক্ষায় লক ছিলেন কিছুটা প্রয়োজন বাদী। আমাদের জীবনের সাথে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক আছে, জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন আমরা তাই শিখব।

লক খেলাভিত্তিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে, শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, খেলার মাধ্যমই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। লককে খেলাভিত্তিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যায়।

লক শিক্ষায় স্মৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর শৃঙ্খলা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক যুগের সাথে তুলনীয়। তিনি বলেন, বেতের সাহায্যে শিক্ষক যা শেখাতে চান, শিক্ষার্থীর মনে সে সম্পর্কে অনুরাগ না জন্মে বিরাগই জন্মে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান লকের এ-কথাই সমর্থন করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতে সপ্তদশ শতাব্দীতে শিশুর জানার আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি যে শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন, তা তাঁর পরবর্তী কালের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের খোরাক জুগিয়েছে। তাঁর বহু মতামতই আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য না হলেও তিনি তাঁর যুগে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে লকের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে প্রতিটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ।

রুশো ঃ—

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবী ধ্বনিত হয় প্রথম রুশোর কণ্ঠে। এর আগে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী এত বলিষ্ঠ-ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। এর আগে শিশু ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, তার মানসিক প্রবণতা— কোন কিছুরই মূল্য ছিল না। রুশোই প্রথম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেন। শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন।

তিনি বলেন, মানুষের তৈরী কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। শিক্ষায় তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তাঁর মতে শিশু প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করবে না, শিক্ষাব্যবস্থাই ক্রমবর্ধমান শিশুকে অনুসরণ করবে। রুশোর শিক্ষা প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষা। রুশোর শিক্ষাপদ্ধতিও এই প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত। তাঁর শিক্ষানীতির ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে তিনি 'এমিল' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। এমিলের জীবন-কথার মধ্য দিয়ে রুশো তাঁর শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শের বাস্তব দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

রুশো শিশু জীবনের পরিণত রূপ লাভ করবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরের পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকালকে দৈহিক বিকাশ ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের শিক্ষাকাল বলা চলে। গৃহের কারাগার থকে শিশুকে মুক্তি দিতে হবে। শাসন বাহুল্য থাকবে না, আদর দিয়েও তাকে বিগড়ে দেওয়া হবে না। খেলাধুলা করবে স্বাধীন ভাবে, স্বাভাবিক পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা চলবে বার বছর বয়স পর্যন্ত। এ স্তর নেতিবাচক শিক্ষার স্তর। মানুষের সমাজের বাইরের উদার প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে শিশু শিক্ষালাভ করবে। গতানুগতিক কোন শিক্ষার ব্যবস্থা এই স্তরে থাকবে না, বইয়ের বোঝা চাপিয়ে মনকে পিষ্ট করা হবে না। খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে সে প্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তব শিক্ষালাভ করবে। বাইরের প্রকৃতি সম্পর্কে তার মনে কৌতূহল জাগবে, কৌতূহল মেটাবার জন্য সে নানা-রূপ প্রশ্ন করবে, এ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে, গল্প বলে তার জানার স্বাভাবিক তৃষ্ণা মেটাতে হবে ও তিরস্কার বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করান হবে না। প্রকৃতিই হবে শিশুর শিক্ষক, প্রকৃতিই তার বিচারক।

তৃতীয় স্তরে শিক্ষা পনের বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এসময় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষকের মুখ থেকে শুনে শিখবে।

রুশো ছিলেন বইয়ের বিরোধী। শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার জন্য শিল্প শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন।

চতুর্থ স্তরে শিক্ষায় শিশুর সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। রুশো শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও, শিশু সমাজবিরোধী হয়ে উঠতে পারে এমন শিক্ষার কথা তিনি বলেননি। তাই ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সাথে শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজ-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

রুশোর দোষত্রুটি ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ প্রদর্শক। প্রকৃতির উদার মুক্ত প্রাঙ্গণ শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ—একথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনিই প্রথম জোরের সাথে বলেন। ইন্দ্রিয় পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিশুর আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতিকে রুশোর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে আভাষ দিয়েছেন সেই ইংগিতগুলি নিয়েই পরবর্তীকালে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়।

রুশো শিশুর নিজস্ব সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে মানসিক বিকাশের পথকে প্রস্তুত করবার নির্দেশ দিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পথ প্রস্তুত করেছেন।

পেষ্টালৎসী ঃ—

রুশোর চিন্তায় যা ছিল অস্পষ্ট, যা তিনি বলতে চেয়েছেন আভাষে-ইঙ্গিতে তাকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা দেখতে পাই পেষ্টালৎসীর মধ্যে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা পেষ্টালৎসীর শিক্ষা প্রয়াসের মধ্যেই দেখা যায়। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে তিনি গঠনমূলক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতি জেনেই স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন সম্ভব। সেই দিক থেকে তিনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে শিশুর বাস্তব বোধ বিকাশের একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর কাছে বিমূর্ত অপেক্ষা মূর্ত বিষয়ের অবদান বেশী, এটা বুঝতে পেরে তিনি শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের ব্যবহার সুরু করেন। ফ্রয়েবেল ও মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে বহুবিধ উপকরণের ব্যবহারের পশ্চাতে পেষ্টালৎসীর প্রভাব রয়েছে। শিশুর শিক্ষায় মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, একথার মধ্যে তিনি বলছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে তার বিকাশ লাভ ঘটবে। এই বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার কাজ।

হার্বার্ট ঃ—

পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল, যার জন্য তিনি আদর্শের সাথে বাস্তবের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে পারেন নি। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি যে কাজ সুরু করেছিলেন তাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে এগিয়ে আসেন হার্বার্ট। রুশো ও পেষ্টালৎসী শিশু শিক্ষায়—শিশুর মনকে জেনে তার শিক্ষাব্যবস্থা করা উচিত —একথা বুঝেছিলেন। তাঁরা এ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। হাবার্ট তাকে বাস্তবে রূপ দেন।

হার্বার্ট শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে অনুসরণ করে চারটি স্তর বা সোপান রচনা করেছেন। এই স্তর বিভাগ অনুসারে তিনি শিক্ষাপদ্ধতিরও চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। হাবার্টের শিক্ষাপদ্ধতির চারটি স্তর হচ্ছে স্পষ্টতা, পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন, সূত্র নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি। প্রথম স্তরটিকে ভেঙ্গে পরে প্রস্তুতি ও উপস্থাপন এই দু'টি স্তর বিভাগ করা হয়।

জ্ঞান এক ও অখণ্ড, এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বসঞ্চিত ধারণার সাথে সুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে নতুন ধারণা গড়ে উঠে ও চিন্তাধারার ঐক্য সাধিত হয়—এই মতবাদকে আশ্রয় করেই অনুবদ্ধ প্রণালীর সৃষ্টি হয়।

আধুনিক পদ্ধতি বিজ্ঞানের বহু পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু সবকিছুর মূলে রয়েছে, শিশুকে জানা ও তার মনে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করা। শিশু-মনের আগ্রহকে কেন্দ্র করেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে। হার্বার্টের পঞ্চ সোপান শিক্ষাপদ্ধতি কিছু পরিমাণে যান্ত্রিক হলেও শ্রেণী শিক্ষায় এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। হার্বার্ট শিক্ষককে দর্শকের ভূমিকায় স্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের যে একটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে তার স্বীকৃতি হার্বার্টের মধ্যে পাই। শিক্ষায় অনুবদ্ধ প্রণালীর কার্যকারিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। হার্বার্ট শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন।

ফ্রয়েবেল ঃ—

শিশু উদ্যানের সার্থক স্রষ্টা ফ্রয়েবেলের অভিনব শিশুশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা-জগতে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন ফ্রয়েবেল। তিনি

বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। এই আত্মবিকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাগানের ছোট ছোট গাছগুলি যেমন তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তেমনি শিশুরা বিদ্যালয়ে সযত্নে পালিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করবে। ফ্রয়েবেল তার বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছেন শিশুউদ্যান (Kindergarten)। খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু উদ্যানের শিশুদের জন্য। প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছ, ফুল, পাখী, পশু প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে নানা জ্ঞান শিশুরা আহরণ করে। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশুদের মনমাতানো গান ও ছড়া। গল্প বলে শিক্ষার ব্যবস্থা তার পদ্ধতির আরেক বৈশিষ্ট্য। শিশুউদ্যানের অভিনবত্ব শিক্ষায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব অনস্বীকার্য।

মেরিয়া মণ্টেসরী ঃ—

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, বিংশ শতাব্দীতে সে প্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ করে। ভাববাদী শিক্ষা-দার্শনিকগণ তাঁদের শিক্ষাদর্শকে বাস্তব রূপায়িত করবার জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেছিলেন, বিংশ শতকে তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রয়েবেলের পর যে মহিলা নব নব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করেছেন তাঁর নাম মেরিয়া মণ্টেসরী। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির ন্যায় মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্র শিশু-শিক্ষার পদ্ধতিরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

রুশোর পরবর্তী অন্যান্য শিক্ষাবিদের মত মণ্টেসরীও রুশোর আদর্শদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক। প্রতিটি শিশুর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে তার বিকাশের স্তর অনুসরণ করে। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন শ্রেণীশিক্ষা অবৈজ্ঞানিক।

মণ্টেসরী শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা। প্রতিটি শিশু নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী একক ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে। শিশুর স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শেখার সুযোগ দেওয়া হয়। মণ্টেসরীর শিক্ষানিকেতনে শিক্ষিকা নেই, আছে পরিচালিকা। তিনি শাসন করেন না, সাহায্য করেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন Didactic Apparatus পরিকল্পনা করেছেন। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একসাথে

শেখান হয়। শ্রেণীশিক্ষার বিলোপ সাধন করে তিনি যে শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা শিক্ষাক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

ডিউই ঃ—

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা যে দু'জন শিক্ষাবিদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে, জন ডিউই তাঁদের অন্যতম। মণ্টেসরী ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি মনোবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে সে সব সূত্রের প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডিউই ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তার শিক্ষা-প্রচেষ্টা ও শিক্ষাদর্শন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

ডিউই বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু শিক্ষা সমাজ জীবনের অঙ্গ, তাই শিক্ষার সাথে সমাজ জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদভাবে জড়িত। তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশুর শিক্ষা তার বর্তমানের সাথেই জড়িত, এ শুধু বাঁচবার জন্য ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি নয়— বেঁচে থাকার ক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা।

ডিউই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম Laboratory স্কুল। এইটিই হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রথম গবেষণামূলক বিদ্যালয়। এখানেই ডিউই প্রথম সমস্যামূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ করেন। ডিউই স্কুলের ছেলেরা চার থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত নানা রকম কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। পূর্বনির্দিষ্ট বাঁধাধরা কোন শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না স্বতন্ত্রভাবে কোন বিষয়ও এখানে শেখান হয় না। শিক্ষার্থীরা নানারকম গঠনমূলক কাজ কর্মের মধ্যদিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে। বিদ্যালয় এখানে বৃহৎ মানবসমাজেরই প্রতিচ্ছবি। শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষা এখানে এগিয়ে চলে। শিক্ষা এখানে অনাগত জীবনের প্রস্তুতি। শুধু প্রস্তুতি নয় শিক্ষাই জীবন। বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক আছে বলেই ছেলেরা এ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। ব্যক্তির প্রয়োজনে ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দিক থেকেই মানুষকে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ। ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার দুই লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার কথা বলেছেন ডিউই। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদায় কোন বিরোধ নেই—এখানে একে অপরের পরিপূরক।

শিক্ষার সর্বব্যাপক রূপটিকে ডিউই যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁর পূর্বে শিক্ষাকে সে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর বিচার করা হয়নি। শিক্ষাই জীবন ও শিক্ষা জীবনের সমব্যাপী। শিক্ষাসম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন।

প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method) ঃ—

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর Problem Method থেকেই তার শিষ্য কিলপ্যাট্রিক Project Method প্রবর্তন করেন।

বাস্তব সমাজের পরিবেশে বাস্তবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে প্রজেক্ট পদ্ধতি পরিকল্পিত হয়েছে।

প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্যামূলক কাজ- যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে একক বা যৌথভাবে দেওয়া হবে, তা হবে সমস্যামূলক। শিক্ষার্থীরা সেই সমস্যার সমাধান করবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। কিলপেট্রিক বলেছেন প্রজেক্ট হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত হবে।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রতি কাজের পিছনে থাকবে একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যার পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য। সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হলে তারা সেই সমস্যাটির সমাধান করবে। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়েই কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বুনিয়াদি পদ্ধতি (Basic Method) ঃ—

কর্মকেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির মত শিল্পকেন্দ্রিক (craft centred) বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন গান্ধীজী। কর্মের সাথে জ্ঞানের বন্ধন করে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের যে ব্যবধান তা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছেন। গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিতে গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার পথকে ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুকে কারিগর বানানো বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধাতির লক্ষ্য নয়। এ শিক্ষায় শিশু যান্ত্রিক ভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবে।

শান্তিনিকেতন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ—

ভারতের যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের স্কুল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "অনন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলার

জন্য যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।" তাই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেন নি। পল্লী প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুশিক্ষার আয়োজন করেছেন শান্তি-নিকেতনে। প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে তিনি শিশুর শিক্ষায় এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সমন্বয়ে এক নতুন শিক্ষাদর্শের সন্ধান আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় পাই।

অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ঃ—

গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে, সেই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি মিস্ পার্কহার্ষ্ট উদ্ভাবিত **ডাল্টন পদ্ধতি**। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, স্বয়ংক্রিয়তা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়। ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা দূর করে শিশুকে নিজের খুশীমত পড়বার অব্যাহত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সুসজ্জিত পাঠকক্ষে শিক্ষার সব সরঞ্জাম রয়েছে, শিক্ষক রয়েছেন সাহায্য করবার জন্য, শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা মত পড়া বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব স্থিরীকৃত পাঠটি তৈরি করে নিচ্ছে। ডাল্টন পদ্ধতির মূল কথা স্বাধীনতা। এখানে নিজের ইচ্ছামত কাজের যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমনি ইচ্ছা করলে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুযোগও রয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, দায়িত্ববোধ জন্মায়, যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি বলে কাজ করবার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক হয়।

উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিশুর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রতিটি শিশুর পক্ষে সব বিষয়ে একই হারে উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে প্রধান বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে। গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। আবার শ্রেণী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে দেওয়া হয়নি। এখানে একই সাথে একটি শিক্ষার্থী তিনটি শ্রেণীতে পড়তে পারে। যে বিষয়ে যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে তার পরিমাপে সে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নেবে। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা প্রচেষ্টায় শ্রেণী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে উইনেটকা শিক্ষা পদ্ধতিতে উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

বাটাভিয়া শিক্ষা পদ্ধতিতে পিছিয়ে-পড়া ছাত্ররা যাতে অবহেলিত না হয়, আর মেধাবী ছেলেদের অগ্রগতি যাতে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্য ব্যাহত না হয়, সে দিকে পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে।

ওভাইড ডেক্রলী প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় হয়েছে। ডেক্রলীর শিক্ষানীতির মূলকথা হচ্ছে জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষা হবে বাস্তবজীবনের অঙ্গ, ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যদিয়েই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করবে। ডেক্রলী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ফলশ্রুতি ঃ—

আধুনিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আমেরিকায়। কি করে শিক্ষাপদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোলা যায় এ বিষয়ে শিক্ষাবিদরা সেখানে গবেষণায় রত। এই গবেষণার ফলেই আমরা পেয়েছি প্রজেক্ট পদ্ধতি, ডাল্টনপদ্ধতি, উইনেটকা পদ্ধতি, বাটাভিয়া পদ্ধতি। সব শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ একই রকম ভাবে হয় না। সব ছেলের শিখবার ক্ষমতা একরকম নয়। বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের জন্য একই পদ্ধতি সমান ভাবে কার্যকরী হয় না। 'বুদ্ধ্যঙ্ক' (I. Q.) নির্ধারণের পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে বুদ্ধির পরিমাপ করে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হচ্ছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাধারণ বুদ্ধিমান, হ্রস্ববুদ্ধি ছেলের জন্য একই পদ্ধতি সর্বত্র সুফল দেবে না। তাই কোন একটা শিক্ষাপদ্ধতি কখনই সার্বজনীন হতে পারে না। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে মৌলিক বিষয়ে চিন্তার সমতা দেখা গেলেও এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি-সমূহের কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, এ বিচার করে গ্রহণ কি বর্জন করা সম্ভব নয়। গ্রহণযোগ্য কি বর্জনীয় কথাটা পদ্ধতির বিচারে আপেক্ষিক ভাবে গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণীগত শিক্ষায় যে পদ্ধতি কার্যকরী, ব্যক্তিগত শিক্ষায় সে পদ্ধতির কোন স্থান নেই। আবার ডেক্রলী পদ্ধতিতে দলগত ও ব্যক্তিগত উভয় প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষার বিলোপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে মিলে মিশে দলগত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিচিত্র শিশুমনের রহস্যময় বিকাশের ধারাকে একই সাধারণ সূত্রে বেঁধে নিয়ে সবার ক্ষেত্রে একই শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ গবেষণার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের আরো অনেক জানবার আছে। শিশুর মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তার গতি-প্রকৃতি আমরা

যতটা জানতে পেরেছি তার উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে পদ্ধতি-বিজ্ঞানের পরিবর্তন হবে। সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেও শিক্ষাব্যবস্থা জড়িত। পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার রূপান্তরের সাথে পদ্ধতি-বিজ্ঞানের রূপান্তর হবে, উন্নতিশীল হবে, আরো নির্ভুলতর হবে।

ভারতে শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তন ঃ—

শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষাপদ্ধতিতে যুগে যুগে যে বিবর্তন হয়েছে আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ তার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বর্তমান ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত, তার বুনিয়াদ পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষাজগতে একাধিপত্য বিস্তার করে, আজও বিরাজ করছে। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের শিক্ষাচিন্তা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। আমরা যখনই কোন আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলি, তা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ ভারতের জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁদের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অতি সামান্য চেষ্টাই হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ একক ভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক যুগ-সম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টায় দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের সাধনা। পরবর্তী কালে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হয়নি। এ সব আধুনিক প্রচেষ্টার প্রয়োগক্ষেত্র অতিসামান্য স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা কিছুটা পরিচিত হলেও এর প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তৃত নয়। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এঁদের সীমাবদ্ধ প্রভাবের ফলে এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত যে শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করেছি, তার যে-কোনরকম সংস্কারের প্রস্তাব আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির পটভূমিকায় বিচার করি। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে একটি মহান শিক্ষাদর্শ এদেশে প্রচলিত আছে। মুস্লিম যুগে বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থা ও আধুনিক যুগেও প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তিতরূপে বেঁচে ছিল ও আছে।

শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কীয় আলোচনা সুরুতেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা লোপ পাবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের তপোবনে, প্রাচীন ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে, বৌদ্ধবিহারে, টোলে, পাঠশালায়, মাদ্রাসা-মক্তবে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, সেখানে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা আমাদের জানা দরকার।

তপোবনের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরুগৃহে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত পবিত্র ও মধুর। তপোবনের আনন্দময় পরিবেশে গুরুগৃহে শিষ্যেরা 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা' গুরুর কাছ থেকে বিদ্যাগ্রহণ করতেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্কই ছিল সে যুগের বিদ্যার্জনের প্রধান মাধ্যম। তপোবনের বিলাস-ব্যসনহীন সরল অনাড়ম্বর পরিবেশে গুরুর বক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে উঠত। সে যুগে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সবাইকেই গুরুগৃহে নির্দিষ্ট সময় বিদ্যাভ্যাস করতে হত।

পাঠপদ্ধতি

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা ছিল মৌখিক। গুরুর কাছ থেকে শুনে শিক্ষার্থীরা রোজকার পাঠ মুখস্থ করত। না বুঝে কিছু মুখস্থ করবার উপায় ছিল না। সে যুগের পাঠপদ্ধতি উপক্রম (প্রস্তুতি), শ্রবণ, আবৃত্তি, অর্থবাদ, ফল, উপপত্তি এই কয়টি স্তরে বিভক্ত ছিল। স্মৃতি ও মেধার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সূত্র সাহিত্য ব্যাখ্যা না করে দিলে বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল। কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে গুরু বুঝিয়ে দিতেন।

তক্ষশীলা

পরবর্তীকালে তক্ষশীলা ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। এখানেও আচার্যের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করত। একই গুরুর অধীনে ২০ জনের বেশী ছাত্র থাকত না বলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখতে পারতেন। একই গুরুর অধীনে ছাত্রসংখ্যা অধিক হলে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছেলেরা নবাগতদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করত। এদের বলা হত পিথিআচারিয়া। ভারতে সর্দার পোড়ো প্রথার এভাবেই সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। তক্ষশীলায় আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। বার বার আবৃত্তি করে অধীত বিদ্যাকে আয়ত্ত করা হত। গুরু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে দিতেন।

লিপির ব্যবহার প্রচলিত হলেও মৌখিক রীতির উপরই জোর দেওয়া হত। মৌখিক পদ্ধতির সাথে পুঁথির ব্যবহার ছিল। তবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় চিরদিনই মুখস্থের প্রাধান্য ছিল।

বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধবিহার-গুলিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল প্রধানতঃ মৌখিক। ভারতে শ্রেণীশিক্ষার প্রবর্তন বৌদ্ধ যুগেই বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিতেই সুরু হয়েছিল। বুদ্ধদেব আলোচনা, উপদেশ, গল্প, উপকথার সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গল্পবলে শিক্ষা দেওয়ার রীতিটি অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে স্থানীয় লৌকিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত।

বৌদ্ধশিক্ষা

নালন্দার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ই-ৎ সিঙ্ একটি সুন্দর বিবরণ রেখে গিয়েছেন। শ্রমণেরা ভোরে উপাধ্যায়ের সেবা করে ধর্মশাস্ত্রের একটি অংশ পাঠ করত, এবং যা পড়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করত। দিনের পর দিন এভাবে নতুন জ্ঞান অর্জন করত। মাসের পর মাস ধরে যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করত। নালন্দায় আবৃত্তি ও উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা থাকায় অধীত বিদ্যাকে উপলব্ধি না করে কেহ বিতর্কে সাফল্য অর্জন করতে পারত না। প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা প্রভৃতি এখানে অভ্যাস করান হত। শিক্ষা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় পদ্ধতিতে দেওয়া হত। নালন্দায় প্রতিটি উপাধ্যায়ের অধীনে ১০ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকত না। অধ্যাপকেরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর উপর নজর রাখতেন। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার ফলে উচ্চ মান বজায় রাখা সম্ভব হত।

নালন্দা

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব শিক্ষাকেন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল, দেশ-দেশান্তর থেকে জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা সেখানে এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করত। অধ্যাপকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা এখানে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে উচ্চশিক্ষার ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল। টোলের শিক্ষায়ও আমরা সেই পদ্ধতিকেই প্রত্যক্ষ করি। টোলের যুগে আলোচনা ও তর্কযুদ্ধ প্রায়ই হত। কূট প্রশ্নে ও চুলচেরা বিচারে কি করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা যায় শিক্ষার্থীর তাই একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিচার-আলোচনা ব্যবস্থা থাকলেও স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থের উপর অসম্ভব গুরুত্ব দেওয়া হত। টোলের পাঠক্রমের মধ্যে ব্যবহারিক

টোল

জীবনের প্রয়োজনীয় কোন বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন দক্ষ কারিগরের অধীনে শিক্ষানবীশ হয়ে সে বিদ্যা আয়ত্ব করতে হত।

মুসলিম যুগেও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুদের টোল ও পাঠশালায়, মুসলমানদের মাদ্রাসা ও মক্তবে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়াছে। উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুশিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যদিয়ে একটা প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হত। মক্তবে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মৌখিক। মক্তবে প্রধানতঃ ধর্মের পালনীয় রীতিনীতি ও কোরাণের অত্যাবশ্যক অংশ শিক্ষা দেওয়া হত। তবে প্রাথমিক লেখাপড়া ও অংক শেখান হত। উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা মুসলিম যুগের সুরু থেকে স্থাপিত হতে থাকে। মুসলিম শিক্ষা হিন্দু শিক্ষার মতই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বড় বড় সহরে মসজিদের সাথে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ আবাসিক। দূর দূর থেকে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত হত। শিক্ষার জন্য ব্যয় করা ধর্মের নির্দেশ বলে অনেক বিত্তবান মুসলমান ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করতেন। শিক্ষাপদ্ধতি ছিল ব্যক্তিগত।

মক্তব ও মাদ্রাসা

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে পদ্ধতি ছিল এবং এখনও যে পদ্ধতিতে শেখান হয়, তা অতি প্রাচীন। গ্রামীণ ভারতের অধিকাংশ পাঠশালায় যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয় তাকে আমরা বলতে পারি Traditional Method, স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে সামান্য রকমফের হলেও এখনও আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় পুরাতনের অনুবর্তন করছি। সে যুগের পাঠশালায় শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। মাটির উপর বালু বিছিয়ে কাষ্ঠফলকে, তালপাতা বা কলাপাতার উপর একটির পর একটি অক্ষর লিখে বর্ণমালা শেখাবার পদ্ধতি বহুদিন থেকে এদেশে প্রচলিত আছে। শিক্ষক একটি বর্ণ লিখতেন শিক্ষার্থীরা সমস্বরে তা উচ্চারণ করে কাষ্ঠফলকে লিখত। এখনও গ্রামের পাঠশালায় দেখা যায় ছেলে মেয়েরা তালপাতায় 'দাগ বুলাচ্ছে' লোহার শলাকা দিয়ে লেখার উপর ছেলেরা লিখছে। প্রাথমিক গণিত শিক্ষার জন্য শতকিয়া, গুণের নামতা প্রভৃতি সমস্বরে আবৃত্তি করে পড়বার অতি প্রাচীন পদ্ধতিটি আজও গ্রামের পাঠশালায় প্রচলিত আছে। পাঠশালায় কিছুদিন পূর্বপর্যন্ত যে অবস্থা ছিল তাকে ব্যক্তিগত ও শ্রেণী শিক্ষার মাঝামাঝি অবস্থা বলা চলে; সে সময়ে বছরের যে কোন সময়ে ছেলেরা পাঠশালায় ভর্তি হত। যোগ্যতা থাকলে মেধাবী ছাত্র এগিয়ে যেত, তাকে বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য বসে থাকতে হত না। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীকে গুরুমশায় তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য

পাঠশালা

নিযুক্ত করতেন। Monitorial শিক্ষা পদ্ধতির জন্ম ভারতের পাঠশালায় হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের স্বপ্ন আমরা দেখি। পাশ্চাত্যে শিশুশিক্ষা পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের আশা সুদূর পরাহত। সহরে সামান্য কয়েকটি K. G. বা মণ্টেসরী স্কুলগুলিতে ভারতের শিক্ষার্থীদের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই শিক্ষার সুযোগ পায়। গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দোষত্রুটি-ভরা সেকেলে যে শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ভাবে গুরুমশায় শিক্ষা দিতেন, এখনও সেই প্রাচীন পদ্ধতিটি চালু আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষা চালু হয়েছে। আগে একজন গুরুমশায় ২৫।৩০টি ছেলেকে একসাথে পড়াতেন। এখন সহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০০।৩৫০ ছাত্র; শিক্ষক ৫ কি ৬ জন। দেশীয় প্রাচীন পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতিকেই আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা বজায় রেখেছি। বাহ্যিক পরিবর্তন কিছুটা হলেও প্রকৃতিগত পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন ইংরেজ যুগ থেকেই সুরু হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণীগত শিক্ষার সুফল ব্যবস্থাকে প্রথম থেকেই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করলে সহজে ছেলেকে পাস করান চলে, শিক্ষকমহাশয়েরা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমত স্পষ্ট সে সব পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান থাকলেও তার প্রয়োগের কোন সুযোগ বর্তমান শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে নেই।

পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিক্ষাপদ্ধতির বহু উন্নতি হয়েছে। কি করে শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নততর করা যায়, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা যায়, ইউরোপ-আমেরিকায় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগের কোন প্রচেষ্টা আমরা দেখিনি। গুরুকুলের শিক্ষাপ্রচেষ্টা অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগপ্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। সমগ্রভাবে বিচার করলে আমরা দেখি আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের সুরুতে আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলাম আজও তার কোন পরিবর্তন আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে হয়নি।

কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ঃ

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (Theory of Activity in Education) ঃ—

শিক্ষায় সক্রিয়তাতত্ত্ব বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ঃ—আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সব আয়োজন শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের গতির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। আধুনিকপূর্ব যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু ছিল অবহেলিত। সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিশুর স্থান ছিল গৌণ ও তার ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। একটা নরম মাটির তাল নিয়ে তাকে যেমন খুশী রূপ দেওয়া যায়—শিশুকেও মনে করা হত সেই নরম মাটি। শিশুকে গড়ে তোলার কাজে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, ভাল লাগা মন্দ লাগা, এসব কথা ভাববার অবকাশ কারো ছিল না, ভাবা দরকার বলেও কেউ মনে করত না। শিশুর যে মন আছে আর সে যে শিশুমন সে যুগে একথা কেউ বুঝতে চাইত না। তখন শিক্ষার অর্থ ছিল শিশুকে ছকে বাঁধা একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা, শিশুজীবনের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তা করার কথা তখন কারো মনে আসত না। ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মধ্য-যুগীয় কৃত্রিম প্রাণহীণ শিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তির বাণী প্রথমে শোনান রুশো। তাঁর 'এমিল' গ্রন্থ শিশুমুক্তির প্রথম সনদ ; এই সনদের প্রথম কথাই হল শিশুকে স্বাধীনতা দাও—তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও। এই কর্মের স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই শিশুজীবন গড়ে ওঠে। তার মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার বিকাশলাভ ঘটে।

সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই শিশুর বিকাশ হয়

শিশুশিক্ষা সম্পর্কে রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ প্রচার হবার পর থেকেই ইউরোপে প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে কি করে তোলা যায় সেই প্রচেষ্টা সুরু হয়। শিক্ষাপদ্ধতি বিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখেছি এই প্রচেষ্টার ফলেই বহু মনীষীর সাধনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সহজ করে তোলার দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। কিণ্ডার-গার্টেন, প্রজেক্ট, মণ্টেসরী, বুনিয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হলেও এসব মনোবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনা ও শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে বিশেষ তারতম্য খুঁজে

মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত

পাওয়া যায় না। শিশুর সক্রিয়তা তার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা ও সৃজনী-শক্তিকে ভিত্তি করেই নানারূপ শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগে শাসনের রজ্জুতে বাঁধাশিশু

শিক্ষায় শিশু ছিল নীরব শ্রোতা। তার কিছুই করবার ছিল না। শিক্ষক একটি পূর্ণপাত্র, শিশুরূপ শূন্য পাত্রটিকে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করতেন শিক্ষক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার কসরৎ করাই ছিল শিক্ষকের কাজ। সেই বোঝা বইবার শক্তি শিশুর আছে কিনা তা দেখবার দরকার ছিল না। সেখানে শিক্ষকই সক্রিয়—শিশু নিষ্ক্রিয়। শিক্ষার অর্থ ছিল শিশুর মগজে বিদ্যাকে পুরে দেওয়া। শিক্ষা যে বিকাশ, সুপ্ত সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করাই যে শিক্ষকের কাজ একথা সেদিন কেউ ভাবত না। সক্রিয়তার পথ ধরে কি করে শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেতে পারে মধ্যযুগীয় শিক্ষাচিন্তায় এ কথা কারো মাথায় আসেনি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার শিশুর প্রাণশক্তির প্রকাশ তার নানা কাজের মধ্য দিয়ে। শিশুর এই স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে মনে করা হত শিক্ষা পথের অন্তরায়। নানারূপ শাসনের বাঁধনে রুদ্ধ করা হত শিশুর সক্রিয়তাকে।

শিশুর উপযোগী শিক্ষক

আজকের শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষাকর্মে শিশুই হচ্ছে প্রধান অঙ্গ। তাই আধুনিক শিক্ষায় পূর্বনির্দিষ্ট একটা পাঠক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে তার সমস্ত স্বাধীন প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে, মন আর দেহের দিক থেকে তার সমস্ত সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় না। শিশুর রুচি, চাহিদা, সামর্থ্য সব কিছু বিচার করতে হয়। শিক্ষা মানে কতকগুলি বই মুখস্ত করা নয়। তাই আধুনিক শিক্ষা পুঁথির বোঝায় ভারাক্রান্ত নয়। আজকের শিক্ষাবিদরা বুঝতে পেরেছেন গতানুগতিক পুঁথি ভারাক্রান্ত নীরস শিক্ষাকে সরস করে তুলতে হলে এমন আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার প্রতিটি কাজে শিশু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষাকর্মে শিশুর একটা বিশিষ্ট অংশ রয়েছে এ বোধ তার জন্মালে সে নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হবে। প্রতিটি কাজে সে আনন্দের সাথে অংশ গ্রহণ করবে। শিশুদের কাজের মূল্য যত বেশী দেওয়া হবে ততই কাজের আগ্রহ বেড়ে যাবে। কাজের মধ্য দিয়েই শিশু তার আত্ম-উন্মেষণের পথ খুঁজে পাবে।

শিশুজীবনের বিচিত্র বহুমুখী প্রকাশ দেখতে পাই শিশুর কাজের মধ্য দিয়ে। শিশু চির চঞ্চল, সারাক্ষণ সে কর্মব্যস্ত, কর্মই তার প্রাণ। এ স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতার পথকে রুদ্ধ করলে আবিলতার সৃষ্টি হবে। 'এ কোর না,' 'ও কোর না,' 'এটায় হাত দিও না'—এই 'না' এর বাঁধনে যদি শিশুকে

আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলা হয় তাহলে তার স্বাভাবিক কর্মশক্তির কোন দিনই বিকাশলাভ ঘটবে না। রুশো বলেছিলেন, শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার পিছনে বাঁধা সৃষ্টি কোর না, কৃত্রিম আরোপিত বাধা শিশুর শিক্ষার প্রতিবন্ধক স্বরূপ, তাই রুশো একথা বলেছিলেন। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু যেমন আত্ম-উন্মেষণের পথ খুঁজে পায়, তেমনি কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর সৃজনাত্মক কর্মশক্তি পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই সে যা আরম্ভ করবে তাই হবে তার সত্যিকারের শিক্ষা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেই শিশুর জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হবে।

কাজই শিশুর প্রাণ কাজের মধ্যেই শিক্ষার সুরু

শিশুজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সক্রিয়তা—দৈহিক ও মানসিক। আধুনিক বহু শিক্ষাপদ্ধতির পশ্চাতে এই নীতি বা তত্ত্বটিকে সক্রিয় দেখতে পাই। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় (naturally active)। শিক্ষার সহজাত সংস্কার সমূহ তার কাজের মধ্য দিয়েই প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। এ শিক্ষাও কাজের মধ্য দিয়ে, বাধাবিপত্তির মধ্যদিয়েই লাভ করা যায়।

শিশুর বৈশিষ্ট্য সক্রিয়তা

একটি সুস্থ সবল শিশুকে সুযোগ দিলে কিভাবে শিখবে সে সম্পর্কে A. Pinsent বলেছেন,"Given favourable oppertunities, the normal healthy child is active and alert during most of his working days, eager to explore, experiment, ask question, demand information, acquire skill wich promise to realize his purpose. He can and does, learn much by his own activities out of school without any formal instruction. Even in school only the child himself can learn. Nobody else can learn for him."

শিশু নিজেই শিখবে। স্কুলে কি স্কুলের বাইরে সে নিজের কাজের মধ্য দিয়েই শিখবে। তাকে সুযোগ দিতে হবে, তাহলেই সে নিজ থেকে শিখবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে। নিজের ইচ্ছায় কাজের মধ্যে শেখাটাই হবে তার স্বাভাবিক শিক্ষা।

স্বাভাবিক শিক্ষা

আগ্রহ ঃ—

শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষাকে যদি শিশুর জীবনের সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টার সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে সহজেই সে শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে উঠবে। মানুষ কতকগুলি সহজাত সংস্কার নিয়ে

। তার সব সংস্কারই একই সময়ে প্রকাশের পথ খোঁজে না। শিশু বয়সের কতকগুলি সংস্কার তার কাজের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হতে পারে। শিশু নতুন জিনিস চায়। তার মুখে 'কি ?' 'কেন ?' প্রশ্নে আমরা বিরক্ত হই। ধমকে বলি, "এত খবরে তোমার কি দরকার ?' আমরা ভুলে যাই শিশুর কাছে এই জগৎ একটা বিরাট বিস্ময় (wonder)। নতুন কিছু দেখলে অবাক বিস্ময়ে সে ভাবে—এ কি ? সে নতুনকে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

শিশুমনের আগ্রহ নানাকাজে সার্থকতা লাভ করে।

এই যে কৌতূহল (curiosity) এর থেকেই তার মনে জানার আগ্রহ জাগে। শিশুর অনুসন্ধিৎসু মন তাকে নানা কাজে প্রেরণা যোগায়। শিশুদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক কাজে তাদের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। যে কাজে বাধা-প্রতিবন্ধক রয়েছে সে কাজে ছেলেরা উৎসাহ পায়। কি করে কাজের অন্তরায় দূর করা যায় সেদিকে সে সচেষ্ট হয়। সমস্যা দেখা দিলে নিজেরাই অনেক সময় সমাধান খুঁজে বের করে। শিক্ষার সাথে সমস্যামূলক কাজ জুড়ে দিলে শিশুর মনে সমস্যা সমাধানের আগ্রহ জন্মায়। এই যে বাধাকে অতিক্রম করবার আগ্রহ, দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতামূলক কাজে উৎসাহ, তার পিছনে রয়েছে যুযুৎসু মনোভাব (Instinct of pugnacity)। দলগত কাজে ছেলেদের উৎসাহ খুব বেশী। শিক্ষায় এই দলগত মনোভাব (Herd Instinct) নানাভাবে কাজে লাগান যায়। প্রজেক্ট, মণ্টেসরী, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতির জনপ্রিয়তার কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখা যাবে ছেলেদের কাজের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে, সেই আগ্রহকেই নানা ভাবে এসব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সার্থকরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে।

যে শিশু দেহে ও মনে সুস্থ, সে কাজ করতে চাইবে। কর্মপ্রবণতা শুধু স্বাভাবিক নয়, একে সহজাত বলা যায়। শিশুকে দিয়ে কাজ করান কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে ঠিক কাজে শিশুকে প্রবৃত্ত করান, স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে ঠিক পথে পরিচালনা করা। একটি সুস্থ সমর্থ শিশু কাজ করতে চায় শিক্ষাক্ষেত্রে এটাই বড় কথা নয়, কি করে শিক্ষা সহায়ক কাজের পথে তাকে পরিচালিত করা যায় শিক্ষাবিদের সেটাই বড় সমস্যা। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিশুকে ঠিক কর্মে কি করে প্রবুদ্ধ করান যায় তার উপর। এজন্য কয়েকটি নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে শিশুর কাজের ধারাকে পরিচালিত করলে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

সহজাত কর্মপ্রবণতা শিক্ষা সহায়ক

শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে তা শিক্ষকের মনঃপূত না হলেও, বিশেষ ভাবে অনভিপ্রেত না হলে তার কাজে বাধা দেওয়া হবে না। প্রতি-

পদেই শিক্ষার ছকবাঁধা পথে তার কাজকে চালাতে চেষ্টা করলে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। শুরুতেই বাধা পেলে তার কাজের উৎসাহ থাকবে না, সে কাজ করতে চাইবে না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজের পথে বাধা পেয়ে শিশু যদি কর্মবিমুখ হয় তাহলে নতুন করে তাকে কাজের মধ্যে নিয়ে আসা কষ্টসাধ্য হয়। কাজ করবার সুযোগ তাকে দিতে হবে, কর্মপ্রবণতার উন্নতিকরণের (Sublimation) মধ্যদিয়ে তার কাজকে শিক্ষার পথে পরিচালিত করতে হবে।

কাজে বাধা সৃষ্টি ক্ষতিকর।

শিশু যখন কোন কাজ করে তখন তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। শিশুর কাজকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে জানতে হবে সে যা করছে তার পিছনে তার মনোগত ভাবটি কি? শিশুর কতকগুলি অভাববোধ থাকে, আবার কতকগুলি প্রয়োজনও থাকে। শিশুর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করবার মধ্য দিয়েই তাকে প্রয়োজনীয় বা ঠিক কাজের পথে চালিত করা যায়। শিশুরা খেলতে ভালবাসে। খেলার প্রতি তাদের যে স্বাভাবিক অনুরাগ তার মধ্য দিয়েই শিক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে।

কাজকে উদ্দেশ্যের পথে চালনা

শিক্ষককে শিশুমনের গতিপ্রকৃতি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জানতে হবে। শিশুর আগ্রহ ও বিশেষ সামর্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে তাকে তার উপযোগী কাজের পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। কেউ ছবি আঁকতে ভালবাসে, কেউ গল্প বলতে ভালবাসে, কারো খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। যার যেরূপ রুচি, তাকে সেরূপ সুযোগ দিতে হবে। সাধারণ শিশুচরিত্র ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই শিক্ষার্থীকে তার যোগ্য কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পথে নিয়ে যাওয়া যাবে।

রুচি মাফিক কাজ

শিশু সুন্দর কি অসুন্দর যে ভাবেই একটি কাজ সম্পন্ন করুক না কেন, তাকে সর্বদা উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষকের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিরুৎসাহিত হলে সে আর সাহস করে কিছু করতে চাইবে না। 'এই বুঝি ভুল হল' এই ভয়ে সে কাজের থেকে সরে দাঁড়াবে। সহানুভূতির সাথে তার ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে সে কাজে উৎসাহিত হবে। শিশু তার নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। শিক্ষক তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করবেন, কাজে সাহায্য করে উৎসাহ দিয়ে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করবেন। শিশুর কাজের বিরূপ সমালোচনা, সহানুভূতির অভাব, পদে পদে বাধাদান, বিরক্তিপ্রকাশ

শিক্ষকের উৎসাহ সম্ভাবনা বিকাশের সহায়ক

প্রভৃতি কারণে কাজের উৎসাহ নিভে গেলে তাকে আর কর্মে প্রবৃত্ত করান যাবে না।

শিশুকে কর্মে প্রবুদ্ধ করতে হলে, তার কাজকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে যেমন মনের গতি-প্রকৃতিকে জানতে হবে, সেই সাথে খোঁজ করতে হবে তার দৈহিক অবস্থা, গৃহপরিবেশ কাজের উপযোগী কি না। সুস্থ ছেলে কাজ করতে চায় এ আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি। যদি কোন ছেলে কাজ করতে না চায়, তাহলে বুঝতে হবে সে অসুস্থ—দেহে বা মনে। প্রায়ই দেখা যায়, এই উৎসাহহীনতার পিছনে রয়েছে দৈহিক অসুস্থতা। এ ছাড়া অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেদের মধ্যে মানসিক অবসাদ ও কর্মে অনাসক্তি দেখা যায়। দারিদ্র্যতাজনিত অপুষ্টি, বিশ্রামের অভাব, সুনিদ্রার অভাব, স্কুলের কাজের চাপে অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে ছেলেরা ক্লান্তিবোধ করে, কাজে কোন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখায় না।

দেহে ও মনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব

ছেলেদের কাজে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, একঘেয়ে কাজ করতে ছেলেরা বেশীদিন উৎসাহ বোধ করবে না। উপযুক্ত পরিবেশে বৈচিত্র্যময় কর্মের আয়োজন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের বন্ধনের মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য। প্রয়োজন মত শ্রেণীকক্ষের বাইরে মুক্ত অঙ্গনে ছেলেদের নিয়ে আসতে হবে। খেলাধুলা, নাচগান, অভিনয়, ছবি আঁকা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেদের নীরস পুঁথিগত শিক্ষাকে সরস করে তুলতে হবে। যে সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-পরিকল্পনা করা হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণসমূহ যথাসম্ভব ছেলেরাই তৈরী করবে বা সংগ্রহ করবে। কাজের পরিকল্পনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যদি ছেলেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে কাজের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে মানসিক ও দৈহিক সক্রিয়তার সমান প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে যে প্রজেক্টগুলি সম্পন্ন করবার জন্য নেওয়া হয় তা উদ্দেশ্যমূলক কাজ (purposeful activity)। এই কাজের মধ্য দিয়ে ছেলেরা যেমন আনন্দ পায় তেমনি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

বৈচিত্র্যময় কাজ

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও সক্রিয়তাতত্ত্ব ঃ—

শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করতে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে ভিত্তি করে নানারূপ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা শিশু-মনের গতি-প্রকৃতি বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করে বুঝতে পেরেছেন—শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীর

কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হবে। সক্রিয়তা বা শিশুর স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতা এই তত্ত্বকে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। রুশোর পরবর্তীকালে যত শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তার পিছনে এই সক্রিয়তা মতবাদের প্রভাব দেখা যায়।

রুশো তার মানসপুত্র এমিলের জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন—শিশুর শিক্ষা চলবে সম্পূর্ণ সক্রিয়তার পথে। রুশো প্রদর্শিত সক্রিয়তার পথ ধরেই এলেন পেস্টালৎসী। স্ট্যান্জে পেস্টালৎসী যে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে লেখাপড়ার সাথে হাতের কাজ যুক্ত করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গতানুগতিক শিক্ষার সাথে শিশুর মনোমতো কাজ জুড়ে দিলে আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে।

রুশো ও পেষ্টালৎসী

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ঃ—

ফ্রয়েবেল সক্রিয়তা তত্ত্বকে (Theory of Activity) আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ফ্রয়েবেল স্থাপিত প্রথম বিদ্যালয় শিশুশিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন সেখানে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা বাগানের কাজ করত, নানা রকম জিনিস তৈরী করত, কাজের মধ্য দিয়েই স্বাধীনভাবে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের পথ খুঁজে পেত। বাস্তব জগতকে চেনাবার জন্য, আর সেই সাথে কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার নানা কাজ আর কাহিনীর অবতারণা করা হত। পরবর্তীকালে ফ্রয়েবেল সৃষ্টি করলেন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি—খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় শিশুউদ্যানের শিশুদের জন্য। শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে বিভিন্ন রকম খেলা আর গানকে ভাগ করা হয়। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতিতে কাদা, বালি, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিস তৈরী শেখান হয়, এতে সৃজনী শক্তির বিকাশ, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি বেড়ে যায়। পেস্টালৎসী প্রথম হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ফ্রয়েবেল তার কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে হাতের কাজের সাথে গান, ছড়া, খেলা, ছবি আঁকা প্রভৃতি জুড়ে দেন। খেলা আর গানের আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, এর মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণা লাভ করে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি

মণ্টেসরী পদ্ধতি ঃ—

ডাঃ মেরিয়া মণ্টেসরী তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পনায় শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তা মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। শিশুরা স্বাভাবিক

ভাবেই কর্মপ্রবণ, শ্রেণীশিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, তাই শ্রেণীশিক্ষাকে তিনি তুলে দিলেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিখবার মত নানা ভাবে সুযোগ দেওয়া হয়। শিখবার সাজসরঞ্জাম দিলে শিশু নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে, এজন্য তিনি কতকগুলি খেলার উদ্ভাবন করেছেন। খেলার পদ্ধতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে নিজেরাই ভুল শুধরে নিতে পারবে। মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনে যথাযথ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মন্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শিক্ষার জন্য Sense training-এর ব্যবস্থা আছে। শরীর চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলা, গানের সাথে নাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে শিক্ষাকে শিশুর চোখে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। শিক্ষানিবাসের সাথে বাগানের ব্যবস্থা রয়েছে, বাগানের কাজের সাথে প্রকৃতি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হয়। পশুপালনের মধ্য দিয়ে প্রাণীজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। শিশুরা ছবি আঁকতে ভালবাসে। নানা রকম রঙীন পেন্সিল দিয়ে তাদের ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। মন্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুশক্তি বিকাশের সর্ববিধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

সমস্যাসমাধান পদ্ধতি ঃ—

ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সক্রিয়তা তত্ত্বকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন; তার সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদদের সক্রিয়তা তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ডিউইর পূর্বে সক্রিয়তা সম্পর্কে মনে করা হত কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকাশের সুযোগ পায়। ডিউই কর্মপ্রবণতা বা সক্রিয়তা তত্ত্বকে আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞান আহরণের পশ্চাতে এই সক্রিয়তা তত্ত্বই কাজ করে। কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায় না। দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা দেখে মানুষ কর্মবিরত হয় না, সে সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে সেই পথ ধরেই সে সত্যের সন্ধান লাভ করে। অর্থাৎ সত্যকে লাভ করতে হলে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ এই সক্রিয়তা তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিকে Problem Method বলা হয়। ডিউইর শিক্ষায় গতানুগতিক শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা

নেই। বাস্তব পরিবেশে প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সক্রিয় ভাবে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

প্রজেক্ট পদ্ধতি ঃ—

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। এই Problem Method থেকেই তাঁর শিষ্য কিলপ্যাট্রিক Project Method প্রবর্তন করেন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তত্ত্বকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রজেক্ট পদ্ধতির মধ্যেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রতিটি কাজ (Project)-এর পিছনে থাকবে একটা সমস্যা, এবং সেই সমস্যার পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য। সমস্যাটি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হলে তারা সেই সমস্যার সমাধান করবে ও সেই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সমগ্র কাজটিকে ভাগ করে নিয়ে এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে ছেলেরা কাজটি করে। স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছেলেরা কাজটি সম্পন্ন করে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজ চেতনার বিকাশ লাভ ঘটে। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষাকে কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করাই এই শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য।

বুনিয়াদী পদ্ধতি ঃ—

প্রজেক্ট পদ্ধতির সাথে প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় যতটা সম্ভব কাজের মধ্য দিয়ে অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্যদিয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে কয়েকটি শিল্প কর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর পরিবেশ অনুসারে এমন একটি শিল্পকর্মকে বেছে নেওয়া হয়—যার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে। এই পদ্ধতিতে মূল শিল্প থেকে অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে ছেলেরা নানা বিষয় জানবে ও শিখবে। এর মধ্যদিয়ে মানসিক ও দৈহিক উভয় দিকেই শিশুর উন্নতি সাধিত হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ডাল্টন পদ্ধতি ঃ—

মিস পার্কহার্স্টের উদ্ভাবিত ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যদিয়ে সক্রিয়তা তত্ত্বকে অন্যরূপে দেখি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা

দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী তার নিজের খুশী মত যে-কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবে। কাজের স্বাধীনতার ফলে শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ জন্মাবে। এই পদ্ধতিতে এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষের বাধা-নিষেধের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, দায়িত্ববোধ জন্মায়, যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি বলে কাজ করবার ও সমস্যা সমাধানের পথে সহায়ক হয়। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় ও অপরের মতামতকে মূল্য দিতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। কাজের স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে শৃঙ্খলাবোধ জন্মায় ও স্বভাবজাত শৃঙ্খলা দ্বারা তার কাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ঃ—

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ যেমন সক্রিয়তা তত্ত্বকে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে গ্রহণ করেছে, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও শিক্ষার্থীর কর্ম-প্রবণতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগবার চেষ্টা হচ্ছে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে (co-curricular activities) বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুকে গ্রন্থকীট করে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। সহ-পাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যদিয়ে শিশুর শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে অন্যান্য বিভিন্ন শক্তির বিকাশ লাভ ঘটে। লেখাপড়া আর খেলাধূলা পরস্পরবিরোধী নয়, গতানুগতিক শিক্ষায় এই কথা স্বীকার করে নিয়ে সক্রিয়তা তত্ত্বকেই গ্রহণ করেছে। গতানুগতিক কি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয়তা তত্ত্বের প্রভাব আজ অনস্বীকার্য।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

যুক্তিসিদ্ধ ও মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি (Logical and Psychological Method) ঃ—

শিক্ষায় আমাদের সামনে থাকে শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হলে জানতে হয় তার স্বরূপ—তার মনের গঠন। কিভাবে কি উপায় অবলম্বন করলে, কোন রীতিতে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর মন তাকে গ্রহণ করবে—এসব জেনে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। আবার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে রীতি বা পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হবে, যে ভাবে বিষয়বস্তুকে ভাগ করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে

ধরা হবে তা যুক্তিনির্ভর কিনা তা দেখতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের পিছনে দু'টি প্রভাব সক্রিয়—একটি মনস্তত্ত্বের দিক, অপরটি যুক্তির দিক। শিক্ষাদান একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা দিতে গিয়ে খেয়ালখুশীমত চললে শিক্ষা সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীতে কতকগুলি শিক্ষাসম্পর্কীয় মূলনীতি (Maxims of Education) মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এই মূলনীতিগুলি হয় যুক্তিসিদ্ধ (Logical), না হয় মনস্তত্ত্ব নির্ভর (Psychological)। শিক্ষাদানে আমরা যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি।

যুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি (Deductive), আরোহী পদ্ধতি (Inductive), বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical and Synthetical Method) প্রভৃতি অনুসরণ করা হয়।

অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সাধারণ সূত্র বা সত্য উপস্থাপন করে তারপর উদাহরণ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা হয় (from General Particular)। মানুষ মরণশীল এই সাধারণ সত্য থেকে—রাম, শ্যাম মানুষ, তাই মরণশীল এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আসি।

আরোহী পদ্ধতিতে স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি উদাহরণ বিচার করে তার মধ্য থেকে সাধারণ গুণটি—যার মাধ্যমে উদাহরণগুলি একই সূত্রে আবদ্ধ হয় সেই গুণটিকে বেছে নিয়ে সাধারণ সত্যে এসে (from Particular to General) পৌছান হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগুনের সাথে ধোঁয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখেই সিদ্ধান্ত করি ধোঁয়ার অস্তিত্ব আগুনের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে একটি বস্তুকে নিয়ে সেই বস্তুটি যে সব উপাদানে গঠিত হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করে তার প্রতিটি দিকের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দেহ-বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটি বস্তুর সমগ্র রূপটিকে একসাথে নিয়ে তারপর তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অংশ থেকে পূর্ণের দিকে (from parts to whole) যাই, আর সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে আমরা পূর্ণ থেকে অংশের (whole to parts) দিকে যাই।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বকে স্বীকার করেও আমাদের মনে রাখা দরকার যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই যে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সহজতম পথ—এ ধারণা ঠিক নয়। যুক্তির বিচারে আমরা মনে করি, যে

শিক্ষায় আমরা অংশ থেকে সমগ্রের দিকে যাই সেই পদ্ধতিটাই ঠিক। একটু একটু করে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে তার পক্ষে বোঝবার সুবিধা হবে। কিন্তু সাহিত্য পাঠে দেখা গিয়েছে সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে তারপর তার আলোচনা করলে সে যেভাবে বিষয়বস্তুর রস গ্রহণ করতে পারে, খণ্ড খণ্ড করে বিষয়টি পরিবেশন করলে সে ভাবে উপভোগ করতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের গঠন, শিশুর গ্রহণের ক্ষমতা, শিশুমনের গতি-প্রকৃতি সবকিছু বিচার করে নির্ধারিত হয়। মনের স্বাভাবিক গতিকে অনুসরণ না করে যদি শুধু মাত্র যুক্তি-নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেই শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক হবার সম্ভাবনা কম। কারণ, দেখা গিয়েছে যুক্তির বিচারে আমাদের কাছে যা সহজ বলে মনে হয়, শিশুর কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। যেমন শিক্ষায় সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার মূলনীতিকে আমরা মেনে চলি—এটা যুক্তির দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ব্যাপারটা ঠিক তত সোজা নয়। সহজ (simple) কথাটা আপেক্ষিক (relative), একে শিক্ষার্থীর মানসিক গঠনের পটভূমিকায় দেখতে হবে। যুক্তির বিচারে সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি একটি শব্দ শেখানো সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়াছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে শুরু করলে ভাষা-শিক্ষা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। সহজ বিচারটা সব সময় যুক্তি দিয়ে হবে না, হবে শিশুর গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিয়ে।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে বা তার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বা অপরিণত মস্তিষ্ক যা গ্রহণ করতে পারবে না এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা জানি মূর্ত (concrete) বস্তু শিশুর কাছে যত সহজবোধ্য ও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যত সহজ, বিমূর্ত বস্তুর (abstract) মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া ততটা সহজ নয় ও মানসিক গঠনের একটা বিশেষ স্তরে না পৌছান পর্যন্ত বিমূর্ত জিনিসকে শিশু তার কল্পনার মধ্যে আনতে পারে না। তাই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়ার কথা বলা হয়। তেমনি শিশু যখন নতুন জ্ঞান আহরণ করে তখন তার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই শেখে। এ জন্য মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়ার পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষায় যুক্তিসিদ্ধ ও মনস্তত্ত্বসম্মত উভয় পদ্ধতির পিছনে শিক্ষার যে সব মূলনীতি (Maxims) আছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। উভয় পদ্ধতিতেই শিশু-শিক্ষার উপযোগী যে রীতি ও প্রণালী রয়েছে

স্থান, কাল ও পাত্রকে বিচার করে যদি তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় তা হলে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

যুক্তির পথ বনাম মনোবিজ্ঞানের পথ (Logical vs. Psychological) ঃ—

আমরা শিক্ষায় যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় শিশু-মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োজনের দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষয় বস্তুর উপস্থাপনায় আমরা যুক্তিনির্ভর পথ অনুসরণ করি। নির্দিষ্ট পাঠের পর্ব বিভাগ করে যুক্তিসিদ্ধ পথ ধরে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করি। শিশু-মনোবিজ্ঞান নির্দিষ্ট বিষয়পাঠে শিশুমনে কি প্রতিক্রিয়া হল তা বিচার করা হয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিচার করে যুক্তিসিদ্ধ পথের সংস্কার করতে হবে। যখন যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় তখন সেখানে আমাদের বিচার বুদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে। শিশুর মন তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা হয়ে দাঁড়ায় গৌণ। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় মনোবিজ্ঞানের পথই প্রশস্ত। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার নীতি অনুসারে অঙ্কনের ক্ষেত্রে সরল রেখা প্রভৃতি আঁকিয়ে হাত পাকালে একটি পুরো চিত্র আঁকা সহজ হয়। শিশুর সামনে একটি পশুর চিত্র রেখে তাকে বিভিন্ন রকমের রেখা আঁকতে দিলে সে বিশেষ উৎসাহ বোধ করবে না। সে প্রথমেই গোটা ছবিটা আঁকতে চাইবে। শিশুর মনের দিকে চেয়ে শিশুর চাওয়াকেই মেনে নিতে হবে। শিশু কিছুটা অগ্রসর হলে শিশুর চিন্তায় শৃঙ্খলা আসে—তার চিন্তা ধারা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুমন অপরিণত—এই অপরিণত অবস্থায় সে যা গ্রহণ করতে পারবে, যে পথে অগ্রসর হলে তার পক্ষে শেখা সহজ হবে শিশুর শিক্ষায় সেই পথই অনুসরণ করতে হবে, যুক্তির পথ আমাদের নির্দেশ দেয় 'যা হওয়া উচিত'—কিন্তু শিশুর পক্ষে উচিত-অনুচিত জ্ঞান জন্মাবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীর অবদান পরিণত বুদ্ধির কাছে। মনোবিজ্ঞানের প্রণালীতে শিশুর কি হওয়া উচিত ছিল, সেটা বড় কথা নয়, শিশু যে অবস্থায় আছে সেখান থেকেই তার যাত্রা শুরু। শিশু মনের গতি-প্রকৃতিকেই মনোবিজ্ঞানী জানতে চাইবে—তার শিক্ষা মনের গতিকেই অনুসরণ করবে। শিক্ষায় আমরা মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই যুক্তিসিদ্ধ পথে পৌঁছাতে পারি। যখন শিক্ষায় শিক্ষার্থী অপেক্ষা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ছিল তখন শিক্ষক শিশুমনের দিকে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিষয়বস্তুর সুসংবদ্ধ বিন্যাসের উপরই জোর দেওয়া হত। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে

অগ্রসর হবার যুক্তিনির্ভর যে প্রণালী আমরা এতদিন অনুসরণ করেছি শিশু-শিক্ষার পক্ষে সে পথই সর্বোত্তম পন্থা নয়। সহজ থেকে জটিলের দিকের নীতি আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যুক্তির বিচারে যা সহজ, শিশুর মন তাকে সব সময় সহজ বলে মেনে নিতে চায় না। তাই আজকের দিনে ভাষাশিক্ষায় একটি শব্দ শিখিয়ে শুরু না করে বাক্য দিয়ে শুরু হয়—শিশু সম্পূর্ণ মনের ভাবকে প্রকাশ করতে সুযোগ পেলে তার শেখা সহজ হয়।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা-বিকাশ লাভ যাতে হয় শিক্ষক সেই চেষ্টাই করবেন—তবে তা শুরু হবে শিশু মনোজ্ঞিানকে অনুসরণ করে। শিক্ষায় যুক্তির পথে আমাদের আসতে হবেই কিন্তু শিশুর মন ও তার বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্বে তার উপর কিছু চাপিয়ে দিলে তার ফল শুভ হয় না, সেইজন্য তার মন প্রস্তুত করতে হবে। শিশুর জ্ঞানের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়বে। শিশুর শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার মানসিক গঠন উপযুক্ত হলে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী শিক্ষায় প্রয়োগ করতে পারা যায়।

যুক্তিসিদ্ধ ও মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রয়োগঃ—

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে জেনে তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা! শিশুর শিক্ষায় তার রুচি, আগ্রহ, ক্ষমতা, সক্রিয়তা সবকিছু বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাই বলে মনোজ্ঞিান সম্মত শিক্ষার পিছনে কোন যুক্তি নেই একথা কেউ বলবে না। যুক্তিসিদ্ধ শিক্ষা প্রণালী প্রধানতঃ বিষয়াশ্রয়ী হওয়ার ফলে একটা নির্দিষ্টক্রম বা ধারাকে অনুসরণ করতে হয়। তাই শিক্ষার্থীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা আগ্রহের উপর নির্ভর করা এখানে সম্ভব নয়। যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে চললেও শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিকাশে সাহায্যই এর মূল লক্ষ্য। মনে রাখতে হবে শিশু কিছুটা পরিণত না হলে, শিক্ষণ কিছুটা অগ্রসর না হলে যুক্তিসিদ্ধ রীতি প্রয়োগ সম্ভব না।

শিশু ধীরে ধীরে যুক্তি প্রবণ হয়ে উঠে। বিমূর্ত বিষয়কে যুক্তির সাহায্যে বুঝতে পারে। যুক্তির সাহায্যে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। মনোবিজ্ঞান সম্মত পথই তাকে যুক্তির পথে পরিচালিত করে। আবার মনোবিজ্ঞান সম্মত যে প্রণালীই আমরা অনুসরণ করিনা কেন তাকে যুক্তিনির্ভর হতে হবে। এদিকে মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই আমরা যুক্তির পথে পৌছাই তাই যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীও মনোবিজ্ঞান নির্ভর হয়ে উঠে।

আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠক্রম যদি বিচার করি তাহলে দেখি শিক্ষাদান

কালে আমরা যুক্তিসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান সম্মত দু'টি প্রণালীর প্রয়োগই করেছি। ইতিহাস জ্ঞানমূলক পাঠ। জ্ঞানমূলক বিষয় পাঠে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীই প্রকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু, কার্যত আমরা দেখি শিশুদের যখন ইতিহাস পড়ান শুরু হয় তখন মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালীই অনুসৃত হয়। ছোটরা গল্প শুনতে ভালবাসে। তাই তৃতীয় শ্রেণীতে যখন ইতিহাস পড়া শুরু হয় তখন অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে শিশুরা ইতিহাসের বদলে গল্পই পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করে ইতিহাসের নিজের ক্ষেত্রে। তখন ইতিহাসের পাঠক্রম তাদের মেনে চলতে হয়। খুশী মত বেছে কোন অংশ পড়লে ইতিহাসকে জানা যায় না। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তাকে মেনে চলতে হবে। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়তে বসে ১৮৫৭ খ্রী: কি হয়েছিল তা পড়লেই হবে না। ইংরেজ অধিকারে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কি করে হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া সিপাহীদের মধ্যে কি হয়েছিল তার পটভূমিকায় সিপাহী বিদ্রোহকে জানতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে একদিন শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য গল্পচ্ছলে যে ইতিহাস পড়া শুরু হয় তা হচ্ছে মনোবিজ্ঞান সম্মত পথ। শিশু যখন বড় হল তখন সন তারিখ মিলিয়ে ইতিহাস পড়ছে। একটা জাতির উত্থান পতনের কারণ বিশ্লেষণ করছে তখন ইতিহাস পড়া হচ্ছে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীতে। প্রাথমিক অবস্থায় শিশু যখন বিমূর্ত বিষয়কে তার ধারণার মধ্যে আনতে পারে না তখন জ্ঞানমূলক বিষয় যুক্তির সাহায্যে বোঝনোর চেষ্টা বাতুলতা। তখন মনোবিজ্ঞান সম্মত পথে শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে। বড় হবার সাথে সাথে ধীরে ধীরে যুক্তির সাহায্য নিতে হবে।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পথই শিক্ষার একমাত্র পথ একথা আমরা বলতে পারি না। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা একথা আগেই বলেছি। এই মনোবিজ্ঞানের পথ ধরেই আমরা যুক্তি নির্ভর শিক্ষার পথে অগ্রসর হই।

আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি (Inductive And Deductive Method) :—

যুক্তিসিদ্ধ শিক্ষার পথে আমরা দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করি। একটি আরোহী পদ্ধতি। শিশু শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কতকগুলি উদাহরণ তার সামনে তুলে ধরা হয় কিম্বা নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে একটা জিনিষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হবার পর সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণায় উপস্থিত হয়। আগুনে নিজে হাত পুড়িয়ে বা বিভিন্ন জিনিষ

আগুনে পুড়তে দেখেই শিশু অগ্নির দাহিকা শক্তি সম্পর্কে ধারণা করতে শেখে। কাঠ জলে ভাসে—টুকরো টুকরো কাঠ জলে ভাসিয়ে বা ভাসতে দেখেই সে এই সিদ্ধান্তে আসে। মানুষ মরণশীল—মানুষ মরছে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তাকে এ কথা বোঝান সম্ভব। দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণসূত্রে পৌছান শিশুর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়, তবুও যাতে তারা নিজেরা পর্য্যবেক্ষণ করে চিন্তা করে, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে সে চেষ্টা করা দরকার। জানা থেকে অজানায় যাওয়া (From known to unknown) বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্র গঠন (From particular to general) ইত্যাদি নীতির ক্ষেত্রে এই আরোহী পদ্ধতিকেই সক্রিয় দেখা যায়। মনে রাখতে হবে আমরাই যদি শিশুর হয়ে সূত্র গঠন করি তাহলে আরোহী পদ্ধতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ, যুক্তিপ্রয়োগ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই আরোহী পদ্ধতির সার্থকতা।

কোন সূত্র গঠিত হলে সেই সূত্রকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা দরকার। সাধারণ সূত্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে বলা হয় অবরোহী পদ্ধতি। এখানে আমরা সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে আসি (Proceed from general to particular)। মানুষ মরণশীল, রাম একজন মানুষ—তাই রাম মরণশীল। এখানে মানুষ মরণশীল এই সাধারণ সূত্রটি রাম নামক বিশেষ মানুষটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিশু যখন কয়েকটী উদাহরণ থেকে সাধারণসূত্রে পৌছাল তারপর সেই সাধারণ সূত্রকে আবার বিশেষ ক্ষেত্রে সে প্রয়োগ করতে পারে কি না তাও দেখা দরকার। এতে যেমন সাধারণসূত্রের পরীক্ষা হয় তেমনি প্রয়োগের (application) মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যুক্তিনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহী ও অবরোহী দু'টি পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারা যায়। একই পাঠে উভয় পদ্ধতির প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীর যুক্তি প্রয়োগের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ডাল্টন-পরিকল্পনা (Dalton Plan) :—

গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলেছে, সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ডাল্টন-শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। শ্রেণীশিক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা লোপ পেয়ে যায়। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, স্বয়ংক্রিয়তা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বহু পরিমাণে ব্যাহত হয়। পড়ায় ইচ্ছা না থাকলেও তাকে পড়তে হয়, নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিক্রান্ত হলে পাঠের বিষয় বদলে তাকে অন্য বিষয়ে মন দিতে হয়। ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা দূর করে শিশুকে

শিক্ষার ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট প্রদেশের ডাল্টন শহরের টাউন হলে মিস হেলেন পার্কহার্স্ট এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে প্রথম পরীক্ষা শুরু করেন বলে এই পদ্ধতি ডাল্টন-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ এই শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করেন। একে Laboratory School ও বলা হয়ে থাকে। ১৯২২ খ্রীঃ মিস এভিলিন ডিউই এই পদ্ধতিকে Dalton Laboratory Plan নাম দেন। এই পদ্ধতিকে 'ল্যাবোরেটরী প্ল্যান' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষগুলিকে এক-একটি পরীক্ষাগারে বা কর্মশালায় পরিণত করা হয় ও সেই ভাবেই ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাগারে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ—বই, ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি থাকবে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরা সেই উপকরণের সাহায্যে নিজেদের পাঠ বা গবেষণা স্বাধীন ভাবে চালিয়ে যাবে।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর নিজ নিজ পাঠ আয়ত্ত করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এখানে নেই। শ্রেণীকক্ষের বদলে এখানে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়-কক্ষ। প্রতিটি বিষয়-কক্ষে বিষয় উপযোগী শিক্ষার উপকরণ রয়েছে—শিক্ষার্থী নিজ নিজ পাঠ আয়ত্ত করতে এর সাহায্য গ্রহণ করে। শ্রেণী-শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নেই, আছে বিষয়-শিক্ষক। শ্রেণী-শিক্ষার মত শ্রেণী-কক্ষে আবদ্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে এঁরা বক্তৃতা করেন না—এঁরা প্রয়োজনমত ছাত্রদের সাহায্য করেন মাত্র। শ্রেণীশিক্ষার মত শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয় বা এখানে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনাই তার একমাত্র কাজ নয়। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত উপস্থাপিত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করবে ও সমাধানের চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীন ও সক্রিয়।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

ডাল্টন পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। শিক্ষক কোন বিষয়ের শুরুতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের ছাত্রদের সামনে সে বিষয় কি ভাবে আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দেন। সেই পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে হয়। ডাল্টন-পদ্ধতিতে বছরের পাঠ বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষক কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেন। এক-একটি ভাগ বা unit নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণতঃ একমাস) শেষ করতে হয়। নির্দিষ্ট কাজকে বলা হয় Assignment. শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত সময়-তালিকা তৈরী করে পাঠ প্রস্তুত করে। তবে কাজ (assignment) নেবার সময় তাকে অঙ্গীকার করতে হয়—যে কাজ তাকে দেওয়া হল, সেই কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ের

নির্দিষ্ট সময়
নির্দিষ্ট কাজ
(Assignment)

মধ্যে শেষ করবে। কাজ নেবার পর সে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করবে। পরীক্ষা না থাকলেও চার সপ্তাহ শেষে তার পাঠ্য সে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা প্রমাণ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষার্থী যে কোন বিষয় নিয়ে শুরু করতে পারে ও যতক্ষণ খুশী একটি বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা করলে একাধিক বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারে বা একটি বিষয়ের উপরই পর পর কয়েকদিন মন নিবদ্ধ রাখতে পারে। শিক্ষক পড়ান না কিন্তু নির্দিষ্ট সময় শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন। যে কোন শিক্ষার্থী সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণতা ও খুশীমত কাজ করবার সুযোগ পায়। শিক্ষকের সাহায্য যে কোন সময় গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এজন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক।

শিক্ষকের কাজ ঃ—

বিষয়-কক্ষে শিক্ষক উপস্থিত থেকে নিম্ন কর্তব্যসমূহ পালন করেন :—

১। বিষয়-কক্ষে পাঠের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা।

২। যে নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হল সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা।

৩। বিষয় উপযোগী শিক্ষা-উপকরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়া।

৪। বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

৫। যখন সত্যিকারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন কোন একটি সমস্যাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে তার কাজে স্বাধীনতা দেবার নীতিকে ডাল্টন-পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে Dalton Association-এর একখানা Leflet-এ যা বলা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেখানে আছে "The Dalton Plan is a scheme of educational reorganisation applicable to the school-work of pupils from eight to eighteen years of age. It aims at giving the child freedom, making the school a community where the mutual interaction of groups is possible, and it approaches the whole problem of work from the pupil's point of view, giving him more responsibility for, and interest in, his education."

"The form rooms become subject laboratories, wherein are collected all the books and apparatus relative to the particular subjects."

"The pupils are srill grouped in forms for convenience sake." (As quoted by Sir John Adams in "Modern Development in Educational Practice.")

দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতাই হচ্ছে এই পদ্ধতির মূলকথা। মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থী তার নিজের খুশীমত যে-কোন বিষয় নিয়ে কাজ করবে; কোন বিষয়ে সে মনোনিবেশ করলে তার কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না, বা বাঞ্ছনীয় নয়। সময়-পত্রিকা (Time Table) থাকলে শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামত সময়ে কোন বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারত না। তাই ডাল্টন-পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেই স্বাধীনতাই শিক্ষার্থীকে দায়িত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। বাইরের জবরদস্তি তার উপরে একটুও নেই, কিন্তু নিজের সংকল্প রক্ষার জন্য আত্মসম্মান রক্ষায় সে নিজেই পড়ায় মনোযোগী হয়। স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ থেকে নির্দিষ্ট কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে দেয়।

সময় তালিকার বিলোপ

ডাল্টন-পদ্ধতিতে যেমন ইচ্ছামত কাজের সুবিধা রয়েছে, তেমনি ইচ্ছা করলে পরস্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুযোগও রয়েছে (Where mutual interaction of groups is possible)। দলবদ্ধ হয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা সৃষ্টির সহায়ক হয়। তবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

সহযোগিতা

ডাল্টন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই কিন্তু শিক্ষার্থীর পাঠ কতটা অগ্রসর হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ রাখা হয়। শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটা আয়ত্ত করল, তা জানার ব্যবস্থা না থাকলে পাঠ-প্রগতি সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির রেকর্ড রাখেন। ছাত্রেরা কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করবার পর তার সারমর্ম দেখে অগ্রগতির লেখচিত্র (graph) অঙ্কন করা হয়। এই লেখচিত্র দেখে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই উন্নতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। শিক্ষাথা বুঝতে পারে কোন বিষয়ে সে কয়েকটি unit পিছিয়ে আছে। শিক্ষক লেখচিত্র দেখে অগ্রগতি ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা বুঝতে পারেন ও দরকার হলে পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে পারেন। চুক্তি অনুযায়ী একটি কাজ শেষ হলেই তাকে নতুন কাজ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে

উন্নতির রেকর্ড

একজনের জন্ত আরেকজনকে বসে থাকতে হয় না। আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যার্থীরা এগিয়ে চলে।

ডাল্টন-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কাজ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। স্বাধীনভাবে কাজ করায় তার দায়িত্ববোধ জন্মায়—যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি বলে কাজ করবার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক হয়। দলগত ভাবে কাজ করবার ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় ও অপরের মতামতকে মূল্য দিতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্রকে অনগ্রসর ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে পারলেই সে নতুন কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। আবার অনগ্রসর ছাত্রকে শ্রেণীর অন্য সবার সাথে এগিয়ে যাবার জন্য তাল সামলাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। বিষয় অনুসারে শ্রেণী-কক্ষ থাকায় বিভিন্ন বিষয়-কক্ষে সেই বিষয়ের উপযোগী পাঠ-পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই আবহাওয়ায় কাজ করবার সুবিধা হয়।

আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ

অসুবিধা ঃ—

ডাল্টন-পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছেলেদের পক্ষে এ-পদ্ধতি সুবিধাজনক হলেও সাধারণ বুদ্ধি—বিশেষ করে অনগ্রসর ছেলেদের পক্ষে এ-পদ্ধতি উপযোগী নয়। ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রেও এ-পদ্ধতির প্রয়োগ খুব সুবিধাজনক নয়। নীচু শ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের পক্ষে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া নিজেদের ক্ষমতায় কাজ করা সম্ভব নয়।

ডাল্টন-পদ্ধতিতে 'শ্রেণী পঠন' একেবারে নির্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে রসগ্রাহিতামূলক ও প্রেরণা-মূলক পাঠে শ্রেণী-শিক্ষা অধিকতর উপযোগী। এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁকে সর্বদাই বিষয়-কক্ষে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা আসছে, কখন কে আসবে তার স্থিরতা নেই, এর ফলে তাঁর উপর চাপ অনেক বেশী হওয়ায় তিনি বিশ্রামের সুযোগ পান না।

অগ্রগতির পরিমাপ শুধুমাত্র অধীত বিষয়-বস্তুর সারমর্ম লেখা দেখেই ঠিকমত বিচার করা যায় না। সাধারণ শিক্ষার মত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ এ পদ্ধতিতে নেই। শ্রেণী-পঠনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবার ও কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের পক্ষে সুবিধা হয়।

ডাল্টন-পদ্ধতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে প্রচুর বিষয়-কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা, অভিজ্ঞ বিষয়-শিক্ষক সংগ্রহ, প্রচুর পরিমাণ শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার। ভারতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। ১৯২৪ খ্রীঃ পাঞ্জাব এডুকেশন জার্ণালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, একবার Chief's College-এ ডাল্টন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা কার্যকরী না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। লাহোর Central Training College-এ এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা কিছু সার্থক হয়, কিন্তু সেখানে কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। বাংলা দেশে বহরমপুরের কোন একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎসাহী হয়ে ডাল্টন পদ্ধতি তাঁর স্কুলে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। দু'টি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কাজ (assignment) ঠিক করে বিষয়-কক্ষ ঠিক করে কাজে অগ্রসর হন। দু'মাসের মত কাজ চালিয়ে কতকগুলি অসুবিধার জন্য পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method) ঃ—

ডিউই শিকাগো সহরে Laboratory School-এ তাঁর শিক্ষানীতিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তিনি গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিকে ত্যাগ করে নানারূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই, সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমস্যা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা না করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করি। গঠনমূলক কাজের মধ্যদিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আমরা বাস্তব জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। সমস্যা সমাধানে কর্ম তৎপর হয়ে আমরা যে ভাবে শিক্ষালাভ করি ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে সেই নীতিরই প্রয়োগ করেছেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Problem Method। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে শ্রেণী-কক্ষের শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষক-নির্ভর না হয়ে যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে। এই সমস্যা সমাধানমূলক কাজের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। সে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। সহযোগিতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠবার যোগ্যতা লাভ করবে। ডিউই চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সার্থক সামাজিক জীবরূপে গড়ে উঠবে। তাঁর Problem Method-এর মধ্য দিয়ে তিনি সেই সার্থকতায় পৌছতে চেয়েছেন।

প্রজেক্ট ঃ—

বিগত প্রথম মহাসমরের পর ডিউইর শিষ্য ডাঃ কিলপ্যাট্রিক ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বাস্তব সমাজের পরিবেশে বাস্তব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে প্রজেক্ট পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। ষ্টিভেনসন বলেছেন, প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্যামূলক কাজ যা স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে—"The Project is a problematic act carried to completion in its natural setting."

এই পদ্ধতিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে, তা হবে সমস্যামূলক এবং শিক্ষার্থীরা সেই সমস্যার সমাধান করবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেছেন, Project is a wholehearted purposeful activity executed in a social environment—প্রজেক্ট হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত হবে।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের পিছনে থাকে একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যার পিছনে থাকবে একটা উদ্দেশ্য। সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হলে তারা সেই সমস্যাটির সমাধান করবে ও এই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কাজটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

সমস্যামূলক কাজটির উপস্থাপনা থেকে সার্থক সম্পাদন ও তার বিচার-বিবেচনা পর্যন্ত আমরা চারটি স্তর লক্ষ্য করি। সেই স্তরগুলি হচ্ছে—

প্রজেক্টের ৪টি স্তর ঃ—

১। শিক্ষার্থীর সামনে যখন একটি কাজ বা সমস্যা (Project) উপস্থাপন করা হবে তখন তারা স্থির করবে এই কাজটি তারা কেন করবে। সেই বিশেষ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—তাই প্রথম স্তরের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্দেশ্য স্থির করা (Purposing)।

২। উদ্দেশ্য স্থির করবার পর ঠিক করতে হবে কি করে কাজটি করা যায়—অর্থাৎ সমস্যার সমাধান হয়। একে বলা হয় পরিকল্পনার স্তর (Planning)। এই স্তরে কাজটি কয়টি ভাগে (unit) ভাগ করা হবে। কে কতটা কাজ করবে, unit-গুলি সম্পাদনের জন্য কিভাবে দল গঠন করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া হবে।

৩। এর পর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে উদ্দেশ্যমূলক কাজটি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সবাই কাজ করবে। এই স্তরকে বলা যায় কর্মসম্পাদন স্তর (executing)।

৪। কাজটি সম্পাদনের পর আসবে বিচারের স্তর (judging)। যে

কাজটি বা সমস্যাটি সমাধান করা হল তা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি কি রইল, কি শিক্ষা হল সে সম্পর্কে সবাই মিলে আলোচনা করবে, বিচার করবে।

একটি প্রজেক্টের বাস্তব রূপায়ণ ঃ—

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক দিক থেকেই শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। সময় দেখতে শেখান, দিগ্ নির্ণয়, স্কুল বাড়ীর নক্সা করা, স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা, বাগান তৈরি করা, পশু-পক্ষী পালন করা প্রভৃতি বহু জিনিষ ছেলেদের প্রজেক্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শেখান যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অনুবদ্ধ প্রণালীর (Correlation) মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে অন্য যে সব বিষয় আসবে তার আলোচনা করা হবে ও শিক্ষার্থীরা সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যেমন—স্থির করা হল ছেলেরা স্কুলের জমিতে একটি বাগান করবে। প্রথমে কাজের উদ্দেশ্য স্থির করে নিতে হবে—কেন বাগান করা হচ্ছে, এর সার্থকতা কি, এর কোন প্রয়োজন বা উপকারিতা আছে কি না সে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা হবে। তারপর বাগানটি কি করে করা হবে সে সম্পর্কে সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হবে। কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এক একটি অংশ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। পরিকল্পনা হয়ে যাবার পর বাগানটি তৈরীর কাজ শুরু হবে। প্রতিটি দল নিজেদের অংশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে কাজটিকে বাস্তবে সার্থক করে তুলবে। এর পর সম্পাদিত কাজটির বিচার-বিশ্লেষণ হবে—ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় রইল তা যেমন খুঁজে বের করা হবে, তেমনি কাজটা কতটা সার্থক হল তাও দেখতে হবে।

মূল্যায়ণ ঃ—

এখন দেখা যাক এই বাগান তৈরী কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা অনুবদ্ধ প্রণালীতে কি কি কাজ শিখতে পারি এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। বাগান তৈরী করতে প্রথমেই একটি নক্সা করতে হবে—স্কুলের কোন জায়গায় বাগান হবে—কতটুকু জমিতে বাগান হবে সব মেপে স্থির করে নিয়ে নক্সাতে দেখান হবে। তারপর যে মাটিতে চাষ হবে তার গুণাগুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায়, সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলবে, কোন ফুল কোন ঋতুতে হয় প্রাসঙ্গিক ভাবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হবে। জমিতে সার দেওয়া হলে কি সার দেওয়া দরকার, বীজ সংগ্রহ করতে হলে নার্শারীতে চিঠি দিয়ে বীজ আনিয়ে নিতে

হবে। বাগান তৈরীর একটা খরচ আছে, সেই খরচের হিসাব রাখা। কাজটি শুরু হবার পর ধারাবাহিকভাবে কাজের অগ্রগতির বিবরণ লিখে রাখা হবে। বাগান শেষ হলে কাজের বিচার করা হবে—আলোচনা সভায় বিশ্লেষণ করা হবে—কাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কতটুকু পার্থক্য হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে একটি বাগান করবার মধ্য দিয়ে ছেলেরা নক্সা তৈরী, উদ্ভিদতত্ব, ভূতত্ব, চিঠি-লেখা, হিসাব রাখা, ভাষাশেখা প্রভৃতি সব কিছুই শিখতে পারবে। কাজের মধ্য দিয়ে তাদের দেহচর্চাও হবে। প্রজেক্ট সম্পাদনে স্বজনীশক্তির বিকাশ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রভৃতির বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অনুবদ্ধ প্রণালীর একটা বিপদ হচ্ছে অতি উৎসাহীরা অনেক সময় কষ্ট-কল্পনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষা-বিভ্রাটের সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে Sir John Adams সতর্ক করে বলেছেন,—but there was a tendency to go to extremes, and sometimes curriculum got into a state of inextricable confusion. All the subjects got mixed up in a general jumple.

প্রজেক্টের গুরুত্ব ঃ—

প্রজেক্ট পদ্ধতি ডিউইর সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থীরা নিজেরা সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং কাজটি করবে তারা স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। তাই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামাজিক চেতনার বিকাশলাভ এই দুই-ই ঘটবে। ডিউই শিক্ষার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে কোন বিরোধ খুঁজে পাননি তাই এই দুইয়ের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে ডিউইর সেই শিক্ষাদর্শের রূপই কিলপ্যাট্রিক দিয়েছিলেন।

প্রজেক্ট পদ্ধতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক স্বজনপ্রতিভা ও কর্মপ্রবণতা রয়েছে সে তার বশে কাজ করতে চায়। যেহেতু শিশু কাজ করতে ভালবাসে, তাই তারা নিজেদের আগ্রহেই কাজ করবে। আগ্রহ ও সমস্যা সমাধানের কৌতূহলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে কাজে স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা লাভ করবে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুকে কাজ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সমস্যাটি যা শিশুর সামনে উপস্থাপিত হল তা সে নিজেই সমাধান করবে। কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে সে যে শিক্ষালাভ করবে তার মধ্য দিয়ে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

সাধারণ শিক্ষায় একটি কাজ করতে গিয়ে বা একটি বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার পিছনে কি নীতি (Principles) রয়েছে, সেটাই আগে শেখান হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজের পিছনে কি নীতি আছে শিক্ষার্থীরা তা নিজেরাই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনমত জেনে নেবে।

"In the topical organisation the principles are learned first, while in the project the problems are proposed which demand in the solution the development of principles by the learner as needs—(W. W. Charters as quoted by Adams in Modern Development in Educational Practice.)

সীমাবদ্ধতা ঃ—

প্রজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা হচ্ছে একটি প্রজেক্ট শেষ করে আরেকটি প্রজেক্ট শুরু করবার মধ্যে যে ফাঁক (gap) থেকে যায়, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর ফলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিম্ন-শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য উপযোগী হলেও উচ্চ-শ্রেণীতে যেখানে জটিল বিষয় রয়েছে সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা না পেলে শিক্ষালাভ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে প্রজেক্টের কার্যকরিতা সীমাবদ্ধ। অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটা সীমা আছে—সীমা ছাড়িয়ে একে বিষয়ান্তরে সম্প্রসারিত করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় এবং এমন সব বিষয়ের আমদানি করা হয় যার সাথে প্রজেক্টের কোন সম্পর্ক নেই। প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব বিষয় শেখানো সম্ভবও নয়। অনেক সময় কাজের চাপে প্রজেক্টের শিক্ষামূলক দিকটা চাপা পড়ে যায়।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষকের যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার ও বহু বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষক পাওয়া কঠিন।

দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়—সামাজিক বোধ জন্মায় আবার দলের মধ্যে মিশে কাজে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা থাকলে তাও খুব কঠিন নয় এবং সর্বকালে সর্বদেশে দু'চারটি ফাঁকিবাজ ছেলে থাকবেই, তারা এ সুযোগ গ্রহণ করবে।

বুনিয়াদী ও প্রজেক্ট পদ্ধতির তুলনা ঃ—

প্রজেক্টপদ্ধতির সাথে আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রজেক্টের স্তায় কর্মকেন্দ্রিক। এখানে একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর পরিবেশ অনুযায়ী কয়েকটি শিল্প থেকে একটি শিল্প বেছে নিতে হবে—যার সম্পর্কে শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করবে। এই পদ্ধতিতেও মূল শিল্পটি থেকে অনুবন্ধ প্রণালীতে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। উভয়

পদ্ধতিতেই মানসিক ও দৈহিক উভয় দিকের চর্চা হয়। দুইটি পদ্ধতিতেই বাস্তব পরিবেশের মধ্যে কর্মের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করা দুই শিক্ষাপদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্ট স্থির করে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট প্রজেক্ট থেকে একটি প্রজেক্ট বেছে নিতে হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতির জ্ঞানলাভের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। একটির পর একটি প্রজেক্ট নিয়ে ছেলেরা কাজ করে যায়, ফলে তাদের জানার মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে একটি মূল শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট থাকে বলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কর্মটি গৌণ, শিক্ষালাভই মুখ্য। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে বিষয় শিক্ষার সাথে শিল্পকর্মে দক্ষতালাভ করতে হয়। শিল্পটি এখানে গৌণ নয়। বুনিয়াদী পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক হলেও মূলতঃ তা শিল্পকেন্দ্রিক। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছেন—"…not activity centred, but craft centred." তবে একথা মনে রাখতে হবে গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। দুইটি পদ্ধতিকেই শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ করায় প্রজেক্ট ও বুনিয়াদী শিক্ষা উভয় পদ্ধতিকেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি (Basic Education)

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সমূহের মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিতে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধানের পন্থারূপে গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ কোন দিক থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নয়। জাতীয় জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, দেশের অর্থনৈতিক কথা বিচার করে গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করেন। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করে নতুন করে তিনি শিক্ষাপদ্ধতি পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজি পরিকল্পিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক, কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতীয় সমাজের উপযোগী শিক্ষা

গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর সক্রিয়তা তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। শিশুরা সর্বদাই কর্মচঞ্চল, নীরস পুঁথির মাধ্যমে যে শিক্ষা, তা শিশুমন গ্রহণ করতে সংকোচিত হয়। পুঁথিনির্ভর নিষ্প্রাণ শিক্ষার মধ্যে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পায় না। এ শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাকে পঙ্গু করে দেয়। আনন্দহীন শিক্ষা শিশুর মনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে পারে না। শিশুর মধ্যে যে কর্মপ্রবণতা রয়েছে তার বিকাশের পথ যদি সুগম করতে হয় তাহলে কাজ দিতে হবে। শিশু চায় খেলা আর কাজ। বুনিয়াদী শিক্ষায় দশজনে মিলে কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তাতে শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও ঔৎসুক্য সম্পর্কে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষাকর্মের যে স্বাধীনতা রয়েছে তার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি সুনিয়ন্ত্রিত হবে, বুদ্ধি মার্জিত হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে শিশু আত্মশক্তিতে আস্থাবান হবে।

সক্রিয়তা তত্ত্বের প্রভাব

বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার সাথে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য এ দুইদিক সম্পর্কেই শিশু যাতে সচেতন হয় সে ব্যবস্থা রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষা মূল কাজের অন্যতম।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে গতানুগতিক পুঁথি-কেন্দ্রিক শিক্ষার পথকে ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পকাজের মাধ্যমে পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুবদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রজেক্ট পদ্ধতিতেও অনুসৃত হয়। শিল্প-শিক্ষার মধ্য দিয়া শিশুকে কারিগর বানানোই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য নয়। এ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশু যান্ত্রিকভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষায় অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তিকেও এখান থেকেই শিখে নিতে পারে।

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা

অনুবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার পথে একটা প্রধান অসুবিধা হচ্ছে বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেবার ফলে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অংক প্রভৃতি অতি সামান্যই এই পদ্ধতিতে শেখান যায়। এগুলি বৃত্তির প্রয়োজনে অতি সামান্যভাবেই তার সাথে জড়িত, তাই এ সম্পর্কে জ্ঞান

সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় এসব বিষয়ে ভিন্ন পাঠ্যসূচী রচিত হয়েছে। অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেটুকু শেখান যায় তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্যরাজি স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অনুবন্ধ প্রণালী

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ফলে শিশুশিক্ষার্থী একদিকে পাঠের নীরস একঘেয়েমী থেকে রক্ষা পেয়েছে, অপরদিকে তার স্বাভাবিক সৃজনীশক্তি বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। পুঁথিকেন্দ্রিক পাঠে কায়িক শ্রমবিমুখতা ও শ্রম সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। বাস্তবধর্মী শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মূল্যবোধ জন্মায় ও সে শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষালাভ করে। এতে তার বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় দেহ ও মনের সমান বিকাশলাভ ঘটবে। একটি শিল্পে কুশলী হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী সেই শিল্পকেই জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার্থী সমাজসচেতন হয়ে উঠছে। সমগ্র ভারতের শিক্ষায় গান্ধীজি প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা

কোঠারী কমিশনের অভিমত :—

কোঠারী কমিশন তাঁদের রিপোর্টে শিক্ষার কোন স্তরকে বুনিয়াদী শিক্ষা নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু কমিশন মনে করেন বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির মূলনীতিসমূহ একটু পরিবর্তিত করে শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রয়োগ করা চলে। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতা ও উৎপাদন, অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা, স্থানীয় সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি কমিশন গ্রহণ করেছেন। কাজের অভিজ্ঞতা (work experience) ও উৎপাদনমূলক কাজ (productive work) যার উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

অনুবন্ধ প্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কমিশন যতটা সম্ভব শিক্ষায় এ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে বলেছেন। শিশুদের সামাজিক ও সমাজমুখী করে তুলতে হলে সামাজিক কাজে ও সমাজসেবামূলক কাজে তাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। কোঠারী কমিশনের এই সুপারিশ বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম মূলনীতি।

[বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য "শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস" দেখুন।]

উইনেটকা পদ্ধতি (Winnetka Plan) :—

চিকাগো শহরের নিকটে মিচিগান হ্রদের তীরে উইনেটকা নামক স্থানে ওয়াসবার্ণ (Washburne) ১৯১৯ খৃঃ একটি নূতন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। উইনেটকার প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করা হয় বলে এই শিক্ষাপ্রণালী উইনেটকা পদ্ধতি' নামে খ্যাত।

ব্যক্তিগত শিক্ষার যে নীতির উপর ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, উইনেটকা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তিও সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা। উদ্দেশ্য এক হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হয়। উইনেটকা পদ্ধতিতে পাঠক্রমকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) সাধারণ অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ (Common essentials) (খ) সামাজিক ও সৃজনমূলক দলগত কাজসমূহ (Social and creative group activities)। অত্যাবশ্যক সাধারণ বিষয়সমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। ডাল্টন পদ্ধতির মত এখানেও শিক্ষার্থীকে কাজ (assignment) দেওয়া হয়। বিষয়সমূহ কতকগুলি unit-এ ভাগ করে শিক্ষার্থী নিজের সাধ্যানুসারে কাজ করে কাজটি বা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে। একটি ইউনিটের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে ইউনিটের উত্তর সম্বলিত একখানি কাগজ পায়। উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে যদি দেখে নিজের উত্তর হয়নি, তখন সে আবার নিজের ভুল সংশোধন করতে লেগে যায়। যদি তার নিজের সমস্ত উত্তর পূর্বপ্রস্তুত উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় উত্তর নির্ভুল হয়েছে, তাহলে সে শিক্ষককে পরীক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করে। প্রতিটি ইউনিট যদি পুরো মার্ক পায় তাহলেই শিক্ষক তাকে পরের unit নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেন। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে আবার তাকে পুরোন unit নিয়ে কাজ করে করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়।

দুটি পাঠক্রম

উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-নীতির (individual difference) স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহের একই হারে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে নিজেদের চেষ্টায় প্রধান বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে। গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। কিন্তু উইনেটকা পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয়নি। এখানে একই সাথে একজন শিক্ষার্থী তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তে পারে। কোন একটি ছাত্র হয়ত সাহিত্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে, বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে চলেছে, অঙ্কে পিছিয়ে আছে। শিক্ষার্থী যে বিষয়ে যে কয়মাস এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি

সেই অনুসারে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতি যদি একই হারে না হয় তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে Promotionও বিভিন্নভাবে হবে। কোন এক বিষয়ের অগ্রগতি ও প্রমোশন অন্য কোন এক বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া কি পিছিয়ে থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলেই তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়।

গঠনমূলক ও সৃজনমূলক কাজ

সৃষ্টিধর্মী দলগত সামাজিক কাজগুলিতে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, বিভিন্ন সৃজনধর্মী কাজে তারা অংশ গ্রহণ করে। ছাত্রদের জন্য অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির জন্য যেরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—দলগত কাজের জন্য সেরূপ কোন পরীক্ষা বা মার্কের ব্যবস্থা নেই—এসব কাজে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে আনন্দলাভ করে—এটাই তাদের পরম লাভ। ছাত্রদের প্রথম থেকেই গঠনমূলক কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা সমবায় বিপণি পরিচালনা, স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনা, ক্লাব গঠন প্রভৃতি কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্কুলের বিভিন্ন দলগত কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি আছে, প্রতিটি ছাত্রকেই কোন-না-কোন সমিতির সভ্য হতে হবে। সাধারণ পাঠক্রম বহির্ভূত এসব সৃজনধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ জন্মায়, দলগত কাজের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় সামাজিকবোধ জাগ্রত হয়। পড়ার পরিবেশ নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দময় হওয়ায় শিশুরা পড়ায় আগ্রহ বোধ করে।

বিদ্যালয় সংগঠনে একজন করে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশারদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও একজন সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত সম্পাদক যুক্ত থাকেন।

মনোবিজ্ঞানসম্মত পুস্তক

বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের উপযোগী করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পুস্তক রচনা করা হয়। ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কীয় সমস্যা মনোরোগ-বিশারদ সমাধান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন সম্পাদক।

ওয়াসবার্ণ পরিকল্পিত এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ডাল্টন শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটিগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তিমুখীন-শিক্ষাপ্রচেষ্টায় শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাপরিকল্পনা করায় উভয় পদ্ধতির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে—সেই সাথে শ্রেণীশিক্ষার দোষ-ক্রটি থেকেও শিক্ষাকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা-পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতির ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ।

উভয় শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় সাধন কিভাবে করা যায় আজকের শিক্ষায় তা একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি (Group Methods)।

যে কোন সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন একটি কাজ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সম্পন্ন করে। কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে করতে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে তার বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। যদি শুধুমাত্র বুদ্ধিমূলক সমস্যা হয় তাহলে সমস্যাটির সবদিক নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দিতে পারলেই কাজটি শেষ হয়। সমস্যা সমাধানমূলক আলোচনায় সবাই অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন গ্রন্থ, চার্ট, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে সবাই যার যার বক্তব্য উপস্থিত করে। এখানে দলের সবাই আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসে। সব দলই তাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে রাখে। সবশেষে সমস্ত দলগুলি নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা হয়, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন দল তাদের অভিমত পেশ করে। সেখানে আবার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ এই যে কাজ বা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি, একে সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method) বলা যায়। বহু শিক্ষা-পদ্ধতিতেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার নীতি অনুসৃত হয়, যেমন সেমিনার বা আলোচনা চক্র, প্রজেক্ট, কর্মশালা পদ্ধতি (work shop), দলীয় আলোচনা।

সমস্যার দলগত সমাধান

সঙ্ঘবদ্ধ কার্যপদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ন্যস্ত কাজটি সমাধানের চেষ্টা করে। সঙ্ঘবদ্ধ কার্যপ্রণালীতে দল পরিচালনার জন্য একজন দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। দলনেতার পরিচালনায় নির্দিষ্ট বিষয়টি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হয়। দলগঠনের সময় ভালমন্দ সব মিশিয়ে দল গঠন করতে হয়। প্রত্যেক দলের যোগ্যতার মান যাতে মোটামুটি একই রকম হয় সেদিকে নজর রাখতে হয়। যদিও দলনেতার নেতৃত্বে আলোচনা কি কার্য পরিচালিত হয়, তবুও প্রতি দলের কার্যপ্রণালী ও কাজের অগ্রগতির প্রতি শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। দলের প্রতিটি ছেলে কাজ করছে কিনা—আলোচনা ঠিক পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কিনা এসব দিকে তাঁকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনমত তিনি ঠিক পথের নির্দেশ দেবেন ও দলের থেকে কাজ আদায় করে নেবেন।

দলনেতার নির্দেশে কাজ

সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতিতে আলোচনা কি কাজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিচালিত হয়। সেমিনার বা আলোচনাচক্রে কোন একটি বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হবার পর আলোচনাচক্র কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মূল-বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়। নির্ধারিত সময়ের পর বিভিন্ন দলগুলি একত্রিত হয়—এখানে বিভিন্ন দলের দলপতি তাদের দলের সিদ্ধান্তসম্বলিত পূর্ণ বিবরণী পেশ করে। সেই সম্মিলিত আলোচনা থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা-চক্র

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে সে কাজটিকে কতকগুলি unit-এ ভাগ করে এক-একটি দলের উপর সেই unit-গুলি সম্পাদনের ভার দেওয়া হয়। সবাই মিলে কাজ করে পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌছান হয়। কাজটির শুরুতে নির্দিষ্ট প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়। কাজটি হয়ে যাবার পর আবার আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের গুণাগুণ বিচার করা হয়।

প্রজেক্ট

সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতির বিভিন্নরূপ দলীয় নেতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। দলনেতার সুপরিচালনার উপর দলের কাজের অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করে। দলনেতাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় দলনেতা স্বেচ্ছাচারী হয়ে দলের অন্য কোন সভ্যকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয় না—তার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দলনেতার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের অভাবে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক দলনেতা দলের প্রতিটি সভ্যকে আলোচনাকালে মতামত প্রকাশের সমান সুযোগ দেবে। দলনেতাকে দেখতে হবে কোন অংশ গ্রহণকারী যেন আলোচনাকালে চুপ করে থেকে কাজকে এড়িয়ে না যায়। আলোচনায় বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যকে সংহত করে দলকে সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের উপর ন্যস্ত কাজটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

দলনেতার ভূমিকা

কর্মশালা পদ্ধতি (Work-shop Method):—

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার সুবিধা-অসুবিধা ও ছাত্র-মনে তার প্রভাব এবং ছাত্রদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা নিয়ে বেশ কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি (group method) নিয়ে আলোচনাকালে সবাই মিলেমিশে কাজ করবার যৌক্তিকতার দিকটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। একা

যে সমস্যা সমাধান করা যায় না, যে কাজ একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, সেই কাজটিকে দশজনের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজটি করবার চেষ্টা করলে কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতির একটি রূপ হচ্ছে কর্মশালা পদ্ধতি (work-shop method)। প্রজেক্ট পদ্ধতির মত ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতির উদ্ভাবনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যেমন একটি কাজকে (problem) হাতেকলমে সম্পন্ন করা হয় এবং শিক্ষা দেওয়া হয়, কর্মশালা পদ্ধতিতে সমস্যাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে, বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাটির বিচার-বিবেচনা করে, সবাই মিলে উপস্থাপিত সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা হয়। এই পদ্ধতিতে সমস্যার বুদ্ধিমূলক সমাধান করলেই সদস্যদের কাজ শেষ হয়—এখানেই প্রজেক্ট পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য।

সমস্যার বুদ্ধিমূলক সমাধান

কর্মশালা (work-shop) পদ্ধতির উদ্দেশ্য গতানুগতিক নীরস প্রাণহীন শ্রেণীশিক্ষার বন্ধন থেকে ছেলেদের মুক্তি দেওয়া। শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ দেওয়া। কাজের মধ্য দিয়ে তারা যাতে তাদের জীবনের সাথে জড়িত বা দৈনন্দিন জীবনে আসতে পারে এমন সমস্যার (felt problem) সমাধানের সুযোগের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষার মাঝে বড় হবার সাথে সাথে কোন সার্থকতা খুঁজে না পেয়ে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগে এই পুঁথিনির্ভর শিক্ষা থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে সে কি পেল ? বাস্তব জীবনের সমস্যাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করে সেই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর হাতে দিলে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। শিক্ষা আর তখন প্রাণহীন বা নীরস থাকে না। জীবন ভিত্তিক শিক্ষার আকর্ষণ শিক্ষার্থীদের নিকট হয়ে উঠে দুর্নিবার।

বাস্তবজীবনে অনুভূত সমস্যা

কর্মশালা পদ্ধতিতে জীবনের সাথে জড়িত একটি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছাত্রদের দেওয়া হয়। যে সব ছাত্ররা সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেবে তাদের নিয়েই তৈরী হয় work-shop—এরা সবাই হবে work-shop-এর সদস্য। সমস্যাটি সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হলে সব সদস্যই তা নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় বই, চার্ট, ম্যাপ, পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহায্য নিয়েও সাহায্যকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির (resource person) সাথে পরামর্শ করে সমস্যার গ্রহণ-যোগ্য সমাধানে পৌঁছাবে। আলাপ-আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র দল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবে।

বিশেষজ্ঞ সাহায্যকারী

উপদলগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমস্যার বিভিন্ন দিক থেকে যে সিদ্ধান্তে আসবে তাই মিলিয়ে মূল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে। মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে যদি কোন গৌণ সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেই সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে।

পরিচালক

কর্মশালায় একজন **পরিচালক** (Director) থাকবেন। পরিচালক কর্মশালার কাজ পরিচালনা করবেন। সমস্যা সমাধানের জন্য, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি ব্যবস্থা পরিচালক করবেন।

পরামর্শদাতা

সভাপতির কাজ পরিচালনার সাহায্যের জন্য ও আলোচনাকালে কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতির জন্য একজন **পরামর্শদাতা** (Consulteut) থাকবেন।

বিশেষজ্ঞের ভূমিকা

কর্মশালার শিক্ষার্থীদের দ্বারা সব সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। সমাধানের পথে কোন জটিল গ্রন্থি দেখা দিলে সেখানে সহজ পথের সন্ধান পাওয়া সদস্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। দিশেহারা সদস্যদের পথের সন্ধান দিয়ে আলোচনাকে সঠিক পথে চালাবার জন্য **বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির** (Resource Person) সাহায্যের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও তথ্যজ্ঞ হবেন। প্রয়োজন হলেই আলোচনার জন্য তাকে পাওয়া যাবে। তিনি সব সময় আলোচনা সভায় উপস্থিত নাও হতে পারেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সদস্যরা তার কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করবেন।

কর্মশালা পদ্ধতিতে সমস্ত সদস্য মিলেমিশে পারস্পরিক সহযোগিতায় কোন একটি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে তারা যে উৎসাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবে, তথ্যাদি সংগ্রহে তৎপরতা দেখাবে, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় সে উৎসাহ আশা করা যায় না—আর সেখানে তাদের কাজ করবার সুযোগ-সুবিধাও সীমাবদ্ধ।

কর্মশালার অভিজ্ঞতা বাস্তবজীবনের পাথেয়

পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্মপ্রচেষ্টার কোন সুযোগ না থাকায় সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কর্মশালা পদ্ধতিতে বাস্তব ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা তার পরবর্তী জীবনে পাথেয় রূপে তার জীবনের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়। কর্মশালা পদ্ধতির বড় কথা এখানে শিক্ষার্থীই কর্মকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ। তারাই একটি সমস্যা বেছে নেয় ও তার সমাধানের জন্য যা কিছু করণীয় শিক্ষার্থীরা মিলেমিশে সে কাজগুলি করে। শিক্ষক বন্ধুর মত পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন। তিনি একজন সুহযোগী। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শিক্ষার সমন্বয় হয়েছে। ব্যক্তির স্বার্থ

আর সমষ্টির স্বার্থ যেমন পরস্পর বিরোধী নয়, এখানে সমষ্টিগত ভাবে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে পরস্পর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সামাজিক চেতনাবোধ জাগে। নিজেরা কাজটি করবার ফলে সদস্যদের আত্মবিশ্বাস জন্মায় ও তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে।

কর্মশালা পদ্ধতি আমেরিকায় উদ্ভব হলেও ভারতবর্ষে এই কার্যপদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাংলাদেশে David Hare Training College-এর Extention Service Dept. বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের নিয়ে work-shop করে এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টা করছেন। ছাত্রদের নিয়ে work-shop পদ্ধতিতে কি জাতীয় Project নিয়ে কাজ করা যায় Extention service আয়োজিত work-shop-গুলিতে শিক্ষকদের সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয় ও নিজ নিজ বিদ্যালয়ে গিয়ে সেই Project-গুলি নিয়ে কাজ করবার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। N. C. E. R. T. কি করে নতুন নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে শ্রেণী-শিক্ষার উন্নতি করা যায় সারা ভারতে সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতে প্রয়োগ

সেমিনার ও সিমপোজিয়ম :—

সঙ্ঘবদ্ধ আলোচনা পদ্ধতির দুইটি বিশিষ্ট রূপ সেমিনার ও সিমপোজিয়াম। সেমিনার বা আলোচনা-চক্রে ছাত্ররা দলবদ্ধ ভাবে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নিজেরাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অলোচ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখে। আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিয়ে ৩।৪ জনের এক একটি গ্রুপের উপর সে বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। গ্রুপ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মূল বক্তব্য স্থির করে নিয়ে দলগত আলোচনায় সেই বক্তব্য উপস্থাপন করে। সম্মিলিত আলোচনা থেকে মূল বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নীচের দিকের ছেলেদের পক্ষে এই জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করবার মত সামর্থ্য থাকে না বলে সেমিনার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র বা কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত। এই জাতীয় আলোচনায় স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অনেক কিছু জানতে পারে ও তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ লাভ ঘটে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতিকে আলোচনা চক্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

সিমপোজিয়ামকেও আমরা আলোচনা চক্র বলতে পারি। এই আলোচনায় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেউ তার পূর্ব থেকে তৈরী লেখা

(paper) পড়েন। একাধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে তাদের তৈরী 'লেখা' পড়তে পারেন। এরপর উপস্থিত ব্যক্তিরা পঠিত বিষয়টির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশন করতে পারেন। বিষয়টি সম্পর্কে মূল লেখাগুলি আগের থেকে ভেবে চিন্তে তৈরী করা হয় বলে এই জাতীয় আলোচনা-চক্রের আলোচনা বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ হয়। আলোচনায় একজন পরিচালক থাকেন তিনি সমগ্র আলোচনার সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করে আলোচনার সমাপ্তি টানেন।

ডিউইর সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Method) ঃ—

দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা দেখে মানুষ কর্ম-বিরত হয় না। সে সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও সমস্যা সমাধানের উপযোগী নানা তথ্যের সন্ধান সে করে। সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সে সমস্যা সমাধান করে। মানুষ বাস্তব জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সাথে মুখোমুখি হতে হলে শিক্ষার মধ্য দিয়েই চলবে তার প্রস্তুতি পর্ব। এই প্রস্তুতি দুই ভাবে চলতে পারে, কর্মের মধ্য দিয়ে আর বৌদ্ধিক দিক থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে।

বৌদ্ধিক দিক থেকে কোন একটা সমস্যা সজ্ঘবদ্ধভাবে সমাধান কি করে হতে পারে তার উপর ভিত্তি করেই problem method-এর উদ্ভব হয়েছে। কোন একটি অনুভূত সমস্যার (felt difficulty) মানসিক সমাধান খুঁজে বের করা পদ্ধতিকেই সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বলা হয়। বিষয়টিকে সমস্যার আকারে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করলে তাদের চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়। তাদের মনে সমস্যা সমাধানের আগ্রহ জন্মে। নানাভাবে বিষয়টিকে বিচার বিবেচনা করে কি করে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, কি করে বিষয়টিকে আয়ত্ত করা যায় problem method সেই পথের সন্ধান দেয়।

সমস্যাকে সমাধান করতে হলে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগুতে হয়। মানুষ কর্মপ্রবণ, এই কর্মপ্রবণতা বলেই সে কাজ করে। কর্মে প্রবৃত্ত হয়েই সে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাই আসে সমস্যা (problem)। সমস্যা সমাধান করতে হলে সমস্যাটিকে ভাল করে বুঝতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমস্যাকে বেছে নিতে হবে। সমস্যাটি এমন হবে যা ছাত্রদের কাছে

উপস্থাপন করলে ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় তার সমাধান করতে পারে ও সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ হবে। সমস্যাটিকে ছেলেরা চিন্তার ক্ষেত্রে সমাধান করতে পারলে তাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা বাড়বে। সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে সে সমাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে। সমস্যা সমাধানের উপযোগী সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ধারণা হবে তার মধ্য থেকে একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় রূপে গ্রহণ করবে। সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চিন্তার জগতে সাধিত হলেও তার যেন একটা বাস্তব মূল্য থাকে। প্রয়োজন হলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যেন তার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি (Kindergarten Method) :—

খেলা আর পড়া এ দু'টি জিনিসের মাঝে আমরা মিল খুঁজে পাই না, তাই বলি খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া। মুস্কিল হয়েছে ছোট ছেলেরা খেলতেই ভালবাসে, পড়তে বসাতে হলে জোর করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়। তবু নীরস লেখা পড়ায় শিশুর মন বসে না। শিশুর এই অনিচ্ছা এই ভীতি দূর করা যায় যদি খেলার সাথে পড়াটাকে জুড়ে দেওয়া যায় তখন আর পড়াটা পড়া থাকবে না তাও হবে এক রকমের খেলা। তাই নানা রকমের খেলা আর মন মাতানো নাচ, গান দিয়ে শিশু-উদ্যানের সৃষ্টি করেছিলেন জার্মাণ শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল্। ফ্রয়েবল্ রচিত শিশু-উদ্যানই হচ্ছে কিণ্ডারগার্টেন।

১৮৩৭ খ্রীঃ ব্লাকেন বুর্গ গ্রামে সাত বছরের ছেলেদের জন্য ফ্রয়েবল একটি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের নাম দেন কিণ্ডারগার্টেন (শিশু-উদ্যান)। এই সার্থক নামটি বিশ্বে শিশু শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে।

বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুলি যেমন মালীর সযত্ন পরিচর্যায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি শিশুরা সযত্ন পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু-উদ্যানের শিশুদের জন্য। গানের তালে আর নাচের ছন্দে শিশুদের জীবন শুধু আনন্দময়ই হয়ে ওঠে না, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে পরিপূর্ণতা লাভের পথে এগিয়ে দিতেও সাহায্য করে।

ফ্রয়েবল বহুদিনের অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থী জীবনের ক্রম বিকাশের স্তরভেদে আত্মবিকাশের উপযোগী কতকগুলি খেলা ও কাজ আবিষ্কার করেন। এগুলি

হচ্ছে শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে ছয়টি উপহার (gift) ও অনেকগুলি হাতের কাজ (occupation)। ফ্রয়েবলের শিক্ষার প্রধান উপকরণই হচ্ছে এই উপহার ও কাজগুলি। উপহারগুলি হচ্ছে নানা রকমের নানা রঙের খেলনা। প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের দু'টি উলের বল। দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে কাঠের গোলক, ঘনক (cube) ও সিলিণ্ডার। তৃতীয় উপহার হচ্ছে একটি ঘনকআটটি ভাগে ভাগ করা ; এ দিয়ে চেয়ার, সিঁড়ি, দরজা প্রভৃতি তৈরী করা যায়। চতুর্থ উপহার আটটি লম্বা প্রিসম (prism)। পঞ্চম উপহার একসাথে ঘনক ও প্রিসম। ষষ্ঠ উপহার এক থেকে পঞ্চম উপহার মিলিয়ে। এসব জিনিস দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরী করা যায় ও বিভিন্ন সংখ্যা গণনা শেখান হয়। সপ্তম থেকে নবম উপহার কাঠ, কাঠের টুকরা, দড়ি ইত্যাদি। এ দিয়ে পরিধি, পরিমাণ ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রতিটি উপহারের পিছনেই ফ্রয়েবল একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। তাত্বিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও প্রত্যেকটি উপহারের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব উপযোগিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ফ্রয়েবলের শিক্ষা পদ্ধতিতে কাদা বালি, কাঠের গুড়া, কাগজ প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিস তৈরী করতে শেখান হয়। এ ছাড়া কে.জিতে সেলাই, মাদুর বোনা প্রভৃতি নানা কাজের ব্যবস্থা আছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে সৃজনী শক্তির বিকাশ, আত্মবিশ্বাস, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, নানা জিনিস সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হয়।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশু ভোলান ছড়া ও গান। খেলা আর গানকে তিনি তার শিক্ষায় অতি উঁচু স্থান দিয়েছেন। খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে খেলার আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণা পায়।

ছেলেদের গানের মধ্যে ৭টি মায়ের গান ও ৫০টি খেলার গান। গানগুলির সাথে রয়েছে নানা রঙের ছবি আর নাচ। গানের সাথে নাচের মধ্য দিয়ে শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালন হয়। এ ছাড়া গানের সাথে মার্চের শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজের সাথে সাথে গানের ব্যবস্থাও আছে। গান ও খেলাগুলি শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী করা হয়েছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে তাই গল্পের মধ্য দিয়ে যা শেখান হয় তা তারা আনন্দের সাথেই শেখে। এতে ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। শিশুর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। দেহের জন্য যেমন খেলা, মনের খোরাক তেমনি গল্প। একটা দেহের অপরটা মনের তৃপ্তি।

[ফ্রয়বেলের শিক্ষাদর্শ আমার "শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস" বইয়ে আলোচিত হয়েছে]

মণ্টেসরী পদ্ধতি (Montessory Method):—

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে শিশুকে স্থাপনের যে চেষ্টা রুশোর সময় শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় ডাঃ মেরিয়া মণ্টেসরীর দান অপরিসীম। শ্রেণী শিক্ষার বিলোপ সাধন করে তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্যক্তিগত পার্থক্যের (individual difference) জন্য প্রতি শিশুর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শ্রেণী শিক্ষায় সেই বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি থাকলেও বিকাশের কোন সুযোগ নেই। শ্রেণী শিক্ষায় শিশুকে আলাদা আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রেণী শিক্ষা অবৈজ্ঞানিক বলে তাকে বিদায় দিতে বলেছেন।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা। প্রতিটি শিশু নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী একক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পুরস্কারের লোভ বা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে জোর করে কিছু করান অস্বাভাবিক। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়। শ্রেণীশিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথই রুদ্ধ হবে। স্বাধীনতার অর্থ ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, ছেলেদের শৃঙ্খল মুক্তির কথাই তিনি বলেছেন। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার (Free or Internal discipline) মধ্য দিয়ে।

স্বয়ং-শিক্ষা (auto-education)

মণ্টেসরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র সত্তার সুসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই ভেবেছেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম তাকে দিলে শিশু নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে। এজন্য তিনি কতকগুলি খেলনার উদ্ভাবন করেন। খেলনাগুলি এমন ভাবে তৈরী যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে নিজেরাই ভুল শুধরে নিতে পারবে। একে বলা হয় স্বয়ং-শিক্ষা (auto-education); শিশুর কাজে পরিচালিকা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন।

পরিচালিকা

মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিকা নেই, আছে **পরিচালিকা** (Directress)। তিনি শাসন করেন না, সাহায্য করেন। জননীর স্নেহ নিয়ে পরিচালিকা সর্বদা পাশে থাকেন। শিশুরা নিজেরা খেলবে, শিখবে, কাজ করবে। পরিচালিকা তাদের সবার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, উৎসাহ দেবেন, প্রয়োজন হলে তাদের সাথে খেলবেন বা কাজের সাথী হবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুরা মগ্ন থাকবে যার যার কাজে। এখানে কোন জোর বা জবরদস্তি নেই, কোন নিপীড়ন নেই;

ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা পরিচালিকা করবেন না। কোন শিশু যদি অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটায় তাহলে পরিচালিকা হস্তক্ষেপ করেন।

মণ্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয় নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন Didactic Apparatus পরিকল্পনা করেছেন। এতে আছে নানা আকারের, নানা মাপের কাঠের ফলক ও কাঠের লাঠি, কাঠের সিলিণ্ডার, রঙীন পুতুল, ধাতুর ঘণ্টা, মঞ্চ, কাঠের সিঁড়ি, বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনের জন্য বদ্ধ কাঠের বাক্স, বড় বড় হরফে লেখা কাঠের রঙীন বর্ণমালা, কার্ডবোর্ডের বাক্সে কার্ডের উপর লেখা বিভিন্ন অঙ্ক ইত্যাদি। এ সব উপকরণ দিয়ে ছেলেদের রঙ্ চেনা, স্পর্শ শক্তি ও স্মরণ শক্তির বিকাশ বিভিন্ন আকৃতি ও আকার সম্পর্কে ধারণা, অক্ষর সম্পর্কে ধারণা সংখ্যার প্রতীক দণ্ডের সাহায্যে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষা-উপকরণ

শিশু বিদ্যালয়ে এলে প্রথমে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। হাত মুখ ধোয়া, স্নান করা, পোষাক পরিচ্ছদ পরা তারপর ধীরে ধীরে ঘর পরিষ্কার, বাসনপত্র পরিষ্কার, খাবারের টেবিল সাজান সবই যাতে তারা নিজেরা করতে পারে সে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীর চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলা গানের সাথে নাচ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার নানাদিক

প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে উদ্ভিদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে এজন্য বিদ্যালয়ের সাথে বাগানের ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া পশুপালনের ব্যবস্থা করে পশুজীবনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুরা ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাদের রঙীন পেন্সিলে প্রথমে আঁকতে শেখান হয়, পরে তুলি দিয়ে আঁকতে দেওয়া হয়।

মণ্টেসরী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া এক সাথে শেখান হয়। মোটা কাগজের অক্ষর কেটে শিরিষ কাগজে এঁটে দিয়ে তার উপর আঙুল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। আঙুল চালানোর সময় শিক্ষকের সাথে শব্দটি বার বার উচ্চারণ করে অক্ষরটির সাথে পরিচয় ঘটে। গণনা শিক্ষায় প্রথমে টাকা-আনা-পয়সার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ১ থেকে ইঞ্চি দাগ দেওয়া কাঠির সাহায্যে গণনা লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরী পদ্ধতি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে ঐক্য রয়েছে কিন্তু বৈষম্যও কম নয়।

মণ্টেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির তুলনা :—

আপাত দৃষ্টিতে দুটি পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। গতানুগতিক নীরস শ্রেণীশিক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে একটা আনন্দময় পরিবেশে খেলার ছলে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা দুজনেই বলেছেন। শ্রেণীশিক্ষার বিরুদ্ধে দুজনেই সোচ্চার। ব্যক্তিগত পার্থক্যকে মেনে নিয়ে কি করে ছেলেদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিক্ষা দেওয়া যায় দু'জনে সে চেষ্টাই করেছেন। তবু পার্থক্য আছে।

মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে খেলা ও কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থায় দলগতভাবে কাজ হয়। ফ্রয়েবল শ্রেণীশিক্ষার বাঁধন থেকে শিশুদের মুক্তি দিতে পারেননি। মণ্টেসরী শ্রেণী-বদ্ধভাবে শিক্ষাদানের সার্থকতা নেই একথা বললেও আবেগমূলক ও প্রেরণা-মূলক শিক্ষা ব্যাপারে, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে সমষ্টিগত শিক্ষার বিশেষ সুবিধা আছে বলে মনে করেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিক্ষা পরিচালনা করেন। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে পরিচালিকা শিশুর কাজের দিকে শুধু দৃষ্টি রাখেন। শিশু কোন উপহার (Gift) নিয়ে খেলবে K. G.-তে তা শিক্ষিকা ঠিক করে দেন। খেলা ও কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে, মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশু তার নিজের ইচ্ছামত খেলনা নিয়ে খেলা করে। খেলা বা কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। শিশু যতক্ষণ খুশী খেলতে পারে।

মণ্টেসরী শিশুদের কাছে বেশী গল্প বা রূপকথা বলার বিরোধী। ফ্রয়েবল্ মনে করতেন গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ফ্রয়েবলের Gift এর পিছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। প্রতিটি উপহার প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে। মণ্টেসরীর Didactic Apparatus-এর পিছনে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য বা গূঢ় অর্থের কল্পনা করা হয়নি।

K. G.-তে লেখাপড়া ও বইয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহার ও লেখাপড়া শেখায় যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মণ্টেসরী পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে ছেলেদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ছেলেরা এর মধ্য দিয়েই শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিচালিকা উপস্থিত থাকেন, ছেলেদের কাজের দিকে দৃষ্টি রাখেন কিন্তু হস্তক্ষেপ বা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন না। K. G.-তে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষকের পরিচালনায় ছেলেরা কাজ করে খেলে। এখানে ছেলেদের রুটিন মেনে

চলতে হয় এবং শিক্ষক সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের দেশে K. G. নামধারী স্কুলগুলিতে ফ্রয়েবেলের পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। সাধারণতঃ মিশ্র পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। K. G. ও মণ্টেসরী উভয় পদ্ধতি থেকেই সুবিধাজনকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন বিষয়গুলি বেছে নেওয়া হয়। যত্রতত্র সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে যেসব K. G. স্কুল খোলা হচ্ছে তার অধিকাংশ শুধু সাইনবোর্ডই। K. G. শিশু শিক্ষায় এই দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন আমাদের দেশে তা এখনও সুদূর পরাহত।

হিউরিসটিক পদ্ধতি (Heuristic Method) ঃ—

শিশু শিক্ষা প্রণালী নির্ধারণে আমাদের চেষ্টা হবে শিশু যাতে নিজেই শিখতে পারে, জানতে পারে ; নিজের চেষ্টায় একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে সেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। হিউরিসটিক পদ্ধতির গোড়ার কথাই হচ্ছে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে জানবে। একদিন মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় অথবা আকস্মিকভাবে যে নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা আজ সামাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেইভাবে হিউরিসটিক পদ্ধতিতে শিশুকে এমন প্রণালী অনুসরণ করতে উৎসাহী করা যাতে শিশুরা অগ্রগামী (Pioneer) হয় নতুন জ্ঞানের সন্ধান করতে।

Prof. Armstrong বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রথম এই পদ্ধতির একটা সুসংবদ্ধ রূপ দেন। কিন্তু দেখা গিয়েছে এই পদ্ধতি সমস্ত বিষয় শেখাবার কাজে লাগান যেতে পারে। একটা পদ্ধতি যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অনুসরণ করে তবে তাকে শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞানমূলক পাঠের (Knowledge lesson) ক্ষেত্রে সর্বত্রই তার প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান চলে।

হিউরিসটিক পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম শেখানোর উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, আহরিত তথ্যগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করে কাজে লাগান যাবে, সেই কাজের মধ্য দিয়ে কি করে সাধারণ নিয়মটিকে ছেলেরা নিজেরাই জানতে পারবে সেই শিক্ষাই এই পদ্ধতিতে দেওয়া হয়।

হিউরিসটিক পদ্ধতিতে আরোহী প্রণালী (Inductive Process) অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। কতগুলি জানা তথ্য থেকে শিক্ষার্থীরা

অজানা জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে (From known to unknown)। ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় বই থেকে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সাহায্য করা হয়।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রধান ভিত্তি এই মতবাদকে এই পদ্ধতিতে কাজে লাগান হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষায় শিশুকে মানসিক দিক থেকে সক্রিয় থাকতে হয় বলে তার চিন্তাশক্তি বিকাশের সাথে যুক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। কোন একটা তথ্যকে গ্রহণ করবার আগে তার অনুসন্ধানী মন বিষয়টি বিচার করে, পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি যাচাই করে দেখে, হিউরিসটিক পদ্ধতিতে এমন একটা শিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হয় যার ফলে শিক্ষার্থী কতগুলি নিয়ম বা তথ্যই জানে না তার মনটি হয়ে উঠে অনুসন্ধানী।

শিক্ষার্থীর পক্ষে সব সময় তথ্য সংগ্রহ করে নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব না। শিক্ষককে অনেক সময় তথ্য সংগ্রহ বা খবর জোগাতে হয়। তা নাহলে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করা সম্ভব হয় না। তবে খেয়াল রাখতে হবে তথ্য জুগিয়েই যেন শিক্ষক কাজ শেষ না করেন বা স্কুলের সময় শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহে ব্যয় না হয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কাজ করবার সুযোগ পাবে না। ছাত্ররা যাতে শিক্ষকের দেওয়া খবরের উপর নিজেরা কাজ করতে পারে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে হিউরিসটিক শিক্ষা পদ্ধতির তাই লক্ষ্য। হিউরিসটিক শিক্ষা প্রণালীকে কোন একটি পৃথক পদ্ধতি না বলে বলা যায়—"essence of all methods" যে কোন শিক্ষাপ্রণালী যেখানে শিক্ষার্থীকে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে নতুন কাজের মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রেরণা যোগায় তাকেই হিউরিসটিক পদ্ধতি বলা চলে।

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, শিক্ষার্থী এখানে শুধুমাত্র নিক্রিয় শ্রোতা নয়। সে এখানে চিন্তা করে, তার মন সক্রিয় ও বিচারশীল। শুধু কথা শুনে বা কাজ দেখে কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয় না। এখানে নিজেকে কাজ করতে হয় বলে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান জন্মে।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে বিষয় সম্পর্কে যে আগ্রহ জন্মে নিজেকে কাজ করে জানতে হলে সে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক বেশী হয়। গতানুগতিক শিক্ষার মত হিউরিসটিক পদ্ধতিতে শিক্ষার বিষয় কখনও নীরস বা বিরক্তিকর বলে মনে হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে শেখার সাথে একটা সৃষ্টির আনন্দ আছে, যার ফলে বিষয়টি একঘেয়ে বা নীরস হয়ে উঠে না।

হিউরিসটিক প্রণালী অনুসরণ করবার কয়েকটি অসুবিধাও রয়েছে সে বিষয় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই প্রণালীতে শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। একটি বিষয় সম্পর্কে যখন কতকগুলি তথ্য শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় তারা তা নিয়ে কাজ করে যাচাই করে দেখে এতে সময় বেশী লেগে যায়।

ছোট ছেলেরা যে বয়সে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে পারে না তখন এই প্রণালীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এই প্রণালীতে শিক্ষকদেরও অনেক সময় অসুবিধা হয়। শিক্ষক শুধুমাত্র পুঁথিনির্ভর হয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারেন না। বিভিন্ন শ্রেণীর বোঝবার মত করে তাকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। সব শিক্ষক এই শিক্ষাপ্রণালীর সুষ্ঠু প্রয়োগ করতেও পারেন না। যদি কোন শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা করেন, এবং ছেলেরাই সব করতে পারবে এই ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তাহলে এই পদ্ধতিতে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। ছেলেরাই করবে, তবে তা শিক্ষকদের সহায়তায়।

শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি (Some Maxims of Education) :—

শিশুপ্রকৃতি জেনে নিয়ে যেসব প্রণালী অনুসরণ করলে শিক্ষা দেওয়া সহজতর ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পরও আরো কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। জটিল শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এই বহু আলোচিত ও পরীক্ষিত মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতিগুলির যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষার মত জটিল কাজকে সহজ করে তুলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষায় ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর কোন স্থান নেই। শিক্ষায় একটা সুসংবদ্ধ প্রণালী ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই সুসংবদ্ধ প্রণালী বা রীতিই হচ্ছে কতগুলি শিক্ষানীতিকে (Maxims of Education) মেনে চলা।

১। জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া (Proceed from Known to Unknown) :—

শিশু পূর্বে যা শিখেছে বা যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষায় হার্বার্ট যে apperceptive mas -এর কথা বলেছেন তা শিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাবার তত্ত্বকেই স্বীকার করে। শিশুকে যখন শিক্ষা দিতে সুরু করা হয় তখন প্রথম নির্ভর করতে

হবে শিশু কতটুকু জানে সেই তথ্যের উপর। সেই জানা থেকেই তার কৌতূহল জাগ্রত করে নতুন নতুন তথ্যের অবতারণা করা হবে। ছেলেরা গান্ধীজীর ছবি দেখেছে, গান্ধীজীর জন্মদিনে ছুটি পায়। অথচ তাঁর জীবনী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট নয়। এই সামান্য সূত্র থেকেই গান্ধীজীর জীবনী ও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ধীরে ধীরে ছেলেদের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব। শিক্ষার স্তরবিভাগ আলোচনায় আমরা দেখেছি স্তরগুলি এমনভাবে ভাগ করা হয় যার ফলে একটি নতুন পর্ব বাস্তবে শুরু হলে তখন তাকে নতুন বলে মনে হবে না। পূর্ববর্তী স্তরের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে যেন আমরা সেখানে এসে পৌঁছেছি এমনিভাবে নতুন পর্বটি উপস্থাপিত হবে। একটি পর্বের সাথে সাথে অপরটি হয় দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। শিক্ষায় পূর্বজ্ঞানকে ভিত্তি করেই আমাদের নতুনের দিকে যাত্রা করতে হবে।

২। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া (Proceed from Simple to Complex) :—

শিক্ষক মাত্রেই এই নীতিকে জানেন ও মেনে চলেন, এটা সাধারণ ভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার একটা ক্রম রয়েছে। সেখানে সহজ থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কঠিনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সহজ থেকে কঠিন বা জটিলের দিকে যাওয়া কথাটা যত সহজভাবে বলা হয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা তত সোজা নয়। সহজ (simple) কথাটা অপেক্ষিক (relative)। একে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যুক্তির দিক থেকে (logically) বিচার করে শিশুর কাছে সহজ বলে যা আমাদের মনে হয় মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে (Psychologically) বিচার করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তা শিশুর কাছে সব সময় সহজ হয় না। আমরা জানি একটি সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি করে শব্দ শেখানো যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়েছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সুরু করলে ভাষাশিক্ষা সুষ্ঠু ও সহজ হয়। তেমনি সরল রেখা বক্ররেখা প্রভৃতি নানাবিধ রেখা আঁকতে পারদর্শী করে চিত্র আঁকতে শেখানোর চেষ্টা যতটা কার্যকরী হবে তার চেয়ে শিশুর সামনে একটি সহজ চিত্র তুলে ধরে আঁকতে দিলে সে আঁকায় বেশী উৎসাহ বোধ করবে। অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর হয়ে শিশু মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ বুজে থাকলে সহজ জটিল বুঝতে ভুল হবে। সহজ বলতে শিশু যাকে সহজ মনে করবে তাই সহজ—If the teacher applies the maxim literally it might lead him to the mistaken nation of analysing the subject matter for the child and then teaching

the elements which then have to be confind into more complex wholes, e.g., alphabetical method of teaching, reading, or an introduction to geometry which being with defination, axioms and postulate (A Short History of Educational Ideas by S. I. Curtis and M. E. A. Boult wood).

এই নীতিকে যদি আক্ষরিক অর্থ (literal meaning) অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা হয় তাহলে ভুল হবে। শুধু এই নীতিটি নয় শিক্ষার প্রতিটি নীতির প্রয়োগের সময় তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে শিশু প্রকৃতি ও মন বুঝে। শিশুর কাছে বিষয়বস্তু কিভাবে উপস্থাপন করলে শিশুর পক্ষে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হবে সেইভাবেই আমাদের শিক্ষার নীতিসমূহ প্রয়োগ করতে হবে।

৩। মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে যাওয়া (Proceed from Concrete to Abstract) :—

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চোখে দেখে হাতে ধরে যাকে বোঝা যায় শিশুরা প্রথমে তাকেই চিনে নেয়। তাদের চিন্তায় প্রথম আসে মূর্ত জিনিসটি, ধীরে ধীরে তারা বিমূর্তের ধারণা করতে পারে। প্রথমে শিশু একটি পাখী দেখে—একটি দুটি এমনি করে বহু পাখী দেখবার পর পাখী সম্পর্কে তার সাধারণ ধারণা জন্মায়। ছেলেদের অঙ্ক শেখানোর সময় দেখা গিয়েছে যোগ-বিয়োগের সাধারণ নিয়ম প্রথমেই বোঝাবার চেষ্টা না করে কোন জিনিস (যেমন মার্বেল), যদি তাদের হাতে ধরিয়ে শেখাবার চেষ্টা করা যায় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ম শেখানোই আমাদের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষগোচর দ্রব্যটি যত শীঘ্র সম্ভব বাদ দিয়ে সাধারণ সূত্রের দিকে যাওয়া যাবে আমাদের কাজ ততই সার্থক হবে। নীতিটিকে স্মরণ রেখে শিক্ষক তাঁর নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে যাবেন।

৪। বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে যাওয়া (Proceed from Particular to General) :—

নির্দিষ্ট বস্তুর ধারণা থেকে সাধারণ সূত্রগঠন যুক্তিবিজ্ঞানের আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) অনুসারে করা হয়। প্রথম আমরা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি তারপর সাধারণ সূত্রে পৌছাই। বহুক্ষেত্রে আগুন ও ধোঁয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক দেখেই আমরা যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন সিদ্ধান্ত করি। এখানে কয়েকটি ঘটনা যা আমরা অবলোকন করেছি তা হচ্ছে মূর্তজ্ঞান (concrete example) তারপর যে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হল তা হচ্ছে বিমূর্তজ্ঞান (abstract conception)।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণালী

(Principles of Teaching Method)

শিশুর যুগ :—

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে আমরা দেখেছি বিভিন্ন যুগে শিক্ষা-সমস্যার রূপ ছিল বিভিন্ন। যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলবার প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষার যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা প্রথম তার সন্ধান পাই। তারপর বহু মনীষীর সাধনায় বহু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। শিশুর শিক্ষায় যেসব নীতি অনুসৃত হচ্ছে তা আমরা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলেই জানতে পারি। আধুনিক যেসব শিক্ষাপদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদের দৃষ্টিভঙ্গীর অদ্ভুত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়—তা হচ্ছে শিশু সম্পর্কে এদের মনোভাব। সমস্ত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতেই দেখা যায় শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাকে এইজন্যই বলা হয় **শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা** (Child Centric education)। শিশুকে জেনে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হয়ে শিশুকে গড়ে তুলতে হলে শিশুশিক্ষার যে রূপ হওয়া দরকার সেইভাবেই আধুনিক শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে

শিক্ষাকার্যে তিনটি অঙ্গ—শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু। এদের প্রাধান্য সব সময়েই একরকম ছিল না। মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী অপ্রধান অঙ্গ। সে সময় শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষাজগতের মধ্যমণি বা কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই মুখ্য, তিনিই সক্রিয়।

মধ্য যুগে শিক্ষার্থী গৌণ

তারপরেই বিষয়। যার জন্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন সেই শিক্ষার্থীই গৌণ। শিক্ষক যা শেখাবেন, যেভাবে শেখাবেন, যতটুকু শেখাবেন তাই শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে। এই ব্যাপারে ছাত্রের গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার ভাল লাগা, তার ইচ্ছা—এসব বিষয় বিবেচনার

মধ্যেই আনা হত না। যা বিবেচনায় মধ্যে আসত তা হচ্ছে শিক্ষকের হাতের যষ্টি। যষ্টির মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ সে যুগে বিশ্বাস ছিল যষ্টির ব্যবহার না হলে নাকি শিক্ষার্থীর উচ্ছন্নে যাবার পথ পরিষ্কার হত। Spare the rod, spoil the child—এই ছিল সে যুগের আপ্ত বাক্য।

ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যার জন্য শিক্ষার আয়োজন সেই শিক্ষার্থী আর গৌণ নয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়—শিক্ষার তিনটি অঙ্গের মধ্যে কি সম্পর্ক তা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার জন এডামস অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। "শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেয়।" শিক্ষক, জন ও ল্যাটিন—এরা যুক্ত হয়েছে একটি কাজের মধ্য দিয়ে, সেই কাজটি (ক্রিয়াপদটি) হচ্ছে 'শিক্ষা দেওয়া'। শিক্ষার তিনটি অঙ্গের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষা যখন দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তখন তাকে আর পিছনে ফেলে রাখা যায় না। বিষয় আর শিক্ষক দুইয়ের প্রয়োজন শিশুর শিক্ষার জন্য; তাই আজকের শিক্ষায় শিশুই প্রধান—বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে একটু দীর্ঘ হলেও স্যার জন এডামসের কথা তুলে দেওয়া হল।

এডামসের ব্যাখ্যা

"Verbs of teaching govern two accusatives, one of the person, another of the thing: as Majister Latinam Johannem Docuit—The Master taught John Latin. The essential difference between the old and the new teaching lies in the incidence of effort on these two accusatives. The old teachers laid most of the stress on Latin, the new lay it on John. In both cases it is probable that the teacher still drives his team tandem, though of old Latin came first, while John was kept in the backward region where, incidentally, he was more accessible to the whip. In these days John is brought into the position of prominence, and certainly gets his full share of the teacher's attention." (Modern Developments in Educational Practice.)

শিক্ষার আয়োজন শিশুকে নিয়ে—শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর মধ্যে যে শক্তি বা সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয়কে বিশেষভাবে জানতে হবে। সাধারণভাবে

শিশুমন, ও যে শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছি বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতিকে যদি জেনে নিতে পারি তাহলে শিক্ষার কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। শিশুদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিশুর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এ পার্থক্য শুধু দেহগত নয়, মনোগত পার্থক্যও রয়েছে। শিশুদের মানসিক গঠন একরকম নয়। তারপর বৌদ্ধিক দিক থেকেও দেখা যায় এক একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আবার সাধারণভাবে যেসব শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রায় একই রকম তাদের মধ্যেও দেখা যাবে এক-একটি শিশু এক-এক বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করছে। শিশুদের আবেগও সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যায় শিশুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে প্রতিটি শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব এক-একটি শিশুর মধ্যে লুকানো রয়েছে অনন্ত রহস্য। শিশুর শিক্ষায় তাই বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে শিশুপ্রকৃতিকে জানা। আগে শিশুকে জানব তারপর স্থির করব শিশুর শিক্ষায় কোন নীতিকে আশ্রয় করা হবে। শিশুর প্রকৃতি কি, তার বৈশিষ্ট্য কি—এ প্রশ্নটা শিশুর শিক্ষা-নীতি নির্ধারণে সব সময় সামনে রাখতে হবে। শিশুকে যেখানে ব্যক্তিগতভাবে তার শক্তি অনুসারে শিক্ষা দিতে হবে (individualised instruuction) সেখানে তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এজন্যই শিশুপর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শিশুকে জেনে শিশুর শিক্ষা

শিশুশিক্ষার একটি প্রধান কথা হচ্ছে শিশু যাতে নিজেই শিখতে পারে, জানতে পারে, নিজেই নিজের কাজ করতে পারে সেভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিশুর উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষক কি অভিভাবক অনেক সময় ইচ্ছামত শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পরিকল্পনা করেন ও শিশুর জীবনকে নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। এ ঠিক পথ নয়। "The growth of the self depends ultimately, however, on the child himself and the ideals that

govern his life. Some teachers and parents have mistakenly tried to plan their children's lives for them and to mould them to their will. This is not right, the child must work out his own ideal and teachers and parents should help—not dictate." (Instruction in Indian Secondary Schools Ed. E. A. Macnee p. 13). বিষয়ের সাথে শিশুর যোগাযোগ স্থাপনে শিক্ষক হবে উপলক্ষ্য (instrumental) মাত্র। শিশু তার পরিবেশের সাথে নিজেকে যাতে মানিয়ে নিতে পারে পরোক্ষভাবে তাকে সেই সাহায্য করতে হবে। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার সাথেই তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ নির্ভরশীল। আমাদের একটি লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে সামাজিক করে তোলা। সামাজিক জীবন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। সে শুধু সমাজের যোগ্য সন্তানই হবে না, তার প্রভাবও সমাজজীবনে প্রতিফলিত হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সহায়তাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ যেমন শিশুর নিজের জন্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের জন্য। সমাজ ও ব্যক্তি—এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দিকে দৃষ্টি রেখেই "শিশুশিক্ষা-নীতি" স্থির করা হবে। সমাজবোধ জাগ্রত করা শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনে যে সমাজবোধ জাগ্রত হয় তা উপদেশ শুনে নয় বিদ্যালয়-সমাজের (School Society) রীতিনীতিগুলি পালনের মধ্য দিয়েই সে সামাজিক হয়ে ওঠে। শুধু সমাজবোধ নয় জাতীয়তাবোধও বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে।

ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশে সহায়তা

শিশু-প্রকৃতি ও শিক্ষা প্রণালী (Child-nature and Teaching Process):—

সক্রিয়তা ও সৃষ্টি প্রবণতা:—

শিক্ষার রূপ কি হবে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হলে আমরা "শিশু প্রকৃতি" অনুসারী শিক্ষার পরের ধাপের জন্য প্রস্তুত হতে পারি। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশ ও তাকে ভবিষ্যতের

জন্য গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে তার শিক্ষারম্ভের সাথে সাথে। শিশুচরিত্রের কতগুলি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে। চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই হচ্ছে শিশু-প্রকৃতির নিয়ামক। শিশুপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, শিক্ষায় তাকে কাজে লাগাতে হবে। শিশুপ্রকৃতির একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু কাজ করতে ভালবাসে। আমরা বলি শিশু সদা চঞ্চল। সব সময়েই সে একটা না একটা কিছু করছে। হয় ভাঙ্গছে, না হয় গড়ছে। তাকে খেলা দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যায়। শিশু ইট দিয়ে ঘর বানাচ্ছে—এটা তার কাছে খেলা আর কাজ দুই-ই। খেলার মধ্য দিয়েই তার কর্মপ্রবণতা চরিতার্থ হয়। খেলাই হচ্ছে শিশুর কাছে একটা কাজ। চুপ করে বসে থাকা তার স্বাভাবিক ধর্ম নয়। একটি সুস্থ শিশুর পক্ষে দৈহিক ও মানসিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক। শিশুর কর্মপ্রবণতা তার দৈহিক ও মানসিক উভয় দিকেই উন্নতির জন্যই প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালিত হয়, শিশুর দৈহিক পুষ্টির জন্য তার কাজের দরকার অত্যন্ত বেশী। শিশুকে কাজ করতে না দিলে তার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তার অপচয় হয়, তার স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয়।

শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃজনী শক্তি রয়েছে কাজের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ ঘটে। কাজ করতে গিয়ে সে ভাঙ্গবে আর গড়বে। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই তার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যাবে, সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করবে, সেই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। শিশুর উপর বইয়ের বোঝা চাপানোর আগে তার যে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা আছে তাকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে শিশুর কর্মপ্রবণতার সদ্ব্যবহার। ডাল্টন প্ল্যান, প্রজেক্ট মেথড, হিউরিষ্টিক পদ্ধতি, Play way প্রভৃতি পদ্ধতিতে খেলা ও কাজ করবার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব—'যূথবদ্ধ প্রবৃত্তি' বশে সমাজে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করি। এই যে মিলে মিশে বাস করা, এটা দশজনে মিশে কাজ করবার মধ্য দিয়ে শেখান হয়।

অনেকে বলেন শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞার সমষ্টি। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি। শিশু স্কুলে আসার বহু পূর্ব

থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করে, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি—এই যে শেখা, তা শুধু বই পড়ে শেখা নয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখা। অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে শিশুর কাজের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। একটার পর একটা কাজ যখন শিশু করে, তখন তার নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। নতুন কাজের মধ্য দিয়ে যে তথ্য সে সংগ্রহ করে তার মধ্য দিয়েই তার জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হতে থাকে। নতুন কিছু শিখতে হলে যতটুকু শিখেছি আমরা সেখান থেকেই শুরু করি। অর্থাৎ পুরাতনের জের টেনে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় বাস্তবের সাথে একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে। শিশু তার বাস্তব পরিবেশে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা লাভ করে তা তার মনে গভীর রেখাপাত করে। বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা কাজের মধ্য দিয়েই সম্ভব। অবশ্য সব সময়েই আমরা যা শেখাতে চাই তার সাথে বাস্তবের যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সমুদ্র সম্পর্কে কিছু পড়াতে গিয়ে ছেলেদের সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বা বাঘ সম্পর্কে পড়াতে বসে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ দেখিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে—এসব ক্ষেত্রে তার বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা দেখতে হবে।

আগ্রহ ঃ—

কাজ করা বা অভিজ্ঞতা অর্জন দুইয়ের জন্য প্রয়োজন আগ্রহের। শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় (Instinctive Tendency) নানা কাজে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তিমূলক সব কাজই যে শিক্ষার পরিপোষক, তা নয়। প্রবৃত্তির আদিম রূপ ও তার নগ্ন প্রকাশ সমাজসম্মত নয়। শিক্ষা আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিমার্জিত করে। প্রবৃত্তিমূলক প্রেরণায় শিশু যে কাজ করে সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তা পরিচালিত করা যায় তাহলে সে কাজ শিশু আনন্দের সাথে করবে। কৌতূহল শিশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু নতুনকে জানতে চায়। এই কৌতূহল প্রবৃত্তিকে শিক্ষায় প্রশ্ন করার কাজে লাগান যায়। শিশু যদি নতুন নতুন বিষয় জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, সে নতুন জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী হয়, তাহলে তার শেখার কাজটি দ্রুত এগিয়ে চলে। যে কাজ শিক্ষাসহায়ক নয় সে কাজ থেকে তার কর্মপ্রবণতাকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষাসহায়ক যে কাজ, সে দিকে তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ যে কাজে শিশুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিশুকে সেই সম্পর্কেই উৎসাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষায় 'আগ্রহ'

একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ নেই, তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি, সে বিষয় যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন তা শিশু সহজ মনে গ্রহণ করবে না। সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিতেই যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনিচ্ছুক শ্রোতাকে কিছু শোনাতে চেষ্টা করলে তা কানে যাবে বটে কিন্তু তা "মরমে পশিবে না।" শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলে শিক্ষার বিষয়কে সরস করে তোলবার সব রকম চেষ্টার পরও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে শিক্ষা ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই মধুর নয়। পথ যতই মসৃণ করা হোক না কেন—চড়াই উৎরাই কিছু থাকবেই। কঠিন নীরস বিষয় আয়ত্ত করতেও শিক্ষার্থী নিরুৎসাহ হবে না যদি বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। উৎসাহ বা ঔৎসুক্য বোধ করলেই শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ জন্মাবে।

পাঠের লক্ষ্য ঃ—

শিশুদের যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তখন সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি শেখাবার উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়টির মধ্য দিয়ে আমরা কোন লক্ষ্যে পৌছাব সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান দরকার। কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে তা শিক্ষা দেবার সময় সেই বিশেষ পাঠের লক্ষ্য স্থির করে যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে পাঠ (Lesson) সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে। সেই নির্দিষ্ট পাঠ আয়ত্তের সহায়ক যে সব তথ্য উপস্থাপন করা হয় সে সব তথ্যের উপযোগিতা কি তা তারা বুঝতে পারে। বিক্ষিপ্ত তথ্য রাজি একটি সুসংবদ্ধ রূপ নেবার ফলে পাঠ সার্থক হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন পাঠ শুরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তাদের সামনে প্রতিপাদ্য বিষয় কি? কি করতে চাই সেটা ঠিক করে নিলে কাজের অনেক সুবিধা। কাজ করতে গিয়ে সে বিচার করে দেখতে পারে যা করতে চাইছে তা হচ্ছে কিনা। পাঠের ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষার্থী জানতে চায় তার নির্দিষ্ট পাঠ তাকে লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে কি না?

তথ্য ও উপকরণ ঃ—

পাঠের লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে লক্ষ্যের উপযোগী তথ্য নির্বাচনে বেগ পেতে হয় না। কোন একটি বিষয় যখন শিক্ষক শিক্ষা দেন তখন সে বিষয়টি বোঝাতে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা শিক্ষককে সংগ্রহ করতে হবে। একই বিষয় শিক্ষার্থীদের বয়স ও গ্রহণের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বোঝান যেতে পারে। একই ইতিহাস বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ান হয়। এক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষককি

বোঝাতে চান তা যদি স্থির থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যা দরকার শিক্ষক ততটুকু তথ্যই উপস্থাপন করবেন। লক্ষ্য অনুসারে তথ্য নির্বাচনের উপর শিক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। শিক্ষায় উপকরণের সাহায্য নেবার সময় খেয়াল রাখতে হবে উপকরণ যেন বিষয়কে ছাড়িয়ে না যায়। বিষয়কে সহজ বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন, উপকরণের সাহায্যে ততটুকুই নেওয়া হবে। উপকরণ শিক্ষাসহায়ক কিন্তু তার আধিক্য যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপস্থাপন ঃ—

নতুন একটি বিষয় যখন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন কি ভাবে বিষয়টি শিক্ষক তাদের নিকট উপস্থিত করবেন তার উপর বোঝা না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে। উপস্থাপন করবার পূর্বে বিষয়টিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া দরকার। স্তর পরম্পরা বিষয়টিকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রতিটি স্তরের মধ্য দিয়ে সেদিনকার পাঠের যা উদ্দেশ্য তাকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারলেই পাঠ সার্থক হবে। পাঠ বোঝাবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই বলা হল কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হল না তা হলে দেখা যাবে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয়নি। বিক্ষিপ্ত তথ্যের মাঝে আসল বিষয় বস্তুটি হারিয়ে যাবে। পাঠকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আগ্রহশীল করে তুলতে হলে সুনির্বাচিত তথ্যরাজিই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণে অনেক জটিল বিষয়ও শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে। স্তর বিভাগের সময় ছাত্রদের সামর্থ্যের কথা ভুললে চলবে না। একটি পর্ব শেষ হলে ছাত্রদের মনে যেন স্বাভাবিক ভাবেই পরের পর্ব সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। তারা যেন মনে না করে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, পূর্ব পাঠের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। নতুনের সূত্রপাত পুরাতনের মধ্যেই হবে। একটি জিনিস জেনে পরের জিনিসটি বুঝবার জন্য যে আগ্রহ, জানা থেকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই সার্থক হতে পারে।

"Thus, by carefully articulating the syllabus and bringing out the connection as vividly as possible, the material can be made into a medium for continuous exploration, and each topic becomes an introduction for the next. By emphasizing the fact of connection the abler pupils can be encouraged to adopt the attitude of expecting connections and development, and of actively searching for these.

When dealing with a syllabus which allows of this

continuous development, it is advantageous to divide the material into topics and sub-topics, each of which is a comprehensible unity, at the end of which reference may be made to the next following topic, giving rise to anticipatory curiosity. The teachers can often take a leaf out of the book of the publishers of serial stories and makers of screen serials and close each episode at an intriguing and exciting juncture, whetting the appetite of the pupils for the next topic (M. A. Pinsent, The Principles of Teaching Method.)

কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সহজ বোধগম্য করে তোলবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য অন্য বিষয়ের অবতারণাও করা যেতে পারে। পাঠে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ও সরল করে তোলবার জন্য প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় মূল বিষয়টির সাথে উপস্থাপন করা দরকার হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে একটি বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাথে ভূগোলের, ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা খুবই সহজ—কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বুনিয়াদি শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে অপর সকল বিষয় শেখান হয়। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি প্রজেক্ট স্থির করে সেই প্রজেক্ট কার্যে পরিণত করতে অনুবন্ধ প্রণালীতে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

(প্রজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষা দ্রষ্টব্য)।

অভ্যাস :—

একটি নতুন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বিষয়টি যদি দক্ষতামূলক-পাঠ (skilled lesson) হয় তাহলে বার বার অভ্যাস না করলে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। যে কোন নতুন পাঠই যদি স্মৃতিতে ধরে রাখতে হয় তা হলে পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক যখন পাঠ দেবেন তখন প্রতি স্তর বা পর্বের পর আলোচ্য বিষয়টির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। পাঠ বোঝা আর আয়ত্ত করা ঠিক এক নয়। কবিতা রসানুভূতিমূলক পাঠ (appreciation lesson), বুঝিয়ে দিলে কবিতার রসগ্রহণে ও অর্থবোধে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু শিক্ষার্থী যদি বার বার অভ্যাস না করে তাহলে কবিতাটি তার আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানমূলক-পাঠ (Knowledge lesson) যেখানে মুখস্তের প্রয়োজন নেই সেখানে বুঝিয়ে দিলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হল না, অধীত বিষয়কে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। অভ্যাস না করলে শেখা বিষয়টির একটা বড় অংশই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

প্রশ্নাবলী

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়]

1. Trace the evolution of teaching methods and show through the contribution of great educators their characters have gradually changed from empirical scientific. (C. U., B. T. 1965)

   What do you understand by logical and psychological approaches in teaching? Discuss by selecting a suitable topic from any subject of the secondary school syllabus. (C. U., B. T. 1966)

3. Estimate relative value of logical and psychological methods of teaching. (C. U., B. T. 1968, Kalyani University 1967)

   Consider the importance of methodology as against knowledge of subject matter in a teaching learning situation. Discuss in this connection if methodology interferes with thorough learning of a subject. (C. U. B. T. 1969)

   Distinguish between logical and psychological methods of teaching. Estimate their relative importance in teaching of school children. (C. U., B. Ed. 1970)

6. Activity is the essence of modern teaching method. Critically discuss how far the progressive teaching practices of today have been influenced by the new activity pedagogy. (C. U., B. T. 1965)

7. What are progressive methods of teaching? Why are they so called? What are their merits and limitations? Illustrate your points taking any two of the methods. (C. U., B. T. 1967)

8. What do you understand by "project Method"? Describe a school project in some detail indicating (a) the class for which it is meant (b) the school subject involved, and (c) the educational objectives that are sought to be realised. (C. U., B. T. 1968) J. U., B. T. 1971)

9. Write notes on (a) Work shop Method. (C. U., B. T. 1965, 1970)
   (b) Activity-Method. (C. U., B. T. '71, J. U. B. T. '70)
   (c) Critically examine 'Dalton plan'. (C. U., B. T. 1968)
   (d) Heuristic method. (C. U., B. T. 1964, J. U. B. T. '71)
   (e) Educational workshop. (J. U., B. T. 1970)
   (f) Particulars to general—as maxim of method. (J. U. '71)

10. Discuss the advantages and the limitations of the project method, taking a concrete example. (C. U., B. T. 1961, 1958)

11. Explain the psychological and pedagogical significance of the project method. Describe any school project, indicating (a) the class for which it is meant, (b) the school subjects and significance activity involved in it, and (c) the educational objectives to be realised through it. (C. U., B. Ed. '70)

12. What is Dalton plan? Discuss its advantages and limitations and illustrate your answer with suitable example. (C. U., B. T. 1962)

13. Give some examples of progressive methods of education, bringing out their progressive features. Examine in detail any one of such methods. (C. U., B. Ed. 1969)

14. What do you understand by an "activity lesson"? Describe some of the important types of activity lessons and point out their educational implications. (Kalyani University B. T. 1968)

15. Outline a plan of the workshop method of study, with suitable example. Compare the workshop method with our conventional methods and show how far it is applicable in our schools? (Kalyani University B. T. 1967)

16. What are the criteria of a good method? Why should a teacher be familiar with satisfactory methods of teaching besides mastering the knowledge of the content of a subject? (J. U. B. T. 1970)

17. What are the progressive methods of teaching? Why are they called so? How far it is possible to use such methods in our educational practices? Discuss. (Jadavpur University B. T. 1970)

18. What are activity methods, and why are they considered important in modern education? How do they compare with traditional methods? (Jadavpur University B. T. 1971)

19. Discuss any one of the progressive methods of teaching and point out its characteristics. (C. U., B. Ed. 1971)

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রেণী শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি

[CLASS TEACHING AND TEACHING METHOD]

ব্যক্তিগত শিক্ষা

(Individual Teaching)

শিশুর প্রকৃতিকে জেনে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় যুক্তি-সিদ্ধ পথে ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক বহু শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেখা যাবে যে, সব ছেলেমেয়ে প্রায়ই একই রকমের। তবুও তাদের মধ্যে প্রকৃতগত পার্থক্য রয়েছে। একটি শিশু আরেকটি থেকে বিভিন্ন; আবার একই শিশু বিভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ আচরণ করে। ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিতে এই ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual differences) স্বাভাবিক এই বৈষম্যকে মেনে নিয়েই মন্তেসরী পদ্ধতি, মিসেস পার্ক হার্স্টের ডাল্টন পদ্ধতি, উইনেটকা পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা করে। শিক্ষক বা পরিচালিকা তাদের কাজ দেখাশুনা করেন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা-ব্যবস্থা করায় বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়েছে। শ্রেণীশিক্ষায় ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধনের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষকই সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন। শিশুর স্বাধীনতা এখানে সীমিত—শিশু নিজ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ বা বিকাশের কোন সুযোগ শ্রেণীগত শিক্ষায় পায় না। মেধাবী ছাত্র ও পশ্চাদ্‌পদ্‌ ছাত্র সবার ক্ষেত্রেই এই শিক্ষার কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। শ্রেণীগত শিক্ষার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

শ্রেণীশিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকটি রক্ষিত হয় না।

শ্রেণী শিক্ষা

(Class Teaching)

যদিও শিশুকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় *"It has told the knell of class teaching" (Sir John Adams)*, তবুও যেখানে ব্যাপক-ভাবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে শ্রেণী শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার উপযোগী করে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রেণী শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। তবুও যখন শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের প্রশ্নটি আমরা বিচার করব, তখন বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে তা করা দরকার। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী শিক্ষারই প্রাধান্য। আমরা একই শ্রেণীতে ৩০।৪০টি ছাত্রকে নিয়ে একসাথে শিক্ষা দেই। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেণী শিক্ষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করে কি ভাবে শ্রেণী শিক্ষার ত্রুটিকে যথাসম্ভব দূর করে একটি আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায় সেই কথাই আমাদের চিন্তা করতে হবে।

শ্রেণী শিক্ষার প্রয়োজন আছে

শ্রেণী শিক্ষা কি ?

(What is Class Teaching)

শ্রেণী শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে,—একই বয়সের (Chronological age) কয়েকজন শিক্ষার্থীকে যাদের মানসিক শক্তি ও মেধা (Mental age) প্রায় একইরকমভাবে বিকাশলাভ করছে বলে আমাদের বিশ্বাস, তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (ধরা হোক ১ বছর) একটি পূর্বনির্ধারিত পাঠক্রমকে একই সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সহজ থেকে জটিলতর বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

একই মানসিক বয়সযুক্ত কিছু ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই হ'ল শ্রেণী শিক্ষা

শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা

(Advantages of Class Teaching)

শ্রেণী শিক্ষায় সাধারণভাবে দেখা যায় যে, একই শ্রেণীর অনেক ছাত্র প্রায় একই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগত শিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন করে একই জিনিস বোঝাবার ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রেণী শিক্ষায় এক সাথে ৪০।৫০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বলে শিক্ষকের বহু সময় বেঁচে যায়—শক্তিও অনেক কম ব্যয় হয়। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় যে পরিমাণ শিক্ষকের প্রয়োজন শ্রেণী শিক্ষায় তার চেয়ে অনেক কম শিক্ষক দিয়ে সে কাজ পাওয়া যায়। এর ফলে অল্প লোক দিয়ে, অনেক কম সময়ে কম শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে অধিকতর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

শিক্ষকের সময় বাঁচে ও কম শিক্ষক কম শক্তি ও কম অর্থ দিয়ে অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া যায়

ব্যক্তিমুখীন পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ও নানারূপ সাজ-সরঞ্জাম যত বেশী প্রয়োজন হয় শ্রেণী শিক্ষায় পাঠের সাজ-সরঞ্জাম ও বহু প্রকার উপকরণও অনেক কম প্রয়োজন।

উপকরণ কম লাগে

শ্রেণী শিক্ষায় সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। শ্রেণী শিক্ষায় ছাত্রেরা দলগত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে। শ্রেণীতে যখন কোন একটি বিষয়ের পাঠ চলে তখন যোগ্য শিক্ষক যদি সবার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে সবাই সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করে সুন্দরভাবে পাঠটি শেষ করতে পারে। একই সাথে কাজ করা ও শেখা এর মধ্য দিয়ে যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে শ্রেণী শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। **শ্রেণী শিক্ষায় পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্যের সুযোগ রয়েছে।** কোন বিষয়ে যদি একটি ছেলে দক্ষতা অর্জন করে তবে সে সেই বিষয়ে তার সহপাঠীকে সাহায্য করতে পারে। আবার সে যদি কোন বিষয়ে পিছিয়ে থাকে তাহলে তাকে শ্রেণীর অপর ছাত্র সাহায্য করতে পারে। এরূপ পারস্পরিক সাহায্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলে শ্রেণীর সবাই উপকৃত হয়—"*This attitude, that some are good at one thing some another, and those who are good must really help those who are not, seems epitomize the right tone the class room*" (*N. Cathy. A first Book on Teaching*)

শ্রেণী শিক্ষায় সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়

শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করা সহজ। দেখা গিয়েছে শ্রেণী শিক্ষায় উৎসাহবোধটা অনেকটা সংক্রামক। ব্যক্তিগত শিক্ষায় ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। একজন জানে না আরেকজন কি করছে—ফলে একজনের মনোভাব (উৎসাহ কি আগ্রহ) আরেকজনের মধ্যে সংক্রমিত হবার সুযোগ পায় না। শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারেন।

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়

শ্রেণী শিক্ষায় একজন অপরজনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। একটি ছাত্র যখন এগিয়ে চলে তখন অপর ছাত্রদের মধ্যেও সেভাবে এগিয়ে চলার প্রেরণা আসতে পারে। শিক্ষায় কিছুটা প্রতিযোগিতা থাকা ভাল; শ্রেণী শিক্ষায় সে সুবিধা রয়েছে। তবে যেন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা না হয় তা দেখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

রসানুভূতিমূলক পাঠে (Appreciation lesson) শ্রেণী শিক্ষার উপযোগিতা এত বেশী যে তার ফলে যেখানে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিমুখীন সেখানেও রসানুভূতিমূলক পাঠ শ্রেণীগতভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রেণীশিক্ষা ও রসানুভূতিমূলক পাঠ

শ্রেণী শিক্ষার অন্যান্য কতকগুলি সুবিধা আছে। শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতি, বন্ধুত্ব ইত্যাদি গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি,

যৌথ মনোভাব, সমবায়মূলক মনোভাব ইত্যাদি গড়ে উঠে, ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। শ্রেণী শিক্ষায় দলগত চেতনা, গোষ্ঠী চেতনা, গোষ্ঠীজীবনযাপন কৌশল, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিক্ষা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সব গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রেণী শিক্ষার অন্যান্য সুবিধা

শ্রেণী শিক্ষার অসুবিধা
(Disadvantages of Class Teaching)

শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ব সিদ্ধান্ত হচ্ছে, একই শ্রেণীতে যাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা ও ধারণশক্তি একই রকম এবং তাদের মানসিক গঠনও অনেকখানি একই রকম। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় একটি শ্রেণীতে প্রতিটি ছাত্র একে অপর থেকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন। একই শ্রেণীতে একই মানের শিক্ষার্থী সমাবেশে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন শ্রেণীর সবচেয়ে ভাল ছাত্রটির সাথে সবশেষের ছাত্রটির মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে যাবেই। মানসিক গঠন বৌদ্ধিক বিকাশ কোনদিক থেকেই একই রকম ছাত্র পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষক যখন একটি শ্রেণীতে শিক্ষা দেন তিনি দেখতে পান তাঁর সামনে যারা রয়েছে যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের মানসিক গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, গ্রহণের ক্ষমতা, জ্ঞানের পরিধি প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই একটা বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁকে একই সাথে এই বিভিন্নমুখী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে।

একই শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রদের মানসিক মান সমান নয়

শিক্ষকের অসুবিধা
(Teachers' Difficulties)

শ্রেণী শিক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা, শিক্ষক কোন ছাত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠপদ্ধতি স্থির করবেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রেণীর মান নির্ণয় করুন না কেন সবার সমান উপকার শ্রেণী শিক্ষায় সম্ভব নয়। ভালর দিকে চাইলে মন্দরা কিছু বুঝবে না। শুধু মন্দ ছাত্রদের কথা মনে করে তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালনা করলে ভালদেরও টেনে পিছনে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা মাঝামাঝি তাদের দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালনা করা। অবশ্য এতেও যে অসুবিধা নেই তা নয়—ভাল মন্দ দু'দিক থেকেই আপত্তি আসতে পারে। এক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের পাঠের অগ্রগতি ব্যহত হয়, আবার পশ্চাদ্‌পদ ছাত্রদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কয়েকটি মাত্র ভাল ও কয়েকটি

শিক্ষক একটি standard ধরে পড়ানোর ফলে অন্যান্য ছাত্রদের অসুবিধা

মাত্র মন্দ ছাত্রদের জন্য অধিকাংশ ছাত্রদের পাঠের ক্ষতি সম্ভব নয়। কারণ দেখা গিয়েছে একটি শ্রেণীতে মাঝামাঝি রকমের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। কঠোর-ভাবে ক্লাস প্রমোশন নিয়ন্ত্রণ করলে হয়ত এই ত্রুটি কিছুটা দূর করা যায়। কিন্তু শিক্ষক মাত্রেই জানেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্লাস প্রমোশনে কঠোরতা অবলম্বন করার পথে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা রয়েছে তাই এই পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। শ্রেণী শিক্ষায় সাধারণতঃ মাঝারী মানের শিক্ষার্থীদের উপকার হয় বেশী। শিক্ষক ছাত্রদের একটি average standard ধরে নিয়ে শিক্ষা দেন। তাতে ভাল ও খারাপ ছাত্র—দু'য়েরই ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ভাল ছাত্রেরা শ্রেণী শিক্ষায় খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শ্রেণী শিক্ষার অসুবিধা দূরীকরণের উপায়ঃ

॥ ১ ॥ শিক্ষকের দায়িত্ব (Teachers' Responsibility) :

শ্রেণী শিক্ষার অসুবিধা রয়েছে অথচ এদেশের শিক্ষা থেকে শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থা লোপ হবার কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও আছে বলে মনে হয় না। তাই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে প্রচলিত শ্রেণী শিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে আমরা ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করে তার মধ্যে যতটা সম্ভব শ্রেণী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে আমাদের কাজ সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কোন উদ্যোগী শিক্ষক যদি কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফল পান তিনি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। এই সমস্যাটিকে আমাদের শিক্ষকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মের পথ অনুসরণ করে চলে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণী শিক্ষার অসুবিধাকে মেনে নিয়ে যথাসম্ভব এই ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা করা দরকার।

বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্রেণী শিক্ষার উপযোগী করতে হবে

॥ ২ ॥ শ্রেণীগঠন ও শ্রেণীবিভাগ (Section) সমস্যা :

শ্রেণী শিক্ষার প্রধান সমস্যা হ'ল শ্রেণীগঠন কি রীতিতে হওয়া উচিত তা স্থির করা। বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভিমত হচ্ছে, একই রকমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমজাতীয় দল বা শ্রেণী গঠন করতে হবে। এই সমজাতীয় দল বিভিন্ন ভাবে গঠন করা যেতে পারে। যেমন—একই রকমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল, যে সব ছেলেমেয়ে পড়ায় একই রকম দক্ষতা দেখিয়েছে তাদের নিয়ে দল, একই বুদ্ধ্যাঙ্ক (I. Q.) সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল; প্রভৃতি

একই বুদ্ধ্যাঙ্কযুক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রেণীগঠন

বিভিন্ন রকমের দল গঠন করবার কথা আমরা জানি। দল গঠনের এসব অভিমত নিয়ে আলোচনা করলে কতকগুলি অসুবিধা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে একই বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে দল গঠন করা হ'ল, কিছুদিন বাদেই তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

॥ ৩ ॥ বিভাগ গঠন (Section) :

সমবয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে যে শ্রেণী বা দল গঠন করা হয় তার মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান, সাধারণ বুদ্ধিমান, নির্বোধ বা পশ্চাদপদ অর্থাৎ যাদের আমরা বলে থাকি ভাল-মাঝারি-মন্দ,—এই তিনটি ভাগ স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। কেহ কেহ একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি এদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ (section) গঠন করার কথা বলেন। এতে অসুবিধা সৃষ্টি হয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অভিভাবকেরা প্রায়ই অনুরোধ করেন তাঁর ছেলেটি যেন 'A' section-এ দেওয়া হয়। তাঁরা ধরে নেন যে,—যত ভাল ছেলেকে বুঝি 'A' section-এ দেওয়া হয় ও সেখানে পড়া ভাল হয় তাই সেখানে দিলে তার ছেলের পড়া ভাল হবে।

A-section-এর প্রতি সকলের ঝোঁক

যদি একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি ছেলেমেয়েদের নিয়ে A-B-C এই তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে C অর্থাৎ 'মন্দ' এই ভাগের ছেলেদের মধ্যে একটা হীনমণ্যতা বোধের সৃষ্টি হবে ও 'A' এই বিভাগের মধ্যে নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়ে তাদের মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। অর্থাৎ দু'দিক থেকেই মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি হ'বার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর তিনটি বিভাগ করবার মত পর্যাপ্ত ছাত্রসংখ্যাও থাকতে পারে। দু'চারটি ছেলে নিয়ে বিভাগ সৃষ্টি করবার আর্থিক সঙ্গতি স্কুলের থাকে না। পাঠ আয়ত্ব করবার ক্ষমতা অনুযায়ী দল গঠন করাও সহজ নয়। একই ছাত্র একটি বিষয় আয়ত্ব করতে যে দক্ষতা দেখাবে অপর একটি বিষয় আয়ত্ব করতে এইরূপ দক্ষতা তার নাও থাকতে পারে।

বিভাগ গঠনের অসুবিধা

অনেকে multilateral class এর কথা বলেন। যারা ভাল তারা যাতে এগিয়ে যেতে পারে সে ভাবে section করা হবে। এমনকি যে ছাত্র যে বিষয়ে ভাল সে বিষয়ে তাকে এগিয়ে দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। কোঠারী কমিশন প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের জন্য এই সুযোগ থাকার কথা বলেছেন। বর্তমান কাঠামোতে এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন বিষয়ে ভাল ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা

সমজাতীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রেণী বা দল গঠন করা হলে কার্যক্ষেত্রে

দেখা গিয়েছে যে,—একমাত্র বয়সের ক্ষেত্র ছাড়া সমজাতীয় দলের সমত্ব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষমতায়, আগ্রহে, ঔৎসুক্যে, দক্ষতায় বিভিন্ন দিক থেকে সমজাতীয় দলে বৈষম্য দেখা দেবেই। সাধারণ (average standard) বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃত পক্ষে সেটাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয় ;—কারণ ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual difference) থেকে যাবেই।

সমজাতীয় শিক্ষার্থীর মধ্যে সমত্ব থাকে না

মিশ্র শ্রেণীবিভাগ ঃ

ভাল-মন্দ-মাঝারী অর্থাৎ সব রকম ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রেণীবিভাগই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য (gap) যেন অত্যন্ত বেশী না হয়। কিছুটা অসুবিধা থাকবে,—তাকে মেনে নিয়েই বিভাগ (section) করতে হবে।

সবরকম ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শ্রেণী গঠন

॥ ৪ ॥ শ্রেণীনিয়ন্ত্রণ ও শ্রেণীর মনোযোগ ঃ

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হবে তাহলে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন পথ কি আর নেই। কিন্তু শিক্ষার প্রসার যে ভাবে হচ্ছে তাতে এই গরীব দেশের পক্ষে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। তাই শ্রেণীশিক্ষার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই সুষ্ঠু পঠন-পাঠন ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষক সতর্ক না হলে প্রায়ই ছাত্ররা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ছাত্রেরা শিক্ষকের কথা শোনা ছাড়া তাদের পাঠের আর কোন অংশ গ্রহণ করবার আছে বলে মনে করে না। অনেকে মন দিয়ে পাঠ শোনেও না। একজন শিক্ষকের পক্ষে পড়াবার সময় সব কয়েকটি ছাত্র মন দিয়ে পড়া শুনছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সার্থক শিক্ষকের বিচারের কষ্টিপাথরই হচ্ছে ক্লাস নিয়ন্ত্রণ ও ক্লাসের সব কয়টি ছাত্রকে পাঠে মনোযোগী রাখা।

শ্রেণী-নিয়ন্ত্রণ ও সব ছাত্রদের মনোযোগ সৃষ্টিতেই শিক্ষকের সার্থকতা

॥ ৫ ॥ সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বিচার ঃ

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সবাইকে পড়ান। সবাই সমবেত ভাবে একটি সমস্যার সমাধান করে। এই সবাই মিলে কাজ করতে পারাটাকে প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের পারা বলে ভুল করা হয়। অর্থাৎ একটি সমস্যামূলক পাঠ সমবেতভাবে সমাধান করবার পর জিজ্ঞেস করলে সবাই বলবে বুঝেছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে অনেকেই উত্তর দিতে পারছে না। সমবেত প্রচেষ্টায় একটা সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে কিন্তু তাকে আয়ত্ব করতে হবে ব্যক্তিগত ভাবে। শিক্ষার্থীরা 'বুঝেছি' বললেই শিক্ষক যদি মনে করেন

প্রতিটি ছাত্র ব্যক্তিগত-ভাবে পাঠগ্রহণ যথাযথ-ভাবে করছে কি না তা দেখতে হবে

তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে তাহলে ভুল করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সবাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে তারা বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছে কি না। প্রশ্ন করলে বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় ছাত্রেরা উত্তরদিতে পারছে না। সমবেত সঙ্গীতে যে ছাত্র অংশ গ্রহণ করল তাকে একা গাইতে দেওয়া হলে সে তা পেরে উঠবে না। শ্রেণীশিক্ষা যেন সমবেত সঙ্গীতের মত না হয় তা দেখতে হবে। একটি অঙ্ক বোর্ডে করে দেওয়ার সময় ছাত্রেরা মাথা নাড়লেই তুষ্ট হলে চলবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অঙ্কটি কষতে পারল কি না তাও জেনে নিতে হবে। সমষ্টিগত ভাবে শিখে ব্যক্তিগত ভাবে তাকে প্রয়োগ করতে পারলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

॥ ৬ ॥ শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা (Student's Active participation) :

আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত সম্ভাবনাকে যেভাবে বিকাশের সহায়তা করা যায় শ্রেণীশিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে সেভাবে সহায়তা করবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। (শ্রেণীশিক্ষায় গোষ্ঠীবোধ যেভাবে জাগ্রত হয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে তা ততটা সহায়ক নয়।) একই সাথে শিক্ষা দেবার কালে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ না পেয়ে অনেকটা ছাঁচে-ঢালা জিনিসের মত গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নানারূপ প্রশ্ন করে শিক্ষায় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে শ্রেণী পাঠের ত্রুটি দূর করতে হবে। শ্রেণীর সব ছাত্রের মধ্যেই একই সাথে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি ক'রে তাদের পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করে তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের। অভিজ্ঞ শিক্ষক যদি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন তাহলে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি দূর করা অনেকটা সম্ভব।

শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করতে হবে

॥ ৭ ॥ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব (Importance of Co-curricular activities) :

ব্যক্তিগত শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সুযোগ রয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় তা নেই। এই অন্তরায় দূর করতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর (Co-curricular activities) ব্যবস্থা করতে হবে ও শিক্ষার্থীরা যাতে তাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে বিদ্যালয়ের নানারূপ সহ-পাঠক্রমিক কাজে ছাত্রেরা যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে শ্রেণীকক্ষে দলবদ্ধ পাঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার যে অসুবিধা আছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে সে অন্তরায় আর থাকে না। পাঠ্যবহির্ভূত বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে সে নিজের সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তুলতে পারে।

সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী শ্রেণী শিক্ষার পরিপূরক

ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে,—যদি শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ করে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করা যায় তাহলে শ্রেণী শিক্ষার ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যখন শ্রেণীশিক্ষা অপরিহার্য তখন সেই ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব ত্রুটি-মুক্ত করে গ্রহণ করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণী শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের কোনরূপ বিরূপ মনোভাব থাকা উচিত নয়। কারণ ভারতের বর্তমান শিক্ষাপরিস্থিতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া শিক্ষা-প্রসারের আর পথ নেই।

শ্রেণীশিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতে হবে

শ্রেণী শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের কয়েকটি মূলনীতি
(Some Maxims of Class Teaching)

শ্রেণী শিক্ষার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলা যায় সে সম্পর্কে *Miss Cathy* তাঁর *A first Book on Teaching* গ্রন্থে মূল্যবান কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

1. *Know exactly what you are going to teach.*
2. *Organise thoroughly.*
3. *Make the best of all apparatus that can be obtained.*
4. *Teach the whole class.*
5. *Try to be calm and natural.*
6. *Remember the test of good class teaching is class working.*
7. *Make full use of the children's knowledge.*

শ্রেণীশিক্ষাকে সফল করার পদ্ধতি

এর সাথে যোগ করা যেতে পারে,—

8. *Make an ally of routine in matters where routine helps.*
9. *Observe and have observed by the pupils the common courtesies.*
10. *Enlist the Co-operation of the class discipline.*

॥ এক ॥ **শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পাঠ সংগঠন (Teacher's preparation and lessons organisation) :**

Miss Cathy প্রথমেই বলেছেন যা শেখাতে যাচ্ছি তা ঠিকভাবে জেনে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে আয়ত্ত না করে ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতে যাওয়া একটা অপরাধ। যা পড়ানো হবে সে সম্পর্কে যদি শিক্ষকের

সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তিনি কি শেখাবেন? ক্লাসের পাঠ্য বইতে যতটুকু তথ্য আছে ততটুকু তথ্যের উপর নির্ভর করে ক্লাসে যাওয়া উচিত নয়।

শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করে জানতে হবে

অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে আকবর সম্পর্কে সামান্য আলোচনাই আছে। শিক্ষক যদি মনে করেন যে,—আমার এইটুকু জানাই যথেষ্ট, তাহলে তিনি ছাত্রদের কৌতূহল বা নতুন জানার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারবেন না। এর ফলে ছাত্রদের সেই বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ বা উৎসাহ স্তিমিত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, শ্রেণীর শৃংখলা রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠবে। যে পাঠ সম্পর্কে উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায় সেখানে ছাত্রদের কোনো মনোযোগ থাকে না, এরকম পরিস্থিতিতে পড়ান অসম্ভব। শিক্ষকদের পাঠপ্রস্তুতি শিক্ষার সাফল্যের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন। দিনের নির্দিষ্ট পাঠ ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়েই শিক্ষক ক্লাসে যাবেন। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে,—পাঠকে সম্পূর্ণভাবে সংগঠন করতে হবে। এটি প্রথম সূত্রে বলা সূত্রের পরিপূরক। অসংবদ্ধ জ্ঞান শিক্ষায় কোন কাজে আসে না। উপস্থাপন করবার সময় বিষয়টিকে কি ভাবে উপস্থিত করা হবে তা এই পাঠসংগঠনের উপর নির্ভরশীল। পাঠ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হলেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন যে,—কি কি তার প্রয়োজন। সেইভাবে তিনি পাঠসংগঠন করে ক্লাসে যাবেন।

॥ দুই ॥ উপকরণের ব্যবহার (Use of Teaching Aids):

পাঠ সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ দরকার। কিন্তু কানে শুনে ও চোখে দেখে যে শিক্ষা, তা ছাত্রদের কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য হয় শুধু ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে তা হয় না। কিন্তু শুধু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ থাকলেই যথেষ্ট নয়। তার সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ব্যবহারও জানা চাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, ইতিহাসের শিক্ষক মানচিত্র নিয়ে ক্লাসে যান নি, পড়াতে পড়াতে যখন খেয়াল হ'ল যে, একখানা মানচিত্র দরকার তখন শ্রেণীশিক্ষক মানচিত্র নেবার জন্য লোক পাঠান। প্রতি শ্রেণীকক্ষে একখানা বোর্ড থাকে। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের বোর্ডের দরকার হয় বলে মনে হয় না। পাঠকে সরস করে তুলতে হলে গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণ ছাড়াও প্রয়োজন হলে শিক্ষক নিত্য নতুন উপকরণ উদ্ভাবন বা সংগ্রহ করবেন। উপকরণ খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীতে। যেখানে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় নি সেখানে উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে,—এর আধিক্য আবার ভাল নয়। উপকরণের বাহুল্য যেন বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে না যায়। বিষয় বস্তুকে পরিস্ফুট করে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী উপকরণ পরিহার ...

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার

॥ তিন ॥ **সমগ্র শ্রেণীকে পড়ানো (To teach the whole class) :**

শ্রেণী শিক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, শিক্ষকের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, পড়াবো কাকে ? প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষক বিশেষ বুদ্ধিমান গুটি-কয়েক ছাত্রদের দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। যাদের কাছ থেকে 'চটপট' সঠিক মনের মত উত্তরটি পাওয়া যায় প্রশ্নগুলি তাদের কাছেই করতে ইচ্ছা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,—ক্লাসের সামনে একটি প্রশ্ন রাখবার সাথে সাথে দু'চারটি ছেলে 'আমি বলি', 'আমি বলি', বলে লাফিয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার আগেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই অভ্যাসটি বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে অধিকাংশ ছাত্রই অবহেলিত হবে। তাই শিক্ষক যখন পড়াবেন তাঁর [illegible]নে থাকবে সমস্ত ক্লাস। প্রশ্ন ক্লাসের সব ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভাল মন্দ সবাই যেন সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজ হিসেবে যে এটা অত্যন্ত কঠিন, তাতে সন্দেহ নেই। ৩০।৪০টি ছাত্র, যারা স্বভাবতঃই চঞ্চল,—তাদের মনোযোগ কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা খুব সহজসাধ্য নয়। সবাইকে সমান ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভুল সংশোধন করতে হবে,—তারপর পড়া আদায় করে নিতে হবে। শ্রে[illegible]তে শিক্ষক এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে সব ক্লাসটি তিনি দেখতে পান। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষক মহাশয় চেয়ার ছেড়ে উঠতে চান না। তাঁকে উঠে তো দাঁড়াতেই হবে,—প্রয়োজন হলে ক্লাসের বিভিন্ন স্থানে তাঁকে ঘুরতে হবে। শিক্ষক যা বলবেন সবাই যেন শুনতে পায়, খুব আস্তে বলা বা অযথা চিৎকার করা কোনটাই ভাল নয়।

শ্রেণীশিক্ষা থেকে সব ছাত্রই যে উপকৃত হয়

॥ চার ॥ **শিক্ষকের মানসিক স্থৈর্য (Mental stability of the teacher) :**

পড়াতে গিয়ে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ও শান্ত থাকতে হবে। শিক্ষক-জীবনের শুরুতে সবাই একটু ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে শুরু করেন। নিজেকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে, স্বাভাবিক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মনে ভয় কি সংশয় থাকলে কোন শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীশৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রস্তুতির অভাব বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে একটা আড়ষ্টতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যর্থতার ফলে ছাত্রেরা অমনোযোগী হয়ে ওঠে,—গণ্ডগোল করে, পড়ায় আগ্রহ থাকে না। এই অবস্থায় আর যাই হোক পড়া হয় না। ছাত্রদের মনে ভীতি সৃষ্টির জন্য একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে, ক্লাস করতে যাওয়া ঠিক নয়, এখানেও স্বাভাবিক সহজ ভাবটি নষ্ট হয়ে একটা আড়ষ্টতার সৃষ্টি হয়। যাদের পড়াবো

অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের ভয় সংশয় কমে যায়

তাদের যদি জানা থাকে তখন এই উপসর্গ আর থাকে না। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবার সাথে শিক্ষক স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।. শিক্ষক সব ভুলে যদি পাঠে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন তখন শিক্ষার্থী আর বিষয় এই দুই'ই তাঁর সামনে থাকবে, ভয়, উদ্বেগ আর সংশয় কিছুই থাকবে না।

॥ পাঁচ ॥ **সমগ্র শ্রেণীকে কাজে ব্যস্ত রাখা (To engage the whole class) ঃ**

শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষককে যেমন মনে রাখতে হবে যে, তিনি সবাইকে পড়াচ্ছেন, তেমনি তাঁকে সজাগ থাকতে হবে, দেখতে হবে সবাই কাজে ব্যস্ত আছে কি না? সবাই যদি পাঠে অংশ গ্রহণ না করে সক্রিয় না থাকে, তাহলে শ্রেণীশৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক সময় শিক্ষকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন শ্রেণীতে একটি কাজ দেওয়া হয়েছে—দু'চার জন অতি অল্পসময়েই কাজটি শেষ করে ফেলল। সে ক্ষেত্রে যদি তাদের নতুন কাজ না দিয়ে অন্য সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা চুপ করে শান্ত হয়ে বসে থাকবে না—গল্প করবে, গণ্ডগোল করবে, না হয় পাশের সহপাঠীকে সাহায্য করবে। তাদের শান্ত রাখবার একমাত্র উপায় তাদের নতুন কাজ দেওয়া, তারা তা আনন্দের সাথে বিশেষ তৎপর হয়েই করবে। এ সম্পর্কে **Ryburn** বলেছেন—"*Nothing will kill the interest of good pupils more quickly than to hold them back and make them sit, mentally inactive. This must always be avoided.*" শিক্ষক মাত্রেই এই কথাটি মনে রাখবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী অকেজো থাকবে না

॥ ছয় ॥ **যান্ত্রিকতা পরিহার (Avoiding the mechanical procedures) :**

শিক্ষাকে বলা হয় 'Bipolar process' বা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'জনেই এতে সমভাবে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক সময় দেখেছি তিনি শুধু বলেই যাচ্ছেন। বক্তৃতাধর্মী পাঠে শিক্ষক জানবার চেষ্টা করেন না—ছাত্রেরা কতটা বুঝতে পেরেছে—তাদের নিজেদের কিছু বক্তব্য আছে কি না? আমাদের মনে রাখতে হবে—"*The main object of Education is not to teach but to develop*" (*Pestalozzi*). আর একজন শিক্ষাবিদ্ সোজা কথায় তাঁর শিক্ষক-ছাত্রদের বলতেন, 'not putting in but leading out." বিদ্যালয়ে শিক্ষায় বক্তৃতাকে যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে (অবশ্য রসধর্মী পাঠে তা সম্ভব নয়)। শিক্ষার্থী যাতে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে পাঠ দিতে হবে। পাঠ প্রস্তুতির

কৃত্রিমতা পরিহার করে শিক্ষাকে স্বাভাবিক করতে হবে

ক্ষেত্রে ছাত্রদের পূর্ব-জ্ঞান পরীক্ষা করার একটা রীতি আছে। এই রীতিকে যদি শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে যান্ত্রিক (Mechanical)।

॥ সাত ॥ **শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশ (Student's part in teaching) :**

পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষা করলেই কাজ শেষ হ'ল না—শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য। ছাত্ররা যদি পাঠে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পায়, নতুন কিছু তাদের মুখ দিয়ে বলান যায়, তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়বে, তাদের আত্ম-বিশ্বাস জন্মাবে। পড়াবার সময় ছাত্রদের সহযোগিতা শিক্ষকের কাম্য হওয়া উচিত। যেখানে শিক্ষক শুধু পড়িয়ে যান, সেখানে 'class progress' বজায় থাকবে, কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষার Progress কতটা হবে বলা শক্ত।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা

॥ আট ॥ **পাঠ পরিকল্পনার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পরিহার :**

একটি আপত্তি আসতে পারে যে, পাঠে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের ফলে শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি মত পাঠ পরিকল্পনাকে (Lesson plan) অনুসরণ করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট পাঠ যদি শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন থাকে তাহলে ছাত্রদের সহযোগিতায় আলোচনার প্রাসঙ্গিক যে বিষয়ই আসুক না কেন, তার সাথে পাঠপরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান খুব কঠিন নয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠ পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু তার উপর আমরা যেন অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে না পড়ি। একথা মনে রাখা দরকার শিক্ষক একজন শিল্পী,—যদি তিনি পাঠদান কালে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে না পারেন, তাহলে তাঁর নিজের কাজটা, তাঁর কাছে অত্যন্ত একঘেঁয়ে ও নীরস মনে হবে। শিক্ষাদানে তিনি আর কোন আনন্দই পাবেন না। পূর্ব পরিকল্পনা কখনও শিক্ষকের নতুন সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করতে পারে না। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি যেন প্রসঙ্গ ছেড়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে না পড়েন। ছাত্রেরা অনেক সময় গল্পপ্রিয় শিক্ষকদের সেদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং বহুক্ষেত্রে সফলও হয়। যখন শিক্ষকের খেয়াল হয় তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন তখন হয়ত ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শিক্ষকের পাঠ পরিচালনায় সতর্ক থাকতে হবে—গল্পের ফাঁদে তিনি যেন না পড়েন।

পাঠ পরিচালনায় শিক্ষকের সতর্কতা

শ্রেণী শৃংখলা ও সৌজন্যবোধ

(Class Discipline & Common Courtesy)

॥ ১ ॥ শিক্ষকের দায়িত্ব (Teachers' Responsibility) :

পড়বার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শ্রেণী শৃংখলার। শিক্ষকের যে সব গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শৃংখলা রক্ষার ক্ষমতা। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শ্রেণী শৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। শৃংখলা রক্ষা নতুন-পুরাতন সব শিক্ষকের কাছেই একটা সমস্যা। এজন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আমরা মেনে চলি ; কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষকের নিজের যোগ্যতা। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ছাত্রেরা যাতে অভ্যস্ত হয় শিক্ষক প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। ক্লাসে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে সবাই যাতে একসাথে চেঁচিয়ে না ওঠে, একজন উত্তর দেবার সময় আরেকজন বলে না দেয়, বা 'হয় নি' বলে বাধার সৃষ্টি না করে। যাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হ'ল শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে যাতে তার কাছ থেকেই উত্তরটি আদায় করা যায়। মাঝপথে বাধার সৃষ্টি হলে জানা থাকলেও সে বলতে পারবে না। পড়াবার সময় বা প্রশ্ন করার সময় ছাত্রেরা যেন নিজেদের মধ্যে গল্প না করে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষক পড়াচ্ছেন, পিছনের বেঞ্চে তখন একটি ছাত্র আরেকজনের খাতা থেকে অঙ্ক টুকছে। এই ত্রুটিগুলি থেকে যাতে ছাত্রদের মুক্ত রাখা যায় শিক্ষক মহাশয় সেদিকে যথা সম্ভব সতর্ক থাকবেন। ক্লাসে শিক্ষক যদি শুধু চেয়ারে আশ্রয় না নিয়ে একটু নড়াচড়া করেন, তাহলে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব।

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শৃংখলা রক্ষা করবেন

॥ ২ ॥ ছাত্রদের সহযোগিতা (Students' Participation) :

শৃংখলা রক্ষায় ও সৌজন্য বোধ সৃষ্টির ব্যাপারে ছাত্রদের সাহায্য ও সহযোগিতা বহুক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়। শ্রেণীশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করা হলে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়ে ও তাদের মধ্যে নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। স্কুল-স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় ছাত্রদের উপর কাজের ভার দিয়ে বহুক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গিয়েছে। অন্তর্গত শৃংখলা শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের শৃংখলা রক্ষায় ও ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলাবোধ জন্মাবার জন্য অধিকতর উপযোগী।

অন্তর্গত শৃংখলা

শিক্ষক যদি স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে ছাত্রদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন তাহলে তাদের কাছ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি অর্জন করতে পারবেন। তখন শ্রেণী শৃংখলা রক্ষা করা সহজসাধ্য হবে।

ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

॥ ৩ ॥ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যকে জানা ও কাজে লাগানো

পূর্বালোচনায় আমরা দেখেছি যে, শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-প্রকৃতিকে জানা বিশেষ দরকার। শিক্ষার একটা লক্ষ্য আছে—এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে শিশুর বৈশিষ্ট্য, অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবণতাকে জেনে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করতে হবে। শিশুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার **কর্মপ্রবণতা**। শিশু কর্মচঞ্চল। আমাদের দেখতে হবে শিক্ষায় কি করে এই কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগান যায়। সমস্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশুই কাজ করতে চায়। যার মধ্যে কর্মবিমুখতা রয়েছে একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে, সে দেহে কি মনে অসুস্থ। ঠিকপথে কর্মপ্রবণতাকে পরিচালিত করে একে শিক্ষার সহায়ক করে তোলা এক সমস্যা। কারণ ছাত্রেরা যে কাজ করতে চাইবে বা যে কাজ করে থাকে তা প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষার অনুকূল নয় বা বিদ্যালয়ে শিশুর কর্ম শক্তিকে যে ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়, অধিকাংশ শিশুই সে ভাবে কাজ করতে চাইবে না। শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের কয়েকটি নীতিকে মনে রাখতে হবে।

শিশুর কর্মচঞ্চলতা

শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হলে শিশুকে জানতে হবে। শিশুর **আগ্রহ ও ক্ষমতা** দুইই শিক্ষকের জানা দরকার। সাধারণভাবে শিশুপ্রকৃতি ও তার বিকাশের ধারাকে জানতে হবে। সেই সাথে প্রতিটি ছেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সন্ধান রাখতে হবে। যে ছেলের বিশেষ প্রবণতা যেদিকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে সেই দিকে পরিচালিত করতে পারলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে।

কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করতে হবে

কাজ বলতে আমরা সর্বদা যেন মনে রাখি যে দৈহিক কাজই কাজ নয়—এর সাথে মানসিক কাজও আছে। দেহের পুষ্টির জন্য দৈহিক কাজের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য, মানসিক বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টির জন্য মানসিক কাজও প্রয়োজন। নৈতিক উন্নতির কথাও চিন্তা করে কাজের পরিবেশকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কাজের পরিধিকে সর্বত্র বিস্তৃত করতে হবে।

॥ ৪ ॥ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সামাজিক রূপ (Socialisation of the Natural Instincts):

প্রথমেই দেখতে হবে যে, কাজ করবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা শিশুর মনে রয়েছে, তাকে যেন অযথা রুদ্ধ করা না হয়। সাধারণ কর্মপ্রবণতাকে রুদ্ধ করে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। যদি দেখা যায় যে, শিশু বাঞ্ছিত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে না তখন তাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিশু যখন কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন

তার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করলে তার প্রতিক্রিয়া কখনও শুভ হয় না। শিশুর সামনে কতকগুলি কাজের সুযোগ রাখতে হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে। কাজগুলি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যার ফলে প্রবৃত্তির সমাজসম্মত রূপই (Sublimated form) ফুটে উঠবে। **যুযুৎসা** (Pugnacity) একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাকে প্রতিযোগিতার কাজে লাগানো যেতে পারে। **সঞ্চয় মনোবৃত্তি** (Acquisition) নানা জিনিস সংগ্রহের কাজে লাগানো যেতে পারে। **নির্মাণের ইচ্ছাকে** (construction) নতুন নতুন জিনিস গড়ে তোলার কাজে লাগানো যায়। **কৌতূহল** প্রবৃত্তিকে (curiosity) জ্ঞান আহরণের কাজে লাগানো যায়। যদি এসব প্রবৃত্তি বিপথে চালিত হয় তাহলে শিশুর জীবনে বিপর্যয় দেখা দিবে।

শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্তিগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষাগ্রহণের কাজে লাগাতে হবে

॥ ৫ ॥ শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা (To encourage the Students) ঃ

শিক্ষক সর্বদা ছাত্রদের কাজে উৎসাহ দেবেন। অতি সাধারণভাবে যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে সেখানেও তাকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে আরো সুনিপুণভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। যদি সহানুভূতির সাথে কাজটির ভুল দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার উৎসাহ বেড়েই যায়। শিক্ষক যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন বা অযথা তিরস্কার করেন তাহলে ছাত্রদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে তারা নিজেরাই সচেতন নয়,—তাদের মধ্যে আছে একটা দ্বিধা, একটা সংশয়। এই দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে দরকার শিক্ষকের সাহায্য। সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করলে কষ্টসাধ্য কাজও শিশু সম্পন্ন করতে পারে। ছাত্রেরা যদি মনে করে তার কাজটির মূল্য আছে, তাহলে তার নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস জন্মায়,—তার মধ্যে যে সৃজনী প্রতিভা রয়েছে আত্মবিশ্বাস জন্মালে তা প্রকাশের স্বাভাবিক পথ খুঁজে বেড়ায়।

সহানুভূতি ও সহায়তা

॥ ৬ ॥ শিক্ষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি ঃ—

কাজে বা শিক্ষায় যদি নতুনত্বের অভাব দেখা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস খুবই কম। শ্রেণী শিক্ষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে সামান্য সুযোগ আসে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। সময়-তালিকা সৃষ্টির সময় দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে একই রকমের বিষয় পর পর পড়ান না হয়। বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি পর পর ছাত্রদের পড়ান হয় সেদিন তাদের পড়ায় উৎসাহ থাকবে না। এতে মানসিক ক্লান্তি এসে তার বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেবে। কাজের ক্ষেত্রে যদি

একই রকম বিষয় পর পর পড়ালে চলবে না

বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে না পারা যায় তাহলে ছাত্রদের উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে আসবে। পড়ার সাথে খেলাকে যুক্ত করে শিক্ষাপরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।

॥ ৭ ॥ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি (Preparation for the future life) :

মানুষের জীবন কর্মময়। শিক্ষার প্রাঙ্গন পার হয়ে গিয়েই শিক্ষার্থীকে বিশ্বের বিশাল কর্মশালায় প্রবেশ করতে হবে। কর্মের দীক্ষা তাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে হবে। সুপরিকল্পিত কাজের মধ্য দিয়ে তার দেহ, মন ও চরিত্র গঠন করতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে তার যে সম্ভাবনা আছে, যে শক্তি আছে তা প্রকাশ পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে।

বিদ্যালয় ভবিষ্যৎ-জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র

যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হয় তাহলে জীবনযুদ্ধে সম্মুখীন হবার মত শিক্ষা তাকে দিতে হবে। বিদ্যালয় হচ্ছে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতিক্ষেত্র। শিক্ষা হচ্ছে তার ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতি। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে সেই শিক্ষালাভ করে বিশ্বের কর্মযজ্ঞে সেও অংশ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণে আমাদের লক্ষ্য থাকবে কি করে আজকের শিশু গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা
(Individualised Instruction)

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির অনেক দোষ ত্রুটি ছিল। সে শিক্ষা ছিল পুস্তক-কেন্দ্রিক, শিক্ষকসর্বস্ব, মুখস্থনির্ভর ও পরীক্ষাশাসিত। সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যান্ত্রিক এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু ছিল অবহেলিত। শিশুর রুচি, সামর্থ্য ও চাহিদার কোন মূল্য ছিল না, এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরবর্তী-কালে বহু বিরুদ্ধ কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। ফলে জন্ম নেয় নতুন নতুন শিক্ষাতত্ত্ব, নতুন নতুন শিক্ষাদান

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্ম

পদ্ধতি, ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুই প্রাধান্য প্রায়, শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য ও চাহিদা শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুকেন্দ্রিক (child-centric) শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। শ্রেণী-শিক্ষা (class teaching) ও গোষ্ঠী-শিক্ষা (group teaching)-র বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে **ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা**

(Individualised Instruction) প্রচলিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে আসে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নতুন জোয়ার।

শ্রেণী শিক্ষণের ত্রুটি লক্ষ্য করে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাকে স্বীকার করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, চাহিদা ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই অবহেলিত নয়। শ্রেণী শিক্ষায় ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করে যে, শিক্ষাকে যথার্থ করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কৌতূহল, আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি, সামর্থ, ও মর্যাদাকে রক্ষা করতে হবে। বিদ্যালয়ে এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাভাবিক পথে। এই জাতীয় পদ্ধতিই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে পরিচিত।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা কি?

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার কতকগুলি সুবিধা ও উপযোগিতা রয়েছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাতত্ত্বের অনুসারী ও মনস্তত্ত্বের অনুগামী। এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষক-কেন্দ্রিকতা, পুস্তকসর্বস্বতা, মুখস্থ নির্ভরতা, যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা পরিহার করে শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা স্বীকৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজস্ব পথেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরতা, আত্ম-প্রত্যয়, আত্মপ্রচেষ্টা, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্য নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ অর্জন করবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভাল, মাঝারি ও মন্দ ছাত্র সকলেই সমান উপকৃত হয়। আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা তাই বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সুবিধা

এই শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ত্রুটি মুক্ত নয়। শ্রেণীশিক্ষায় যেগুলি ছিল সুবিধা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় সেগুলিই অসুবিধায় পরিণত হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় অধিক শ্রম, অধিক সময় ও অধিক শিক্ষক প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা শিশুকে অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলে, ফলে তার সামাজিকগুণাবলীর (বন্ধুত্ব, স্বার্থত্যাগ, পরমতসহিষ্ণুতা, গোষ্ঠীচেতনা, বা সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি) যথাযথ বিকাশ হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণীশিক্ষারই উপযোগী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার পক্ষে নয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার অসুবিধা

শ্রেণী শিক্ষার সুবিধা অসুবিধা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সুবিধা-অসুবিধা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা স্মরণ রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষা ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এমন করতে হবে যাতে শ্রেণী শিক্ষার সুবিধাগুলি গ্রহণ করা যায়, অসুবিধা দূর করা যায়; আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সুবিধাগুলি গ্রহণ করা যায়, এবং অসুবিধা দূর করা যায়। ফলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরিপূর্ণভাবে ভেঙে সাজাতে হবে না, Supervised Study (তত্ত্বাবধায়ক পাঠচর্চা), Socialised Recitation (সমাজীকৃত পাঠচর্চা) প্রভৃতি পদ্ধতি-গুলির ধরন শ্রেণী শিক্ষার; কিন্তু এদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ধাঁচ আনা যায়। অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিক্ষা যথাযথ হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। আবার প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method), সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Method), ওয়ার্কশপ পদ্ধতি (Workshop Method) প্রভৃতি আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলিকে বিভিন্ন দল বা উপদল গঠন করে, তার মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে শ্রেণী শিক্ষার ধাঁচ আনা যেতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণী শিক্ষার সুবিধাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার সুবিধাও পাবে। এবং এর জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তনও করতে হবে না।

শ্রেণীশিক্ষা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়

প্রশ্নাবলী

1. On what basis are pupils classified? Are you in favour of such classification? Why? (P. G. B. T. 1971)
2. What is individualised instruction? How can it be best imported under the existing system of collective teaching? (C. U., B. Ed. 1971)
3. Take one axample of a method of individualised instruction and one of group instruction, and compare their relative educational advantages. Are the methods entirely individual on group oriented as their names indicate? (Jadavpur University B. T. 1971)
4. Prepare a paper of instructions for a young teacher towards effective class-room teaching with special reference to individualised instruction. (North Bengal University B. T. 1968)
5. Draft a set of instructions for a young, inexperienced teacher for his guidance in effective class-room organisation and management bearing on the following:
   (a) Nature of management the changed outlook.
   (b) Techniques of good management
   (c) Behaviour problems. (Kalyani University B. T. 1960)

6. What are the advantages of individualised instructions as distinguished from the class teaching ? (C. U., B. T. 1968)
7. Discuss the psychological significance of the methods of individualised instruction. How can they be integrated with the methods of collective teaching ? (C. U., B. T. 1966)
8. Indicate some techniques of efficient teaching and management in the classroom and say have you would use them successfully. (C. U., B. T. 1969)
9. Discuss the merits and limitations of ordinary class teaching. How should it be supplemented by individualised instruction ? (Jadavpur University B. Ed. 1970)

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদানের কৌশল
(TECHNIQUE OF TEACHING)

শিক্ষা দেবার নীতি নির্ধারণের পথে আমাদের সামনে আসে শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রশ্ন। শিক্ষা দিতে কি রীতি অবলম্বন করবেন, শিক্ষা দিতে তাকে কোন পন্থা অনুসরণ করতে হবে শিক্ষককে তা জানতে হবে। শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য রীতি, পদ্ধতি ও কৌশল না জেনে শিক্ষকতা শুরু করলে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে—কাজটিও সুষ্ঠু ভাবে সমাধান হবে না।

ভূমিকা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা
(Role of the Teachers and the Students) :

শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া। এই "শিক্ষা দেওয়া" কথাটা পূর্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত বর্তমানে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করা হয় না। সে সময় ছিল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক। একটি পূর্ণ পাত্র থেকে শূন্য পাত্রে জল ঢেলে দিয়ে ভর্তি করবার রীতি অনুসরণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। সে ছিল শুধু দেবারই সম্পর্ক। সেখানে শিশুর একমাত্র ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার ভূমিকা। তারপর শিক্ষাদর্শে পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাকে এখন বলা হয় Bipolar Process ; শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, শিক্ষক শুধু দিয়েই যাবেন তাই নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় শিশুর জানার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীও সমভাবে সক্রিয়। শিক্ষক কি ভাবে শিশুকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবেন, কি রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তাকেই আমরা শিক্ষা দেবার কৌশল বলেছি। সার্থক শিক্ষক হতে হলে শিক্ষা দেবার মূল কতকগুলি রীতি পদ্ধতি তাঁকে আয়ত্ব করতে হবেই।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা

সার্থক শিক্ষকের করণীয় কর্তব্য
(Duties of an Ideal Teacher)

শিক্ষা দেওয়া কাজটি অত্যন্ত জটিল। সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী থাকলেই সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না। অন্যান্য দশটি বৃত্তির মত শিক্ষকতাও শিক্ষা সাপেক্ষ। তাঁহার জানা বিষয়টি কি করে একটি তরুণ শিক্ষার্থীকে তার-পক্ষে

বোধগম্য ভাষায় ও সহজবোধ্য পন্থায় শেখানো যায় শিক্ষককে তা জানতে হবে। শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি জানার সাথে সাথে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কৌশল বা পদ্ধতি জানা না থাকলে শিক্ষক হিসেবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যাঁদের শিক্ষকতার জন্মগত প্রবণতা রয়েছে তাঁদেরও আধুনিক শিক্ষার রীতি পদ্ধতি সব জানা দরকার। ক্লাসে পড়া দেওয়া, পরের দিন পড়া জিজ্ঞেস করা ও নতুন করে বাড়ীর জন্য পড়া দিয়ে দেওয়া—সাধারণ ভাবে মনে করা হয় এই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। কিন্তু সার্থক শিক্ষকের বিচার হবে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে কতটা সচেতন করতে পেরেছেন তার উপর। সার্থক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

শিক্ষককে শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলিকে জানতে হবে

"The fundamental distinction between a successful teaching and unsuccessful teaching lies in the amount and value of learning that is stimulated in the pupils······Teaching does not mean, performing the operations which teachers perform. It means getting puplis to learn and nothing else. The successful teacher Studies his problems, formulates his aims, select his procedures, combines them, and carries them out primarily in terms of observed effect upon the pupils taught. The unsuccessful teacher usually takes these effects for granted. Herein lies the distinction. (Instruction in India Secondary School. Ed. E. A. Macnee.)

সার্থক শিক্ষা ও ব্যর্থ শিক্ষা

উপস্থাপনের গুরুত্ব
(Importance of Presentation)

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই শিক্ষার্থী পাঠ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে তিনি যাই বলুন না কেন শিক্ষার্থীর মনে তা রেখাপাত করবে না। উপস্থাপনের সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাত্রদের মন পাঠ্যাভিমুখী করবার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষা-দানকালে উপস্থাপনের সাফল্যের জন্য আমরা যে সকল কৌশল অবলম্বন করে থাকি তা হচ্ছে—বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টান্ত পাঠটীকার ব্যবহার, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের ও সাজ সরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি। আমরা একটি একটি করে এদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

উপস্থাপনের বিভিন্ন কৌশল

বর্ণনা
(Narration)

শিক্ষায়, বিশেষ করে শ্রেণী শিক্ষায় বর্ণনার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। শ্রেণী শিক্ষায় বক্তৃতাধর্মী পাঠে ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করবার কোন সুযোগ পায় না। তবু শ্রেণী শিক্ষায় বিশেষ করে রসানুভূতি-মূলক পাঠে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক যা পড়াবেন, অর্থাৎ তাঁর নির্দিষ্ট পাঠ-উপস্থাপনায় প্রথম তাঁকে বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়। কোন একটি বিষয়-বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হলে শিক্ষককে গল্প করবার কৌশল আয়ত্ব করতে হয়। বর্ণনা যদি আকর্ষনীয় না হয় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হবে না। বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন। তিনি হবেন দক্ষ কথাশিল্পী, তাঁরা বর্ণনার গুণে বিষয়-বস্তুর একটি জীবন্ত চিত্র ছাত্রদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ছাত্রেরা স্বভাবতঃই গল্প শুনতে ভালবাসে, শিক্ষার্থীদের সেই গল্প শোনার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মনে নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা

আগ্রহ সৃষ্টি
(Creating Interest)

নতুন পাঠে কোন কিছু বর্ণনার সময় শিক্ষক ছাত্রদের পূর্ব জ্ঞানের পটভূমিকায় বিষয়টি স্থাপন করবেন। পূর্ব-জ্ঞানের সাথে নতুন বিষয়টি যুক্ত হলে ছাত্রদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বিষয়টিকে জানবার জন্য তারা মনোযোগী হবে।

বর্ণনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে

বর্ণনার ভাষা
(Languase of Narration)

বর্ণনাকালে শিক্ষকের ভাষা সহজ, ও সরল, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে শ্রেণীতে শিক্ষা দিবেন ভাষা যেন সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত হয়। শিক্ষকের বলায় যেন কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা না থাকে। উচ্চারণ-শুদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্ররা শিক্ষকের উচ্চারণ অনুসরণ করে। তাই শিক্ষকের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উচ্চারণ যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থেকে দোষ-মুক্ত থাকে। ছাত্রজীবনে অতি উচ্চ-শিক্ষিত একজন বাংলা শিক্ষকের চরম ব্যর্থতার মথা মনে আছে ; তাঁর প্রধান দোষ ছিল তিনি বাংলা পড়াতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব জেলার উচ্চারণ ভঙ্গী ছাড়তে পারেন নি। বর্ণনার মধ্যে

বর্ণনার ভাষাই তাকে সার্থক করে

যেন একটা আন্তরিক স্বর ফুটে ওঠে। রসানুভূতি মূলক পাঠের সময় বর্ণনা যদি আবেগপূর্ণ না হয় তাহলে তা হৃদয়গ্রাহী হবে না। বর্ণনাকালে অযথা চীৎকার বা অত্যন্ত নিম্ন-স্বরে বলা কোনটাই সঠিক নয়। বর্ণনার গুণে ঘটনা ছেলেদের মানস-চোখে ভেসে উঠবে,—তাহলেই বর্ণনা সার্থক হবে।

বর্ণনায় বিষয় কেন্দ্রিকতা
(Centralisation of Narration)

বর্ণনার সময় যেন লক্ষ্য স্থির থাকে। বর্ণনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানই হবে পাঠের উদ্দেশ্য। পাঠের যদি কোন স্থির লক্ষ্য না থাকে তাহলে ছাত্রেরা বুঝতে পারবে না বিষয়টি কেন পড়ানো হচ্ছে। বর্ণনাকালে লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হবে। প্রয়োজনীয় অবান্তর বিষয় আলোচনা হলে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য থেকে দূরে সরে আসবে। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে পড়াবার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের উপর জোর দিয়ে পড়াতে হবে; এবং সেদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। বর্ণনা বিষয় বস্তুর বাইরে অবান্তর আলোচনায় যাবে না।

বর্ণনা বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে

বর্ণনায় বৈচিত্র্য

বর্ণনাকে অনেকটা গল্পের মত করতে হবে,—যাতে বর্ণনা সরল ও সহজবোধ্য হয়। বর্ণনা যেন একঘেঁয়ে না হয়। দীর্ঘ সময় ধরে একটানা বর্ণনা বিরক্তির উৎপাদন করতে পারে। বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে না পারলে ছাত্ররা ক্লান্তি বোধ করবে—তাদের আর উৎসাহ থাকবে না। এজন্য বিভিন্ন পাঠ্য-উপকরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে হবে। বর্ণনার মধ্যে ব্যঙ্গ ইত্যাদির মধ্যদিয়ে বৈচিত্র সৃষ্টি করতে হবে। গলার স্বরের ও উচ্চারণের বৈচিত্র্য এনেও বর্ণনাকে সরল করতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হবে। বর্ণনার সময় বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারও পাঠদানকে সরস করে।

বর্ণনা আকর্ষণীয় হবে

গল্প বলা
(Story Telling)

'ঠাকুরমা গল্প বলো' নিত্যকালের শিশুর এই আবদার 'ঠাকুরমা গল্প বলো।' সন্ধ্যা না হতেই নাতি-নাতনীর দল ঘিরে বসে ঠাকুমার কোল ঘেসে। তাদের আবদারে ঠাকুরমা তাঁর গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেন। গল্পের রাজপুত্রের সাথে খোকা উড়ে চলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে কোন

সুদূর কল্পলোকে। গল্পের যাদুকাঠির পরশে ভোলে নি এমন মানুষ কোথায়। ঠাকুরমা, পিসীমার মুখে গল্প শুনতে শুনতে সে একদিন হয়ে ওঠে সাহিত্য রস-পিপাসু। গল্পের প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ চিরন্তন। ছেলে-বুড়ো সবাই গল্প শুনতে ভালবাসে। বয়স ভেদে রুচি ভেদে রূপ কথা থেকে অতি বাস্তব নানা বিষয় মানুষকে আকর্ষণ করে। এর পিছনে রয়েছে গল্পের প্রতি মানুষের চিরন্তন আসক্তি। ছেলেমেয়েদের গল্পের প্রতি এই আসক্তিকে শিক্ষাদানের অতি প্রয়োজনীয় কৌশল রূপে ব্যবহার করা যায়। অতি নীরস বিষয়কে অতি সরস করে তোলা যায় শিক্ষক যাদ সুন্দর একটি গল্পের মাধ্যমে জিনিসটি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন।

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন

মৌখিক শিক্ষারীতিতে সব শিক্ষককেই কম বেশী গল্প বলার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণনা যদি গল্পের মত করে বলা যায় তা হলে অনেক বেশী কার্যকরী হয়। সবাই খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারেন না। গল্প বলা একটা আর্ট. গল্প বলার স্বাভাবিক শক্তি সবার সমান না থাকলেও একটু চেষ্টা করলে, একটু যত্ন নিলে সব শিক্ষকই সহজ ভাষায় বিষয় বস্তুটিকে সহজ ও সরল করে ছেলে-মেয়েদের কাছে বলতে পারেন। গল্প বলার মধ্যে একটা আন্তরিকতার সুর থাকলে একটু দরদ মিশিয়ে বলতে পারলেই তা হৃদয়-গ্রাহী হবে।

গল্প বলবার কৌশল

নিয়ম শিখিয়ে একজন উঁচুদরের কথক সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে গল্প বলার রীতিকে উন্নত করা যায়। শিক্ষক যখন শিক্ষা বিষয়ে গল্প বলার পদ্ধতিকে তাঁর কাজে লাগাবেন তখন কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে গল্পকে উন্নত ধরনের করে তুলতে পারবেন।

গল্প বলার নিয়ম

প্রথমেই মনে রাখতে হবে গল্প বলা,—পড়া নয়। পড়ে শোনাতে শুরু করলেই সেটা আর গল্প বলা হ'ল না। গল্প বললে ছাত্রেরা যে আগ্রহ নিয়ে শুনবে সেই গল্পটিই পড়ে শোনালে সে আগ্রহ আর তার থাকবে না। ছাত্রেরা মুখে শুনতেই ভালবাসে। গল্প শোনার মধ্যেই তারা বেশী আনন্দ পায়।

মুখেই গল্প বলতে হয়

শিক্ষক গল্প বলবার আগে ভাল করে তৈরী হয়েই গল্পটি মুখে বলে শোনাবেন। গল্প শুরু করে মাঝ পথে যদি বই খুলতে হয় তাহলে গল্পের রসভঙ্গ হবে। শিক্ষক গল্পটি মুখস্থ করবেন না, কিন্তু গল্পের ধারা-বাহিকতা বজায় রেখে যাতে বলতে পারেন সে ভাবে তাঁকে তৈরী হতে হবে। শিক্ষক গল্পটি যথাসম্ভব নিজের ভাষায় বলবেন। শিক্ষক যদি মনে করেন গল্পের কোন কোন অংশ বিশেষ ভাবে জানা দরকার তা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি বইয়ের ভাষা ব্যবহার করবেন

গল্পের ভাষা ও ধারাবাহিকতা

গল্পের জীবন্ত চিত্র

শিক্ষক তাঁর বলার মধ্য দিয়ে গল্পটির একটি জীবন্ত চিত্র ছেলেদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন। গল্পের ভাষা হবে সহজ, উচ্চারণ হবে স্পষ্ট। গল্পের বিষয়-বস্তু ভেদে স্বরগ্রাম উঁচু-নীচু হবে। স্বাভাবিক সাবলীল ভাবে তিনি বলে যাবেন, যাতে বলার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা বিষয়ের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

গল্পের আন্তরিকতার সুর

শিক্ষকের গল্প বলার মধ্য দিয়ে বিষয় বস্তু সম্পর্কে আন্তরিকতার সুর যেন প্রকাশ পায়। প্রয়োজনবোধে বিষয়কে প্রানবন্ত করে তুলতে কিছুটা অভিনয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে যায়, সে বিষয়ে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

গল্প নির্বাচন

শিক্ষক গল্প নির্বাচন করবার সময় যাদের নিকট গল্প বলবেন তাদের বয়স, মানসিক গঠন প্রভৃতি বিচার করে গল্প নির্বাচন করবেন। ১০ বছরের ছাত্রদের উপযোগী গল্প ৫ বছরের ছাত্রদের তা কোন কাজে আসবে না। বলার রীতি, পদ্ধতি ও শ্রোতাদের বয়স ও গঠন অনুযায়ী হবে।

গল্পের লক্ষ্য (Aimes of Story telling) :

গল্প শিক্ষামূলক হবে

গল্প বলার সময় শিক্ষকের সামনে যেন একটা উদ্দেশ্য থাকে। গল্প শুধু মাত্র আনন্দের জন্য হতে পারে। আবার এর একটা শিক্ষার দিকও রয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে ছেলেদের কল্পনা শক্তির বিকাশ হয়; সাহিত্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। গল্প একটা যুক্তপূর্ণ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। গল্প শোনায় ছাত্রদের চিন্তায় শৃংখলা সৃষ্টি হয়। শিক্ষক যদি তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ থাকেন তাহলে উপস্থাপনের কৌশলে আনন্দরস পরিবেশনের সাথে গল্প বলাকে শিক্ষাদানের একটি কার্যকরী কৌশলে পরিণত করতে পারেন।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Explanation and Analysis) :

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক বিষয় সহজভাবে উপস্থাপিত করা যায়

বর্ণনাকালে আলোচ্য বিষয়টি বর্ণনার মাধ্যমে যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তবুও প্রতি বিষয়ের মধ্যে দু'একটি অংশ থাকে যা বেশ কঠিন,—সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা বোঝান সম্ভব নয়। কঠিন দু-রকম হতে পারে, ভাষার দিক থেকে কঠিন আর ভাবের দিক থেকে কঠিন। বর্ণনার মধ্য দিয়ে যে অংশ ছাত্রেরা বুঝতে পারে নি সে অংশ ব্যাখ্যা করে বিষয়কে ভাল করে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কঠিন ভাষায় যে অংশ রয়েছে সহজ ভাষায় তাকে প্রকাশ করলেই অনেক সময় ছাত্রেরা বুঝতে পারে। কিন্তু ভাব যেখানে কঠিন সেখানে সহজ ভাষায়

প্রকাশ করলেই হবে না ; ব্যাখ্যা করে বিষয় বস্তুকে শিক্ষার্থীদের বোঝবার সীমার মধ্যে এনে দিতে হবে।

বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু অংশ থাকে যা যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তবে অনাবশ্যক দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও অতি-বিশ্লেষন পাঠকে ভারাক্রান্ত করে, ব্যাখ্যার সময় Black board ও Teaching aids-এর ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সমস্ত ছাত্রের উপযোগী হয়, Hughes and Hughes ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"*The surest form of explanation is one that presents and arranges the necessary facts in such a way that pupils draw their own conclusion, they themselves complete the explaining process*", ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রচলিত পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত।

পাঠদানের সময় ব্যাখ্যার ব্যবহার

প্রশ্ন
(Questions)

শিক্ষা দেবার জন্য যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে বিশেষ কার্যকরী পন্থা। শিক্ষায় ছাত্রদের সহযোগিতা লাভের উপায়ই হচ্ছে প্রশ্ন। বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠ যেভাবে অগ্রসর হয় সেখানে ছাত্রদের শোনা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কাজ থাকে না। তাই শিক্ষার্থীকে পাঠের সক্রিয় অংশীদার করতে হলে 'প্রশ্নোত্তর' মাধ্যমের অংশ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকালে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারা যায়। যা পড়ান হচ্ছে তা শুনেছে কি না জানা যায়, পড়া বুঝতে পেরেছে কি না বা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না শিক্ষক তাও জানতে পারবেন।

প্রশ্ন করা হয় কেন ?

॥ ১ ॥ একটি প্রাচীন শিক্ষা রীতি (An old Technique) ঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় 'বিদ্যাবিচার' নামক প্রথা ছিল সেখানে প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা হ'ত। প্রশ্নিন, অভিপ্রশ্নিন প্রভৃতি শব্দে বোঝা যায় যে, শিক্ষায় প্রশ্নের ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। গীতায় শিক্ষলাভের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রণীপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। প্রশ্ন শুধু গুরুই করতেন না, শিষ্যরাও প্রশ্ন করত। "বিদ্যাবিচার" বিতর্কে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই বহু কূট প্রশ্নের মীমাংসা হ'ত। সক্রেটীসের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনি শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে অভিপ্রেত উত্তর বের করে নিতেন। এই পদ্ধতিকে সক্রেটীস পদ্ধতি বলা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের "disputa-

প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদানের একটি প্রাচীন কৌশল

tion" বলে যে রীতি প্রচলিত ছিল তাও ছিল প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই জ্ঞান পরীক্ষা প্রশ্নোত্তর অতি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষাদানের কৌশল।

॥ ২ ॥ শিক্ষকের দায়িত্ব (Teachers' Responsibility) ঃ

শিক্ষাদানের কৌশল বলে অধ্যয়ন শুরু হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা শিক্ষার্থীর মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। শিক্ষার্থীর সামনে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সে নিজেই তা পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর বিচার-বিশ্লেষণ করে তা সমাধান করবে ও একটা সিদ্ধান্তে আসবে। **শিক্ষকের কাজ হবে সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষর্থীর যুক্তি ও চিন্তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে ঠিক সমাধানটি বের করে নেওয়া।** (*'Teaching means skilful questions to force the mind to see, to arrange etc'*)।

যথাযথ প্রশ্ন সঠিক উত্তর বের করে আনে

শিক্ষা দেবার কৌশলের মধ্যে 'প্রশ্ন' যেমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তেমনি প্রশ্ন করাও অত্যন্ত জটিল কাজ। যোগ্যতার সাথে প্রশ্ন করবার উপরেই শিক্ষার সাফল্য নির্ভরশীল। **শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীর চিন্তা-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা। সুদক্ষ শিক্ষকের চিন্তা-উদ্দীপ্তকারী (Thought Provoking) প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে।** মামুলী গতানুগতিক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন জিনিসকে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন করা একটি জটিল কাজ

॥ ৩ ॥ উদ্দেশ্য ভেদে প্রশ্নের শ্রেণী বিভাগ (Classification of questions according to their objectives) ঃ

সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, যে জিনিসটি আমরা জানি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমরা সে বিষয়টি সম্পূর্ণ জেনে নিতে চাই। নতুন জিনিস জানা, নতুন তথ্যের সন্ধানই আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় শিক্ষক যে প্রশ্ন করেন তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন করে শিক্ষক নতুন কোন জ্ঞান অর্জন করতে চান না। তাহলে তিনি কেন প্রশ্ন করেন? এখানে প্রশ্নের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক জানতে চান প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে কি না। শিক্ষকের জানা নয়, শিক্ষার্থীর জ্ঞান-পরীক্ষাই প্রশ্নের প্রথম উদ্দেশ্য। জ্ঞান পরীক্ষার সাথে সাথেই জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা প্রশ্নের দ্বিতীয় লক্ষ্য। প্রশ্ন নানারকম হতে পারে, **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing question) অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Searching question), শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Train-**

প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও শ্রেণীবিভাগ

-ing or Developing question), **শাসনমূলক প্রশ্ন** (Disciplinary question) ইত্যাদি।

॥ ৪ ॥ পরীক্ষা মূলক প্রশ্ন (Testing questions) ঃ

পরীক্ষামূলক প্রশ্নের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অধীত বিষয় শিক্ষার্থী কতটা আয়ত্ব করতে পেরেছে, কতটা মনে রাখতে পেরেছে তা জেনে নেওয়া। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন। এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বপাঠের সাথে নতুন পাঠকে যুক্ত করা। **পাঠের শুরুতেই পূর্বজ্ঞান স্মৃতিতে আনবার জন্য শিক্ষক কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করবেন ও পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। পরীক্ষামূলক প্রশ্নের মধ্যে এই জাতীয় প্রশ্নকে প্রস্তুতিকরণ প্রশ্ন (Preparatory question) বলা যায়।** যেমন স্বাধীনতা দিবস বা নেতাজী দিবসকে উপলক্ষ্য করে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি।

প্রস্তুতিকরণ প্রশ্ন

পাঠ চলা কালে নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পাঠে ভাগে করে প্রত্যেকটি পাঠের বিষয়বস্তু বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। পাঠ চলাকালীন শিক্ষক প্রশ্ন করে জেনে নেবেন যে, ছাত্রেরা শুনছে কি না বা ঠিক বুঝতে পেরেছে কি না। এতে ছাত্রের সাথে শিক্ষকের পরীক্ষাও হবে। পাঠ চলাকালীন এই জাতীয় পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ ছাত্রই যদি দিতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন বা যেভাবে পড়াচ্ছেন ছাত্রেরা তা বুঝতে পারে নি। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর ত্রুটি সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হবেন। পাঠ চলাকালীন ছাত্রেরা যাতে অমনোযোগী না হয় সে জন্য প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে নিবদ্ধ রাখতে হয়, তাই এই জাতীয় প্রশ্ন অতি দরকারী।

পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন

একটি পর্ব শেষ হয়ে যাবার **পর নতুন পাঠ শুরু করবার পূর্বে আলোচিত বিষয়, শিক্ষার্থীরা কতকটা আয়ত্ব করতে পেরেছে তা জানবার জন্য ও পুনরালোচনার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। একে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন (Recapitulatory question) বলা যায়।** কোন একটা জিনিসকে জানার পর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে হলে বার বার অভ্যাস করতে হয়। প্রয়োগের স্তরেও (application stage) নানারূপ প্রশ্ন করে আলোচিত বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে।

পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন

ছাত্রেরা অনেক সময় বহু বিষয় মুখস্থ করে। স্মৃতি শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় না।

প্রয়োগের স্তরে এই ক্রটিগুলি দূর করবার জন্য প্রশ্ন করতে হবে। নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অধীত বিদ্যাকে যাতে প্রয়োগ করতে পারে সে ভাবে প্রশ্ন না হলে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রেরা যাতে আত্মবঞ্চনার সুযোগ না পায় তা দেখা। তারা অনেক সময় ক্লাসে যা পড়ানো হ'ল তা না বুঝেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যায়। সত্য সত্যই তারা মনে করে বিষয়টি তারা বুঝতে পেরেছে ;—প্রশ্ন করলেই তাদের এই ভুলটি ভেঙ্গে যায়। কারণ না বুঝে তো উত্তর করা চলে না। সবাই লক্ষ্য করেছেন ক্লাসে যখন শিক্ষক একটি Phrase এর অর্থ বলেন ছাত্রেরা বলবে, 'বুঝতে পেরেছি'। কিন্তু শিক্ষক যেন এখানেই থেমে না থাকেন। Phrase বা Idiom দিয়ে বাক্য রচনা করতে না পারলে তা শেখার কোন সার্থকতা নেই। প্রশ্ন করে দেখে নিতে হবে সেই Phrase বা Idiom-টি সার্থক প্রয়োগ করতে ছাত্রেরা পেরেছে কি না?

প্রশ্ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দোষত্রুটি ধরতে পারেন

॥ ৫ ॥ অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Searching questions) :

চিন্তা উদ্দীপ্ত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রশ্ন করা। এজন্য চিন্তাউদ্দীপ্তকারী অনুসন্ধান প্রশ্নের (thought provoking searching question) সাহায্য নেওয়া যায়। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে নতুনকে জানবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। চিন্তা উদ্রেককারী অনুসন্ধানী প্রশ্নগুলি 'কেন', 'কি করে' দিয়ে শুরু হয়। একটু না ভেবে শুধু মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই ছাত্রেরা নিজেরাই একটু চিন্তা করুক। মুখস্থ যা করা হয়েছে তা প্রয়োগ করতে পারে কি না তা জানা যেমন দরকার স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশও তেমনি প্রয়োজন। প্রশ্নের মধ্যে 'কেন'র ব্যবহারে আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়

॥ ৬ ॥ শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training or Developing questions) :

শিক্ষামূলক প্রশ্নের (Training or Developing) উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। শিক্ষকের প্রশ্নের ধারাকে অনুসরণ করে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে উত্তর দেয় ও শিক্ষকের সুপরিচালনায় তারা নতুন তথ্যকে আবিষ্কার করে। শিক্ষক সাধারণতঃ পরিচিত বিষয় নিয়ে শুরু করবেন। তারপর উত্তরের সূত্র ধরে একটির পর একটি প্রশ্ন করে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীরা যতটা সম্ভব নিজেরাই উত্তর খুঁজে বের করবে। যেখানে তারা জানে না

বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের অগ্রগতি

সেখানে শিক্ষক অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation) যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে Developing প্রশ্নের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থা করতে হয়।

॥ ৭ ॥ শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary question) ঃ

শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে কি না, শ্রেণীর পাঠ বুঝতে পেরেছে কি না প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রশ্ন করবার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। তা হচ্ছে শ্রেণীশৃংখলা রক্ষা করা ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের শাসন করা। অনেক সময় ছাত্রেরা পাঠে অমনোযোগী হয়ে ক্লাসে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। তখন যা পড়ান হচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে দুএকটি কঠিন প্রশ্ন ছেলেদের সামনে রাখতে হয়। অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ; তার ফলে তারা লজ্জিত হয়। অনেক সময় ভাল ছাত্রেরা পাঠকে অবহেলা করে। তারা মনে করে তাদের সব জানা হয়ে গিয়েছে,—পাঠ্যবিষয় থেকে কঠিন প্রশ্ন করে তাদেরও শাসন করা যায়।

শ্রেণীশৃংখলা রক্ষায় প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন কখন করা হবে
(When to put questions)

॥ ১ ॥ পাঠ প্রস্তুতি পর্বে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন ঃ—

দিনের নির্দিষ্ট পাঠ শুরু হবার পূর্বেই প্রথম প্রশ্ন করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাঠ প্রস্তুতিপূর্বে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক যা শিক্ষা দিতে চান সেদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করা। শিক্ষক প্রথমেই জানতে চেষ্টা করবেন যা তিনি পড়াতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণা আছে কি না? একে বলা হয় পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই স্তরে পাঠ শুরু হবে। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেদিনের পাঠ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে পূর্বজ্ঞানের সাথে তিনি যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন তাকে সম্বন্ধযুক্ত করবেন।

পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে প্রশ্নের উপযোগিতা

॥ ২ ॥ পাঠ উপস্থাপন-কালীন প্রশ্ন ঃ—

এর পর উপস্থাপনপাঠ। পাঠ চলাকালীন প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে যা পড়ান হচ্ছে ছেলেরা তা বুঝতে পারছে কি না। খুব বিচার বিবেচনা করে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে হবে। শিক্ষক যা বর্ণনা করছেন তার একটি পর্ব শেষ করে প্রশ্ন করবেন। রসানুভূতিমূলক পাঠে একটি গল্প বা কবিতা পড়া হতে থাকলে সেই গল্পটি শেষ না করে পাঠ একটু এগিয়ে যাবার পরই প্রশ্ন শুরু করলে

পাঠে রসভঙ্গ করা হবে। শুধু রসানুভূতিমূলক পাঠ নয়, জ্ঞানমূলক পাঠ যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রথম একটি পর্ব বুঝিয়ে আবার সেই পর্বটি সম্পর্কে আলোচনা কালে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটা শৃংখলা থাকবে, প্রশ্নগুলি হবে প্রগতিমূলক (Developing)। একটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আরেকটি প্রশ্ন এসে যাবে। এমনিভাবে চিন্তাধারার বিকাশ লাভ ঘটবে। শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি, অনুমান শক্তি, চিন্তা বুদ্ধি, বিচার শক্তির বিকাশ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনে রেখেই তাদের কাছে প্রশ্ন করতে হবে।

পাঠদানের উপস্থাপন পর্যায়ের প্রশ্ন

॥ ৩ ॥ **অভিযোজন-কালীন প্রশ্ন ঃ—**

পাঠ অভ্যাস করতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। যা পড়ান হয়েছে শিক্ষক যদি আবার তাই বলে যান তা খুব কার্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতায় পঠিত অংশের আলোচনা হলে পাঠ আয়ত্ত করা ছাত্রদের পক্ষে সহজ হয়।

পাঠদানের অভিযোজন স্তরে প্রশ্ন

প্রশ্ন করার রীতি

(Technique of questioning)

শিক্ষায় প্রশ্নের কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু এই কার্যকরী শক্তিকে শিক্ষায় সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষককে জানতে হবে কি করে প্রশ্নের প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষককে শ্রেণীশিক্ষায় প্রশ্ন করবার সময় একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অগ্রসর হতে হবে।

শিক্ষকগণ ক্লাসে যখন প্রশ্ন করেন—তখন দেখা যায় একটি ছাত্রের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বা নাম ধরে ডেকে বলেন, "তুমি বলতো···?" এতে ক্লাসের অন্য সবাই ভাবে প্রশ্ন যখন আমায় করা হয় নি—তখন এর উত্তর কি হবে সে সম্পর্কে আমার চিন্তার কিছু নেই। আগে নাম ধরে ডাকা ও তার পর তাকে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। **শিক্ষক প্রশ্ন সমস্ত ক্লাসকে উদ্দেশ্য করে করবেন** (To put the questions before the class)। তারপর একটু ভাবতে সময় দেবেন, কেউ যেন বুঝতে না পারে তিনি কার নাম ধরে উত্তর দিতে আহ্বান করবেন। ফলে সবাই সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে। কোন নির্দিষ্ট ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন না করে সমস্ত শ্রেণীর সামনে প্রশ্নটি রাখলে—শ্রেণীর সব ছাত্রেরাই পাঠে মনোযোগী থাকবে। প্রতি শ্রেণীতে দেখা যায় দু' চারটি ছেলে থাকে যারা প্রশ্ন করবার সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠে—'আমি বলি,' অনেক সময় জিজ্ঞেস করার পূর্বেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে এক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে।

সমস্ত শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন

প্রশ্নের উত্তরদানে শিক্ষার্থীদের শৃংখলা

একসাথে একজনের বেশী যেন উত্তর না দেয়। এ অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে দু' একদিন একটু কঠোর মনোভাব দেখাতে হবে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন যতটা সম্ভব ছড়িয়ে করতে হবে। শুধুমাত্র ভাল ছেলেদেরই যেন প্রশ্ন করা না হয়। পিছনের বেঞ্চে বসলে প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে শিক্ষক এ মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ কখনও দেবেন না। প্রশ্ন যেন সারিবদ্ধভাবে পর পর করা না হয়। সারিবদ্ধভাবে প্রশ্ন করলে ছাত্রেরা তার সুযোগ নেবে। প্রশ্ন ঘুরিয়ে করতে হবে,—শেষের দিকে প্রশ্ন করে,—মাঝের দিকে কি সামনের দিকে চলে আসলে ছাত্রেরা সব সময় তৈরী থাকবে। প্রতি ছেলেই যেন ভাবে এখনি আমাকে প্রশ্ন করা হবে। তাহলেই তারা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট থাকবে। যারা হাত তুলছে শুধু তাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। হাত না তুলেই যদি রেহাই পাওয়া যায় তাহলে কেউ পড়া তৈরী করে আসবে না।

উত্তরদানের জন্য বিভিন্ন ছাত্রদের নির্বাচিত করতে হবে

একই প্রশ্ন বার বার বলা হবে না। একই প্রশ্ন একাধিকবার বলা হলে ছাত্রেরা প্রথম যখন প্রশ্ন করা হবে তখন প্রশ্নে মনোযোগী হবে না। তবে শিক্ষক যদি মনে করেন প্রশ্নটি ছাত্রেরা বুঝতে পারে নি তাহলে প্রশ্নটি আবার বলা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রশ্নের ভাষার পরিবর্তন করতে পারেন।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ও ভাষার পরিবর্তন

একজনকে উত্তর দিতে আহ্বান করেই যেন তার কাছ থেকে সাথে সাথে উত্তর আশা করা না হয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। সময় কতটুকু দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে প্রশ্নের ধরনের উপর। প্রশ্ন কঠিন হলে উত্তর দিতে একটু বেশী সময় লাগবে। তারপর সব ছাত্রই ভাল নয়, শিক্ষক জানেন কোন ছাত্রটি কি রকম বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন। অল্প মেধার ছাত্রকে একটু বেশী সময় দিতে হবে।

প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য সময় দিতে হবে

কোন শিক্ষার্থী ভুল উত্তর দিলে তা নিয়ে যেন হাস্য-পরিহাস না করা হয়। এতে সে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং অন্য সময় প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও বলতে সাহসী হবে না। **শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ সদয় ব্যবহার নির্ভুল উত্তর আদায়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।** যাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে তাঁকে এমনভাব দেখান হবে যেন সে ইচ্ছা করলেই উত্তর দিতে পাবে। আংশিকভাবে শুদ্ধ উত্তর দিলে তাকে সময় দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে সে ভেবে চিন্তে ঠিক উত্তর দিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রশ্নের উত্তর স্মৃতির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মুখস্থ না থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে যে জানে না তার কাছ থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে

প্রশ্ন করবার কৌশল ও শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার

অযথা সময় নষ্ট করা। এসব ক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থী নির্ভুল উত্তর দিতে পারে তার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে যারা জানে না তাদের শিখে নিতে হবে।

বিভিন্ন প্রশ্ন করে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি

কোন ছেলে যদি দেখা যায় অমনোযোগী হয়েছে তাহলে তাকে প্রশ্ন করা হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ হলেও শিক্ষক আরো দু'একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এতে যাদের মনে সংশয় আছে তারা পিছিয়ে যাবে—এও এক ধরনের পরীক্ষা, শিক্ষকের প্রশ্ন যেন একই রকম না হয়। তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন করে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করবেন।

আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ
(Qualities of good Questions)

পড়াতে গিয়ে প্রশ্ন আমরা সবাই করি, কিন্তু সব প্রশ্নই পাঠ-প্রগতির সহায়ক নয়। আমাদের যেমন প্রশ্ন করবার রীতি জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে প্রশ্ন কিরূপ হবে।

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক সক্রিয়তা বাড়বে

আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ হচ্ছে প্রশ্নের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন সক্রিয় হয়ে উঠবে—সে চিন্তা করবে আর স্মৃতি চারণা করবে, সেই সাথে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে (*......it should incite the pupil to genuine activity of mind ; it should cause him to observe, remember and think" T. Raymont*)।

প্রশ্নের ভাষা সহজবোধ্য হবে

প্রশ্ন করার সময় প্রথমেই প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন করা হবে যাতে ছাত্রেরা বুঝতে পারে শিক্ষক তার কাছে কি জানতে চাইছেন। প্রশ্নের ভাষা সহজবোধ্য না হলে জানা উত্তরও ছাত্রেরা বলতে পারবে না।

প্রশ্নগুলি শ্রেণীর উপযোগী হবে

প্রশ্নটি যেন শ্রেণীর উপযোগী হয়। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে যদি জানতে চাই সূর্যগ্রহণ কি করে হয়—তাহলে তারা উত্তর দিতে পারবে না। যে শ্রেণীর ছাত্রেরা যে প্রশ্নের উপযোগী তাদের সেরূপ প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন খুব সোজা বা খুব কঠিন হবে না। যে প্রশ্নের উত্তর দু'একটি ভাল ছাত্র ছাড়া দিতে পারে নি বুঝতে হবে সে প্রশ্ন সে শ্রেণীর উপযোগী হয় নি।

একটি প্রশ্নের দুটি উত্তর হবে না

প্রশ্ন যেন দ্ব্যর্থ ভাষায় রচিত না হয়। প্রশ্নটি এমন ভাবে রচিত হবে যার একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব। যে প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে সে প্রশ্ন ভাল প্রশ্ন নয়। যে প্রশ্নের উত্তর বর্ণনাত্মক সে প্রশ্ন পরিহার করা উচিত। সাধারণতঃ যে

প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ প্রশ্ন করতে হবে। **যে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেই সারা যায় সে প্রশ্ন করা উচিত নয়।** এতে চিন্তা ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না—আন্দাজ অনুমান করেই উত্তর দেবার চেষ্টা করে। আকবর কি সুশাসক ছিলেন? এই জাতীয় প্রশ্ন চিন্তা শক্তি উদ্দীপ্ত করে না। **অনুমান** নির্ভর উত্তর যেখানে সম্ভব সেই প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে হবে। সম্পূর্ণরূপে স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে সে সব প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্নের মধ্যে পড়ে না।

'হ্যাঁ'-'না' উত্তরের প্রশ্ন

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রশ্ন

তবে স্মৃতি শক্তি নির্ভর প্রশ্নকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। **যে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তা করা ঠিক নয়।** বিষধর সাপ কামড়ালে কি মানুষ মরে? এর উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে—অনুমান করে আন্দাজে হ্যাঁ বা না বলে দিলেও চলে, উত্তরের জন্য চিন্তা করতে হয় না। এ প্রশ্নও করা ঠিক নয়। **প্রশ্ন নানা রকমের হবে—এবং বইয়ের ভাষায় হবে না।** শিক্ষক নিজের ভাষায় প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে এমন প্রশ্ন

প্রশ্ন করার রীতি পদ্ধতি ও আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ নিয়ে আলোচনার পরও আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে; সুযোগ্য শিক্ষক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হন তাহলে তিনি নিজস্ব সৃষ্ট রীতি পদ্ধতিই অনুসরণ করবেন। তাঁকে শুধু মনে রাখতে হবে যে,—**যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে ও পর্যবেক্ষণের প্রেরণা যোগায় সেইরূপ আদর্শ প্রশ্ন** —*One golden rule of questioning is make your pupils observe and think"—T. Raymont.* কোন বাঁধা ধরা নিয়ম মেনে সব সময় প্রশ্ন করা চলে না। শিক্ষক সাধারণ নিয়মগুলি জানবেন এই জন্য যে, ত্রুটিগুলি তিনি জেনে তবে নিজ অভিজ্ঞতা, বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রশ্ন করবেন। নিয়মভঙ্গ করেও যদি তিনি শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন, বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করতে পারেন তাহলেই কাজ সার্থক হবে।

আদর্শ প্রশ্ন

প্রশ্নের উত্তর ও সংশোধন

আমরা যখনই শ্রেণীর সামনে একটি প্রশ্ন করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে সার্থক উত্তর আদায় করা। সঠিক উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের সার্থকতা। **যতক্ষণ না সঠিক ও নির্ভুল উত্তর আদায় করতে পারা যাবে ততক্ষণ শিক্ষকের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বক্ষেত্রেই যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদর্শ উত্তর মিলবে তা আশা করা উচিত নয়। চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সে জানে ততটুকু**

যাতে সে পরিষ্কার করে বলতে পারে। তার উত্তর ভুল হতে পারে, নির্ভুল হতে পারে, দুয়ের মাঝামাঝি হতে পারে। সে যাই বলুক না কেন তাকে বলতে দিতে হবে। শিক্ষক তা আগ্রহের সাথে শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তাকে নিরুৎসাহ করা বা তিরস্কার করা ঠিক নয়। বরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সে ঠিক উত্তর দিতে পারে। শিক্ষকের সদয় ব্যবহার ও অনুপ্রেরণায় অনেক কাজ হয়।

প্রশ্নের লক্ষ্য সঠিক উত্তর আদায় করা

॥ এক ॥ প্রশ্নের উত্তর হবে সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত ভাবে।

প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা বই মুখস্ত করে বইয়ের ভাষায় না দিয়ে নিজের ভাষায় যতটা সে বুঝতে পেরেছে তাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা উত্তরকে বাদ দেবার চেষ্টা করবে। এতে ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না। উত্তরের ভাষা হবে সহজ এবং উত্তরটি হবে সংক্ষিপ্ত। যা তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে ঠিক তার উত্তরই যেন হয়। উত্তর যেন আংশিক না হয়। উত্তরটি যথাসম্ভব একটি সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করতে হবে। ছাত্রেরা অনেক সময় যা বলা উচিত তার চেয়ে বেশী বলে—সেখানে ছাত্রকে সংযত করতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই দেওয়া থাকে যে,—*answer must be brief and to the point.*

উত্তর সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হবে

প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে বলতে হবে যাতে শ্রেণীর সব ছাত্রই উত্তরটি শুনতে পায়।

॥ দুই ॥ শ্রেণীর ছাত্রদের কাছ থেকেই উত্তর আদায় করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম উত্তরটি যদি সঠিক নাও হয় তাহলেও চেষ্টা করতে হবে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার কাছ থেকে বা সমস্ত ক্লাসের কাছ থেকে নির্ভুল উত্তর আদায় করা যায়। উত্তরটি মনোমত না হলে বলতে পারা যায়, হয়েছে, কিন্তু আরো ভাল করে কে বলতে পারে? কেন ওর ভুল হ'ল, কোথায় ভুল তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিক্ষক যদি হয় নি বলে কর্তব্য শেষ করেন, তাহলে ছাত্রদের ভুল কোনদিনই সংশোধিত হবে না। শিক্ষক সব সময় কোথায় ভুল ও কেন ভুল হ'ল এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন। তবে শিক্ষক উত্তর বলে না দিয়ে যদি ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে উত্তরটি বের করে নিতে পারেন। তাহলেই ভাল হয়।

একই ছাত্র ভাল উত্তর দিতে না পারলে অন্যান্য ছাত্রদের প্রশ্ন করা যেতে পারে

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সাথে সাথে সমস্বরে সবাই যেন চিৎকার করে না ওঠে। তাহলে শ্রেণীর শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না, এবং কে কতটা জানে তাও সঠিকভাবে বোঝা যাবে না। শিক্ষক এ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকবেন, দরকার হলে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবেন।

প্রশ্ন ও শ্রেণীশৃংখলা

॥ তিন ॥ ছাত্রদের প্রশ্ন ।

শ্রেণী শিক্ষায় ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষকই একমাত্র বক্তা। তিনিই সক্রিয়, আর সব নির্বাক শ্রোতা। শ্রেণী শিক্ষার এই ত্রুটি দূর করতে হলে ছাত্রেরা যাতে যথাসম্ভব পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিত। ছাত্রদের সাথে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনাই সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। পড়াবার সময় যদি ছাত্রেরা উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করে—কিছু জানতে চায় তাহলে মনে করতে হবে ছাত্রেরা পড়ায় মনোযোগী ও আগ্রহশীল। অনেক সময় ছাত্রেরা ক্লাসে প্রশ্ন করলে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের প্রশ্ন সম্পর্কে এই মনোভাব খুবই নিন্দনীয়। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন। তবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কৌতূহল শ্রেণীতে বসে মেটান সম্ভব নয়। কোন বিষয় আলোচনা কালে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে শিক্ষক সেই সব প্রশ্নের মীমাংসা করে দেবেন। এক সাথে সবাই মিলে প্রশ্ন করে যেন গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ এটা শ্রেণী শৃংখলা রক্ষার সহায়ক বা সুশিক্ষার পরিচায়ক নয়।

শিক্ষার্থীরাও নানাবিধ প্রশ্ন করতে পারে

শিক্ষক প্রথমে চেষ্টা করবেন ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় কি না জানতে। প্রশ্নটি শ্রেণীর সামনে রাখলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সমবেত প্রচেষ্টায় ছাত্রেরা যদি উত্তর দিতে পারে তাহলে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়বে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশ্নের উত্তর বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

শিক্ষক যদি কোন প্রশ্নের উত্তর সঠিক না জানেন তাহলে তা স্বীকার করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। তিনি বলবেন—আমি এখন সঠিক বলতে পারছি না, পরে তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব। এতে দোষের কিছু নেই, কারণ শিক্ষক সবজান্তা নন। কিন্তু তিনি যদি ভুল উত্তর দিয়ে আসেন তবে সেটা দোষের হবে। ছাত্ররা যখন সঠিক উত্তর জানতে পারবে তখন তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়,—ভুল বলে এসে তাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করতেও দেখেছি, এটা সবচেয়ে মারাত্মক।

কোন প্রশ্নের উত্তর শিক্ষক না জানলে তা স্বীকার করবেন

কোন কোন সময় দুষ্টু ছাত্রেরা মাষ্টার মহাশয়কে জব্দ করার জন্য বা পরীক্ষা করার জন্য নানারূপ উদ্ভট প্রশ্ন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক দৃঢ় হবেন ও শিক্ষার্থীকে প্রশ্রয় দেবেন না।

আজেবাজে প্রশ্ন এলে কঠোর মনোভাব নিতে হবে

শিক্ষায় প্রশ্নের গুরুত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে 'প্রশ্নের' অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষককে শিক্ষাদানের কৌশলটি আয়ত্ব করতে হবে। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর

অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। দৈনন্দিন শ্রেণীতে যে পাঠ দেওয়া হচ্ছে, বর্ণনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হলে পাঠ আয়ত্ব করা সহজ হয়। প্রশ্ন শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষাই নয়—শিক্ষকেরও পরীক্ষা। শিক্ষক কি ভাবে গ্রহণ করেন ও ভুল সংশোধন করেন তার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ করা চলে। এ সম্পর্কে G. S. Krishnayya যা বলেন তা প্রণিধান যোগ্য। *By a conscious process of good questioning, an intelligent teacher can lead his educational traveller through unfamiliar regions to a desired destination. The right question is the psychological basis of all learning. It is certainly the best means of stimulating thought. A teacher's skill can be measured by the way he handles the most important pedagogical instrument. (Instruction in Indian Secondary Schools. Ed E. A. Macnee.)*

প্রশ্নগুলির মাধ্যমে শিক্ষকের সাফল্যের পরিমাপ

ART OF QUESTIONING :—

ভাল প্রশ্ন করা এক ধরনের শিল্প। ভাল প্রশ্ন করার কৌশল সব শিক্ষকেরই জানা উচিত। তবে সব শিক্ষকের ক্ষমতা সমান নয়, তাহলেও প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলেরই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। শ্রেণী কক্ষে পাঠের অগ্রগতিতে, পাঠের উপলব্ধিতে প্রশ্নের গুরুত্ব অসীম। প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা, পাঠে আগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়, প্রশ্ন করার মূল কৌশল তিনটি—

প্রশ্ন তৈরী করা, জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর গ্রহণ

(ক) **প্রশ্ন তৈরী করা।**

(খ) **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।**

(গ) **প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ।**

প্রশ্ন করার বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতিকে যথাযথ ভাবে উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, ফলে প্রশ্নগুলি বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী হবে, শিক্ষাও সফল হবে। Art of questioning সমস্ত শিক্ষককেই জানতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the marks of good questions ? Illustrate your answer with suitable examples. (C. U., B. Ed. 1971)
2. Illustrate with examples the use of questioin in iving a lesson. (Jadavpur University B. T. 1970)
3. **Indicate the various purposes and uses of questions in class-room teaching and some characteristics of good questions. Prepare a series**

of six consecutive questions, with their answers, on any topic of your choice. (Kalyani University B. T. 1967)

4. What are the different ways in which the art of questions can be employed? How do they correspond to successive stages in the process of a lesson?

5. Write notes on—

(a) The art of questioning. (C. U., B. T. 1968. 1970)

(b) What purposes are served by questioning in developing a lesson?

(c) Mention in this connection three characteristics of a 'good' question.

(d) Give three examples of 'bad' questions and give their corrected forms.

(e) In developing a lesson on social studies mention the stages when—(i) the teacher should ask questions; (ii) the teacher should give information to the pupils; and (iii) the students should be given opportunities to ask questions.

(P. G., B. T. 1971)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ

(TEACHING AIDS)

শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষক বক্তা, শিক্ষার্থী শ্রোতা। শিক্ষক যদি ভাল বক্তা হন, তাহলে যে বিষয় পড়াচ্ছেন বর্ণনার মাধ্যমে তার নিখুঁত চিত্র ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। ছাত্রেরা বর্ণনার গুণে মনে করবে ঘটনাটি যেন তাদের সামনে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি যদি পড়াবার সময় বিষয় সম্পর্কীয় একটি চিত্র ছাত্রদের দেখাতে পারেন তাহলে সেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে;—ছাত্রদেরও বুঝাতে সুবিধা হবে।

শিক্ষাদানে দৃষ্টান্তের উপযোগিতা

শিক্ষকমাত্রই জানেন অনেক কথা বলে যা বোঝান যায় না,—একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে তা সহজেই বোঝান যায়। 'Example is better than precept' এই প্রবাদ বাক্যের মূলে গভীর সত্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত সহযোগে পাঠ সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী. বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষায় শোনাবার চেয়ে দেখাবার উপযোগিতা অনেক বেশী। কারণ বড়রা মুখে শুনে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। কিন্তু শিশুদের ধারণা শক্তি কম। তাই শুধু মুখে শুনে কোন জিনিস সম্পর্কে ততটা সুস্পষ্ট ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিক্ষাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিচারে উপকরণগুলির গুরুত্ব

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলেই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহারের কথা বলেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাতত্ত্ববিদ এই উপকরণগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা-পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্ব—সব কিছুর বিচারেই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে তাই এই উপকরণগুলি ব্যবহারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে।

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

(Utility of Teaching Aids)

আমরা সাধারণভাবে বলি,—চোখে দেখে কানে শুনলেই বিশ্বাস হবে। শিক্ষায় আমরা কানে শোনা (audio) আর চোখে দেখা (visual) এই দুইয়ের সাহায্যই লই। শিক্ষকের কাছ থেকে যা শুনলাম তা আমরা ভুলি না, যা দেখি তা আমাদের মনে থাকে। যদি শোনার সাথে সাথে দেখি তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই শিক্ষায় আমরা বহু কথা বলে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেয়ে এই চোখে দেখে কানে শুনে (audio-visual

aids) শেখাবার পথটি বেছে নিয়েছি। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্ণনা-বহুল পাঠে ছাত্রদের মনকে আকর্ষণ করবার জন্য বহু শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। চোখে দেখে শেখার উপযোগিতাকে মেনে নিলেও সব সময় বাস্তব জিনিসটি ছাত্রদের সামনে হাজির করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমরা বিকল্প জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করি। পশুরাজ সিংহের বিবরণ শুনিয়ে বাস্তব জ্ঞানের জন্য ছাত্রদের সব সময় সিংহ দেখাতে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সিংহের ছবির সহায়তায় শিশুর জ্ঞানকে অনেকটা বাস্তবধর্মী করে তোলা যায়। ভূগোল পড়াবার সময় পাহাড়-পর্বত-নদী সব কিছু চোখে দেখিয়ে শেখান যায় না—এক্ষেত্রেও ছবি দেখিয়ে মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলের অনেক তথ্য ছাত্রদের সুন্দর ভাবে শেখান যায়।

চোখ ও কানের মাধ্যমে শিক্ষা ছাত্রদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়

যে সব বস্তু ব্যবহার করলে ছেলেমেয়েদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় তাকেই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ বলা চলে। শিক্ষা-সহায়ক বহু প্রকার উপকরণ শিক্ষাকার্যে ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি উপকরণ দ্রব্যমূলক। যেমন উদ্ভিদবিদ্যা শেখাবার জন্য লতা-পাতা, ফুল-ফল, নানা গাছ-গাছড়া ইত্যাদি। প্রকৃত বস্তুটির ব্যবহার যেখানে হয় সেখানে শিক্ষার্থীকে কল্পনা করে আর কিছু বুঝতে হয় না। বাস্তব বস্তুটির সাথে পরিচয় হবার পর সে সম্পর্কে আর কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না। কোন জিনিসের আদর্শ (model), ছবি, ম্যাপ, চার্ট, নকসা প্রভৃতি বিকল্প বস্তু। বাস্তবের অভাব পূরণের জন্য এসব ব্যবহার করা হয় যেখানে এই উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞান-শিক্ষায় শিশু শিক্ষার্থীর বুঝবার সুবিধার জন্য যতটা সম্ভব অকৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নেওয়া দরকার। একটু বয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্য চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একটু বড় হলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিমূর্ত বস্তুর ধারণা করা সম্ভব। শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি (Imagination) বৃদ্ধি করে, পর্যবেক্ষণের (Supervision) শক্তিকে দৃঢ় করে, বিশ্লেষণী (Analysis) ও সংশ্লেষণী (Synthesis) মনোভাবকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ ও যথার্থ্য হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী মনোভাব বৃদ্ধি হয়

উপকরণের শিক্ষায় প্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করে। শিক্ষা তখন জীবন্ত হয়। আনন্দময় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণের বহুল ব্যবহার শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের ব্যবহারের ফলে যে সব

জিনিস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে অনেক বাধা ছিল ছবি দেখে বা মডেল দেখে তারা সে সম্পর্কে সহজেই একটা ধারণা করতে পারে।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারে পাঠদান জীবন্ত হয়

শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সমাবেশে একটা বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একটানা নীরস বর্ণনার-মাঝে বৈচিত্র্য সম্পাদনে শিক্ষাসরঞ্জাম বিশেষ কার্যকরী। শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে দেওয়া হলে বিষয়টি শিক্ষার্থীর মনে গাঁথা হয়ে যায়। প্রায়ই দেখা যায় ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান বইয়ে শাপলাফুল কি ঐ জাতীয় কোন ফুলের বিবরণ রয়েছে। শিক্ষক যদি পড়াবার সময় ত্'একটি ফুল এনে দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের সামনে ফুলের গঠন ও তার বিভিন্ন অংশের সাথে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন তাহলে ছাত্ররা শুধু সহজে বুঝবে না মনেও রাখবে। একটি জিনিস সামনে রেখে শিক্ষা দিলে ছাত্ররা নানাভাবে জিনিসটি দেখবে এতে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিও বাড়বে এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণক্রিয়া কি ভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হবে।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির সাহায্যে পাঠ দান শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আবেদনের সৃষ্টি করে। ফলে ধারণা পূর্ণ হয় এবং জ্ঞান গভীর হয়। সম্পূর্ণ

ধারণা সম্পূর্ণ হয়

ধারণা শক্তি (clear conception) জ্ঞানের স্থায়িত্ব এনে দেয়। শ্রেণীতে যারা poor readers ও slow listeners তারাও উপকরণগুলির সাহায্যে স্বচ্ছ ধারণা করতে পারে। কারণ উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে ও মনকে যুক্তিনির্ভর করে। শিক্ষায় পুঁথিগত বিদ্যা ও পরীক্ষা সর্বস্বতার অবসান হয়। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ বিদ্যার তুরন্তপনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শিশুমন স্বাধীন শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়।

উপকরণগুলির ব্যবহার পাঠদানের উৎকর্ষ সাধন করে। কারণ এর মাধ্যমে পুরনো যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অবসান হয়ে শিক্ষাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে

শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়

প্রাধান্য বিস্তার করে। শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহল বেড়ে যায়। উপকরণগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হয়। তখন জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসেতু স্থাপিত হয়।

প্রাক্ প্রাথমিক কি প্রাথমিক স্তরে খুব কম জিনিস আছে যা উপকরণ ব্যতীত ঠিক ভাবে শেখানো যায়। শিক্ষাসরঞ্জাম সমূহ সহজ সরল হলে শিশু-

নীচু শ্রেণীগুলিতে শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি খুবই প্রয়োজনীয়

শিক্ষার্থীর পক্ষে বোঝবার সুবিধা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় অল্প আয়াসে ও অল্প খরচেই বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা বেশ কিছু ব্যয়সাধ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করে না দেখলে শুধু বই পড়ে বা মুখে শুনে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয়টা

আয়ত্ব করা কষ্টসাধ্য। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সমূহ ছাত্রদের সামনে যতটা সম্ভব উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার উপযোগী কয়েকটি সরঞ্জাম
(Some Useful Teaching Aids)

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি সাজসরঞ্জাম অতি সহজেই যোগাড় করা যেতে পারে। যেমন উদ্ভিদ বিদ্যা শেখবার নানারকম লতা-পাতা, ফুলফল ইত্যাদি। জীববিদ্যার জন্য হাঁস, ব্যাঙ, খরগোস, কয়েক প্রকার পাখী। ভূতত্ত্বের জন্য পাথর, চক, বালি নানারকম মাটি। রসায়নের জন্য কয়েক প্রকার এসিড ধাতু। ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার জন্য মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট, ঐতিহাসিক মানচিত্র, প্রাচীন ছবি ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে বহু ছবি, নক্সা, চার্ট এঁকে দিতে পারেন। শিক্ষাউপকরণের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের একটি বিশেষ বিশিষ্ট স্থান আছে। এছাড়া ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে কোন বিষয়ের ধারাবাহিক ছবি দেখিয়ে সুন্দর ভাবে বিষয়টি শেখান যায়। সিনেমাকে যদি শিক্ষামূলক কাজে লাগান হয় তাহলে সিনেমা একটি শক্তিশালী শিক্ষার মাধ্যমে হতে পারে।

কতকগুলি উপকরণ সহজেই সংগ্রহ করা যায়

চোখে দেখে ছাড়াও কানে শুনে অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। গ্রামোফোন, রেডিও, বিতর্ক-সভা, টেপ রেকর্ডার, কোন বিষয়ে বক্তৃতা ইত্যাদি। এ ছাড়া ছাত্রদের এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে গেলে নতুন নতুন বহু জিনিস দেখেও সে সম্পর্কে শুনে তারা বহু কিছু শিখতে পারে। গ্রামের ছাত্রদের যদি শহরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তারা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীঅঞ্চলের ছাত্রদের জন্য ছুটির দিনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে—শুধু কলকাতা থেকেই তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। শহরের ছাত্রদের গ্রামে যাওয়া বিশেষ দরকার, দেশের সাথে পরিচয় না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন শিল্পনগরী, বহুমুখী নদী পরিকল্পনার বাঁধ বইয়ের মাধ্যমে চেনবার সাথে যদি সেখানে ঘুরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা বহু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। শিক্ষার উপকরণ সমূহ দক্ষ শিক্ষক যদি নিপুণ ভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে ছাত্রেরা এতে অত্যন্ত আনন্দ পাবে ও উৎসাহের সাথে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও অঞ্চল পরিক্রমা

উপকরণ ব্যবহারের রীতি ও কৌশল
(Methods and Techniques of using Teaching Aids)

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে এই উপকরণগুলি ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার প্রয়োজনও রয়েছে। শিক্ষকগণ

অনেক সময় অতি উৎসাহের বশে উপকরণের আধিক্য সৃষ্টি করেন। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে অত্যধিক উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। **আমাদের মনে রাখতে হবে উপকরণের বাহুল্যে আসল বিষয়বস্তুটি যেন চাপা পড়ে না যায়।**

উপকরণ বাহুল্যে পাঠ্যবস্তু চাপা পড়ে যায়

"Like most other things, illustration may be averdone. There has been a tendency, especially in our training colleges for teachers to exalt what is essentially a means to the position of an end, a tendency doubtless encouraged by the mode of examination in practical teaching that has prevailed. Though the ability to illustrate appositely and readily is one of the marks of good teacher, yet it can not be too strongly emphasised that a highly finished and elaborated diagram, picture or model is quite insufficient in itself to make a lesson a good one. Speaking generally the utmost simplicity should be aimed at, and those illustrations which are so simple that they can be made or worked out in the presence of the class are best of all"— *T. Rayamont.*

পাঠ্য বিষয় মুখ্য, উপকরণ গৌণ

উপকরণের প্রয়োজন বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য, তাই ছবি কি নক্সা যেন জমকালো না হয়। উপকরণ যদি অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ হয় তাহলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি ছবিতেই আটকে থাকবে,—বিষয়বস্তু তলিয়ে যাবে। সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে তোলবার জন্য। উপকরণ যেন মূল বিষয়ের স্থান অধিকার করে না বসে। মনে রাখতে হবে পাঠ্য বিষয়টি মুখ্য, উপকরণ গৌণ। শিক্ষার্থীর মন যেন পাঠ থেকে সরে উপকরণের মধ্যে নিবদ্ধ না হয়।

উপকরণগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী হবে

যে শ্রেণীতে পড়ান হবে সরঞ্জামগুলি যেন সেই শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী হয়। নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে জটিল কোন উপকরণ উপস্থিত করলে তাদের বোধগম্য হবে না। উপকরণগুলি সুনির্বাচিত হবে। উপকরণগুলির মধ্যে এমন সব লোভণীয় গুণ থাকবে যা শিশুচিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করবে। উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, বয়স ও মানসিকতার উপযোগী হবে।

সরঞ্জাম যেন বিষয়ের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক হয়। উপকরণটি দেখলেই যেন শিক্ষার্থীরা যা পড়ান হবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষক যে সব উপকরণ নিয়ে ক্লাসে যাবেন তার পিরিয়ডের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যেন তার ব্যবহার করতে পারেন; তা না হলে কতকগুলি উপকরণ বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ হয় না। বহু সময় দেখা গিয়েছে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাতে সময় রয়েছে, ছাত্রদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু শিক্ষকের দক্ষতার অভাবে উপকরণ সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হ'ল না।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপকরণগুলিকে ব্যবহার করতে হবে

শিক্ষক মনে রাখবেন ক্লাসে গিয়েই উপকরণগুলি ছাত্রদের সামনে খুলে রাখা ঠিক নয়। তাহলে তারা উপকরণ সম্পর্কে কৌতূহলী হবে। শিক্ষক কি বলেন তা শুনতে চাইবে না। শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ নিয়ে আলোচনাকালে যখন উপকরণটি উপস্থাপনের সময় আসবে তখনই তার ব্যবহার করবেন। তাহলেই ছাত্ররা জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে ও উপকরণের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। উপকরণগুলিকে তাই নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। আগে থেকে উপকরণগুলি দেখানো ঠিক নয়। সুপ্রযুক্ত না হলে উপকরণগুলি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। আগে থেকে পরিকল্পনা করে উপকরণগুলি পাঠদানের সময় ব্যবহার করতে হবে।

উপকরণগুলিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে

বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ
(Different Teaching Aids)

শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ ও কান—এই দু'টি ইন্দ্রিয় সব থেকে বেশী ব্যবহৃত হয়। চোখ দিয়ে দেখে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করি, কান দিয়ে শুনে শিক্ষা গ্রহণ করি। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলিকে এরই ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ
(Visual Aids)

চক্ষু—এই ইন্দ্রিয়ের পথে শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষাগ্রহণে সাহায্য করে। এই জাতীয় উপকরণগুলির আবেদন শিক্ষার্থীদের চোখের কাছে। দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ অনেকগুলি আছেতার মধ্যে প্রধান হ'ল,—

(১) পাঠ্য পুস্তক (Text Book)
(২) ব্ল্যাক বোর্ড (Black-Board)
(৩) মানচিত্র ও গ্লোব (Maps and Globe)
(৪) ছবি (Pictures)

(৫) নমুনা (Specimen)
(৬) গ্রাফ (Graph)
(৭) নক্সা ও চার্ট (Diagram and chart)
(৮) মডেল (Model)
(৯) ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern)
(১০) এপিডায়োস্কোপ (Epidiascope)
(১১) সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র (Newspaper and Periodicals)

(খ) শ্রুতিনির্ভর উপকরণ (Audio Aids)

(১) রেডিও (Radio)
(২) টেপ রেকর্ডার (Tape Recorder)
(৩) গ্রামোফোন (Gramophone)

(গ) দৃষ্টি-শ্রুতি নির্ভর উপকরণ (Audio-Visual Aids)

এই জাতীয় উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের চোখ ও কান—এই দুয়ের কাছেই আবেদন সৃষ্টি করে। এই জাতীয় উপকরণ হ'ল,—
(১) চলচ্চিত্র (Motion pictures)
(২) টেলিভিশন (Television)
—উল্লিখিত উপকরণগুলি সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ (Visual Aids) :

॥ ১ ॥ পাঠ্য পুস্তক (Text Book)

শিক্ষায় সাজসরঞ্জাম ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কালে আমরা বহু প্রকার শিক্ষাউপকরণের নাম উল্লেখ করেছি। উপকরণ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি যে বস্তু পাঠকালে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, বর্ণনামূলক বা যুক্তিমূলক বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারা যায় তাই হচ্ছে শিক্ষা উপকরণ। এই অর্থে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাউপকরণের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের পর্যায়ভুক্ত করা না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে পড়ান সম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক যে শিক্ষা সহায়ক এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যে যুগে শিক্ষার ব্যবহার বিভিন্ন উপকরণের উপযোগিতা স্বীকৃতি ছিল না বা ব্যবহার ছিল না তখন

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য-পুস্তকের গুরুত্ব

পাঠ্যপুস্তক ছিল শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। আজকাল শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ মুখে বলেন—শ্রেণীতে পড়াবার সময় বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন না। এজন্য অনেকে ঠাট্টা করে বলেন আগের দিনে ছাত্ররা পড়া শিখে এসে শিক্ষকের কাছে বলত আর আজকাল শিক্ষক পড়া শিখে এসে ছাত্রদের কাছে বলেন। পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে অত্যধিক অবহেলা সম্পর্কে এটা একটি সতর্কবাণী। অতিরিক্ত পুঁথিনির্ভরতা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বই একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টাও শুভ নয়। বিষয়বস্তু ভেদে, ছাত্রদের বয়স ও বোধশক্তির পার্থক্যের অনুসারে পাঠ্যপুস্তক এর ব্যবহার করা উচিত। ছাত্ররা যতদিন ভাল করে পড়তে না পারে ততদিন পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার খুব কম হবে। যতটুকু হবে তার মধ্যে পড়ার সাথে দেখার বস্তুর সমাবেশ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীতে পাঠ হবে প্রধানতঃ মৌখিক। একটু উঁচু শ্রেণীতে উঠলে শিক্ষকের পড়ার সাথে শিক্ষার্থীরা বইয়ের ব্যবহার কিছুটা শিখবে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষকের দেওয়া পাঠই হবে মুখ্য—বই হবে তার পরিপূরক। কিন্তু শিক্ষককে পাঠ্য পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। শুধু মাত্র শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট একখানি বই নয়—নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বইয়ের সাহায্য শিক্ষক গ্রহণ করবেন। পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে ক্লাসে যাওয়া শিক্ষকের পক্ষে একটা অপরাধ। পাঠ্য বই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকটই শিক্ষাসহায়ক মূল্যবান অত্যাবশ্যক উপকরণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তকগুলির (Reference books) মূল্যও কম নয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই এই সব প্রাসঙ্গিক বই মূল্যবান, কিন্তু এগুলি ঠিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণের মধ্যে পড়ে না, কারণ এই জাতীয় বইগুলি নিয়ে শ্রেণী কক্ষে যাওয়া যায় না। তবুও এই সহায়ক প্রাসঙ্গিক বইগুলি খুবই মূল্যবান, শিক্ষাদানকালে শিক্ষক এগুলির উল্লেখ করবেন।

সহায়ক পুস্তক

॥ ২ ॥ ব্ল্যাকবোর্ড (Black-Boord) :

শিক্ষাসহায়ক উপকরণের তালিকায় ব্ল্যাকবোর্ডের স্থান সর্বাগ্রে। যে স্কুলের কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখানা ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ব্ল্যাক বোর্ড বাদ দিয়ে স্কুলের কথা কল্পনা করা যায় না। বোর্ড সর্বজন পরিচিত একটি অত্যাবশ্যক অপরিহার্য উপকরণ। এরচেয়ে সুলভ ও স্কুলে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত উপকরণ বোধ হয় দুটি নেই। সব শ্রেণীতেই ব্ল্যাকবোর্ডের প্রয়োজন রয়েছে। তবে নীচের দিকে মুখের কথার সাথে যদি ব্ল্যাকবোর্ডে নানা রেখা চিত্র অঙ্কন করা যায় তাহলে বিষয়টি তাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পাঠে বাজারে কেনা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার অপেক্ষা

শিক্ষক যদি তাদের সামনে পড়াবার সাথে সাথে নানারকম নক্সা, চিত্র ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে দেন বা কিছু লিখে দেন তাহলে তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করতে পারবেন। *"The map that grows before the children's eyes as the lesson proceeds ; and the sand or clay model that is moulded in the presence of the class, as the feature after feature of the object is disclosed, are far more effective than the most ornate production presented at the outset in its complete form."* *T. Raymont.* চোখে দেখে আর শিক্ষকের মুখে শুনে অর্থাৎ শ্রবনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্তু ছাত্রদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। অনেক সময় শিক্ষকেরা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোঝেন না, বা জেনেও যতটা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করা দরকার ততটা কাজে লাগান না। শিক্ষকতা করতে লক্ষ্য করেছি অঙ্কের শিক্ষক ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে কেউ যান না। এমনকি সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষক পর্যন্ত বাজারে কেনা ডায়গ্রাম ছাড়া বোর্ডে কিছু এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। ইতিহাস শিক্ষকের যে বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন আছে একথা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। আমাদের শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার সাধারণ স্কুলে শিক্ষার সহায়ক উপকরণ মাত্র একটি, তা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড। ক্লাসের শোভাবর্ধনের জন্য যেন ব্ল্যাকবোর্ড রাখা হয় না—আমরা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করব তবেই বুঝবো তার সার্থকতা।

বোর্ডের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ

পড়াবার সময় নতুন কি কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তুলনামূলক বিষয় ইতিহাসের সন তারিখ, কোন যুগের প্রধান ঘটনা, সময়-রেখা প্রভৃতি বোর্ডে লিখে দেওয়া দরকার। তাহলে ছাত্রেরা সহজে বিষয়টি মনে রাখতে পারবে। পড়া শেষ হলে সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া উচিত। সারাংশ লিখবার সময় শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণ করবেন। বোর্ডের সাহায্য বিনে অঙ্ক শেখান যায় না। কিন্তু বোর্ডে শুধু শিক্ষকই অঙ্ক করে দেবেন না ছাত্ররাও অঙ্ক করবে। বোর্ডের কাজে তাদের পরীক্ষা হবে, আত্মপ্রত্যয়ও জন্মাবে।

শ্রেণীকক্ষে বোর্ডের ব্যবহার

ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে। বোর্ড পরিষ্কার রাখবার দায়িত্ব মনিটারের উপর থাকা উচিত। বোর্ডের লেখা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে। বোর্ডের লেখায় অসাবধানতা জনিত ভুল যেন কখনও না হয়। বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লেখা সম্ভব নয়, বোর্ডের লেখা হবে সংক্ষিপ্ত। চিত্র, নক্সা প্রভৃতি আঁকা হলে অন্য বিষয় শুরু করবার পূর্বে বোর্ডের চিত্র মুছে দিতে হবে, না হলে ছাত্রদের মন বিষয়ান্তরে আনা যাবে না। শিক্ষক বোর্ডে যা লিখবেন ছাত্ররা তা খাতায়

শ্রেণীকক্ষে বোর্ড ব্যবহারের কৌশল

লিখে নেবে। লিখবার সময় তিনি বোর্ডে আড়াল করে দাঁড়াবেন না। পিছন ফিরে লিখলে ক্লাসে বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে। বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লেখাই সঙ্গত, তাহলে ক্লাসের উপর নজর রাখা সম্ভব।

॥ তিন ॥ **মানচিত্র ও গ্লোব (Maps and Globe) :**

বহুল প্রচলিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে মানচিত্র ও গ্লোব অন্যতম। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠে মান-চিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। ভূগোলের প্রাথমিক পাঠে পৃথিবী গোলাকার এ সম্পর্কে মুখে অনেক কথা বলে ছাত্রদের যতটুকু বোঝান যাবে একটি গ্লোব সামনে রেখে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলে অল্পকথায় ছাত্ররা বুঝবে। পৃথিবীর একদিকে যখন দিন আরেকদিকে তখন রাত, একথা মুখে শুনে মনে রাখবে, গ্লোবটি সামনে রাখলে চোখে দেখে কানে শুনে মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। উঁচু ক্লাসে আন্তর্জাতিক সীমা রেখা পার হলে জাহাজে একটি দিন কেন এগিয়ে কি পিছিয়ে দেওয়া হয়,—মুখে বলে একথা যেমন বোঝান যায়, তার চেয়ে অনেক সুন্দর করে বোঝান চলে একটি গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্র সামনে রাখলে। দ্রাঘিমারেখা, অক্ষাংশ প্রভৃতির ব্যবহার, দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে কোন একটি স্থানের অবস্থান নির্ণয় এসব বিষয় গ্লোব বা মানচিত্রের সাহায্যে শেখান হলে ছাত্রেরা সহজেই বুঝতে পারে।

কতকগুলি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য মানচিত্র অপরিহার্য

মানচিত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ভূগোল পড়ালে সে পড়া ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র আমরা ব্যবহার করি। দেশের সীমারেখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান, মানচিত্রের সাহায্য ছাড়া ঠিকমত বোঝান যায় না। যে কোন স্থানের অবস্থান জানতে আমরা প্রথমেই মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক মানচিত্র থেকে ছাত্রদের নদী, পাহাড় খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ কোথায় কিরূপ তা বুঝাতে পারি। মানচিত্রে বিভিন্ন রং ও সংকেতের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন ও অবস্থান বোঝান হয়, এর ফলে কোন দেশের কোথায় কি পাওয়া যায় তা বুঝতে ছাত্রদের কষ্ট হয় না। বিদ্যালয়ে শুধু মানচিত্র দেখিয়ে শেখানই হবে না, মানচিত্রের সাহায্যে তাদের অধীত জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শিক্ষক ছাত্রদের ম্যাপে বিভিন্নস্থান, নদ-নদী, পর্বত, খনিজ, কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ স্থান সমূহের নির্দেশ করতে বলবেন। বাড়ী থেকে ছাত্রদের মানচিত্র এঁকে আনতে বলবেন—ছাত্রেরা উৎসাহের সাথে তা করে আনবে—সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে তারা নতুন জিনিস শিখতে পারবে।

মানচিত্র দেখে বা এঁকে অনেক কিছু জানা যায়

ইতিহাস পাঠেও মানচিত্রের সাহায্য অপরিহার্য। ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব পড়াতে গিয়ে যদি ছাত্রদের ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার তাৎপর্য মানচিত্রের সাহায্যে বোঝান না হয় তাহলে তারা ঠিক ভাবে পাঠ আয়ত্ব করতে পারবে না। ভারতের প্রাচীন যুগের কাহিনীতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মগধ প্রভৃতি বহু রাজ্যের নাম রয়েছে, ঐতিহাসিক মানচিত্রের সাহায্যে স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ না করে দিলে ছাত্রেরা বুঝতে পারবে না তাদের কোন দেশের ইতিহাস পড়ান হচ্ছে। ইউরোপের নবজাগরণের ইতিহাস পড়াতে গ্রীস, ইতালী, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি দেশের সাথে যদি ছাত্রদের মানচিত্রের মধ্যদিয়ে পরিচয় করিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। তাই শুধু ভূগোল পাঠে নয় ইতিহাস পাঠেও মানচিত্রের উপযোগিতা একটুও কম নয়।

ইতিহাস শিক্ষাদান ও মানচিত্রের ব্যবহার

॥ ৪ ॥ ছবি (Picture) ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি মনেও তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। তার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে ছবির ব্যবহার তাই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ ছবি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর সময় বিভিন্ন রকম ছবি ব্যবহার করা হয়। নীচু শ্রেণীগুলিতে নানা রঙের ছবি বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক যদি নিজে এঁকে ছবি দেখাতে পারেন তাহলে তাঁর আবেদন সব থেকে বেশি হয়। শিক্ষক বোর্ডেও ছবি এঁকে দিতে পারেন। অন্য কাউকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে তা-ও শ্রেণীকক্ষে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বাজার থেকে কিনে বা সংগ্রহ করেও ছবি সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকেও ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরাও ছবি আঁকতে ও ছবি সংগ্রহ করতে পারে। তার মধ্য দিয়েই তারা শিক্ষাগ্রহণ করবে।

বিভিন্ন ধরনের ছবি উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

॥ ৫ ॥ নমুনা (Specimen) ঃ

অনেকগুলি নমুনা শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন মুদ্রা (coins) ও জীবজন্তুর Specimen শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার আছে। এই জাতীয় উপকরণের অনেকগুলি original, আর অনেকগুলি অনুকৃতি।

মুদ্রা ও জীবজন্তুর নমুনা

॥ ৬ ॥ গ্রাফ (Graph) ঃ

অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, তুলনামূলক তথ্য প্রভৃতির জন্য graph ব্যবহার করা যায়। কতকগুলির ক্ষেত্রে graph অপরিহার্য। বিদ্যালয়ে graph board-এর ব্যবহার আছে। graph চার প্রকারের—

গ্রাফ হিসেবেও তুলনার জন্য ব্যবহৃত হয়

(ক) চিত্রমূলক গ্রাফ (Pictorial Graph)
(খ) স্তম্ভ গ্রাফ (Bar Graph)
(গ) রেখা গ্রাফ (Line Graph)
(ঘ) বৃত্ত গ্রাফ (Circle Graph)

গ্রাফ হিসেবেও তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাই কেবলমাত্র উঁচু শ্রেণীগুলিতেই গ্রাফের ব্যবহার করা হয়।

॥ ৭ ॥ নক্সা ও চার্ট (Diagram and Chart) ঃ

বহু বিষয় আছে যা মুখে বোঝাবার সাথে চার্ট বা নক্সা থাকলে বুঝতে সুবিধা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস পড়াতে যদি চার্টের সাহায্যে বিভিন্ন বছরের ক্রমোন্নতির স্তরগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বছরে কি হারে উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়। শুধু মুখে শোনা পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে যা বোঝান যায় সেই সাথে তুলনামূলক চিত্রের সাহায্যে অল্প কথায় বিষয়বস্তুকে আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলা যায়। বাজারের কেনা নক্সা ও চার্ট ছাড়াও পড়াবার সময় শিক্ষক বোর্ডে চার্ট বা নক্সা তৈরী করে নেবেন। ইতিহাস পাঠে বংশ তালিকা, সময়রেখা (time chart), শাসনতন্ত্র পড়াবার সময় ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, জ্যামিতি পাঠে বিভিন্ন রূপ জ্যামিতিক চিত্র শিক্ষক বোর্ডে আঁকবেন এতে পাঠ বুঝতে ছেলেমেয়েদের সুবিধা হবে।

নক্সা ও চার্টের ব্যবহার

॥ ৮ ॥ মডেল (Model) ঃ

শিক্ষায় চার্ট ও ছবি ব্যবহারের সাথে মডেলের ব্যবহার করা যেতে পারে। মডেল হচ্ছে একটি জিনিসের যথাসম্ভব সঠিক অনুকৃতি। ছবি দেখে কোন একটি জিনিস সম্পর্কে যে ধারণা হয়, মডেল দেখলে সে জিনিস সম্পর্কে ধারণা আরো বাস্তব হয়। নীচের শ্রেণীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা-উপকরণ রূপে মডেলের উপযোগিতা খুবই বেশী। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা যে সব সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করেন তা দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায়, অনেক কিছু শিখতে পারে। মূর্তি গড়তে

মডেলের শিক্ষাগত মূল্য

ছেলেমেয়েরা ভালবাসে। তাদের তৈরী মূর্তি দিয়ে যদি স্কুলে শিক্ষামূলক কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তারা উৎসাহের সাথে সে কাজে অংশগ্রহণ করবে।

॥ ৯ ॥ ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern) ঃ

কিছু বলবার সাথে সাথে বিষয়ানুরাগ চিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে আরো সুন্দর করে শ্রোতার কাছে পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবহার হয়। প্রচারকার্যের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠনের প্রচলন রয়েছে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ রূপেও ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্যবহার সম্ভব। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক স্লাইড (slide) তৈরী করে নিয়ে যদি একটির পর একটি ছবি ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে ছাত্রেরা আনন্দ পায়; তেমনি তারা নতুন বিষয় শিখতেও পারে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকতে পারে, যেমন রুটিন মত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় পড়ান হবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কক্ষেও ঘর অন্ধকার করে মসৃণ দেওয়ালের উপর ছবি ফেলে পড়ান যেতে পারে। আমাদের দেশের স্কুলে এর ব্যবহার নেই কিন্তু দৃশ্যের সহযোগে পড়াবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতিটিকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসেবে ম্যাজিক লণ্ঠনকে ব্যবহার করতে হবে

॥ ১০ ॥ এপিডায়োস্কোপ (Epidioscope) ঃ

এই উপকরণটি ম্যাজিকলণ্ঠনের পরিবর্তিত সংস্করণ। এর জন্য কোন স্লাইডের দরকার হয় না। বইয়ের যে কোন ছবিকে কাগজে এঁকে অন্য কোন ছবিকে বড় করে দেখান যায়। শিক্ষক পড়াবার সময় কোন ছবি বা ডায়গ্রামকে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে বড় করে দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারেন।

॥ ১১ ॥ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র (Newspaper and Periodicals) ঃ

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ঠিক শিক্ষাসহায়ক উপকরণের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এগুলি শ্রেণীশিক্ষার পরিপূরক। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় ও আলোচনা থাকে যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে হলে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের আবশ্যক। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র থাকবে। এইসব পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন reference শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে দিবেন। কখনও কখনও কোন কোন পত্র-পত্রিকাও তার অংশ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষেও নিয়ে যেতে পারেন।

(খ) শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ (Audio Aids) ঃ

কতকগুলি উপকরণ আছে যেগুলির আবেদন কেবলমাত্র কানের থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে এই উপকরণগুলি শিক্ষাকার্য করে। এই জাতীয় উপকরণগুলি হ'ল ঃ—

॥ ১ ॥ রেডিও (Radio) ঃ

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে আধুনিক কালে রেডিও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রেডিও-র মাধ্যমে শিক্ষামূলক আলোচনাসমূহ ছেলেমেয়েদের শোনাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার থেকে বহু স্কুলে রেডিও দেওয়া হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা থেকে দুপুরে বিদ্যার্থী মণ্ডলের আসরে ছেলেমেয়েদের উপযোগী নানা বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। দেশের যে সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে শোনবার কোন সুযোগই দূরের ছেলেমেয়েদের হয় না রেডিয়োর আলোচনার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের পক্ষে তা শোনবার সুযোগ হয়েছে। বেতার কর্তৃপক্ষ ছেলে-মেয়েদের উপযোগী যে সব আলোচনার আয়োজন করেন আমাদের উচিত তার সুযোগ গ্রহণ করা। যদি বেতার কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় প্রোগ্রাম করা হয় তাহলে আলোচনার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে স্কুল রুটিনের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যার ফলে ছেলেমেয়েরা আলোচনা শুনবার সুযোগ পাবে।

রেডিও-র শিক্ষাগত মূল্য

॥ ২ ॥ টেপ রেকর্ডার (Taperecorder) ঃ

এই ব্যয় বহুল শিক্ষা উপকরণটির প্রচলন আমাদের দেশে হয় নি। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উপকরণ। কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য টেপ রেকর্ড করে এনে ছেলেমেয়েদের শোনান যায়। শিক্ষাবিষয়ক কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রেকর্ড করে রেখে পরে তার ব্যবহার করা চলে। ছেলেমেয়েদের পড়া রেকর্ড করে তাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়া, উচ্চারণ শুদ্ধি, গান শেখান প্রভৃতি কাজে টেপ-রেকর্ডের ব্যবহার চলতে পারে। আমাদের দেশেও এই উপকরণটির ব্যবহার সর্ব-ভাবে কাম্য।

॥ ৩ ॥ গ্রামোফোন (Gramophone) ঃ

একটি গ্রামোফোন ও কিছু প্রয়োজনীয় রেকর্ড শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসেবে খুবই কার্যকরী। তবে গ্রামোফোনের ব্যবহার পুরোপুরি শিক্ষামূলক হবে; রেকর্ডগুলিও শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর হবে। আমাদের দেশে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসেবে গ্রামোফোনের ব্যবহার কম; প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক রেকর্ডও নেই।

(গ) দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর উপকরণ
(Audio-Visual Aids) :

এমন কতকগুলি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যেগুলির আবেদন একই সঙ্গে চোখ ও কানের থাকে। শিক্ষার্থীর যুগপথ দৃষ্টি ও শ্রুতি মাধ্যমে এই উপকরণগুলি শিক্ষাকার্যে ব্যবহৃত হয়। এইজাতীয় উপকরণগুলি হ'ল—

॥ ১ ॥ চলচ্চিত্র (Motion Picture) :

চলচ্চিত্রের সচল ও সবাক চিত্র শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যক্ষ আবেদনের সৃষ্টি করে। তার শিক্ষাগত মূল্য অনেক বেশী। বিদ্যালয়ের পক্ষে Film Projecting Machine ক্রয় করা সহজ নয়। শিক্ষা বিভাগ যদি শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র তুলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করে তাহলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণও করতে পারবে। শিক্ষামূলক চিত্র দেখাবার পূর্বে শিক্ষক সে সম্বন্ধে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সিনেমা ব্যবসায়ীরা যদি লাভজনক প্রমোদচিত্র তুলে দু'একখানি শিক্ষামূলক চিত্র তুলে দেশের শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন তার জন্য তাঁদের দায়িত্বশীল হতে হবে।

॥ ২ ॥ টেলিভিশন (Television) :

আমাদের দেশে টেলিভিশনের প্রচলন নেই তাই বর্তমানে শিক্ষা-উপকরণ রূপে এদেশে এর ব্যবহারের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে এর ব্যাপক ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়েছে। রেডিয়োতে শুধু কানে শোনার মাধ্যমে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি, টেলিভিশনে কানে শুনে চোখে দেখে শেখার ব্যবস্থা হলে তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি ছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলি নিঃসন্দেহে শিক্ষার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু তবুও সেগুলিকে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের মধ্যে ফেলা যায় না। সেগুলি হ'ল—

দেওয়াল-পত্রিকা ও নিউজ বুলেটিন
(Wall Magagine and News Bulletin)

খুব অল্প খরচে ছেলেমেয়েদের সহযোগিতায় দেওয়াল-পত্রিকা ও নিউজ-বুলেটিনের ব্যবস্থা স্কুলে করা যেতে পারে। নিউজ-বুলেটিনে দৈনিক সংবাদ-পত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে ছেলেমেয়েদের জানান যেতে পারে, বা কাগজ থেকে প্রধান খবরগুলি কেটে নিউজ-

বুলেটিন তৈরী করা যেতে পারে, 'দৈনিক-সংবাদ' বা 'সাপ্তাহিক-সংবাদ' পরিক্রমা এই পর্যায়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদসমীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা অনেক তথ্য জানতে পারবে।

দেওয়াল-পত্রিকায় ছোট ছোট রেখা আর ছবি থাকবে। যদি প্রতি শ্রেণীর পক্ষ থেকে সম্ভব না হয় স্কুল থেকে মাসে একখানা দেওয়াল-পত্রিকা বের করা যেতে পারে। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা লিখবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যারা আঁকতে পারে তারা সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হবে। নিউজ-বুলেটিন ও দেওয়াল-পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের উপর দেওয়া দরকার। একজন শিক্ষক পরামর্শদাতারূপে থাকবেন। এই দুয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ
(Educational Excursions)

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ছাত্রদের দেওয়া হয় তা পুঁথিগত। পুঁথিনির্ভর বিদ্যা সংকীর্ণ; কারণ এর সাথে বাস্তব জগতের সম্পর্ক থাকে না। এখানে শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্ক না থাকায় সে শিক্ষা কার্যকরী বা ফলপ্রদ হয় না। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা বইয়ে যা পড়ছে, সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যা হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানকে কার্যকরী করে তুলতে হলে দেশ-ভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ করে তুলতে হবে। দেশভ্রমণই শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করে (Travelling makes education perfect)

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমরা জগতকে পাই না। প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহুদূর দেশে যেত, এতে তাদের বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'ত। বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছু সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞানের জন্য দেশ ভ্রমণের উপযোগিতা রয়েছে। দেশ-ভ্রমণে আমরা সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করি। বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে পাঠ্য পুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে বিশাল বিশ্ব রয়েছে, তার সাথে পরিচয় হয় দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে। এতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার হয়, মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীর তা দূর হয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের সাথে আত্মীয়তা বাড়ে।

দেশভ্রমণ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ

দেশভ্রমণের মত একই সাথে শিক্ষা ও আনন্দলাভের উপায় খুব কমই আছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলে ইতিহাসের পাতায় যা পড়েছে তার পরিবেশের মধ্যে প্রাচীনযুগের একটি চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে। নালান্দার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়ালে ইতিহাসের ছাত্র ভারতের অতীত গৌরবের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পায়। আবার আধুনিক যুগের শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশ কি ভাবে এগিয়ে চলেছে তার সাথে বাস্তব পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা ও শিল্প-শহরগুলিতে যে সব কারখানা গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে আনা দরকার। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য সেভাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা এখনও হয় নি।

যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দলাভ

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ছাত্রদের পক্ষেও যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন ভ্রমণের জন্য বিশেষ কিছু খরচ করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্য আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যেভাবে সম্ভব সেইভাবে দেশভ্রমণের পরিকল্পনা করা উচিত। শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনায় অভিভাবকদের সাহায্য ও সহ-যোগিতা যাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। দূরের পথে যেতে হলে যারা যাবে তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন অভি-ভাবকদের কাছ থেকে যাতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় সে চেষ্টা করা দরকার। তাহলে সবার চেষ্টা ও সহযোগিতায় স্কুলের পক্ষে ভ্রমণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

আর্থিক অসুবিধা

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের পিছনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। এজন্য পরিকল্পনা অনুসারে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দেশভ্রমণ পরিকল্পনায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য একই রকম ব্যবস্থা হবে না। নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরিবেশ পরিচিতির। এজন্য তাদের নিজেদের গ্রামের মধ্যে বা নিকটস্থ কোন জায়গায় দর্শনীয় কিছু থাকলে তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। নতুন জিনিস সম্পর্কে কৌতূহল যাতে তারা নিজেরাই মেটাতে পারে সেজন্য তাদের ধীরে ধীরে সুযোগ দিতে হবে। একটু বড় হলে ছেলেমেয়েদের কাছের শহর বা কোন কলকারখানা দেখবার সুযোগ থাকলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বই পড়ে তারা যা শিখেছে এসব দেখে তারা সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। শহরের ছেলেমেয়েদের গ্রাম ও গ্রামের লোকেরা জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিশেষ অজ্ঞতা থাকে; তা দূর করতে হলে শহরের ছেলেমেয়েদের গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া দরকার। গ্রামের ও শহরের স্কুলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময়মূলক ব্যবস্থায় একজাতীয় ভ্রমণের আয়োজন সুষ্ঠুভাবে করা যায়।

দেশভ্রমণের শিক্ষাগত লক্ষ্য

বড় ছেলেমেয়েদের জন্য ঐতিহাসিক স্থান বা বড় শিল্পনগরীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থান নির্বাচনে সে স্থানের গুরুত্ব তার ইতিহাস প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। দেশ দেখতে যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ছাত্রেরা করলে ভাল হয়। এই জাতীয় প্রজেক্টের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রতিটি ভ্রমণ-পরিকল্পনা শিক্ষামূলক ও আনন্দমূলক হবে। ভ্রমণের মধ্যে ছাত্রেরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে বৃহত্তম মানব-সমাজের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। দেহের স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্য, জীবন ও দৃষ্টির প্রসারতার জন্য শিক্ষামূলক দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলে ছাত্রদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

বৃহত্তর মানব সমাজের সাথে পরিচিত

শিক্ষামূলক প্রদর্শনী
(Educational Exhibitions)

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেও তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেককিছু শিখতে পারে, এই জাতীয় প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে।

বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা
(School Museum)

বিদ্যালয়ে যে সংগ্রহশালা থাকবে সেখান থেকেও শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করতে পারবে, এই জাতীয় সংগ্রহশালাতেও শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত উপাদান ও উপকরণগুলি স্থান পাবে।

উপকরণগুলি পাব কোথায় ?
(How to get these aids ?)

উপকরণগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর পর প্রশ্ন আসে, উপকরণগুলি পাব কোথায় ? তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকরণগুলি পাওয়া যায় :—

(১) উপকরণগুলি **প্রস্তুত** করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রস্তুত উপকরণগুলির ব্যবহারিক যোগ্যতা সর্বাধিক। শিক্ষক মহাশয় নিজে যেসব উপকরণ প্রস্তুত করেন তা পাঠদানের উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করেই করেন। কাজেই সেগুলির ব্যবহারিক সাফল্য অনিবার্য। অনেক সময় আবার ছাত্রদের দিয়েও অনেক উপকরণ তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়। শিক্ষক মহাশয় সেখানে পরামর্শদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরই নির্দেশে ও উপদেশে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই উপকরণ তৈরী করবেন

নিজেরাই এগুলি প্রস্তুত করে। এই ধরনের পদ্ধতি অন্যদিক থেকেও লাভজনক। শিক্ষার্থীরা এইসব উপকরণ তৈরী করার মধ্যেও অনেক কিছু শিক্ষালাভ করে। কোন কোন Map, Graph, Chart, Picture ইত্যাদি প্রস্তুত করার সময় শিক্ষার্থীরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করে যা তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিশীল মন থাকে যার বহিঃপ্রকাশ হয় সৃজনশীলতার মাধ্যমে। এই উপকরণগুলি প্রস্তুতের সময় শিক্ষার্থীদের শিল্পী-মন প্রকাশের সুযোগ পায়। উপকরণগুলি প্রস্তুত করার মাধ্যমে শিল্পচর্চা ও শিল্পসাধনা সম্ভব হয়।

(২) অনেক উপকরণ **সংগ্রহ** করা যেতে পারে। সমাজের মধ্যে শিক্ষাদানের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে। কাজেই বিভিন্ন উপকরণ নানাদিক থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ছবি, ম্যাপ, গ্লোব, মডেল, পুরাতন মুদ্রা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে শিক্ষাদানের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন Text Book থেকে অনেক চিত্র, diagram প্রভৃতি বড় করে এঁকে তাকে শিক্ষাদানের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধার করে বা ভাড়া করেও অনেক উপাদান শিক্ষাদানের সময় প্রয়োগ করা যায়।

সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে উপকরণগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে

(৩) বাজার থেকে **ক্রয়** করে নানাবিধ উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের বাজারে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের যোগান (supply) খুব কম। এ ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। সরকারকেও এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত করে বাজারে অল্পদামে সরবরাহ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদান বাড়িয়ে বিদ্যালয়গুলির ক্রয়ক্ষমতা এনে দিতে হবে সরকারকেই। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (পুস্তক ব্যবসায়ী ইত্যাদি) এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারে। তবে তাদের আর্থিকক্ষতির দায়িত্ব দিতে হবে। বাজারে উপকরণগুলির চাহিদা (Demand) বেড়ে গেলে যোগানও বাড়বে। তখন উপকরণগুলি সহজেই পাওয়া যাবে।

বাজারে উপকরণগুলির যোগান খুব অল্প

বাস্তব অবস্থা
(Practical Situation)

সর্বত্রই দেখা গেছে যে, পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োগের কোন সামঞ্জস্য নাই। পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক বড় বড় আদর্শকে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু বাস্তব বড় দৃঢ়। তাই প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলাচ্ছে না। শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলির কথা বলতে গিয়ে আমরা বড়

বড় কথা বলেছি। বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তাই শিক্ষাদানের সময় এই অতি প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অসুবিধা তিনদিক থেকে আসে—

(১) **অর্থের (Money)** :—আজ জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। সর্বত্রই 'নাই-নাই' রব। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আর্থিক অভাবের এই মারাত্মক সংক্রমণের মড়ক থেকে অব্যাহতি পায় নাই। প্রায় প্রতি বিদ্যালয়েই আর্থিক সংকট দেখা যায়। নানা রকম পথ অবলম্বন করেও এই অভাব দূর করা যায় না। শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ক্রয় করতে, ভাড়া করতে ও সংগ্রহ করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। যে সব বিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দিতে পারে না, শ্রেণী পাঠনের জন্য ন্যূনতম কক্ষ যোগান দিতে পারে না,—তারা এই সব শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সংগ্রহ করবে কী ভাবে? অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা তো রীতিমত ব্যয় বহুল ব্যাপার। উপকরণ ক্রয়ের যেটুকু সামর্থ্য থাকে তাও আবার আবশ্যিক বিষয়গুলির উপকরণ ক্রয় করতে খরচ করা হয়।

টাকা দিয়ে উপকরণ কেনবার মত অবস্থা বিদ্যালয়গুলির নাই

(২) **উপকরণের (Aids)** :—অনেক সময় টাকা দিয়েও প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি,—শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রস্তুতের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। শিক্ষা-উপকরণের বাজার খুব ক্ষুদ্র,—যোগানও অল্প। কাজেই এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না।

উপকরণের অভাবও আছে

(৩) **সময়ের (Time)** :—বিদ্যালয়ের সময় তালিকা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রাখে নাই। সেখানে আবশ্যিক বিষয়গুলির প্রচণ্ড ভীড় অতিক্রম করে পাঠদান অগ্রসর হবার পথ পায় না। কোন রকমে course শেষ করতে পারলেই যথেষ্ট। শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করে পড়ালে অধিক সময় লাগে। কাজেই তা সম্ভব নয়,—শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি তো রীতিমত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার!

উপকরণগুলি যথাযথ ব্যবহারের মত সময় সময় তা শিক্ষায় নাই

কাজেই দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করে পাঠদান করা অসম্ভব ব্যাপার। সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দিতেন তো এ সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যেত। আর্থিক অসুবিধা সরকার দূর করতে পারেন। সরকার নিজেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কিছু কিছু শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রস্তুত করতে পারেন। প্রাথমিক ভাবে এ দু'টো বিষয়ে (আর্থিক অনুদান ও উপকরণ প্রস্তুত) সরকার এগিয়ে এলে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহার বেড়ে যাবে। ফলে এইসব উপকরণের

চাহিদাও বেড়ে যাবে। তখন বাজারেও এইসব উপকরণ কিনতে পাওয়া যাবে; কারণ চাহিদা যোগানকে ডেকে আনে।

উপসংহার

আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে, যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন Note-book, Suggestion, Sure Success, Made Easy, Question-answers, Helps to the study of '—' প্রভৃতি বই এর সংখ্যা অনেক, সেখানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের একান্ত অভাব, ব্যাপারটি বাধার বিষয়। শিক্ষা আজ কোন পথে ?

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of audio-visual aids in education. Describe the audio-visual aids that can be commonly used in schools and indicate how some of these can be prepared by the teachers with the help of pupils. (C. U., B. T.—1968, 1970)
2. Point out the advantages and limitations of audiovisual communication as supplement to class-room teaching, with special reference to the radio and film Describe a teaching aid that you have prepared and used successfully in the class room. (Kalyani University, B. T.—1961)
3. Describe the special value of the radio and the film as aids to class-room instruction, and out [illegible] plans for their effective use in our schools. (North Bengal University, B. T.—1968)
4. What are the different types of audio-visual aids used in education and their utility? Give a detailed example of the eye of one such aid. (Jadavpur University, B. T.—1971)
5. Describe briefly two visual aids that you may have used in teaching and one oral aid which may be used effectively in teaching. (C. U., B. T.—1958)
6. Describe the place of audio-visual aids in modern teaching. Discuss with illustrations the psychological effects of such aids on the formative minds of the children. (C. U., B. T.—1965)
7. Write notes on :—
   (a) Psychological effect of the audio-visual aids in teaching. (C. U. B. T.—1966)
   (b) Teaching aids and appliances. (C. U., B. T.—1967)
   (c) Educational Film and the radio as aids to class-room instruction. (C. U., B. T.—1969)

সপ্তম অধ্যায়

পাঠ-পরিকল্পনা
(LESSON PLAN)

আমরা যখন কোন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করি তখন সে কাজটি সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় কাজটি কি—কি করে সম্পন্ন করা সম্ভব, কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে আমাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে ইত্যাদি। কাজে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল আর যে করে হোক কাজটি শেষ করে দিয়ে এলাম তা কখনও ত্রুটি শূন্যভাবে সুসম্পন্ন হয় না। প্রস্তুতি নেই, পরিকল্পনা নেই—এভাবে কোন কাজ হতে দেওয়া আর উদ্দেশ্যহীন নৌকা চালানো একই কথা।

পাঠ-পবিকল্পনা কি

শিক্ষকের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব রয়েছে তা হচ্ছে শ্রেণী-পাঠনা (Class Teaching)। চিরাচরিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক সামনে বই রেখে উপস্থিত মত কিছু বলে আসেন, ছাত্র নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মত মুখ বুজে বসে থাকে—কতটুকু শোনে বলা কঠিন। এই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে, কারণ এতে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না। তাই শ্রেণী পাঠনার দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করতে হলে শিক্ষকের একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। একবছরে তিনি যতটা পড়াবেন সেই সমগ্র বিষয়টি বিভিন্ন ইউনিটে (Unit) ভাগ করে নিয়ে তিনি দিনে কতটা পড়াবেন এ সম্পর্কে তিনি একটি ছক তৈরী করে নেবেন। **তাঁকে স্থির করতে হবে, তিনি কি পড়াবেন, কি ভাবে পড়াবেন, পড়াবার সময় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে ও তিনি যা বোঝাবেন তা হৃদয়গ্রাহী হবে।** শিক্ষকের এই প্রস্তুতির মধ্যে থাকবে একটা ধারাবাহিকতা। সারা বছরের কাজ ছোট ছোট অংশে (unit) ভাগ করে তিনি রোজকার পাঠ পরিচালনা করবেন। **সুষ্ঠুরূপে দৈনন্দিন শ্রেণীশিক্ষা পরিচালনার জন্য এই যে প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা এরই লিখিত রূপকে বলা হয় পাঠটীকা বা পাঠ-পরিকল্পনা।**

পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
(Utility of Planning Lessons)

শিক্ষকের জন্য একটি বিষয় শিক্ষা দেবার নির্দিষ্ট সময় (period) নির্ধারিত রয়েছে সেই পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যখন কোন একটি বিষয় শিক্ষা দেবেন তখন তাঁকে **এমন ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে যাতে**

তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে দিনের পাঠ শেষ করতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা কালে তিনি মনে রাখবেন যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সেই **শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠ সম্পর্কে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে ;** তা না'হলে সেদিনের পড়া তাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না। আজকের দিনে শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক বলবে, শিক্ষার্থী শুনে যাবে। শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (bipolar process)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন ভাবে পাঠ পরিচালনা করবেন যাতে তারাও সমভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাঠে শিক্ষক সাহায্য-কারীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন কারণ শিক্ষা-রঙ্গমঞ্চের নায়ক শিশু। তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবার কৌশল জানা না থাকলে তাদের পাঠে উৎসাহী করা সম্ভব হবে না। শিক্ষণীয় বিষয় যদি নীরস হয় তবু তাকে যথাসম্ভব আনন্দমধুর করে তোলবার চেষ্টা পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে করতে হবে। পাঠ-পরিচালনার সময় ছাত্রেরা শুধু কান দিয়ে শুনবে কিন্তু সেই সাথে চোখ দিয়ে দেখে বিষয়টি যাতে আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারে, দরকার হলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। **পাঠ পরিকল্পনার সাথে আমাদের ভাবতে হবে বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তুলতে বর্ণনার সাথে কি শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা যায়।** পড়াবার সময় শিক্ষার্থীর একাধিক ইন্দ্রিয় যাতে সক্রিয় হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকার জন্য পাঠ-টীকার প্রয়োজন

পাঠ-পরিকল্পনাকালে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার মধ্যে যেন অযথা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ না পায়। **যে শ্রেণীর পাঠটীকা রচনা করা হবে সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করে তাদের উপযোগী পাঠটীকা রচনা করবেন।** একদিনের প্রচেষ্টায় কতটুকু তাদের শেখান যেতে পারে বা কতটুকু তারা বুঝতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বধারণা না থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকলে এমন কোন বিষয় শিক্ষক অবতারণা করবেন না যা ছেলেমেয়েদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে।

পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের অনুযায়ী করতে হবে, শিক্ষকের পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়

শিক্ষক যদি পাঠটীকা রচনা না করে শ্রেণীতে যান তাহলে তাঁর সামনে পাঠের কোন স্থির লক্ষ্য থাকবে না। তিনি কোন দিকে নিয়ে যাবেন, তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য কি এসম্পর্কে ধারণা করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠ অনুসরণ করতে পারবে না। পূর্ব-পরিকল্পনার অভাবে পাঠে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পাঠটীকা না থাকলে পাঠদান লক্ষ ভ্রষ্ট হবে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই সব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজন। কোন বিষয় কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তা পূর্ব-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে শ্রেণী-শিক্ষার অনেক ত্রুটি অপসারণ করা যায়।

শ্রেণী-শিক্ষাকে ত্রুটি মুক্ত করতে পাঠটীকার প্রয়োজন

পাঠটীকা শিক্ষককে শ্রেণী পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সমাধা করতে অনেক সাহায্য করে। শিক্ষক তাঁর সময় সূচী অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। তাঁর কাজকর্মকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপের মাধ্যমে নির্ধারিত করতে পারেন। তাতে তাঁর শিক্ষাদান কার্য সুসম্পন্ন করার অনেক সুবিধা হয়। পূর্ব থেকে পাঠ পরিকল্পনা থাকার ফলে পাঠদানে শিক্ষকের আত্মপ্রত্যয়ও বাড়ে।

শিক্ষকের সুবিধা

পাঠ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে শিক্ষক যখন একটি পাঠটীকা রচনা করেন তখন তিনি পূর্বেই স্থির করতে পারেন পাঠকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে কি কি শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন, কোন কোন বিষয় উপস্থাপন সম্ভব, অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ সম্ভব কি না ইত্যাদি। শিক্ষার মত একটি জটিল কাজকে সুসম্পন্ন করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীতে যেতে হবে। শিক্ষকের প্রস্তুতির বাস্তব রূপায়ণ হয় পাঠটীকার মাধ্যমে। **বিষয়বস্তু শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে থাকলেই সর্বদা সার্থক পাঠটীকা রচনা করা সম্ভব নয়।** কিভাবে আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠটীকা রচনা করা যায় এ বিষয়ে আমাদের হার্বার্ট পথ দেখিয়েছেন।

শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠটীকা প্রয়োজন

বিভিন্ন ধরনের পাঠ
(Types of Lessons)

মানুষের মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনুযায়ী পাঠকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। **এই তিন ধরনের পাঠের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান।**

(১) জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lessons)

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অধিকাংশই জ্ঞানমূলক পাঠের অন্তর্ভূক্ত। যে পাঠে জ্ঞান ও তথ্য নির্ভর তাকে জ্ঞানমূলক পাঠ বলে। ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা জীববিদ্যা গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বগত অংশ জ্ঞানমূলক পাঠের অন্তর্গত।

(২) রসানুভূতিমূলক পাঠ (Appreciation Lessons)

কবিতা, গল্প, সংগীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতি যে বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর অনুভূতি-প্রবণ মনে আবেদন সৃষ্টি করে সেগুলিকে রসানুভূতি মূলক পাঠ বলে। মানুষের

মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে (Fine Sentiments) বিকশিত করতে ও প্রক্ষোভজনিত তৃপ্তি (Emotional Satisfaction) সাধনে রসানুভূতিমূলক পাঠেও জ্ঞানের বিষয় থাকতে পারে।

(৩) দক্ষতামূলক পাঠ (Skill Lessons)

শিক্ষার্থীদের কতকগুলি বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হ'ল দক্ষতামূলক পাঠের উদ্দেশ্য। লেখা, পড়া, আঁকা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোলের ব্যবহারিক অংশগুলি (Practical works) ইত্যাদি দক্ষতামূলক পাঠের অন্তর্ভুক্ত,। এই ধরনের পাঠ শিক্ষার্থীদের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বাড়ে। ফলে পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বাড়ে। শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

হার্বার্তের পঞ্চ সোপান
(Herbart's Five Steps)

হার্বার্তের শিক্ষাদর্শন

হার্বার্ত বলেন, জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শূন্য। প্রকৃতি ও সমাজের সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। মনের দুটি ক্ষমতা থাকে,—একটি হচ্ছে পরিবেশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে উপস্থাপিত উপকরণগুলিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (Perception)। আর একটি হচ্ছে উপলব্ধিগুলিকে আয়ত্ব করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ক্ষমতা (Assimilation)। পুরাতন পূর্বসঞ্চিত ধারণা ও চিন্তার প্রয়োগ করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে নিত্য-নতুন ধারণা মনের আয়ত্ব হয়। এই আয়ত্বকরণকে বলা হয় সমবেক্ষণ (Apperception)। **এই পুরাতন ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার আয়ত্বীকরণ অর্থাৎ সমবেক্ষণ-বাদের উপরেই হার্বার্তের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত।** পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ দ্বারাই নতুন জ্ঞান লাভ হয়। হার্বার্তের মতে শিশুকে যে নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় করান হবে সেই জ্ঞানকে তার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া চাই। নতুন বিষয় আয়ত্ব করার উপযুক্ত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি (apperceptivemass) শিশুর আছে কি না। **শিশুর জানা বিষয়ের সাথে সম্বন্ধিত করে নতুন বিষয়ের উল্লেখ করলেই নতুন বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হবে।** তাই নতুন পাঠ শুরু করার পূর্বে শিক্ষককে সেই নতুন পাঠের সঙ্গে সুকৌশলে ছাত্রের আয়ত্বীকৃত পুরাতন জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। তাহলে নতুন জ্ঞান আয়ত্ব করা শিশুর পক্ষে সহজ হবে।

হার্বার্ত বলেন, আমাদের মনে কোন ধারণা গঠিত হতে হলে দুটি ব্যাপার ঘটে। প্রথমে কোন বস্তুর মূর্তি মনের সামনে আসে, মন তখন তাতে নির্দিষ্ট

হয়। একে বলা হয় মনোনিবেশ (concentration)। তারপর নতুন বস্তুটির সঙ্গে পূর্বসঞ্চিত আয়ত্তীকৃত ধারণার সংযোগ হয়ে মনে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। কোন বস্তুর প্রতি মন নিবিষ্ট হলে বস্তুটি মনের সামনে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুটি যতই মনে সুস্পষ্ট হতে থাকে ততই মনের পূর্বসঞ্চিত ধারণাগুলির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটতে থাকে এবং ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে মিশে যেতে থাকে। চিন্তাবৃত্তে (circle of thought) পড়লেই মন নতুন ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের পূর্বসঞ্চিত একই ধারণাগুলির সঙ্গে এক শ্রেণীর করে রাখে। তারপর প্রয়োজন মত বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সেই ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে হার্বার্টের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শিক্ষা প্রক্রিয়ার স্তর হচ্ছে:—

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে হার্বার্টের চারটি স্তর

(১) **সুস্পষ্টতা** (Clearness)
(২) **সংযোগ** (Association)
(৩) **শ্রেণীভুক্তকরণ** (Classification or Systematisation)
(৪) **প্রয়োগ-পদ্ধতি** (Method)

হার্বার্টের এই শিক্ষাতত্ত্বের চারটি স্তরকে তাঁর অনুগামীরা কিছুটা পরিবর্তিত করে পাঁচটি সোপানে দাঁড় করান। **সুস্পষ্টতা (clearness) স্তরটি শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরটিকে ভেঙ্গে জিলার (Zeiller), আয়োজন (Preparation) ও উপস্থাপন (Presentation) এই দু'টি অংশে ভাগ করেন।** হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বকে অনুসরণ করে তাঁর অনুগামীরা যে **পঞ্চ সোপান শিক্ষাপদ্ধতির (Five formal steps of Instruction)** সৃষ্টি করেন। তাঁর পাঁচটি সোপান হচ্ছে:—

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁর অনুগামীরা পাঁচটি স্তরের কথা বলেন

(১) **প্রস্তুতি বা আয়োজন** (Preparation)
(২) **উপস্থাপন** (Presentation)
(৩) **তুলনা** (Comparison)
(৪) **সূত্র গঠন** (Generalisation)
(৫) **প্রয়োগ ও অভিযোজন** (Application)

(বিস্তারিত আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)

হার্বার্ট নির্দেশিত আদর্শকে গ্রহণ করে বর্তমানে পাঁচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবর্তিত করে বর্তমানে পাঠটীকা রচিত হয়। এই তিনটি সোপান হচ্ছে (১) **আয়োজন (Preparation), (২) উপস্থাপন (Presentation) (৩) অভিযোজন (Application)। হার্বার্টের পঞ্চ সোপানের তুলনা ও সূত্রগঠন এই দু'টি সোপান উপস্থাপনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।**

সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমানে তিনটি স্তরকে স্বীকার করা হয়েছে

শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য হার্বার্ত নির্দেশিত পঞ্চ সোপান পদ্ধতি নীতিগত ভাব গ্রহণ করে পাঠটীকা রচনার প্রণালী বর্তমানে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হলেও এই পদ্ধতির কয়েকটি ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।

অসুবিধা
(Defects)

আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যক্তিমুখীন। ব্যক্তিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে প্রতিটি শিশুর শক্তি, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করাকেই শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা বলা হয়। পূর্বকল্পিত পাঠটীকায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পূর্ব-ধারণাকে কাজে লাগান। শিক্ষক শ্রেণীগত ভাবে পাঠটীকা রচনা করেন। ব্যক্তিমুখীন শিক্ষায় যে ভাবে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা করা হয়, এখানে তা সম্ভব নয়। পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতির মূলভিত্তি হার্বার্তের শিক্ষাদর্শন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীগণ মনের গঠন ও ধারণা করার শক্তি সম্পর্কে হার্বার্তের মতবাদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না।

পাঠটীকার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে রক্ষা করা যায় না

পাঠটীকা-নির্ভর পাঠে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় না।

পাঠটীকায় শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান

এ পদ্ধতিতে যে ভাবে পাঁচটি সোপানের মধ্যে বিষয়কে সীমাবদ্ধ করে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে শিক্ষার মত একটি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা ও যান্ত্রিক (Mechanical) হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চসোপান-পদ্ধতি শিক্ষকের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। এই পদ্ধতিকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঁচটি সোপানকে যথাযথ অনুসরণ করে পড়ান সম্ভব নয়।

পাঠটীকায় শিক্ষাদান কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়

শিক্ষকের কর্তব্য
(Duties of the teacher)

শ্রেণীশিক্ষার বহু দোষ ত্রুটি জেনেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষাকে যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করার জন্য হার্বার্তের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়। পাঠটীকা রচনায় ও পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক যতটা সম্ভব ছেলে-মেয়েদের সহযোগিতায় তাদের প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব করেছে একথা বলা

শিক্ষক পাঠটীকার দোষ ত্রুটিগুলিকে রোধ করার চেষ্টা করবেন

ঠিক নয়। পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাঠামোটিই স্থির করে দেওয়া হয়েছে। যোগ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানকালে তাঁর প্রয়োজনমত পাঠটীকার পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের সব প্রশ্নই পাঠটীকার পরিকল্পিত পথ ধরে যাবে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের স্বাধীনতা আছে। পাঁচটি সোপান অনুসরণ সম্ভব নয় বা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই বলেই বর্তমানে তিনটি সোপানের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও শ্রেণীশিক্ষা-ব্যবস্থায় হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতাকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

পাঠটীকা প্রস্তুত প্রণালী
(Planning a lesson)

পাঠটীকা হবে শ্রেণীর উপযুক্ত—

কোন একটি বিষয়ের পাঠটীকা রচনার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমেই তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোন শ্রেণীর জন্য পাঠটীকা রচিত হচ্ছে। শ্রেণীভেদে ছাত্রদের বয়স ভেদ হয়, গ্রহণের শক্তির তারতম্য হয়। অনেক সময় একই কবিতা বা গদ্যাংশ উঁচু ও নীচু শ্রেণীতে পড়ান হয়—পাঠটীকা রচনায় শ্রেণীর কথা বিবেচনা করতে হবে। তারপর সময়—আমাদের অনেক কিছু বলার থাকতে পারে কিন্তু সময় মাত্র ৪০ মিনিট। তাই এমন ভাবে পাঠটীকা রচনা করতে হবে যাতে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করা যায়। কোন ঋতুতে পাঠদান হচ্ছে তা খেয়াল রাখতে হবে, কারণ ঋতু অনুযায়ী পাঠদান ভিন্ন রকম হবে।

শ্রেণী, বয়স, সময় ও ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠটীকা রচিত হবে

পাঠটীকা প্রস্তুতের সময় অনেকগুলি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে। কখন কখন কোন কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে তার উল্লেখ পাঠটীকায় রাখতে হবে। কখন কোন প্রশ্ন করা হবে তার পরিকল্পনাও পাঠটীকায় থাকবে। কোথায় কোথায় বোর্ডের ব্যবহার করা হবে, কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হবে, কোথায় কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা পাঠটীকায় উল্লেখ করা থাকবে। শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা পাঠটীকায় থাকবে। পাঠটীকায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করার ও তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা থাকবে।

পাঠটীকায় বিভিন্ন শর্ত

উদ্দেশ্য (Aim)—

ছেলেমেয়েদের কি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তা আগে থেকেই স্থির করে নিতে হবে। শুধু বিষয় স্থির করলেই চলবে না, কোন বিষয়ের কতটুকু পাঠ

দেওয়া হবে, সেদিনকার বিশেষ পাঠ কি সে সম্পর্কে ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে। পাঠের উদ্দেশ্য কি তা স্থির করে পাঠপরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে নির্দিষ্ট যে পাঠ তারা গ্রহণ করছে তার লক্ষ্য কি? সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে না রেখে কোন বিষয়ের পাঠ শুরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে না তাদের সামনে প্রতিপাদ্য বিষয় কি? পাঠটীকা লক্ষ্যে পৌঁছাবার দিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হবে। পাঠের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভেদে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠপরিচালনার রূপ ভিন্ন হবে। জ্ঞানমূলক পাঠ (knowledge lesson) এবং রসানুভূতিমূলক পাঠের (appreciation lesson) উদ্দেশ্য একরকম হতে পারে না। উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠ পরিচালিত হবে এবং সেই ভাবেই পাঠটীকা রচিত হবে। পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে। কোন পরিকল্পনা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না, পাঠদানও উদ্দেশ্যবিহীন নয়, পাঠপরিকল্পনাও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। পাঠপরিকল্পনার উদ্দেশ্য দু'রকমের হয়,—মুখ্য ও গৌণ। পাঠদানের মাধ্যমে আশু যে ফল লাভ করা যায় তাকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলে, আর গৌণ উদ্দেশ্য হ'ল সুদূর প্রসারী। গৌণ উদ্দেশ্যগুলির চরিত্রের গুণ হিসেবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

পাঠপরিকল্পনা উদ্দেশ্যহীন হবে না

উপকরণ (Aids)—

শুধুমাত্র শিক্ষকের মুখে শুনে ছেলেমেয়েদের তৃপ্তি হয় না। তাই পাঠকে সব দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কানে শোনার সাথে চোখে দেখার কি কি সরঞ্জাম ব্যবহার করা যেতে পারে তাও পূর্বে স্থির করে নিতে হবে। যে সব শিক্ষ-উপকরণ পাঠকালে ব্যবহৃত হবে পাঠটীকায় তার উল্লেখ থাকবে। এই সব শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি (Teaching Aids) দু' রকমের—সাধারণ ও বিশেষ। চক, ডাস্টার প্রভৃতি উপকরণগুলি প্রতি বিষয়ের জন্য প্রতি শ্রেণীতেই লাগে। আর মানচিত্র, ছবি, মডেল, গ্রাফ ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হয়।

পাঠদানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি প্রয়োজনীয়

প্রস্তুতি (Preparation)—

পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তুত করা এক কঠিন কাজ। আয়োজন বা প্রস্তুতির উপর পাঠ পরিচালনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়, তারা যদি নতুন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী না হয় তাহলে তাদের পড়াবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ও যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান কতটা আছে শিক্ষক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে তা জেনে নেবেন। পূর্বজ্ঞান

পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ও আগ্রহ সৃষ্টি পাঠ-প্রস্তুতির অঙ্গ

পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রশ্ন করে সেদিনকার নতুন পাঠের সাথে পুরাতন অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করে দেবেন। যদি বিষয়টি নতুন হয় তাহলে বিষয়ানুগ প্রশ্ন করে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে একই শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রের পূর্বজ্ঞান ঠিক একই রকম নাও হতে পারে। তাই প্রস্তুতি পর্বে আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। আগ্রহ সঞ্চার করতে শিক্ষক কি পন্থা অবলম্বন করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষক তাঁর স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য নেবেন।

পাঠ ঘোষণা (Announcement of day's lesson)—

পাঠের উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনকে নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহণে প্রস্তুত করে—তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। এর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ঠিক জানা ছিল না কি নিয়ে আলোচনা হবে, পাঠঘোষণার পর পাঠ একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হবে।

পাঠটীকা ও পাঠঘোষণা

উপস্থাপন (Presentation)—

পাঠ শুরু হলে শিক্ষক ধীরে ধীরে বিষয় বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবেন। পাঠের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পর্বে (unit) ভাগ করা যেতে পারে। শিক্ষক ধারাবাহিক ভাবে একটির পর একটি পর্ব বা অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করবেন। বিষয় বস্তু ভেদে (জ্ঞানমূলক, রসানুভূতিমূলক, দক্ষতামূলক) পাঠ উপস্থাপনের রীতি-পদ্ধতি ভিন্নরূপ হবে। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা জ্ঞানমূলক পাঠে যে ভাবে করা হবে রসানুভূতিমূলক পাঠে সে ভাবে করা হবে না। উপস্থাপন পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করা হবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। উপস্থাপনই হচ্ছে পাঠটীকার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়। এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে। পাঠদানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষক সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন পর্যায়ে পাঠদান করবেন। এই পর্যায়ে শিক্ষকের পাঠদান ও বিষয়বস্তুর পরিবেশন নৈপুণ্যের উপর পাঠদানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করছে।

উপস্থাপন পাঠটীকার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

অভিযোজন (Application)—

নির্দিষ্ট পাঠ আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং যতটুকু বুঝতে পেরেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কি না জানবার জন্য আলোচ্য বিষয় থেকে শিক্ষক কতকগুলি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের অধীত বিদ্যাকে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে ছেলেমেয়েদের পাঠ

অভিযোজনে ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়

আয়ত্ত হয়েছে। এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের অধীত জ্ঞানের ভিত্তিও দৃঢ় হয়।

বোর্ডের কাজ (Board Work)—

শ্রেণীতে যে পাঠ আলোচনা হ'ল তার কঠিন অংশ বা আলোচনার সারাংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেবেন। বোর্ডে লিখিত অংশ শিক্ষার্থীরা লিখে নেবে।

বোর্ডের কাজে ছাত্রদের সহযোগিতা

বাড়ীর কাজ (Home Task)

পাঠ শেষ হলে বাড়ীর জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া হবে। বাড়ীর কাজের মধ্যে যেন বৈচিত্র্য থাকে। যেমন আকবরের সম্পর্কে আলোচনার পর বাড়ী থেকে যা পড়ান হ'ল তা সংক্ষেপে লিখে আনতে বলা চলে কিন্তু বাড়ী থেকে আকবরের রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে একখানা ভারতের মানচিত্র এঁকে আনতে বলা ভাল।

বাড়ীর কাজ বৈচিত্র্যময় হবে

পাঠটীকা প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা থেকে আমরা নিম্নরূপ একটি পাঠটীকার কাঠামো তৈরী করতে পারি।

পাঠ-পরিলেখ

তারিখ—

বিদ্যালয়ের নাম— বিষয় :—

শ্রেণী— পাঠক্রম :—

ছাত্র সংখ্যা— বিশেষপাঠ :-

গড় বয়স—

সময়—

শিক্ষক— আজকের পাঠ :-

উদ্দেশ্য— প্রত্যক্ষ

পরোক্ষ

উপকরণ—

প্রস্তুতি—

পাঠ ঘোষণা—

উপস্থাপন—

বোর্ডের কাজ—

অভিযোজন—

কাজ—

পাঠ-পরিলেখ ঃ

বিদ্যালয়—রামজয়শীল শিশু পাঠশালা
শ্রেণী—সপ্তম 'খ'
ছাত্রীসংখ্যা—৪০ জন
গড় বয়স—১১ বছর+
সময়—৪০ মিঃ
তারিখ—৮ ৯.৬৮
শিক্ষিকা—সন্ধ্যা মজুমদার এম-এ. বি.টি.

বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশেষ—দ্রুতপাঠ
সাধারণ পাঠ—'বেহুলা'
পাঠক্রম— * বেহুলা কর্তৃক লখিন্দরের জীবন আনয়ন এবং মর্তে মনসাদেবীর পূজা প্রচার
* অদ্যকার পাঠ—ঐ

উদ্দেশ্য **মুখ্য** ঃ—বেহুলা গল্পের বিষয়বস্তু যথাযথ অনুধাবনে এবং দ্রুত পঠনে ছাত্রীদের সহায়তা করা।

গৌণ ঃ—গল্প পাঠে এবং সাহিত্যে ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

প্রস্তুতি ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার্থে এবং অদ্যকার পাঠে তাদের মনকে আগ্রহশীল করে তোলবার জন্য শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন ;—

(১) লখিন্দরের বিবাহ-বাসর কেন লোহার তৈরী করা হয়েছিল ?

(২) মনসা লখিন্দরকে সর্পদংশন করালেন কেন ?

(৩) মৃত স্বামীকে বাসর ঘরে দেখে বেহুলা কি করলেন ?

পাঠসংজ্ঞাপন আজ আমরা স্বামীর জীবন আনয়নের জন্য বেহুলার স্বর্গলোকে যাত্রা এবং মনসার মর্তে পূজা প্রচার সম্বন্ধে পড়ব।

উপস্থাপন ঃ শিক্ষিকা অদ্যকার পাঠ্যাংশটুকু শ্রেণীর সকল ছাত্রীদের দ্রুত পাঠ করতে বলবেন। পাঠের সময় যাতে ছাত্রীরা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করতে পারে সেজন্য শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী বোর্ডে লিখে দেবেন। ছাত্রীরা বোর্ডের প্রশ্নের ভিত্তিতে অদ্যকার পাঠ্যাংশটুকু নীরবে দ্রুত পাঠ করবে। ছাত্রীরা যখন নীরবে পাঠ করবে, তখন শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রীদের নির্ভুল পঠনে এবং কঠিন শব্দের অর্থগ্রহণে সহায়তা করবেন।

(১) বেহুলা স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবার প্রতিজ্ঞা করলেন ?

(২) বেহুলা লখিন্দরের দেহকে কোন পথে ও কিসে করে নিয়ে যাত্রা করলেন ?

(৩) গাঙুরের জলে ভাসতে ভাসতে বেহুলা কি ঘটনা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন ? বেহুলার আশ্চর্য হওয়ার কারণ কি ?

(৪) নেতা ধোপানীকে বেহুলা কিসের জন্য অনুরোধ করলেন ?

(৫) বেহুলা স্বর্গে গিয়ে কি করলেন ?

(৬) বেহুলার নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে মনসা কি করলেন ?

(৭) স্বামীর প্রাণ, শ্বশুরের চোদ্দ ডিঙ্গা ফিরে পেয়ে বেহুলা কাকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন বললেন ?

অভিযোজন ঃ ছাত্রীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন ;—

(১) বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে কি করে স্বর্গে পৌঁছালেন ?

(২) তিনি কিভাবে মনসাকে সন্তুষ্ট করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন ?

(৩) চাঁদসদাগর মনসার পূজো শেষ পর্যন্ত করলেন কেন ?

বাড়ীর কাজ ঃ বাড়ী থেকে অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার ছাত্রীদের লিখে আনতে বলা হবে।

পাঠ-পরিলেখ

তারিখ—৮.৮ ৬৮ বিষয়—বাংলা কবিতা

বিদ্যালয়—ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি পাঠপরিচয়—'জন্মভূমির প্রতি'

শ্রেণী—সপ্তম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ছাত্রী সংখ্যা—৫০ পাঠক্রম * (১) রেখো মা দাসেরে মনে ... জীবন নদে।

গড় বয়স—১১+বৎসর

সময়—৪৫ মিঃ (২) 'কিন্তু যদি রাখ মনে' হইতে শেষ।

শিক্ষিকা—জ্যোৎস্না দাস এম.এ.বি.টি. নির্দিষ্ট পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ।

উদ্দেশ্য ঃ **মুখ্য** ঃ—রসসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে চিন্তা, কল্পনা ও ভাববৃত্তির বিকাশ সাধন করে অদ্যকার পাঠ ও বিষয়ের সারমর্ম গ্রহণ ও কবিতার রসাস্বাদনে ছাত্রীদের সাহায্য করা।

গৌণ ঃ—ভাষাজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ও কবিতা পাঠে ছাত্রীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

উপকরণ ঃ কবিতার লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি ছবি।

আয়োজন ঃ যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রীদের মনকে পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য এবং কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাদের মনে অনুরাগ সঞ্চারের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে ঃ—

(১) "নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি"—এই লাইনটি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে ?

(২) বঙ্গভূমিকে জননী বলা হয়েছে কেন ?

(৩) এই কবিতাটি কোন কবির লেখা ?

(৪) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির নাম বলতে পার ?

(৫) মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুই একখানা কাব্য গ্রন্থের নাম বলত ?

পাঠঘোষণা ঃ আজ আমরা কবি মধুসূদন দত্তের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে জননী বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ্য করে লেখা "জন্মভূমির প্রতি" কবিতাটি পড়ে রসাস্বাদন করব।

উপস্থাপন ঃ (ক) এবার আবেগানুভূতির সাথে ছন্দ, যতি ও ছেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র কবিতাটির একটি রসমধুর পাঠ দেওয়া হবে। এই পাঠ ছাত্রীদের মনে কতটা রেখাপাত করেছে জানবার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে ;—

(১) "রেখো মা দাসেরে মনে—দাস বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন ?

(২) মনে রাখবার কথা কবি কেন বলেছেন ?

(৩) 'মা' বলে কবি কাকে সম্বোধন করেছেন ?

(খ) এবার ছাত্রীদের বুঝবার সুবিধার জন্য কবিতাটির প্রথম অংশ পাঠ করে শোনান হবে। কঠিন শব্দের অর্থ ও কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্রীদের সহযোগিতায় আলোচনা কালে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি করে ছাত্রীদের মন পাঠে নিবদ্ধ রাখা হবে ;—

প্রথম অংশ—"রেখো মা দাসেরে মনে······জীবন নদে"

(১) "সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—"

(ক) কবির মনের কি কি সাধ ছিল ?

(খ) পরমাদ বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

(২) 'মন কোকনদে"—কথাটির অর্থ কি ?

(৩) কাহার মনকে কোকনদ বলা হয়েছে ?

(৪) 'মধুহীন করোনা'—কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ?

এবার ছাত্রীদের কয়েকজনকে কবিতাটি পড়তে বলা হবে ও প্রয়োজন হলে পাঠ সংশোধন করে দেওয়া হবে।

বোর্ডের কাজঃ ছাত্রীদের সহোযোগিতায় কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যা বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ও তাদের নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

অভিযোজনঃ নবলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য ও পঠিত কাব্যাংশটি ছাত্রীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কি না জানবার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন তাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে ;—

(১) কবি জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন কেন ?

(২) "জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়"

(ক) এই লাইনটিতে কি বোঝান হয়েছে ?

(খ) কেন কবি এই লাইনটি রচনা করেছেন ?

(৩) 'অমর কে কোথা কবে ?'

(ক) পৃথিবীতে অমরতা লাভের কি উপায় ?

বাড়ীর কাজঃ আবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের বাড়ী থেকে পঠিত অংশ মুখস্থ করে আনতে বলা হবে।

পাঠ-পরিলেখ

বিদ্যালয়—লেক বালিকা বিদ্যালয়
শ্রেণী—সপ্তম 'খ'
ছাত্রী সংখ্যা—৪৫
গড় বয়স—১১+বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—৮।১০।৬৮
শিক্ষিকা—বিভা চৌধুরী এম. এ. বি. টি

বিষয়—ভূগোল
বিশেষ বিষয়—আগ্নেয় গিরি
পাঠক্রম—(১) * আগ্নেয় গিরির গঠন
(২) * অগ্ন্যুৎপাতের কারণ
(৩) অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল
অদ্যকার পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্যঃ **প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যঃ**—আগ্নেয়গিরির গঠন ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা।

পরোক্ষ উদ্দেশ্যঃ—ছাত্রীদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা ও ভূগোল পাঠে আগ্রহের সৃষ্টি করা।

উপকরণঃ আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে অঙ্কিত চিত্র।

আয়োজনঃ ছাত্রীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করার জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজন বোধে পূর্বজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

(১) পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কিরূপ পদার্থ দ্বারা গঠিত ?

(২) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উত্তপ্ত কেন ?

(৩) ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত পদার্থ কোন কোন উপায়ে ভূ-ত্বকের উপরিভাগে আসে ?

(৪) মাঝে মাঝে পৃথিবীর উপরিভাগ কেন কাঁপে ?

(৫) ভূ-কম্পনের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে কি কি পরিবর্তন ঘটে ?

পাঠ ঘোষণা : আজ আমরা 'আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ' সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উপস্থাপন

বিষয় "১"—পৃথিবী এককালে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত ছিল। ভূ-ত্বকের উপরিভাগ কঠিন ও শীতল হলেও উহার অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। উপরের প্রস্তর, মাটি ইত্যাদির চাপে ভিতরের দ্রব্য তরল অবস্থায় পরিণত হতে পারে না। যদি কোন কারণে উভয়ের চাপ হ্রাস পায় তাহলে উহা গলে যায় এবং ভিতর হতে গলিত পদার্থ জলীয় বাষ্প (উহাকে ম্যাগমা বলা হয়) ভূ-ত্বক ফাটিয়ে উপরে ওঠে এবং স্তরে স্তরে জমে পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে।

পদ্ধতি "১"—আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র পাঠটি চারটি অংশে বিভক্ত করা হবে। শিক্ষিকা প্রয়োজনমত এঁকে দেখাবেন।

(১) পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল।

(২) পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগ কিরূপ ?

(৩) ভূ-অভ্যন্তরের প্রস্তর মাটি ইত্যাদি কেন গলিত হতে পারে না ?

(৪) ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ কি করে ভূত্বকের উপরে আসে ?

(৫) 'ম্যাগমা' কাকে বলে ?

(৬) আগ্নেয়গিরি কিরূপে সৃষ্টি হয় ?

বিষয় "২"—ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থ যখন উপরে আসে তাকে লাভা বলে। ভূ-পৃষ্ঠের এক গোলাকার ছিদ্র দিয়া এই লাভা বাহির হয়। একে আগ্নেয়গিরি-মধ্যস্থ নালী বলা হয়। নলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে গলিত পদার্থ সমূহ সঞ্চিত থাকে তাকে ম্যাগমা চেম্বার বলে। আগ্নেয়গিরির শিখরে বাটির আকারে এক গহ্বর থাকে। তাকে জ্বালামুখ বা Crater বলে। অনেক সময় মূল নল দিয়ে লাভা না বাহির হয়ে অন্য পথে পর্বত গাত্রের এক ভিন্ন স্থান দিয়ে উপরে উঠে এবং তলায় জ্বালামুখ সৃষ্টি করে, এইভাবে একাধিক জ্বালামুখ সৃষ্টি হয়।

পদ্ধতি "২" ১। 'লাভা' কাকে বলে ?

(২) আগ্নেয়গিরির নালী কাকে বলা হয় ?

(৩) ম্যাগমা চেম্বার আগ্নেয়গিরির কোন অংশে থাকে ?

(৪) ম্যাগমা চেম্বারে কোন কোন জিনিস সঞ্চিত হয় ?

(৫) আগ্নেয়গিরির 'জ্বালামুখ' কাকে বলে ?
(৬) একটি আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জ্বালামুখ কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

বিষয় "৩" কোন স্থানে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠ ঘন ঘন আন্দোলিত হয়। একে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের ঠিক পূর্বে মাটির নীচে গুড়্ গুড়্ শব্দও শোনা যায়। হঠাৎ একস্থান থেকে গলিত লাভা ও ছাই ইত্যাদি আকাশের বহুদূর বিস্তৃত হয়। পরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে মোচাকৃতি এক পর্বতের সৃষ্টি করে।

পদ্ধতি "৩" (১) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয় ?
(২) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বের আন্দোলনকে কি বলে ?
(৩) আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে মোচাকৃতি পর্বত কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

বিষয় "৪" যে আগ্নেয়গিরি হতে অবিরত বা মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তাকে জীবন্ত (active) আগ্নেয়গিরি বলে। যে আগ্নেয়গিরি হতে বহুদিন অগ্ন্যুৎপাত হয় না কিন্তু যে কোন সময় হতে পারে তাকে সুপ্ত (dormant) আগ্নেয়গিরি এবং যে আগ্নেয়গিরি হতে অগ্ন্যুৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই তাকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। পৃথিবীতে এক হাজারের মত আগ্নেয়গিরি আছে, তার মধ্যে ৪০০ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

পদ্ধতি "৪" (১) কোন আগ্নেয়গিরিকে 'জীবন্ত' বলে ?
(২) সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কাকে বলে ?
(৩) মৃত আগ্নেয়গিরি কাকে বলে ?
(৪) পৃথিবীতে মোট কতটি আগ্নেয়গিরি আছে ?
(৫) মোট কতটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষিকা ছাত্রীদের সহায়তায় আলোচনার সারাংশ বোর্ডে লিখে দেবেন।

আয়োজন : নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।
(১) পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল ?
(২) ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত উত্তপ্ত পদার্থ কিরূপে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে আসে ?
(৩) 'ম্যাগমা চেম্বার' কাকে বলে ? কোন স্থানে এর অবস্থিতি ?
(৪) অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ হয় ?
(৫) আগ্নেয়গিরিতে একাধিক জ্বালামুখ কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

বাড়ীর কাজ : একটি আগ্নেয়গিরির চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ দেখতে বলা হবে।

পাঠ-পরিলেখ

তারিখ—১৮. ৮. ৬৮

বিদ্যালয়—ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি — বিষয়-ইতিহাস

শ্রেণী—অষ্টম 'ক' শাখা — পাঠ পরিচয়—নবজাগরণ

ছাত্রী সংখ্যা—২৮ — পাঠক্রম :—(ক) নবজাগরণ ও তাহার প্রস্তুতি

গড় বয়স—১৩+বৎসর

সময়—৪৫ মিঃ — (খ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে নবজাগরণের প্রভাব

শিক্ষিকা—জ্যোৎস্না দাস এম. এ. বি. টি. — *(গ) ধর্মসংস্কার—মার্টিন লুথার

অদ্যকার পাঠ—তারকা চিহ্নিত অংশ।

উদ্দেশ্য **মুখ্য** :—নবজাগরণের যুগে মার্টিন লুথার খ্রীষ্টধর্মে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেন সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে ছাত্রীদের সাহায্য করা।

গৌণ :—নবজাগরণের যুগের ধর্মসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে ছাত্রীদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ও স্বাধীন বিচারশক্তি বিকাশের সহায়তা করা।

উপকরণ : মার্টিন লুথারের একখানি চিত্র ও ইউরোপের একটি মানচিত্র।

আয়োজন : ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে,—

(১) ইউরোপের নবজাগরণ কোথায় শুরু হয়?

(২) নবজাগরণের উপর কোন্ দেশের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে?

(৩) এই যুগে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরুকে কি বলা হ'ত?

(৪) এই পোপ কোথায় বাস করেন?

পাঠ ঘোষণা : নবজাগরণের যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের জীবনী আজ আমরা আলোচনা করব।

উপস্থাপন : ছাত্রীদের বোঝাবার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নরূপে ভাগ করে বর্ণনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। আলোচনা-কালে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

বিষয় (ক) মধ্যযুগে খ্রীষ্টান পুরোহিতেরা এক নীতিভ্রষ্ট অনাচারীর জীবন যাপন করত। ফলে ধর্মক্ষেত্রে নানা অনাচার প্রবেশ করেছিল। নবজাগরণের যুগে বাইবেলের অনুবাদের ফলে সাধারণ মানুষ বাইবেলের যথার্থ

রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ শুরু করে। স্বয়ং পোপও ধর্ম অপেক্ষা অর্থকেই শ্রেয় মনে করতেন এবং তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য মুক্তিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। যে কোন লোক মুক্তি ক্রয় করে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতো। জন ক্যাল্‌ভিন, ইরাসমাক্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পদ্ধতি (ক) ১। মধ্যযুগের মানুষ পুরোহিতদের উপর কেন বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল।

২। বাইবেল অনুবাদের ফল কি হয়েছিল ?

৩। মুক্তিপত্র কাকে বলে ?

৪। পোপ কিরূপ জীবন যাপন করতেন।

বিষয় (খ) যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে জার্মানীতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই তরুণ সন্ন্যাসী জার্মানীর উন্‌টেবার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি মানবতাবাদ ও বাইবেলের সরল আদেশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পোপ সেণ্টপিটার গির্জা নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পদ্ধতি (খ) ১। পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোথায় তীব্র আকার ধারণ করে ?

২। এই আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?

৩। তিনি কি কারণে পোপের বিরোধিতা করেন ?

৪। পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কথা কেন ঘোষণা করলেন ?

বিষয় (গ) লুথারের আন্দোলনের ফলে চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হ'ল। লুথার বললেন, অনুতাপই পাপ মোচনের একমাত্র উপায়। বাইবেল পড়লেই ধর্মের মূল কথা জানা যায়, সেজন্য পোপের অধীনতা স্বীকারের প্রয়োজন নেই। পোপ-দশম লিও ও পঞ্চম চার্লস অনেক চেষ্টা করেও জনমতকে দমন করতে পারলেন না। লুথারের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হ'ল। জার্মানী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীন পন্থীরা রোমান ক্যাথলিক ও লুথারের অনুগামীরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট বলে পরিচিত হ'ল।

পদ্ধতি (গ) ১। মার্টিন লুথার পাপ মুক্তির উপায় সম্পর্কে কি বলেছিলেন ?

২। মার্টিন লুথারকে কে কে বাধা দিয়েছিলেন ?

৩। এই সময়কার পোপ কে ছিলেন ?

৪। মার্টিন লুথারের অনুগামীদের কি বলা হ'ত ?

বোর্ডের কাজ : আলোচনা শেষে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য পাঠের সারাংশ ছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ও তাদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন : নির্দিষ্ট পাঠ ছাত্রীরা আয়ত্ব করতে পেরেছে কি না জানবার জন্য সমগ্র আলোচ্য অংশটির উপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে।

১। মার্টিন লুথারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের জন্য আর কে কে আন্দোলন করেছিল ?

২। মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৩। লুথারের অনুগামীদের প্রোটেস্ট্যান্ট কেন বলা হ'ত ?

বাড়ীর কাজ : ছাত্রীদের বাড়ী থেকে নবজাগরণের একটি 'সময় রেখা এঁকে আনতে বলা হবে।

প্রশ্নাবলী

1. In what form do you prefer to cast your notes of lessons and why ? (C. U., B. T. 1963)
2. What are the criteria of an effective lesson ? How should you plan and give a lesson that it may be effective ? (C. U., B. T. 1967)
3. Write notes on :—
   (a) Formal steps of Herbart (C. U., B. T. 1964)
   (b) Main types of lessons (C. U., B. T. 1959)
   (c) Planning a lesson (C. U., B. T. 1968, 1969 (Jadavpur University, B. T. 1970)
4. What are the essential elements in preparation of lesson plan ? Elucidate their implications. (C. U., B. Ed. 1971)

অষ্টম অধ্যায়

অনুবন্ধ প্রণালী
(CORRELATION OF STUDIES)

হার্বার্তের তত্ত্ব
(Herbart's Theory)

একটি বিষয় আর একটি বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়

শিক্ষায় একটি পাঠক্রম অনুসৃত হয়। এই পাঠক্রমে বহু বিষয়ের সমাবেশ করা হয়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকে একক ও অন্য-নিরপেক্ষ ধরে নিয়ে সেই ভাবে সময় তালিকা রচনা করে শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ জানার বিষয় গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় আমরা যে সব বিষয়কে অন্যনিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র মনে করি সে সব বিষয় সব সময় স্বতন্ত্র নয়। তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় গুলিকে আমরা 'রুদ্ধকক্ষ' (Closed compartment),—একটির সাথে আর একটির কোন সম্পর্ক নেই একথা যেন মনে না করি। **আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটির সাথে অপরটি নিঃসম্পর্কীয় নয়। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় সেই জ্ঞানরাশি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে শৃংখলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত হয়। হার্বার্ত বলেন পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা নতুন জ্ঞান আহরণ করি।· জীবনের যাত্রাপথে প্রতি-নিয়ত আমরা নতুন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি,—নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছি। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। এমনি করে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশির সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে।** সুশৃংখল যুক্তিসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারাই আমাদের চরিত্র গঠন করে। হার্বার্ত বলেন আমাদের চরিত্র নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর, ইচ্ছাশক্তি আকাঙ্ক্ষার উপর, আকাঙ্ক্ষা আগ্রহের উপর ও আগ্রহ চিন্তাবৃত্তের উপর। এই চিন্তাধারার মধ্যেই আমাদের অন্তর্নিহিত যত কর্মপ্রেরণা, এখানেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য নিহিত। চিন্তা-ধারার ব্যাপক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চরিত্র সুগঠিত হতে পারে—(*'Since character depends upon will, will upon desire, desire*

upon interest and interest upon 'circle of thought,' in which the whole inner activity has its abode, it follows that the main business of education lies here, for a strong character can be formed only by cultivating an extensive and coherent circle of thought'.) হার্বার্তের মতে সুশৃংখল ও সম্যবদ্ধ চিন্তাধারা সৃষ্টি করাই শিক্ষার আসন্ন উদ্দেশ্য (immediate aim), তিনি বলেন শিক্ষার পূর্ণশক্তির ব্যবহার তাঁরাই করেন যাঁরা জানেন কি করে শিশুর তরুণ মন জুড়ে দৃঢ় সুসংবদ্ধ বিস্তৃত চিন্তাবৃত্তের সৃষ্টি করতে হয়—*"Those only wield the full power of education who know how to cultivate in the youthful soul a large circle of thought clolsely connected in all its parts"*

Circle of thought

শ্রেণী পাঠন
(Class Teaching)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রেণী পাঠনকে স্বীকার করে নিয়েছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সব শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। এই পাঠদান গোষ্ঠী পাঠদানের (Group teaching) পর্যায়ে পড়ে। একজন শিক্ষক একসঙ্গে অনেকগুলি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক্রম আবার কতকগুলি বিষয়ে (Subjects) বিভক্ত। প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষয়-শিক্ষক (Subject-teacher) থাকেন। এই পদ্ধতি শিক্ষাতত্ত্ব-বিরুদ্ধ; কারণ হার্বার্তের মতে জ্ঞান এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসি (Pestalozzi) ও জন ডিউই (John Dewey) মেনে নিয়েছেন। শ্রেণী পাঠন ও বিষয় বিভাজন নীতি তাই শিক্ষা দর্শনের পরিপন্থী। তাছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও বোধশক্তির রূপও সামগ্রিক। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (Personality) বা চরিত্র (Character) সামগ্রিক ভাবেই বিকশিত হয়। এ প্রসঙ্গে K. Nesiah বলেছেন,—"*A person does not truly function by fractions, nor is he educated by fractions. You educate a person, not a part of a person ; and you educate, ultimately to integrate personality. Besides knowldge is a unity, not only as it appears and appeals to the child, but in its ultimate end purpose. Learning is better done by wholes than by parts ; a study unit is best dealt with as a whole, subjects are best studied in relation to each other and to life.........*"

শ্রেণী পাঠন ও বিষয়-বিভাজন নীতি

(Social Studies in Schools)

শিক্ষা দানের সময় তাই বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করার প্রশ্ন আসে। হার্বার্তের শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁরই অনুগামী জিলার (Ziller) অনুবন্ধ প্রণালীর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। সেই পদ্ধতিকেই পরবর্তীকালে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের প্রচেষ্টা হয়েছে।

বিষয় সমূহ অন্য-নিরপেক্ষ নয়
(Subjects are not Independent)

হার্বার্তের শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বসঞ্চিত ধারণার সাথে সুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত হয়ে নতুন ধারণা গড়ে উঠে ও চিন্তাধারার ঐক্য সাধিত হয়। এই মতবাদকে আশ্রয় করেই তাঁর অনুগামীরা "বিভিন্ন বিষয় একটি আর একটির সাথে সম্পর্কযুক্ত" এই মতবাদের অর্থাৎ অনুবন্ধ প্রণালীর সৃষ্টি করেন। এই তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায় জ্ঞান অখণ্ড এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে পরস্পর সম্পর্কহীন স্ব স্ব প্রধান মনে করলে ভুল করা হবে। অনেক সময় আমরা অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলিকেও আলাদা করে দেখি। লেখা-পড়া দুটো বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদেরও ভিন্ন ভিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস-ভূগোল, অঙ্ক-বীজগণিত এদের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র রয়েছে সেকথা আমরা ভুলেই যাই। এই বিষয়গুলির একটি পড়াতে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আর একটি এসে যায়। পাঠ্য প্রতিটি বিষয়কে ছাত্রদের পৃথক পৃথক ভাবে না পড়িয়ে একই শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে যদি সে বিষয়গুলি একসাথে পড়ান যায় তাহলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়।

জ্ঞান অখণ্ড এবং প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত

অনুবন্ধ প্রণালী কি ?
(What is Correlation)

সমজাতীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে পড়াবার প্রণালীকেই অনুবন্ধ প্রণালী বলা হয়। অনুবন্ধ প্রণালীর শিক্ষাকে প্রসঙ্গানুগ শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। এক বিষয় আলোচনা কালে আলোচনার সূত্র ধরে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয় অবতারণা করা ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব বিভেদ ঘুচিয়ে একসাথে পড়ানই হ'ল অনুবন্ধ প্রণালীর গোড়ার কথা। প্রসঙ্গক্রমে এমন াপূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে হবে যে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি প্রয়োগের হবে অবিচ্ছেদ্য। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়বার সুবিধা উপলব্ধি শক্ষাবিদগণের মধ্যে শিক্ষায় বিশেষ করে শিশুশিক্ষায় অনুবন্ধ

অনুবন্ধ প্রণালীর সংজ্ঞা

প্রণালীকে অনুসরণ করার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছে। শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে যখন সম্পর্কিত কোন বিষয় যা অন্য কোন বিষয় বা ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার সামঞ্জস্য বিধান করা হয় তাকে অনুবন্ধ বলে,—*"Correlation means the seeking and utilising of points of contact and relationship among subject in order to bring about association in the general field of knowledge and, to some degree, among the various parts of the curriculum."* কোন বিষয় পাঠদানের সময় আমরা অন্য বিষয়ের কোন অংশের বিশেষ সম্পর্ক লক্ষ্য করি। পাঠদানের সময় ঐ সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা করতে হয়। অখণ্ড জ্ঞানের রাজত্বে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হ'ল অনুবন্ধ প্রণালী। *D. H. Bining* ও *A. C. Bining*-এর মতে, *"Correlation is nothing more than the attempt to tie up the knowledge that the pupil is studying with the knowledge in a related field." (Teaching the Social Studies in Secondary Schools).*

অনুবন্ধ প্রণালীর সুবিধা
(Advantages of Correlations)

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রথম সুবিধা এতে বিষয়-বাহুল্য কমান সম্ভব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ত্রুটি সম্পর্কে শিক্ষকগণ বলেন, শিক্ষার্থীদের মাথায় বিষয় ও সেই সাথে বইয়ের বোঝা এত বিরাট যে তা বইবার ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের আছে কি না আমরা সে সম্পর্কে খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করি না। নিকট-সম্পর্ক-যুক্ত বিষয়গুলিকে এক করে বিষয়-বাহুল্য কমানো যায় কি না সে কথা চিন্তা করা দরকার। এক বাংলা ভাষার মধ্যেই গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, রচনা, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি বহু ভাগ করা হয়েছে, এজন্য সময় তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করে দেওয়া হয়। এই বিভাগের স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন বই পাঠ্য করা হয়। এই জাতীয় বিষয়-বিভাগ স্বাভাবিক নয়। কৃত্রিম বিষয়-বিভাগ শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সৃষ্টি করে। একই মূল বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে পড়াবার ফলে বিষয়টির সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে ধারণা করাতে বেগ পেতে হয়। একটু চেষ্টা করলেই বিষয় ভাগ না করে গদ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ ও সেই সাথে রচনা শেখানো যায়।

এই পদ্ধতিতে বিষয়-বাহুল্য কমানো যায়

বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ নিজেদের বিষয়গুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দেখেন। তাঁর বিষয়ের সাথে যে অন্য বিষয়ের যোগ হতে পারে একথা অনেক সময় চিন্তা করেন না। অঙ্কন শিক্ষক ছাত্রদের অঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি শেখাবার সাথে যদি ভূগোলের নানারূপ চিত্র, ইতিহাসের কোন চিত্র, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ণের প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলি আঁকতে শেখান, তাহলে বিশেষজ্ঞ-শিক্ষক হয়েও তিনি পাঁচটা বিষয়

অনুবন্ধ প্রণালী কৃত্রিম বিষয়-বিভাগ দূর করে

শেখাতে সাহায্য করতে পারেন। বিষয়সমূহের মধ্যে চুলচেরা ভাগের ফলে পড়বার অসুবিধা শিক্ষক মাত্রেই উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র রয়েছে এ সম্পর্কে সচেতন না হবার ফলেই পাঠক্রমে বহু বিষয়ের সমাবেশ করে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এক বিষয় যে অন্য বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারে, তার উপর নতুন আলোক সম্পাত করতে পারে সেদিকে চোখবুজে থাকার ফলেই কৃত্রিম বিষয় বিভাগের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জ্ঞান যে অখণ্ড ও অবিভাজ্য সে কথা ভুলে শিক্ষার্থীরা মনে করতে শেখে জ্ঞান হচ্ছে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সমষ্টি। এজন্য শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে—

অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করে।

'Total neglect of natural affinities of the subjects of instruction undoubtedly increased the embrrassments caused by crowded curricula, it shuts out the light which one study often sheeds upon another, it leads to artificiality of treatment and loss of interest, it deliberately trains the pupil to take a false view of knowledge as mere agglomeration of independent parts, and to drown all it leaves room for diversities of aim when the aim is essentially the one." T. Rayment.

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ

ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইতিহাস পাঠকে সার্থক করতে হলে আমাদের মানচিত্রের সাহায্য নিতে হয়। কোন একটি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা রচনায় প্রকৃতির প্রভাব জানতে ভূগোলের সাহায্য দরকার। ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের সংযোগ সাধন করাও সম্ভব। পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান যায়। চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস আলোচনা কালে 'চন্দ্রগুপ্ত নাটক' ছাত্রদের সামনে আলোচনা করলে পাঠ-সহায়ক হয়, ছাত্ররাও আনন্দ পায়।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ
(Method of following the Principles of Correlation)

সতর্কভাবে অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ

অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার স্বাভাবিক সুবিধাগুলি মনে রেখে আমাদের সতর্কভাবে এই প্রণালীকে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ স্বাভাবিক ও সাবলীল হওয়া দরকার। কষ্টকল্পিত কৃত্রিম সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলে অনুবন্ধ প্রণালীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় কিভাবে বিষয় সংযোগ করা যায় তা বুঝে নিয়ে আমরা কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে পারি।

পড়াবার সময় একই বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে সেই বিষয়ের বিভিন্ন দিক শেখাতে পারি। বাংলাকে—গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, রচনা প্রভৃতি বহু খণ্ডে ভাগ না করে বাংলা পদ্য বা গদ্য পড়াবার সময় ব্যাকরণ (Textual grammar) পড়ান সম্ভব। রচনা শেখা, ভাবসম্প্রসারণ, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি একই সাথে শেখান যেতে পারে। এইজন্য সময় তালিকার (Time table) পিরিয়ড নির্দিষ্ট না করে বাংলা শিক্ষকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে। তিনি তাঁর সুবিধামত বিষয় সমূহ অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিবেন, এছাড়া ইতিহাস কি গণিত প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেও একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতা রয়েছে। ইতিহাসে এক যুগকে বাদ দিয়ে তার পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য সমূহ আয়ত্ব করা যায় না। অঙ্কের শিক্ষক জানেন পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে নতুন কোন পদ্ধতি শেখান যায় না। একই বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। পড়াতে গিয়ে বা আলোচনা কালে স্বাভাবিক ভাবেই একটি বোঝাতে আর একটি অধ্যায়ের সাহায্য নিতে হয়। এই জাতীয় অনুবন্ধ বিষয়গত, একে **উলম্ব অনুবন্ধ (Vertical Correlation)** বলে।

উলম্ব অনুবন্ধ বা একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন

অনুবন্ধ প্রণালীর আর একটি রূপ হচ্ছে এক বিষয় পড়াতে গিয়ে অন্যবিষয় প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করা। ইতিহাস পড়াতে ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতে ইতিহাস অপরিহার্য ভাবেই এসে পড়ে। কোন দেশের ইতিহাস পড়াতে শুরুতেই সেই দেশের ইতিহাসের উপর প্রকৃতির প্রভাব বলে যে অধ্যায়টির আলোচনা করি তা সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যকে জেনেই আলোচনা করি। ইতিহাস পড়াতে সাহিত্যের অবতারণা করা বহু ক্ষেত্রেই হয়। ঐতিহাসিক চিত্রাদির সাহায্যে পাঠকে সরস করে তোলা যায়। সাহিত্যের রসাস্বাদনের সাথেও ভূগোলের যোগ সাধন করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের "সেদিন সুনীল জলধি হইতে—" কবিতাটি পড়বার সময় ভারতের মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এমনি করে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে আমরা অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য নিতে পারি। শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এই জাতীয় অনুবন্ধ ও বিষয়গত, একে **অনুভূমিক অনুবন্ধ (Horizontal Correlation)** বলে।

অনুভূমিক অনুবন্ধ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগের রূপ ও রীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাধারণ একটা নিয়ম থাকলেও একটি বিষয় পড়াবার সময় কি ভাবে অন্য একটি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হবে বা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'তিনটি বিষয় অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তা শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশলের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের জ্ঞান যদি সীমাবদ্ধ হয় বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যদি নিজের

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগে শিক্ষকের কৌশল

বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য বিষয়ের সীমায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করা বা তার সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ দু'ভাবে হতে পারে,—**পূর্ব পরিকল্পিত (Pre-planned) ও আকস্মিক (Sudden)।**

পূর্ব পরিকল্পিত অনুবন্ধ

পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা কালে স্থির করে নিতে হবে একই সাথে একাধিক উপস্থাপন করে কিভাবে মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা হবে ও সেই সাথে আনুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা হবে। সেই কয়টি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পাঠ-পরিকল্পনা করে নিলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিচালনা সহজতর হয়। এই জাতীয় অনুবন্ধে শিক্ষকের পূর্বপরিকল্পনা থাকবে।

আকস্মিক অনুবন্ধ

পাঠ-পরিকল্পনা করে পড়াতে গিয়েও আমরা লক্ষ্য করেছি আলোচনা কালে নতুন বিষয় উপস্থিত হয়। পাঠকে সহজবোধ্য করে তুলতে যদি প্রাসঙ্গিক ভাবে কোন কথা এসে যায়—ছাত্রেরা যদি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তবে তাকে এড়িয়ে না গিয়ে তার সাহায্যে ছেলেমেয়েদের বোঝাবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাংলা শিক্ষক 'আত্মবিলোপ' কবিতা পড়াবার সময় মধুসূদনের জীবনকাহিনী আলোচনা কালে যদি রবীন্দ্রনাথের "ঘরেও নহে পরেও নহে যে জন আছে মাঝখানে—সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে" লাইন দু'টি আবৃত্তি করে মধুসূদনের জীবনের সাথে তুলনা করেন তাহলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী পড়াতে পড়াতে "বণিকের মানদণ্ড দেখাদিল···পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে" লাইনটি আবৃত্তি করে শোনাতে প্রায়ই দেখা যায়—এটা সবসময় পূর্বপরিকল্পনা জাত নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে ইতিহাসের নজীর তুলে ধরা বা ইতিহাস পড়াতে ভূগোলের সাহায্য নেওয়া স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই জানেন কি করে কখন অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করলে পাঠ সার্থক হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কালে শিক্ষক আকস্মিক ভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করে অনুবন্ধ করতে পারেন।

প্রয়োগকালীন সতর্কতা
(Protection during application)

অনুবন্ধ কষ্টসাধ্য ও কৃত্রিম হবে না

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগকালে সতর্ক থাকতে হবে। সংযোগ-সাধনে আমরা যেন কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নেই ও সংযোগ যেন কৃত্রিম না হয়। যখন একটি বিষয় পড়াতে গিয়ে আর একটি বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করব তখন সেই অপ্রধান বিষয়টি মূল বিষয়কে বুঝাতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী স্থান জুড়ে না বসে। মূল বিষয়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সব বিষয় আনা সম্ভব সেই বিষয়-

গুলির যোগসাধন করতে হবে। মূল বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বা ছেলেমেয়েদের মন মূল বিষয় বিক্ষিপ্ত হতে পারে এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা হবে না। গৌণ বিষয় যাহাই অবতারণা করা হোক না কেন তার লক্ষ্য হবে মূল বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করা। পাঠের স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিকে ব্যবহৃত করতে পারে এমন কোন বিষয় অবতারণা করলে অনুবন্ধ প্রণালীর কোন সার্থকতা থাকবে না।

অনুবন্ধ প্রণালীর কেন্দ্রীকরণ
(Concentration of Correlation)

অনুবন্ধ প্রণালী সম্পর্কে যাঁরা চরমপন্থী এই প্রণালীকে কেন্দ্রীকরণের তাঁরা পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন বিভিন্ন বিষয়কে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে হলে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য বিষয় সমূহ শিক্ষা দিতে হবে। কেন্দ্রীভূত অনুবন্ধ প্রণালীতে কোন বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করা হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। রেমণ্ট মনে করেন সাত আট বছরের ছেলেমেয়েদের রবিনসন ক্রুশোর কাহিনীকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করে নানা-বিধ বিষয় শেখানো যায়। রবিনসন ক্রুশোর গল্পে জাহাজ, সাগর, দ্বীপ, ভেলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে এসব বিষয় সম্পর্কীয় বহু তথ্য ছেলেমেয়েদের শেখান যায়। গল্পটি পড়ে,—লেখা পড়া দুইই হয়। এ বিষয়ে ছবি আঁকা, মডেলিং, সহজ অঙ্ক প্রভৃতি শেখান যায়। সেই সাথে "I am monarch of all I survey" কবিতাটি শেখান যেতে পারে।

রবিনসন ক্রুশো-কে কেন্দ্রীয় বিষয় করে শিক্ষাদান

ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে একটু বড়দের শিক্ষাব্যবস্থা করার অভিমত কেহ কেহ প্রকাশ করেছেন। যেমন পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্রীয় পাঠ রূপে গ্রহণ করা হয় ;—এখানে ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, ভূগোল, সেই যুগের যুদ্ধ প্রণালী, মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি শেখান যেতে পারে। এছাড়া গণিতও জুড়ে দেওয়া যায়।

ইতিহাসকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান

বুনিয়াদী শিক্ষার কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে (craft centred) বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীকে যে ভাবে গ্রহণ করা হয় তাকে concentration method বলা যেতে পারে। তবে আদর্শগত পার্থক্য আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিষয়সম্বলিত জ্ঞান পরিবেশন করাটাই বড় কথা নয়,—তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জীবন ঘনিষ্ট ও ব্যাপক। তাই এমন কয়েকটি কাজকে বেছে নিয়ে কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কাজ উদ্দেশ্যমূলক ও বহু সম্ভাবনাপূর্ণ।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও craft centric education

বর্তমানে কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা চলেছে—আমেরিকার কর্ণেল পার্কার এই মতের প্রধান প্রবক্তা।

কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালী সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল লেখক বলেছেন:—*"True concentration is not the strained and mechanical bringing together of diverse subject matter into the same recitation, but fixing the attention on all the relations of the given subjects matter and thus drawing into the movement the other subject required for the mastery of one under consideration...If the thing be taught in the only way it can truely be taught, whatever subjects are needed will inevitably be drawn into the process." Arnold Tompkins.*

কেন্দ্রবদ্ধ অনুবন্ধ সম্বন্ধে Arnold Tompkins-এর অভিমত

কেন্দ্রীকরণের কুফল ঃ
(Defects of Concentration)

কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কষ্ট-কল্পনা বা যান্ত্রিক সংযোগ-সাধনের ফলে এই প্রণালীর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের (specialist teacher) দৃষ্টি একটি মাত্র বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকার ফলে বিষয় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় অনুবন্ধ প্রণালী (concentrated scheme) এই ত্রুটিকে দূর করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু গোঁড়া কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীর অনুসারী শিক্ষক যদি মাত্রা না রেখে এই প্রণালীর প্রয়োগের চেষ্টা করেন তাহলে বহু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বিষয় না হয়ে অন্য কোন বিষয় আনতে গেলেই কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস বোঝাতে মানচিত্রের প্রয়োজন হয়, সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্য নেওয়া যায় কিন্তু যদি এর সাথে অঙ্কের সংযোগ সাধন করতে হয় তাহলেই তাকে কষ্টকল্পনা বা অবাস্তর সংযোগ সাধন বলতে হবে। তাছাড়া মূলবিষয় যেখানে ইতিহাস পাঠ, সেখানে অঙ্ক টেনে আনলে ইতিহাস বুঝবার পক্ষে সহায়ক বা ইতিহাসের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কোন আলোক সম্পাত করতে পারে না। অঙ্কের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে তাও রক্ষিত হয় না। যে বিষয় টেনে আনলে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না সে বিষয় আনবার কোন যৌক্তিকতা নেই। সে বিষয় সযত্নে পরিহার করে চলতে হবে। অনুবন্ধ বা কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাদের পড়ান হচ্ছে তাদের গ্রহণ করার বা বোঝবার ক্ষমতা কতটুকু। ছাত্রদের

কেন্দ্রবদ্ধ অনুবন্ধ অত্যধিক যান্ত্রিক হয়ে পড়ে

মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।

অনুবন্ধ প্রণালীর সাফল্য শিক্ষকের ব্যবহারিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে

অনুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক দিক ঠিক কিরূপ হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়ের প্রয়োগ ছাড়াও শিক্ষক তাঁর নব নব উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করে বিচিত্র ধরনের সম্ভাব্য বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল শিক্ষাপদ্ধতিকে সার্থক করে তুলবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান। সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যে শিক্ষকের সম্যক ধারণা রয়েছে তিনি অতি সহজেই পাঠদানের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করে তার স্থিরকৃত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন,—"*All successful grouping of instruction depends on the teacher himself and on the which of his culture. If he has a well stored mind, he can not fail to see how a lesson on geography suggests relation to history and economics and nature knowledge—relations which should be elicited from his class, so far as relevant to the lesson of the day.*" *Dr. S. S. Laurie.*

সম্বন্বিত-শিক্ষা প্রণালী
(Integrated Teaching)

কেন্দ্রবদ্ধ প্রণালীতে কখনও কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়ান হয় এবং কেন্দ্রীয় বিষয়টি পড়াবার সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় শেখান হয়।

সম্বন্বিত শিক্ষা প্রণালী

কোন কোন জায়গায় কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে না শিখিয়ে অন্যসব বিষয়ের সাথে এক সাথে পড়ান যেতে পারে। এখানে কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে আর স্বতন্ত্র বিষয়রূপে দেখা হয় না। এই পাঠপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় বিষয় শুধু মাত্র অন্য বিষয় সমূহের সাথে সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। একে সম্বন্বিত শিক্ষা প্রণালী (Integrated Teaching) বলা হয়।

জ্ঞান এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। কিন্তু পাঠদানের সুবিধার জন্য আমরা জ্ঞানকে কতকগুলি বিষয়ে বিভক্ত করি। কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে কোন সামঞ্জস্য থাকবে না তা নয়। প্রত্যেকটি বিষয়ের নিজস্ব একটি গণ্ডী আছে। সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বিষয়টি যেন আবদ্ধ। কিন্তু সে গণ্ডী অনতিক্রম্য নয়। পাঠদান বা পাঠ গ্রহণের সময় অনায়াসে সে গণ্ডী অতিক্রম করা যায়। ***"There are no pass-port or visas required at the boundaries of subjects. Students may cross and recross at will. Subjects are classifications and not restraing walls."***

বিভিন্ন বিষয় হ'ল সম্পূর্ণ জ্ঞানের এক একটি ধারা। এই বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ধারাগুলিকে শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে একীভূত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মন হবে বিভিন্ন জ্ঞানধারার ত্রিবেণী সঙ্গম। জ্ঞানকে খণ্ডিত করে নয়—এক অখণ্ড ও অবিভক্ত জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর মন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াই হ'ল সম্বন্ধিত শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য। তার ফলে শিক্ষার্থীর ধারণা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়। *"Integration means the creation of understanding that consists in integrated materials of instruction from several fields in order to present a whole picture of a phase of knowledge rather than a part."*

What is Integration ?

সম্বন্ধিত শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সম্পর্কহীন বা বিচ্ছিন্ন রূপে উপস্থাপন করা হয় না। বিচ্ছিন্ন ও অমূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় না। বিষয় সমূহ শিক্ষার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয় না,—বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের ভাষা-ভাষা জ্ঞান জন্মে। সম্বন্ধিত শিক্ষায় ত্রুটি দূর করার জন্য বাস্তব ঘটনার সাথে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যুক্ত করে সজীব মূর্তরূপে বিষয়গুলি উপস্থাপন করে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে নানারূপ আচার আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলা সম্ভব। ছোট শিশুদের ঘরবাড়ী তৈরী, পুতুল খেলা, পুতুলের বিয়ে খেলাগুলি খুবই আনন্দদায়ক—এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনাশক্তি দুইই বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা এখানে স্বাভাবিক ও জীবনের অঙ্গীভূত করে তোলায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। একটু বড় ছাত্রদের ধীরে ধীরে জটিল বাস্তব বিষয়ের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন জাতীয় উৎসব বা কোন জাতীয় নেতার উৎসব পালন, দেশ ভ্রমণ, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সম্বন্ধিত শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন সম্ভব। সম্বন্ধিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে শিক্ষামূলক অবলম্বন করে সেই বিষয়সমূহ উপস্থাপন করে জীবন ও শিক্ষাকে সম্বন্ধিত করে তোলা যায়। সম্বন্ধিত শিক্ষায় জীবন ও শিক্ষার মধ্যেই শুধুমাত্র যোগ সাধিত হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যেও একটা সহজ ঐক্য সাধন সম্ভব হয়। বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত শিক্ষায় যে শক্তির বিরাট অপচয় হচ্ছে সম্বন্ধিত শিক্ষায় সে অপচয় দূর করে জীবন ও শিক্ষার মধ্যে একটি সঙ্গতি সাধন সম্ভব।

বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও অনুবন্ধ প্রণালী
(Present Educational system and the Principles of Correlation)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে বিষয়কেন্দ্রিক। বর্তমান যুগই হ'ল Specialist-এর যুগ। সকলেই এক একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়;—সমাজের প্রয়োজনও তাই। কিন্তু একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়গুলিকে অবহেলা করে। ফলে সামাজিক দায়িত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়। তাই শিক্ষাদান কালে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে তাতে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হয়। শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়োজনও আছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন বিমুখ হয়ে পড়েছে। পুস্তক-নির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীরা স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে। শিক্ষা তখন হবে সার্থক।

অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন; শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by correlation and integration of studies? Explain their advantages with examples, indicating when the desired results may not be forth coming. (Jadavpur University, B Ed. 1970)
2. "Facts and ideas have a real and useful influence over the mind only when the mind systematises and co-ordinates them with other facts and ideas as they are produced." —Discuss the statement with special reference to the doctrine of 'the correlation of studies.' (C. U., B. T. 1964)
3. Write notes on :—
   (a) Correlation of studies (C. U. B. T., 1959, 1968, 1969, 1971)
   (b) Different types of correlation and their advantages (Jada pur University, B. Ed. 1971)

নবম অধ্যায়

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ

(EXAMINATION AND EVALUATION)

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য আসে। শিক্ষক যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে তাদের শিক্ষা দেন। শিক্ষার ফলে তারা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, দক্ষতা লাভ করে, তারা নতুন জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে, তারা দক্ষতা ও কৃতিত্ব অর্জন করে জীবনে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জন করল তার ফলে তার কতটা উন্নতি হ'ল তার পরিমাপ কি করে করা হবে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়ের নিখুঁত ভাবে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু পরিমাণগত বস্তুর পরিমাপ যত সহজ, মানুষের গুণগত পরিমাপ তত সহজ নয়। মিটারের বা কিলোর মাপে মানুষের যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। তবুও মানুষের বুদ্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক অগ্রগতি, যার পিছনে রয়েছে মানুষের সজ্ঞান প্রচেষ্টা, তার নিখুঁত পরিমাপ কষ্টসাধ্য হলেও আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে তার পরিমাপ করি। পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের, তার উন্নতির মূল্যায়ণ করা হয়। পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ দু'টি কথাকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করলেও দু'টি কথার মধ্য দিয়ে আমরা যা জানতে চাই তা হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও মানসিক পরিমাপ।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ ঃ
(Examination and Evaluation)

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ দু'টি কথা আমরা প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ সমার্থক নয়। ছাত্রদের উন্নতি ও কৃতিত্বের পরিমাপ আমরা করতে চাই। জানতে চাই একটা নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করল। কি পরিমাণ বিদ্যা অর্জন করল। আমাদের পরীক্ষাসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাগত কৃতিত্ব অর্জনের মান নির্ধারণ। এর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির আর কোনদিকের প্রত্যক্ষ পরিমাপ সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক উন্নয়ণ (all round development of the personality)। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অতি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়গুলিতে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক উন্নতি কতটা হ'ল তার পরীক্ষা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর আবেগ অনুভূতি তার সামাজিক চেতনা, তার মানসিক ও দৈহিক বিকাশ, কোন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে, কতটা হচ্ছে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তা জানা সম্ভব নয়।

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিমাপ সম্ভব নয়

পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যদি সত্যিকারের কার্যকরী ও সত্যিকারের প্রয়োজনীয় (effective & useful) করে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করার ব্যবস্থাই হচ্ছে মূল্যায়ণ (Evaluation)। প্রচলিত পরীক্ষা (তার দোষ ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েই বলছি) মূল্যায়ণের বা সামগ্রিক বিচারের একটি পদ্ধতি মাত্র। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিকাশের আংশিক জানতে পারি মাত্র।

মূল্যায়ণ

মূল্যায়ণ সম্পর্কে কোঠারী কমিশন বলেছেন.—একথা আজ স্বীকৃত যে মূল্যায়ণ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (continuous process)। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে এ ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়েই আমরা জানতে পারি শিক্ষার্থীর উন্নতি বাঞ্ছিত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে কি না। মূল্যায়ণের গুরুত্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত বেশী তাই মূল্যায়ণ হবে নির্ভুল, নির্ভরশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব (valid, reliable, objective and practical)।

মূল্যায়ণ সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের অভিমত

স্কুলগুলিতে পরীক্ষার মাধ্যমে আংশিক মূল্যায়ণ হয়। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে একে অধিকতর নির্ভরশীল করে তুলতে পারলেও সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিকাশের ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে পারলে সেই হবে মূল্যায়ণ।

পরীক্ষার মাধ্যমে আংশিক মূল্যায়ণ সম্ভব হয়

পরীক্ষার ইতিহাস ঃ
(History of Examination)

পরীক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। যতটা জানা যায় চীন দেশেই প্রথম লিখিত পরীক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ দু'হাজার বছর পূর্বে চীনদেশে যোগ্যতার বিচারের জন্য রাজ-কর্মচারীদের পরীক্ষা নেওয়া হ'ত।

পরীক্ষার ইতিহাস প্রাচীন

প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—কিন্তু বিদ্যা-বিবাদ, বাকো-বাক্যম প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষাকেন্দ্রে, যজ্ঞ স্থলে রাজসভায় তর্কযুদ্ধ বা বিচারের আয়োজন হ'ত। তর্কযুদ্ধে বা বিচারে যে জয়ী হ'ত তাকে উপাধি দান ও অন্যান্যভাবে সম্মানিত করা হ'ত। তক্ষশীলায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধযুগে নালন্দায় ও বিক্রমশীলায় দ্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা না দিয়ে কেহ প্রবেশাধিকার পেত না। একে বর্তমান যুগের admission test-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মধ্যযুগে মৌখিক

প্রাচীন [illegible] পরীক্ষা ব্যবস্থা

পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। মিথিলায় ও নবদ্বীপে উপাধি পেতে হলে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হ'ত।

মধ্যযুগে ইউরোপে তর্কযুদ্ধ বা Disputation-এর ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা থেকেই পরবর্তীকালে পরীক্ষা প্রথার উদ্ভব হয়। Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮২৭ খ্রীঃ প্রথম মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ইংলণ্ডে Public Examination প্রথা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। New Castle Commission সর্বপ্রথম পরীক্ষার ফলের উপর সরকারী সাহায্যের প্রথা প্রবর্তন করেন। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অনুকরণে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

পরীক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন

পরীক্ষার উদ্দেশ্য
(Purposes of Examination)

॥ ১ ॥ কৃতিত্বের পরিমাপ ঃ—

শিক্ষক শিক্ষাদান করেই তৃপ্তি হন না। তিনি জানতে চান শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর কতটা অগ্রগতি হ'ল বা জ্ঞান অর্জন করল। শিক্ষার্থীও জানতে চায় তার কতটা উন্নতি হ'ল, অভিভাবকও জানতে চান শিক্ষার অগ্রগতি কতটা হচ্ছে। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। শিক্ষার্থীকে যা শেখান হয়েছে দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও জ্ঞান পরিমাপই পরীক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

॥ ২ ॥ শিক্ষার ত্রুটি নির্ধারণ ঃ—

পরীক্ষায় শুধুমাত্র কৃতিত্বের পরিমাপই হয় না, দোষত্রুটি ও পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা যায়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বুঝতে পারে শিক্ষার্থীর ত্রুটি কোথায়, তার ব্যর্থতার কারণ কি? তা বুঝে নিয়ে দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সচেষ্ট হতে পারেন।

॥ ৩ ॥ শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ ঃ—

পরীক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থী কতটা যোগ্যতা অর্জন করল তার পরিমাপ নয়, শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি কতটা সাফল্য লাভ করল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারও বিচার হয়। শিক্ষকের শিক্ষায় যদি ত্রুটি থাকে, তিনি যদি দক্ষতার সাথে তাঁর কাজ করে না থাকেন, পরীক্ষায় তা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। শিক্ষকের শিক্ষাদানের যোগ্যতার উপর শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল। এইজন্যই ইংলণ্ডে ও ভারতে সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্রে Payment by results প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানেও বাংলাদেশে এই প্রথাকে পরোক্ষভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

॥ ৪ ॥ পরিচালনার সুবিধা ঃ—

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ধারিত করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে অঙ্কে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট নম্বর না পেলে কোন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে দেওয়া হয় না। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই স্থির করা সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়বার নিম্নতম যোগ্যতা আছে কি না। কারিগরী বা বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষায় admission test করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রার্থীর সেই বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভের যোগ্যতা আছে কি না তার বিচার করা। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষার কোন বিভাগে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সর্বাধিক সার্থকতা লাভ করবে তা স্থির করা হয়।

॥ ৫ ॥ উদ্দীপণার সহায়ক ঃ—

পরীক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর জীবনে উদ্দীপকের কাজ করে। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ না হলে এবং তাতে যোগ্যতার নিম্নতম মান অর্জন করতে না পারলে পরবর্তী উচ্চতর পাঠক্রম অনুসারে সুযোগ পাবে না—তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রেরণা লাভ করে। এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করা ভাল কি মন্দ তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু পরীক্ষার ফলে যে একটা কৃত্রিম আগ্রহের সৃষ্টি হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

॥ ৬ ॥ Class Promotion ঃ—

পরীক্ষা class promotion-এ সাহায্য করে। পরীক্ষায় সফল হলে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এইভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি সাধিত হয় ও বিদ্যালয়ে শ্রেণী-বিভাজন নীতি অব্যাহত থাকে। পরীক্ষা হ'ল বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের (Session) সমাপ্তি ও শিক্ষার্থীদের পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ।

॥ ৭ ॥ শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরীক্ষার নির্দিষ্ট মান রক্ষা ঃ-

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক। এই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। শিক্ষাগত অগ্রগতি ও যোগ্যতার উপর পরীক্ষা করেই শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিন্যাস ও শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট মানে স্থির রাখা সম্ভব হয়। পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি শ্রেণী-বিন্যাস সম্ভব হয়। পরীক্ষার ভিত্তিতেই আবার এক একটি শ্রেণীকে A, B, C, D প্রভৃতি Section-এ ভাগ করা যায়। এবং তা যদি করা যায় তো বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার

একটি মান বজায় রাখা সম্ভব। ফলে সকলের জন্য পাঠক্রম রচনা, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরূপণ ইত্যাদি সহজ হয়।

॥ ৮ ॥ শিক্ষার্থীর গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ঃ—

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর অর্জিত গুণাবলীর পরিমাপই মাত্র হয় না, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব হয়। পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে শিক্ষার্থীর ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনোযোগ, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি গুণের প্রয়োজন হয়। আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, প্রবণতা প্রেষণা প্রভৃতির পৃথক পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ ৯ ॥ যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন ঃ—

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে বা কোন পুরস্কার বৃত্তি (Scholarship) দেবার ক্ষেত্রে যেখানে পাস ফেলের প্রশ্ন নেই, কয়েকজন মাত্র নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে সুবিধা বণ্টন করা হবে সেখানে শত শত প্রার্থীর মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাছাই করা সম্ভব।

॥ ১০ ॥ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় ঃ—

পরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পরীক্ষার ফলাফল দেখে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন Course-এ ভর্তি করা হয়। এবং তার মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ জীবন প্রভাবান্বিত হয়।

সার্থক অভিক্ষার বৈশিষ্ট্য
(Criteria of a Good Test)

সার্থক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ—

॥ ১ ॥ নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ঃ—

পরীক্ষা হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ সঠিক পরিমাপক যন্ত্র। পরীক্ষার উত্তর পত্রের মান বা নম্বর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন হলে চলবে না। পরিমাপক যন্ত্রটি দাঁড়িপাল্লার মত এমন নিখুঁত হবে যে কোন দ্রব্যের ওজন যদি এক মন হয় তবে, সর্বত্রই তার ওজন এক মন হবে তা যে কেউ পরিমাপ করুক না কেন। নির্ভরযোগ্যতা তাই পরীক্ষার বিশেষ একটি গুণ।

॥ ২ ॥ নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) ঃ—

পরীক্ষা একটি পরিমাপক যন্ত্র। তাই পরিমাপের সময় কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দের কথা থাকলে চলবে না। পরীক্ষক যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করতে পারেন।

॥ ৩ ॥ যথার্থতা (Validity) :—

যথার্থতা হ'ল পরীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীর যে বিষয় বা যোগ্যতা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে, কেবলমাত্র তারই যথার্থতা বজায় রাখা হ'ল পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের পরীক্ষায় বানান ও ভাষা-প্রয়োগের পরীক্ষা হবে। ইতিহাস পরীক্ষার সময় বা অঙ্কের পরীক্ষার সময় বানান ভুল ও ভাষা প্রয়োগকে বড় করে দেখলে চলবে না।

॥ ৪ ॥ মিতব্যয়িতা (Economy) :—

পরীক্ষার সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতা রক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ করতে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় করা চলবে না। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে, যাতে অধিক অর্থ ব্যয় না হয়, সময়ও বেশী না লাগে; এমনকি উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য অধিক সময় লাগবে না।

॥ ৫ ॥ প্রয়োগধর্মীতা (Administrability) :—

পরীক্ষা এমন হবে যা প্রয়োগ করা ও পরিচালনা করা সহজ হয়। প্রশ্নের ভাষা সুস্পষ্ট হবে। প্রশ্নে কি জানতে চাওয়া হয়েছে তা দ্ব্যর্থহীন হবে। উত্তর-পত্রেও সঠিকভাবে নম্বর দেওয়ার সুযোগ থাকবে। তবেই পরীক্ষার সহজ পরিকল্পনা সম্ভব।

॥ ৬ ॥ স্তর-বিন্যাস (Gradation) :—

শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী তাদের সামর্থ্যের তারতম্য হয়, যোগ্যতারও পার্থক্য হয়। একই বয়সের শিক্ষার্থীর মধ্যে আবার ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার এই সমস্ত বৈষম্যের কথা মনে রেখে স্তর অনুযায়ী প্রশ্নপত্র রচিত হবে।

॥ ৭ ॥ বাস্তব-ধর্মীতা (Practicability) :—

শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন বাস্তবমুখী করতে হবে, পরীক্ষাকেও তেমনি বাস্তবমুখী করতে হবে। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হবে।

॥ ৮ ॥ তুলনীয়তা (Comparability) :—

পরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগ্যতার তুলনামূলক বিচারের সুযোগ থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়, তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞানের পরিমাপই হয় না—পরীক্ষায় পাস করতে হলে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য প্রভৃতির প্রয়োজন। তাই বিষয়গত জ্ঞানের পরীক্ষার সাথে অন্যবিধ প্রয়োজনীয় গুণের পরীক্ষাও হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষা
(Different Types of Examination)

শিক্ষার্থীর বিষয়গত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত নানাবিধ গুণের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্নরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই পরীক্ষাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা চলে, (১) **মৌখিক** (২) **লিখিত**।

॥ ১ ॥ মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test) ঃ

মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে। এটি হচ্ছে পরীক্ষার আদিম রূপ। মৌখিক পরীক্ষায় একজন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের সামনে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হলে একাধিক পরীক্ষায় এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার একাধিক পরীক্ষকের সামনেও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা হয়। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। মৌখিক পরীক্ষা থেকেই লিখিত পরীক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মধ্যেই হয়ে থাকে। লিখিত পরীক্ষার সাথে কোন কোন দেশে (ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী) মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার সেখানে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বহিঃপরীক্ষায় উচ্চতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার পক্ষে বিভিন্ন জায়গা জুড়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়।

মৌখিক পরীক্ষার সুবিধা-অসুবিধা

॥ ২ ॥ লিখিত পরীক্ষা (Written Test) ঃ

লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে লিখিত ভাবে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। **লিখিত পরীক্ষার দু'টি রূপ—(ক) রচনাত্মক পরীক্ষা** (**Essay type**) (খ) **নতুন ধরনের পরীক্ষা (New Type Test) বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা** (**Objective Test**).

॥ ক ॥ রচনাত্মক পরীক্ষা (Essay type Examination) ঃ

লিখিত পরীক্ষার প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে রচনাত্মক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, পরীক্ষার্থীরা সেই প্রশ্নপত্র থেকে কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নাতিদীর্ঘ রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

॥ খ ॥ বিষয়াত্মক পরীক্ষা (Objective Test) ঃ

অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। রচনামূলক পরীক্ষায় পরিমাপ যেরূপ ব্যক্তিমুখীন (subjective), নতুন ধরনের পরীক্ষায় নির্ব্যক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন

করা হয়। নতুন ধরনের পরীক্ষায় বহু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সঠিক উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

॥ গ ॥ **বহিঃপরীক্ষা (External Examination) :**

পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী ভেদে পরীক্ষাকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বহিঃপরীক্ষা (External or Public Examination) সরকারী শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় বা আইন অনুসারে গঠিত কোন বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এইরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার দিন ধার্য করা, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা করান। কোন একটি শিক্ষাস্তরের শেষে বহিঃপরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ও সমাজের স্বীকৃতিমূলক উপাধি (Degree) বা অভিজ্ঞান-পত্র (Certificate) প্রভৃতি দেওয়া হয়।

॥ ঘ ॥ **আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal Examination) :**

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে যোগ্যতা অর্জন করেছে তার পরিমাপ করা হয়, স্কুলের সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক, প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। **স্কুলের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।** আভ্যন্তরীণ একটি বা কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ঘোষণা করা হয় পরীক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণীর জন্য যোগ্য (উত্তীর্ণ) বা অযোগ্য (অনুত্তীর্ণ)।

রচনাধর্মী পরীক্ষা
(Essay Type Examination)

প্রচলিত পরীক্ষা বা চিরাচরিত পরীক্ষা বলতে আমরা রচনাত্মক (Essay type) পরীক্ষাকেই বুঝি। রচনাত্মক পরীক্ষায় কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। **প্রশ্নপত্রে বিকল্প** প্রশ্ন থাকে ও পরীক্ষার্থীদের সেই প্রশ্নের মধ্য থেকে বেছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখে দেয়। উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট রচনার আকারে প্রকাশ পায়। পরীক্ষক উত্তরপত্রগুলি পড়ে শিক্ষার্থী অধিত বিষয় কতটা আয়ত্ব করতে পেরেছে বিচার করে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে (Scoring) কৃতিত্বের পরিমাপ করেন।

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্য একটা অবস্থা হ'ল **সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের প্রশ্নাবলী (Short Answer type Questions)**। ছোট ছোট প্রশ্ন

করে তার নাতিদীর্ঘ উত্তর দেওয়া হয়। এতে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। ফলে পাঠক্রমের অনেকটা cover করা সম্ভব। তাতে শিক্ষার্থীরা সমস্ত বিষয়টি পড়েছে কি না তার পরীক্ষা নেওয়া যায়। এই জাতীয় প্রশ্ন হ'ল :—

সংক্ষিপ্ত উত্তর দানের প্রশ্ন ও Short notes

(ক) অক্ষাংশ কি ?

(খ) আবুল ফজল সম্বন্ধে কি জান ?

(গ) গণতন্ত্র কাকে বলে ?

(ঘ) রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন topic-এর উপর **Short note** লিখতে দেওয়া হয়। রচনাধর্মী পরীক্ষায় সাধারণতঃ একটি short note-এর প্রশ্ন থাকে। ৪।৫টি short note মিলে একটি বড় প্রশ্ন হয়। ফলে পাঠক্রমের অনেকটা cover করা সম্ভব হয়। এই ধরনের প্রশ্ন রচনাধর্মী পরীক্ষারই অন্তর্গত।

রচনাধর্মী পরীক্ষার সুবিধা

(Advantages of Essay type Examination)

প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। **উত্তরপত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি ও বিচারসহ উপস্থিত করার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে ওঠবার সুবিধা হয়।** একই প্রশ্নে একটি মাত্র উত্তর নাও হতে পারে। ছেলেমেয়েরা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত প্রশ্নের বিভিন্ন দিক বিচার করে যুক্তি দিয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারে। **পরীক্ষার্থীদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ থাকায় চিন্তাশক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে।** নিজের উপস্থাপিত বিষয়টিকে যুক্তিপূর্ণ করার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও বাইরের বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করে। বিষয় উপযোগী বহু প্রয়োজনীয় বই পড়ার প্রেরণা তারা লাভ করে।

চিন্তার বিকাশ ও যুক্তির স্বাধীনতা

রচনামূলক পরীক্ষায় নিজের বক্তব্যকে সুশৃংখলভাবে উপস্থিত করতে হয়। এর ফলে চিন্তাধারা ও সমস্যার যুক্তি গ্রাহ্য বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। **রসানুভূতিমূলক কল্পনা শক্তির প্রকাশ ও রচনায় শিক্ষার্থীর দক্ষতার পরিচয় প্রচলিত পরীক্ষায় যেভাবে পাওয়া যায় অন্য কোন পরীক্ষায় সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।** রচনাত্মক পরীক্ষায় শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞানই নয় তার প্রকাশ ক্ষমতার বিচারও হয়।

প্রকাশ ক্ষমতার বিচার

রচনাত্মক **পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ।** পাঠক্রম নির্ধারিত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষাই এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা সম্ভব।

পরীক্ষা পরিচালনা সহজ

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে এই পরীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে "*...that essay type tests are easy to prepare and administer, that it is possible to use them for all subjects of curriculum and that they have values not possessed by the objective test in as much as they call for comparison, for interpretation of facts for criticism and for other forms of higher mental activity.*"

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি
(Defects of Essay type Examination)

॥ এক ॥ **নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব (Want of Objectivity) :**

পরীক্ষার মাধ্যমে যে মূল্যায়ণ হয় তা নির্ভরযোগ্য হবে এই আমরা আশা করি। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই পরীক্ষা ব্যক্তিমুখীন (subjective) হওয়ায় এর নির্ভর যোগ্যতার একান্ত অভাব। পরীক্ষার খাতার নম্বর (marks) দেওয়া অনেকখানি 'পরীক্ষকের' সময়-মাফিক মেজাজ বা খেয়াল খুশীর (Personal equation) উপর নির্ভরশীল। যদি পরীক্ষকের মেজাজ ভাল থাকে তাহলে তখন খাতা দেখে যতবেশী নম্বর দেবেন মেজাজ কোন কারণে বিগড়ে গেলে তিনি সেরকম নম্বর দেবেন না। অর্থাৎ বেশী নম্বর কি কম নম্বর পাওয়া শুধুমাত্র উত্তরপত্রের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না, এটা অনেকটা পরীক্ষকের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল। Prof. Sandiford কিছুটা ঠাট্টা করে বলেছেন—"*It (Pass mark) alters from hour to hour, and does not mean the something before lunch and after lunch.*"

॥ দুই ॥ **নির্ভরযোগ্যতার অভাব (Want of Reliability) :**

বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মান আলাদা—তাই রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্র বিচারে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মান রক্ষিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উত্তরপত্রের বিচার করে নম্বর দেন। তার ফলে একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হলে তাঁদের দেওয়া নম্বরে বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হবে। এমন কি একই পরীক্ষক এক খাতা দু'বার দেখলে দু'রকম নম্বর দেবেন। দুটি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখা যায় একজন ৪৫ নম্বর পেয়েছে আর একজন ৪৭ নম্বর পেয়েছে তা দিয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। কারণ আর একজন পরীক্ষকের বিচারে হয়ত বিপরীত ফলই হতে পারে। এ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, কয়েকটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হ'ল তা দিয়েই আমরা বিচারের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

একবার Dr. Ballard কয়েকজন পরীক্ষক দিয়ে কতকগুলি উত্তরপত্রে

পরীক্ষা করালেন। দেখা গেল পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছে কিন্তু পার্থক্য এত বেশী যে বিশ্বাস করা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষক যে খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন আর একজনকে সেই খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি উত্তরপত্র বাছাই করা অভিজ্ঞ পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করান হয়েছিল। এর পর যা ঘটল তা আরো আশ্চর্যজনক। তিনি কয়েক বছর বাদে সেই পুরোন উত্তরপত্রগুলিই আবার সেই পরীক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা করালেন, এবার দেখা গেল পূর্বে যিনি যে খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছিলেন তিনিই সেই খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন।

একই উত্তর পত্রে নম্বরের বিভিন্নতা

Prof. Sandiford বলেছেন একটি প্রবন্ধ একবছর লিখে একজন ৮০ নম্বর পেয়েছিল। ঠিক সেই প্রবন্ধটিই আর এক বছর লিখে একজন ৩৯ নম্বর পেয়েছিলেন। School Certificate পরীক্ষায় কয়েকটি উত্তরপত্র একই রকম বিবেচিত হওয়ায় সেই উত্তরপত্রগুলি একই রকম নম্বর পাবার যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর সেই উত্তরপত্রগুলিকে অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে পাঠান হয়। দেখা গেল বিচারে নম্বরের পার্থক্য হয়েছে ২১-৭০ পর্যন্ত। বুদ্ধি দিয়ে কি এর কোন ব্যাখ্যা চলে। Prof. Sandiford তাই বিদ্রূপ করে বলেছেন,—*'It (marks) alters from hour to hour and does not mean the something before lunch and after lunch."*

Prof. Sandiford-এর বক্তব্য

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার পূর্বে একটি ব্যাখ্যা প্রাইভেট টিউটারকে দিয়ে লিখিয়ে মুখস্থ করেছিলাম। আর একটি ছেলেও সেটি লিখে নিয়ে মুখস্থ করেছিল। কপালগুণে ব্যাখ্যাটি পরীক্ষায় এসেছিল। দু'জনেই নির্ভুলভাবে লিখেছিলাম। আমি পেলাম তিন, আর সে ছেলেটি পাঁচ। মাষ্টার মশায়কে বলতে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিলাম সে কথা আজও মনে আছে। সেদিন আমার শিক্ষক যা করেছিলেন আজ আমরা খাতা দেখতে গিয়ে ঠিক তাই করি, একথা স্বীকার করতেই হবে।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

অতি আধুনিক কালে আমাদের দেশে পরীক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। বিগত ২রা জানুয়ারী (১৯৬৫ খ্রী:) অমৃত বাজার পত্রিকায় University Grants Commission পরীক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তার ফলাফল কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদের শতকরা ৬০ ভাগ পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটির জন্য ফেল করে। পরীক্ষকের ভুলে প্রতি পত্রে ৭ নম্বর কম পায় (**Examiner's errors are not less than 7 marks per script**)।

University Grants Commission

একই মানের খাতা বেছে নিয়ে দেখা গিয়েছে যেখানে একজন পরীক্ষক শতকরা ৬০ জন পাস করিয়েছেন সেখানে অন্য একজন পরীক্ষক পাস করিয়েছেন মাত্র শতকরা ১১ জন।

ঢাকা টিচার্স ট্রেণিং কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ Dr. West অনুসন্ধান করে একই রকম তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন *"Examinations are the webs of penelope. What the teachers do the examiners undo."*

॥ তিন ॥ **যথার্থ্যের অভাব (Lack of Validity) :**

রচনামূলক পরীক্ষায় যে নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয় মূল্যায়ণের সময় বিষয়বস্তু ছাড়া আরো কয়েকটি উপাদান পরীক্ষকের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক মাত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন ইতিহাস কি ভূগোলের পরীক্ষায় পরীক্ষক বিষয়-জ্ঞানের পরিমাণের সাথে উত্তরদাতার রচনা শক্তি, বানানের নির্ভুলতা, সুন্দর হাতের লেখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। দু'টি ছাত্রের ইতিহাসের উত্তর তথ্যগত দিক থেকে একই রকম হলেও যার খাতায় এই ত্রুটিগুলি থাকবে সে কম নম্বর পাবে। ইতিহাসের পরীক্ষা রচনাশক্তি কি বানানের নির্ভুলতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কতটা সঙ্গত তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তাকে অস্বীকার করা যায় না।

॥ চার ॥ **অনুমান নির্ভর পরীক্ষা :**

রচনামূলক পরীক্ষায় সমস্ত পাঠক্রমের উপর সুবিচার করা সম্ভব হয় না। তিনশত পাতার একখানা বই থেকে ১০ কি ১২টি প্রশ্ন করা হবে, ছেলেমেয়েদের তার মধ্য থেকে ৫।৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হবে, সমস্ত বই থেকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। তার ফলে ছেলেমেয়েরা বাছাই করে প্রশ্ন নির্বাচিত করে মুখস্থ করে। Note, Digest, Sure Success প্রভৃতির সাহায্যে 'যেন তেন' প্রকারে পরীক্ষা পাসের ফিকির খোঁজে। সারা বছর বই পড়ে একটি ভাল ছাত্র হয়ত কম নম্বর পেল, আর একটি সুযোগ সন্ধানী ছাত্র কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন বেছে নিয়ে 'বরাত জোরে' বেশী নম্বর পেল, এর ফলে ছেলেমেয়েরা cramming বা note learning-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমস্ত বিষয়টিকে না জেনেও পরীক্ষায় পাস করতে বেগ পেতে হয় না।

কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করার প্রবণতা

॥ পাঁচ ॥ **অনিশ্চিত :**

রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা ছাত্রদের কাছ থেকে কতটুকু জানতে চান তা সব সময়ে বোঝা যায় না। তাই দেখা যায় উত্তর জানা থাকলেও ছাত্রেরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে পারে না। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র অনেক সময় দীর্ঘ হয়, ছেলেরা অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারে না।

এই পরীক্ষায় সঠিক মূল্যায়ণের পথে অনেক বাধা আছে বলে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন। বিষয়াত্মক পরীক্ষার সাথে রচনাত্মক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই জাতীয় পরীক্ষায় সুফল পাওয়া যেতে পারে। নতুন ধরনের পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ যতদিন সম্ভব না হচ্ছে ততদিন এই পরীক্ষা ব্যবস্থার কি করে উন্নতির সাধন করা যায় আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। এইজন্য প্রশ্ন নির্বাচন ও নম্বর দেওয়া পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ধারণা থাকবে। এই জাতীয় পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সাথে চিন্তা, যুক্তি, বিচারপূর্বক উপস্থাপন, সৃজন ধর্মী ভাষ্য, প্রভৃতির উপর জোর দিতে হবে। কমিশন বলেছেন,—"*By itself this type of examination may not be expected to fulfil the basic conditions of a good test, but in conjunction with more objective techniques it may be utilised to great advantage. Moreover, until such time as objective examinations at all educational levels are evolved, this type will hold the field. It should, therefore, be the concern of all educational organisations improve this type also. This improvement can be brought about in the selection of test content, in the framing of questions, and in the scoring of results. The exact purpose of the examination must be understood by both the examiner and the students. The emphasis in this type of examination should be expressly on thought, acute reasoning, critical exposition, creative interpretation and other types of mental activity in relation to the materials of the course. Its main concern should be with topics involving relations and problems.*"

রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়

বস্তুনিষ্ঠ উদ্দেশ্যমূলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective Tests)

প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার দোষত্রুটি নিয়ে বহুদিন থেকে আলোচনা হচ্ছে। এর দোষত্রুটি কি করে দূর করা যায় তা নিয়ে আলোচনার সাথে ইউরোপ ও আমেরিকায় সঠিক মূল্যায়ণের নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কি না তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। আমরা দেখেছি রচনামূলক পরীক্ষার দু'টি প্রধান ত্রুটি :—**একটি ব্যক্তিমুখীনতা (Subjective), অপরটি নম্বর দেওয়ার অনিশ্চয়তা (inaccuracy in marking)।** প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যক্তিমুখীনতা দূর করে কৃতিত্বের মূল্যায়ণ যতটা সম্ভব নির্ভুল ও নির্ভর যোগ্য করে তুলবার উদ্দেশ্যে নতুন বস্তুনিষ্ঠ

প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্যই বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার উদ্ভব

(objective) পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের বিবর্তনের ইতিহাসে নতুন বলে এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে New Type Test বলা হয়। আজকাল এ ধরনের অভীক্ষার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সকল প্রশ্ন করা হয় বলে এই ধরনের অভীক্ষার মূল্যায়ণ যথাযথ হয়।

বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয় বলে নতুন বস্তুনিষ্ঠা পরীক্ষা নানারকম হতে পারে। যেমন,—**সত্য মিথ্যা নির্ধারণ (True-False Type), সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূরণ (Completion Type), শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (Multiple choice), সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer Test), সামঞ্জস্য সন্ধান (Matching Test) স্মৃতি মন্থন (Recall Type), সংজ্ঞা জ্ঞাপক (Definition type), সম্পর্ক জ্ঞাপন (Relation Type), পার্থক্য নির্দেশক (Distinction Type), শ্রেণী বিন্যাস (Classification Type), সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো (Arrangement Type), উপমান অভীক্ষা (Analogy Type Tests)**। একে একে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে,—

বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার বিভিন্ন ধরন

॥ এক ॥ **সত্য মিথ্যা বিচার (True-False Type) :**

এই জাতির প্রশ্নে একই সাথে কতকগুলি শুদ্ধ, কতকগুলি অশুদ্ধ উত্তর দেওয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের বলা হয় যেগুলি শুদ্ধ সেগুলির পাশে √ চিহ্ন ও যেগুলি অশুদ্ধ সেগুলির পাশে পাশে × চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দাও। যেমন,—

১। হর্ষবর্ধন বিভিন্ন দেশে ধর্ম মহাপাত্র প্রেরণ করেন।

২। ফা-হিয়ান নালন্দায় অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩। আকবর দীন ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন।

॥ দুই ॥ **সম্পূর্ণ করণ (Completion Type) :**

এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যে একটি কি দু'টি শব্দ উহ্য থাকে। ছেলে-মেয়েদের বলা হয় উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পূর্ণ করতে। সম্পূর্ণকরণ তথ্যগত হতে পারে, আবার রচনামূলকও হতে পারে। যেমন,—

১। বন্দেমাতরম সঙ্গীত—রচনা করেছিলেন।

২। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা—

৩। জন্মিলে—হবে অমর কে কোথা কবে।

॥ তিন ॥ **শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (Multiple choice Type) :**

প্রশ্নের নীচে সত্য মিথ্যা অনেক উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে থেকে শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করে নিতে হবে। যেমন,—

তাজমহল নির্মাণ করেন, আলাউদ্দীন খিলজী, মহম্মদ তুগলক, শাহজাহান, বাহাদুর শা।

নর্মদা একটি পাহাড়ের নাম, একটি দ্বীপের নাম, একটি নদীর নাম, একটি শহরের নাম।

॥ চার ॥ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer Test) :**

এই জাতীয় প্রশ্ন স্মৃতি নির্ভর হতে পারে। ইচ্ছা করলে এই প্রশ্নকে এমন-ভাবে তৈরী করা যেতে পারে যার ফলে শিক্ষার্থীকে একটু ভাবতে ও দু'কথা লিখতে হয়।

॥ পাঁচ ॥ **সামঞ্জস্য সন্ধান (Matching Test) :**

কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলেমেলো ভাবে দেওয়া থাকে সে গুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে দিতে হয়। যেমন,—

১৭৫৭ খ্রীঃ প্রথম পানিপথের যুদ্ধ

১৮৫৮ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ।

১৫২৬ খ্রীঃ সিপাহী যুদ্ধ।

॥ ছয় ॥ **স্মৃতি মন্থনমূলক (Recall Type) :**

সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। যেমন,—

ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে ?

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কি ?

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

॥ সাত ॥ **সংজ্ঞা জ্ঞাপক অভীক্ষা (Definition Type Test) :**

এই শ্রেণীর প্রশ্নে কতকগুলি প্রচলিত Term-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে বলা হয়। যেমন—

সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, দ্রব্য, অর্থ ইত্যাদি।

॥ আট ॥ **সম্পর্ক বিষয়ক অভীক্ষা (Relation Type Test) :**

এই জাতীয় অভীক্ষায় দু'প্রকার বিষয়ের সম্পর্ক জানতে চাওয়া হয়। যেমন—

লোকবসতির সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক বিচার কর।

অর্থনীতির সঙ্গে পৌরনীতির সম্পর্ক কি ?

অশোক ও আকবরের ধর্মমতের তুলনা কর।

॥ নয় ॥ **পার্থক্য নির্দেশক অভীক্ষা (Distinction Type Test) :**

দুই জাতীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে বলা হয় এ জাতীয় অভীক্ষায়, যেমন—

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

আকবর ও ঔরংজেবের ধর্মমত।

শেরশাহ ও আকবরের শাসন সংস্কার।

॥ দশ ॥ **শ্রেণী বিন্যাস (Classification Type) :**

একই জাতীয় বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করতে বলা হয়। যেমন—

(ক) পশ্চিম বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য—রবার, চা, কফি, পাট, ধান, গম, কার্পাস, যব, কোকো।

(খ) ভারতের দ্রষ্টব্য বস্তু ও স্থান—

তাজমহল, হোয়াইট হাউস, অজন্তা, পিরামিড, কুতুবমিনার, কোনারকের মন্দির, কন্যাকুমারিকা, সিমলা, পেট্রোগ্রাড, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, অমৃতসহ।

॥ এগার ॥ **সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো (Arrangement Test) :**

এক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনাকে কালানুক্রমিক সাজাতে বলা হয়। যেমন,—অশোক, বাবর, রিজিয়া, তিলক, হুসেনশাহ, টিপুসুলতান।

অনেক সময় আবার কতকগুলি বস্তুকে প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে সাজাতে বলা হয়। যেমন—

বিলাসের দ্রব্য, পানীয় দ্রব্য, খাদ্য দ্রব্য, পোযাক, পুস্তক।

॥ বার ॥ **উপমান অভীক্ষা (Analogy Type Test) :**

এই জাতীয় অভীক্ষায় দু'টি বস্তুর মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথা দেওয়া থাকে, তারপর শিক্ষার্থীদের কাছে তৃতীয় বস্তুটির সম্পর্কে ঠিক সেরূপ আর একটি বস্তু সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন—

দিন : রাত্রি : : আলো : —
গোরু : বাছুর : : ব্যাঙ : —
ক্ষুধা : খাদ্য : : তৃষ্ণা : —

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of objective Tests) :

বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সর্বপ্রধান সুবিধা হচ্ছে এ পরীক্ষার **নির্ভরযোগ্যতা।** এই পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার জন্য উত্তর পত্রের মূল্যায়নে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী, ভাল লাগা, মন্দলাগা, সময় মাফিক মেজাজ প্রভৃতির কোন স্থান নেই।

নির্ভরযোগ্যতা

এই পরীক্ষার একটি **প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর হতে বাধ্য ;** তাই উত্তরপত্র বিচারের মানের তারতম্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই। শুদ্ধ উত্তর লিখলে সমস্ত পরীক্ষকই সমান নম্বর দিতে বাধ্য। পরীক্ষকের মনোমত উত্তর হয় নি, তাই তিনি কম নম্বর দিয়েছেন ; একথা বলার সুযোগ এখানে নেই। পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব করেছেন এই অভিযোগ কেউ করবে না।

নির্ভুল উত্তর

রচনামূলক পরীক্ষায় বিষয়-জ্ঞানের সাথে ভাষা-জ্ঞান, রচনার অন্যান্য দোষ গুণ দ্বারা পরীক্ষক প্রভাবিত হন। এছাড়া পরীক্ষক একই সময় সবদিকে সমান মনোযোগ দিতে পারেন না। **বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষায় শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট উত্তর ছাড়া দ্বিতীয় উত্তর হবার অবকাশ নেই, তাই মান নির্ণয় সহজ ও নির্ভুল হয়।**

সঠিক নম্বর দান

এই জাতীয় অভীক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা (Subjectivity) থেকে মুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ (Objective)। তাই পরীক্ষকের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে যা তা নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়। এই জাতীয় অভীক্ষার **যথার্থ্য (validity)** আছে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করে যথাযথ পার্থক্য নির্দেশ সম্ভব হয়। বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় **তুলনীয়তা** (**Comparability**) বিদ্যমান। এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষার **প্রয়োগ যোগ্যতাও (Administrability)** অস্বীকার করা যায় না। কারণ উত্তরপত্র সঠিকভাবে পরীক্ষা করা ও নম্বর দেওয়া এই জাতীয় অভীক্ষায় কঠিন ও জটিল নয়।

বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় যথার্থতা, তুলনীয়তা ও প্রয়োগ যোগ্যতা

এই পরীক্ষায় **প্রশ্নের সংখ্যা বহু হওয়ায় সমগ্র পাঠক্রমের উপর প্রশ্ন করা চলে।** বেছে বেছে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে ভাল নম্বর পাওয়ার সুযোগ এখানে নেই। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে হলে, কি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সমগ্র পাঠক্রম আয়ত্ব করতে হবে। বিষয়টি না জেনে যা ইচ্ছা খুশী লিখলে এখানে নম্বর পাওয়া যায় না। রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর না জেনেও বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে এমন ভাবে লিখতে পারে যাতে অনেক সময় পরীক্ষক ফাঁকি ধরতে পারেন না। কিছু নম্বর দিয়ে বসেন। এই পরীক্ষায় পাশ কাটিয়ে জবাব দেবার অবকাশ নেই।

সমগ্র পাঠক্রমের উপর প্রশ্ন করা যায়

এই ধরনের অভীক্ষা পুস্তক নির্ভরতা ও মুখস্থ বিদ্যার হাত থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে। Note books, Suggestions ইত্যাদির দৌরাত্ম্য বিনষ্ট হয়, শিক্ষা প্রচলিত গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পায়।

পুস্তক নির্ভরতা ও মুখস্থ বিদ্যার অবসান

এই পরীক্ষায় সময়-পরিশ্রম কম লাগে। ছোট ছোট প্রশ্নের জবাব লিখতে কম সময় দরকার হয় তাই ছেলেমেয়েরা চিন্তার সময় পায়। উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে তেমন খুব বেশী সময় প্রয়োজন হয় না। খাতা দেখতে খুব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। উত্তরগুলি নির্দিষ্ট থাকার জন্য পরীক্ষকের গুরুত্ব কমে গিয়েছে।

পরীক্ষা গ্রহণের সময় কম লাগে

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Objective Tests) :

নতুন পরীক্ষায় প্রচলিত পরীক্ষায় দোষ ত্রুটি অনেকটা দূর করা সম্ভব হলেও এই পদ্ধতিরও কতকগুলি ত্রুটি রয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হ'ল **শিক্ষার্থীর সুশৃংখল চিন্তা-শক্তি প্রকাশের সুযোগ এই ধরনের পরীক্ষায় নেই।** বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে যুক্তির দ্বারা কোন বিষয় প্রতিপাদন বা উপস্থাপন করার কোন সুযোগ ও স্বাধীনতা এখানে নেই। ঘটনামূলক জ্ঞান, বিশেষ করে স্মৃতি নির্ভর জ্ঞানের পরীক্ষা নির্ভুলভাবে এই পদ্ধতিতে হয়। কিন্তু রচনাশক্তি বিকাশের উপর কোন জোর এই ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। কোন মৌলিক রচনা যুক্তিমূলক লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার বা স্বকীয় চিন্তাধারা গড়ে তুলবার সুযোগ এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে নেই।

এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর সুশৃংখল চিন্তাশক্তি ও ভাষাজ্ঞান প্রকাশের সুযোগ থাকে না

২) **প্রশ্নপত্র রচনা পরিশ্রম সাধ্য,** এই জাতীয় **প্রশ্নপত্র ছাপাতে ব্যয়ও অধিক হয়।** মুদ্রণ খরচ বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা কষ্ট সাধ্য। সকলেই এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারেন না। অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষককে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করতে দিলে মামুলি ধরনের প্রশ্নপত্র রচিত হবে।

এই অভীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা পরিশ্রমসাধ্য, ছাপানো ব্যয়সাধ্য

বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় যতগুলি সঠিক উত্তর হয় তত নম্বর পাওয়া যায়, উত্তরও খুব সংক্ষিপ্ত। তাই পরীক্ষার হলে অপরের দেখে উত্তর লেখার মনোবৃত্তি বেড়ে যায়। এইভাবে পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা দেখা দেয়।

অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা

৩) বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষা মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে অবৈজ্ঞানিক। এতে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বাড়ে না, ভাষাজ্ঞান হয় না, বিচার বিশ্লেষণী মনোভাব গড়ে উঠে না, কল্পনাশক্তি বিকশিত হয় না, মননের তীব্রতা আসে না। বার বার সত্যি-মিথ্যা, ভুল উত্তর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্লেষণী শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা যায় না। ফলে তা দূর করে তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের পথ দেখান যায় না। এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু বলাও খুব মুশকিল। অনেকে তাই এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে অমনস্তাত্ত্বিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে থাকেন।

বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষা অমনস্তাত্ত্বিক ও অবৈজ্ঞানিক

এই জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নের **উত্তর অনেক সময় কিছুটা আন্দাজ বা অনুমান করে দেওয়া সম্ভব।** একটি দাগ বা একটি ক্রশ চিহ্ন অথবা হাঁ৷ কি

না অনুমান করে লিখে দিলেও কোন কোন সময় কাজে লেগে যেতে পারে। কোথায় যে উত্তরটি অনুমান নির্ভর এ কথা বলা খুবই কঠিন। তাই Prof. Sandiford বলেছেন, পরীক্ষক সব সময় ঠিক করতে পারেন না কোথায় জ্ঞানের শেষ ও অনুমান শুরু হয়—*"The examiner cannot tell when knowledge stops and guessing begins."*

এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর অনুমান নির্ভরতা বেড়ে যায়

তুলনামূলক বিচার
(Comparative Judgement)

নতুন পরীক্ষায়ও দেখা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা ত্রুটিশূন্য নয়। Raymont বলেছেন, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্য সার্থক করতে হবে। একটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ, দ্বিতীয় হচ্ছে উন্নত ধরনের পাঠ-প্রেরণা যোগান। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার মূল্যায়ণ যাতে নির্ভুল হয় সে দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে যে পরিমাণ পড়াশুনা করা দরকার সে দিক থেকে কোন প্রেরণা যোগায় না। রচনামূলক পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের ভাল উত্তর লিখতে শুধুমাত্র শ্রেণীপাঠ্য বইই যথেষ্ট নয়, আরো বহু গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষায় নিজের পাঠক্রমের বাইরে থেকে কিছু প্রকাশের সুযোগ নেই। তবুও দোষ ত্রুটিকে মেনে নিয়ে বলা যায় নতুন পরীক্ষা কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। কমিশন বলেছেন—... *"That a battery of psychological and achievement tests be developed for use with Higher Secondary School students for the final test at the end of twelve years of schooling."*

বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার সুযোগ নেই

(১) রচনামূলক পরীক্ষায় একটি ছোট পত্রে অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে প্রশ্ন ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক বড় উত্তর দিতে বলা হয়। পরীক্ষার হলে গিয়ে নিজের তৈরী প্রশ্নগুলিকে প্রশ্নপত্রে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় অনেক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে অনেক বড় প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট উত্তর দিতে হয়। অনেক সময় আবার দাগ মেরে দিলেও চলে। বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় সমস্ত পাঠক্রমের উপর অনেকগুলি প্রশ্ন থাকে;—তাই এখানে ভাগ্যের প্রশ্নই আসে না। (২) রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তর-পত্র পরীক্ষা ও নম্বর দেওয়া কষ্টকর। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় এ কাজ অনেক সহজ। ভাল পরীক্ষার লক্ষণগুলি রচনাত্মক পরীক্ষা অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় বেশী আছে। রচনাত্মক পরীক্ষায় মুখস্থের সুযোগ থাকে, বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় তার

রচনাত্মক পরীক্ষা ও বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষায় তুলনামূলক বিচার

সুযোগ নেই। রচনাত্মক পরীক্ষা ব্যক্তিভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষা বস্তুনিষ্ঠ। দু'টি অভীক্ষারই দোষ-ক্রটি আছে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও আমরা রচনামূলক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ সাহিত্য বিষয়ে যেখানে রচনাশক্তির ও কল্পনাশক্তির পরীক্ষার প্রয়োজন সেখানে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা খুব উপযোগী নয়। Prof. Sandiford বলেছেন, দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও এই নতুন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী এবং প্রয়োজনানুরূপ পুরাতন পদ্ধতির সংমিশ্রণে নতুন পদ্ধতিকে ক্রটিমুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সাথে নতুন পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান করে পুরাতন পদ্ধতিকে যথাসম্ভব দোষ মুক্ত করার চেষ্টা করলে একে অধিকতর নির্ভরশীল করে তোলা যায়। পরীক্ষা-পদ্ধতিকে ক্রটি মুক্ত করতে হলে, নৈর্ব্যক্তিক করতে হবে; তাহলে পরিমাপ নির্ভুল হবে। অন্যান্য কুশলতা, রচনাশক্তি, বিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং কল্পনা শক্তি পরিমাপের জন্য রচনামূলক পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে। দু'টি ব্যবস্থার সংমিশ্রণে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। কি করে এই অসুবিধা দূর করা যায় তা নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের স্থির করতে হবে যে,—মিশ্রপদ্ধতিকে আমাদের পরীক্ষায় প্রয়োগ করার উপযোগী করে তোলা যায় কি না।

রচনামূলক পরীক্ষাকেও একেবারে পরিত্যাগ করা যায় না

মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিক্ষক সমিতির "Education & Research" উপসমিতির ৫।১।৬৬ তারিখে একটি সভায় রচনামূলক ও বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা পদ্ধতির সংমিশ্রণে বর্তমান পরীক্ষার সংস্কার করা যায় কি না সে সম্পর্কে আলোচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্কুলে আদর্শ মিশ্র প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে বিদ্যানগরে (বর্দ্ধমান) পশ্চিমবঙ্গের বহু অভিজ্ঞ প্রধান-শিক্ষক "পরীক্ষা পদ্ধতি" সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য এক আলোচনা চক্রে সমবেত হয়েছিলেন। সেই আলোচনায় সকলেই রচনামূলক পরীক্ষার ক্রটি সম্পর্কে আলোচনা করলেও তাকে বাদ দেবার কথা বলতে পারেন নি। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সাথে যুক্ত করে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষাকে কি করে দোষমুক্ত করা যায় তাঁরা সে চেষ্টা করারই পক্ষপাতী।

মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা

ব্যবহারিক পরীক্ষা
PRACTICAL EXAMINATION

পুঁথিগত বিদ্যার অবসান করে বাস্তবের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কযুক্ত করতে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব আজ সবাই স্বীকার করেছেন। শুধুমাত্র বই পড়ে কখনও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। Child Centric education-এ তাই শিক্ষার্থীর Activities-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবে, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়। জ্ঞানবিজ্ঞান আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান হ'ল প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞান। কাজেই বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগই বড়কথা। Science-এর বিভিন্ন বিষয়ে তাই ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন Stream-কে স্বীকার করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে এমন কিছু বিষয় আছে যাদের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। Physics, Chemistry, Biology, Agriculture, Home Science, Craft, Geography, Psychology, Fine Arts প্রভৃতি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল বিদ্যালয়গুলিতে তার অভাব দেখা যায়। যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, শিক্ষক ও কক্ষের অভাবই তার কারণ। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলির ব্যবহারিক শিক্ষা বিপর্যস্ত হচ্ছে ;—ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তা কোন রকম দায়সারা ভাবে। এসব বিষয়গুলির উপর যথাযথ ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে পারলে তাতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োগ-যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব হ'ত। বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলিকে যথাযথ ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা
INTERNAL AND EXTERNAL EXAMINATION

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal or School Examination) ঃ বিদ্যালয়ের শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করল তা পরিমাপ করার জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় থেকে এই পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করেই ছাত্রদের উন্নতি অবনতির বিচার ও ক্লাস প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যালয় বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করে

বহিঃপরীক্ষা (External or Public Examination) : বহিঃপরীক্ষা বা সাধারণী পরীক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়। আমাদের দেশে বহিঃপরীক্ষা সরকারী শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড পরিচালনা করে। প্রতিটি স্তরের জন্য একটি সাধারণ পাঠক্রম থাকে যা সব স্কুল বা কলেজে অনুসৃত হয়। তারপর নির্দিষ্ট শিক্ষাকালে সেই স্তরের শেষে সকলে একটি পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর পত্রের বিচার ও ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করা থাকে। পরীক্ষায় সাফল্যের স্বরূপ সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী প্রভৃতি দেওয়া হয়।

একটি সাধারণ পাঠক্রমের উপর বিদ্যালয়ের বাইরের কোন পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়

বহিঃপরীক্ষায় দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়,—যোগ্যতা নির্ধারণ ও নির্বাচন। প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপরীক্ষায় বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হয়। সাধারণভাবে বহিঃপরীক্ষায় পরিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারলেই যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ ঘোষিত হয়। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, *The purpose (of the external examination) is twofold, selective and qualifying—selecting those who have successfully completed a course and qualifying those from among many for the next higher."*

যোগ্যতা নির্ণয় ও নির্বাচন :—বহিঃপরীক্ষার দু'টি উদ্দেশ্য

সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব অসীম। এর ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। তাই বহিঃপরীক্ষার প্রশংসা ও নিন্দা দুই শুনতে পাওয়া যায়। আমরা এ ব্যবস্থার দোষ গুণ দুদিক নিয়েই আলোচনা করব।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব

মুদালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, "*External examination has a stimulating effect both on the pupils and on the teachers by providing well defined goals and objective standard of evaluation.'*

মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য

ছাত্র, শিক্ষক ছাড়াও একটি দিক রয়েছে তা হচ্ছে স্কুলের দিক। এ সম্পর্কে কমিশনের অভিমত হচ্ছে, "*Finally, external examination has another Great advantage, namely that it helps a school to compare itself with other schools.*"

বহিঃ পরীক্ষায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করা যায়

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার ফল শুভ হয় নি। পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু পরীক্ষাই শিক্ষার শেষ

কথা নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষাকে শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলে মনে করা হয় না। এদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার শেষ কথা। বহিঃপরীক্ষার সাফল্য বর্তমান সমাজে বৈষয়িক সাফল্যের একটা প্রধান উপায়। তাই জীবনে অর্থোপার্জন ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পরীক্ষা পাশ করাই হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনের শেষ কথা। শিক্ষা নয় পরীক্ষাই যেখানে মুখ্য এবং সেই পরীক্ষা যখন বহিঃপরীক্ষা তাকে নিয়ে যে বহু পঙ্কিলতার সৃষ্টি হবে তা স্বাভাবিক। প্রচলিত পরীক্ষার দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে যে সব কথা উল্লেখ করা হয় তা বহিঃপরীক্ষায় অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য বহু পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে। ডিগ্রীর সর্বনাশা মোহ শিক্ষার কি ক্ষতি করছে সে সম্পর্কে **রাধাকৃষ্ণণ কমিশন** বলেছেন *"A university degree is a kind of passport for jobs. With great economic pressure due to the prevailing poverty in the country, the insistence on a university degree as the minimum requirement even for posts of minor officials and clerks, has put a premium on a number of evils which have come to be associated with the examination system. It has subjected teaching to the examination, made it almost impossible to provide true education to develop wider interests, and has created temptations of cheating, corruption and favouritism. The obsession to secure, as it were a ticket in the lottery of job seeking has over shadowed the educational purposes which a good examination can serve."*

পরীক্ষায় পাশ করে চাকুরী গ্রহণ কই সকলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করে

সাধারণভাবে পরীক্ষা সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হলেও বিশেষ ভাবে বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য। বহিঃপরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাজগতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী আজ এই পাপচক্রে কবলিত। শিক্ষাব্যবস্থায় এর ক্ষতিকর প্রভাব সুস্পষ্ট।

শিক্ষাজগতে অরাজকতা

বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Raymont বলেছেন, বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ পরীক্ষাকে তাঁদের সর্ব-কর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করে। তার পর স্কুলের সময়-তালিকা, পড়াবার গতিপ্রকৃতি সব কিছু বহিঃপরীক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন এই ব্যবস্থায় জীবনে বৈষয়িক সাফল্যকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান প্রয়োজনীয় মনে করার প্রেরণা যোগায়। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানে কোনক্রমে পরীক্ষার বাধা অতিক্রম করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাধীন

পরীক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পরীক্ষক অনেক সময় প্রয়োজনীয় অংশ অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় অসার অংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যারা অপ্রয়োজনীয় অংশ জানে, প্রয়োজনীয় অংশ তারা অবশ্যই আয়ত্ব করেছে। এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন একটি বিষয়ের প্রধান বৈশিষ্টপূর্ণ অংশকেই তাঁরা বাদ দিয়ে চলেন। এর ফল শিক্ষার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর হয়।

পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ

বহিঃপরীক্ষায় তথ্যগত বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় যা শুধুমাত্র মুখস্থ করেই লেখা চলে। শিক্ষার্থীর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে আসবার সুযোগ যেখানে নেই সেখানে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করেই পরীক্ষা পাশ করে। মুখস্থ করে পাশ করার সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানেই প্রশ্ন বেছে পড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য প্রশ্নের বাইরে শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে চাইবে না।

মুখস্থ বিদ্যায় প্রাধান্য

এছাড়াও পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক শ্রমে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য হানি ঘটে।

বহিঃপরীক্ষার কুফলের প্রতিকার সম্পর্কে Raymont কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, পরীক্ষক সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা ও শিক্ষাদান ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে পারেন। পরীক্ষক মনে রাখবেন তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তা দিয়ে শুধু শিক্ষণীয় জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয় না, পরবর্তীকালে ছাত্ররা কি ভাবে পড়বে, কি ভাবে প্রশ্ন তৈরী করবে ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে তাও তারা প্রশ্নের ধরন দেখে স্থির করবে। পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষককের শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির করতে অনেকখানি প্রভাবিত করে। তাই পরীক্ষক প্রতিটি প্রশ্ন নির্বাচন করার সময় খেয়াল রাখবেন যে,—তাঁর প্রশ্নটির প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল হবে কি মন্দ হবে। প্রশ্ন সহজবোধ্য এবং যে শ্রেণীর জন্য করা হয়েছে তার উপযুক্ত হবে। এই প্রশ্ন কি পড়াবার ধারাকে ঠিক পথে চালিত করবে? এই প্রশ্ন কি মুখস্থ করতে প্রেরণা যোগাবে? প্রতিটি প্রশ্ন করার পূর্বে পরীক্ষক এসব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

সুচিন্তিত ও সঠিক প্রশ্ন শিক্ষাদানকে প্রভাবিত করে

শিক্ষকগণের মধ্য থেকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষক যে শিশুদের মনকে জানেন, একজন মস্ত পণ্ডিত যিনি স্কুলে শিক্ষার সাথে যুক্ত নন তিনি তাঁদের সে ভাবে জানতে পারেন না। বহিঃপরীক্ষার প্রভাব সম্পর্কে বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সাধারণ ছেলের মান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা একজন স্কুলের শিক্ষক যতটা জানেন স্কুলের শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন একজন পণ্ডিতের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই স্কুলের শিক্ষার সাথে যাঁর সম্পর্ক নেই তাঁকে প্রশ্ন পত্র রচনা করতে দেওয়া উচিত নয়।

শিক্ষকদেরই পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে

শিক্ষা ও পরীক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে। বহিঃপরীক্ষা ঘন ঘন হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর স্কুলজীবনের শেষেই একবার বহিঃপরীক্ষা হওয়া উচিত।

বহিঃপরীক্ষার বহু দোষ একথা মেনে নিয়েও একে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেবার কথা কেউ বলেন নি। মুদালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করার কথা বলেছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলও বিচার করে দেখা দরকার *"In the final assessment of the pupi's due credit should be given to the internal tests and internal records of the pupils. Even the public examination need not be compulsory for all, that is if pupils desire they need not be taken."*

বহিঃ পরীক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ

ফলশ্রুতি
(Results)

পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করে একথা বলা চলে যে, পরীক্ষার যত দোষ ত্রুটিই থাক না কেন, পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। একে আমরা ত্যাগ করতে পারব না। প্রচলিত পরীক্ষার সংস্কার সাধন করে কি করে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে যে আলোচনা হ'ল সেই আলোচনা সূত্র ধরে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি আলোচনা করা যেতে পারে।

রচনামূলক পরীক্ষা ও নতুন-পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্যে সংমিশ্রণ করে একটি নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতির সৃষ্টি করতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যার উত্তর শুধু মাত্র স্মৃতিনির্ভর হবে না। উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে কিন্তু কিছুটা চিন্তাশক্তি প্রকাশের সুযোগও থাকবে। তাহলে note, made easy, digest থেকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না এবং প্রশ্ন সংখ্যা বেশী করার সুযোগ থাকায় সমগ্র পাঠক্রম থেকেই প্রশ্ন করা সম্ভব হবে।

রচনা-মূলক পদ্ধতি ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতির সংমিশ্রণ করে পরীক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা

স্কুলের শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই এমন কোন লোককে বহিঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না। ইংরেজী ব্যতীত সমস্ত প্রশ্নপত্র মাতৃভাষায় রচিত হবে। রচনা মূলক প্রশ্নে কোন বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হবে না। প্রশ্নের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

প্রশ্নপত্র রচনা

চূড়ান্ত ফলাফল শুধুমাত্র বহিঃপরীক্ষা নির্ভর থাকবে না। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলের উপরও যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা থাকবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বিচার করতে হবে। সর্বাঙ্গীন বিকাশের মূল্যায়ণের জন্য সর্বাত্মক পরিচয়-লিপির সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

চূড়ান্ত ফলাফলের সময় আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার গুরুত্ব

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কোন ছাত্রকে আটকে রাখা হবে না। তিনটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের বিচার হবে। পরপর দুইটি পরীক্ষার বা একই বিষয়ে দুইটি পত্রের নম্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক পার্থক্য দেখা গেলে প্রধান শিক্ষক সেই পত্রের পুনরায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন। যে শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার প্রয়াসী নয় তাকে বহিঃপরীক্ষার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে School leaving Certificate-কে যারা বহিঃপরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের সাথে সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করতে হবে।

কয়েকটি পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাণ

পরীক্ষা সংস্কার
EXAMINATION REFORM

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে জিনিসটি সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে 'পরীক্ষা'। বর্তমানে মূল্যায়ণ (evaluation) কথাটা খুব শোনা যায়। কিন্তু মূল্যায়ণ আর পরীক্ষা সমার্থক নয়। পরীক্ষা (examination) মূল্যায়ণের একটি পদ্ধতি মাত্র। আমাদের দেশে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ পরীক্ষাকেন্দ্রীক। পরীক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এর কুফল সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমরা এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ থেকে আলোচনায় মুখর। তবুও লর্ডকার্জনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমালোচনার বেশী আমরা অগ্রসর হতে পারি নি।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ সমার্থক নয়

দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মুদালিয়র কমিশন, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার (আইন ও চিকিৎসা বাদে) জন্য কোঠারী কমিশন। তিনটি কমিশনই প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে তার সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছেন।

স্বাধীনতার পর তিনটি শিক্ষা কমিশন

কমিশনের সুপারিশ সমূহ যদি কাজে লাগাবার চেষ্টা হ'ত তাহলে হয়ত প্রতি বছর পরীক্ষার হলে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত না। প্রতি বছর পরীক্ষার সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা চলে দোষটা শুধু মাত্র পরীক্ষার্থীদেরই নয়, পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও কোন ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। পরীক্ষার হলে হৈ হাঙ্গামা কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন। এই হৈ-হাঙ্গামার কারণ পরীক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলি দূর করা।

পরীক্ষার স্বরূপগত ত্রুটিই পরীক্ষা বিভ্রাটের কারণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সংস্কার ও আনুসাঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। দু'টি কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন সেন মহাশয় বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন, সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন—"বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করাই হবে আমার প্রথম কাজ।" কিন্তু কিছু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরীক্ষা সংস্কার দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষা সংস্কার

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা একটি মাত্র সংস্কারও সুপারিশ করি তাহলে সে হবে পরীক্ষা সংস্কার। কমিশন আরো বলেছিলেন—পরীক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে তার আমূল সংস্কার আরো বেশী প্রয়োজন। কুড়ি বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছিল। আজ কুড়ি বছর বাদে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গিয়েছি। এতদিনে বিষ বৃক্ষে ফল ফলেছে তাই চারিদিকে 'ত্রাহি মধুসূদন' রব।

পরীক্ষা সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হয় নাই

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন গঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের জন্য। কমিশন পরীক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা একই সাথে চিন্তা করেছেন। কমিশনের অভিমত—শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা মাধ্যমিক কলেজে বারো বছরের শিক্ষা শেষ করতে হবে। কলেজগুলির ভীড় কমাতে হবে। কলেজে কাজের দিন বাড়িয়ে ১৮০ দিন পরীক্ষার দিন বাদে করতে হবে। ছোট ছোট শ্রেণীতে (Tutorials) ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার্থীদের প্রচুর লেখার অনুশীলন করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের অভিমত

পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে—রচনাত্মক পরীক্ষার দোষ ত্রুটি থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত করতে হলে বস্তুধর্মী পরীক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট স্থান পরীক্ষার মধ্যে থাকবে। শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজকে অবহেলা করলে চলবে না। শ্রেণীর

কাজের জন্য প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণমানের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট রাখা হবে। প্রথম ডিগ্রীর তিন বছরের পড়া একটি মাত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করা সঙ্গত নয়—তাই সমগ্র পাঠক্রমকে তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ unit-এ ভাগ করে নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা রচনাধর্মী না হয়ে যতটা সম্ভব বস্তুধর্মী (objective) করা হলে নম্বর দেওয়ার অসুবিধা অনেকটা দূর হবে। পরীক্ষক নিয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একটি বিষয় পাঁচ বছর পড়ালেই তিনি সেই বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হতে পারবেন।

পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার যৌক্তিকতা মুদালিয়র কমিশন স্বীকার করে ও কয়েকটি অসুবিধা দেখিয়ে ১১ বছরের শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন। ফলটা যে সুফল হয় নি কোঠারী কমিশন তা বুঝতে পেরে ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা

স্কুল কি কলেজের কাজের দিন বাড়ানোর সুপারিশ সব কমিশন করে থাকে। এবং তাতে কেউ কান দেয় না। কুড়ি বছর বাদে দেখছি কাজের দিন বাড়ে নি বরং কমেছে। সময়ের অভাবে course শেষ হয় না। ফলে পরীক্ষার হলে চেয়ার বেঞ্চ ভেঙ্গে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়।

স্কুল-কলেজে কাজের দিন বাড়ানো

Tutorial class অধিকাংশ রুটিনের শোভাবর্ধন করে মাত্র। প্রচুর লেখার অনুশীলন—কোথাও হয় না। আর লিখলেই বা দেখবে কে?

পরীক্ষা সংস্কারের পথে **Internal assessment** একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ, কিন্তু এদিক থেকে কিছু করার সাহস আমাদের নেই।

মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে প্রথমেই বলেছেন বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের আংশিক বিচার হয়—**সাধারণ শিক্ষা ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সে কতটুকু অর্জন করেছে academic and intellectual attainment** শুধু মাত্র তাই জানার চেষ্টা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিশনের অভিমত—"*If examinations are to be real value they must take into consideration the new tucts and test in detail in all round development of pupils.*"

পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্প্রকে মুদালিয়র কমিশন

পরীক্ষা শিক্ষক অভিভাবক ও ছাত্র সবার উপর কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা লক্ষ্য করে দুঃখের সাথে মন্তব্য করেছেন—"*The examination determines not only contents of education but also the method of teaching—in fact the entire cpproach of education. They have so pervaded the entire atmos-*

পরীক্ষার বিষময় প্রভাব

phere of school life that they have become the man motivating force of all effort on the part of the pupil as well as teacher."

ছাত্রদের লক্ষ্য, কি করে পাশ করা যায়। পাশ করার জন্য যে কোন পথ বেছে নিতে তারা দ্বিধা করে না। কারণ পরীক্ষা পাশের সাথে জড়িয়ে আছে

কি করে পাশ করা যায়

তাদের ভবিষ্যৎ। কমিশনের সিদ্ধান্ত *"He is more interested in notes and cribs than in text books and original works, he goes on for cramming rather than for intellectual understanding since this will help him to pass the examination on which depends his future."*

শিক্ষক মহাশয়ও যে কোন ভাবে পাশের পাগলামি থেকে মুক্ত নন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে শিক্ষকের সাফল্য বিচার হবে তিনি কতজন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিতে পারলেন তার উপর। স্কুলের বিচার এই একই মানদণ্ডে হচ্ছে। পরীক্ষা পাসের ভিত্তিতে সাহায্যের রীতি বহুদিন বাতিল হয়ে গিয়েছে—অথচ এই বিচারের মধ্য দিয়ে সেই প্রথাকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

পরীক্ষা পাসের ভিত্তিতেই বিদ্যালয় ও শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার

অভিভাবক চান—ছেলে পাস করুক—কি ভাবে পাস করল তা তিনি দেখতে, কি জানতে চান না। পরীক্ষা পাসের সাথে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে—তাই পাস হলেই হ'ল।

অভিভাবকের আশা

এর পর কমিশন মন্তব্য করেছেন—*"Pupils asses education in terms of success in examination"*. আমরা একটু বাড়িয়ে বলতে পারি সবাই পরীক্ষা পাশের মাপ কাঠিতেই শিক্ষা ও শিক্ষিতের বিচার করেন।

বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলেই আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই কমিশন পরীক্ষা সংস্কারের জন্য প্রথমেই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমাতে বলেছেন। বহিঃপরীক্ষা হবে মাত্র একটি। Public examination সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। স্কুলের কোর্স শেষ হলে তাকে তার বিভিন্নদিকের কৃতিত্ব বিচার করে কৃতিত্বের পরিচয় সূচক School certificate দেওয়া হবে।

বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

বর্তমান রচনাত্মক পরীক্ষা ব্যক্তি মুখীন (Subjective) হতে বাধ্য। তবু এই ত্রুটিকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পরীক্ষার রীতি ও প্রশ্নের **ধরন (nature of test and type of question)** বদলাতে হবে। **বস্তুধর্মী পরীক্ষার (objective test) ব্যবস্থা করতে হবে।**

রচনাধর্মী পরীক্ষা

একটি ছাত্রের চূড়ান্ত বিচার একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়। আভ্যন্তরীণ বিচার (internal tests) ও শিক্ষকদের দ্বারা তৈরী school record প্রভৃতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্কুলের আভ্যন্তরীণ বিচার শুধু মাত্র annual পরীক্ষা ফল দেখেই করা হবে না। Periodical tests ও স্কুলে যে উন্নতির রেকর্ড রাখা হয় সব দেখে চূড়ান্ত বিচার করা হবে।

Internal assessment

সামগ্রিক মূল্যায়ণের জন্য স্কুলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (Cumulative record card) রাখা হবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ও আভ্যন্তরীণ বিচারের সাথে যুক্ত হলে বহিঃপরীক্ষা দ্বারা সত্যিকারের উপকার হবে।

C. R. C.

বর্তমানে আমরা যে ভাবে নম্বর দিয়ে থাকি সে সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য হচ্ছে—"*It is indeed difficult to distinguish between two pupils one of whom obtains, say 45 marks another 46 or 47 .. It must however be admitted that difference of a few marks on the percentile scale is more often a matter of chance than of exact determination*". কমিশন যা বলেছেন তা একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যে ছাত্রটি ২৮ কি ২৯ পেয়ে ফেল করল তার সাথে যে ৩০ কি ৩১ পেয়ে পাশ করল তার কি সত্যি কোন পার্থক্য আছে। এ জন্য কমিশন Five point scale-এর মাধ্যমে কৃতিত্ব বিচারের মাননির্ধারণের সুপারিশ করেছেন।

পরীক্ষার নম্বর দান ও Five point scale

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরীক্ষার সাথে স্কুলের কাজের দিন বাড়ানোর **প্রশ্নটি** জড়িত তাই কমিশন স্কুলে কাজের দিন বাড়াবার সুপারিশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির জন্য নিয়োজিত দু'টি কমিশনই পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ে একই রকম সুপারিশ করেছেন। বহিঃপরীক্ষার প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা, রচনামূলক পরীক্ষায় নির্ভর যোগ্যতার অভাব; Objective Type Test-এর সাহায্যে রচনাত্মক পরীক্ষায় ত্রুটি থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করা প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশসমূহ প্রায় একই রকম।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

চূড়ান্ত ফলাফল বিচারে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার সুপারিশ বিশেষ জোরের সাথে দু'টি কমিশনই করেছেন।

এরপর শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন। দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার করে কোঠারী কমিশন পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা সবাই জানেন। পরীক্ষাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মূল্যায়ণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটা নিরবচ্ছিন্ন

কোঠারী কমিশন

প্রক্রিয়া (Continuous Process) এই মূল্যায়ণের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি শিক্ষার্থীর বিকাশ বাঞ্ছিত পথ ধরে হচ্ছে কি না। তাই সঠিক মূল্যায়ণ পদ্ধতি হবে—যথার্থ, নির্ভরশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব (valid, reliable objective and practicable)।

বর্তমানে লিখিত পরীক্ষাই মূল্যায়ণের একমাত্র পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে এমন উন্নত করতে হবে যাতে এই ব্যবস্থা শিক্ষায় কৃতিত্ব বিচারের বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল পদ্ধতি হয়ে ওঠে। কমিশনের মতে পরীক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে—*The whole purpose is to reform the existing examination by making it less formal, reducing its burden on the pupils mind and increasing its validity as a measure of educational attainment."*

লিখিত পরীক্ষাকে নির্ভরযোগ্য করতে হবে

কোঠারী কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিমত জানিয়েছেন—

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বাধ্যতামূলক বহিঃপরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করেন না। তবে শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষা ও কৃতিত্বের উপযুক্ত মূল্যায়ণের জন্য জেলা স্তরে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় এরূপ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রাথমিক পর্যায় শেষে বহিঃপরীক্ষার প্রয়োজন নাই

মাধ্যমিক শিক্ষায় বহিঃপরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—এর প্রধান দুর্বলতাগুলি রয়েছে প্রশ্ন ও প্রশ্ন রচনার ধরনের মধ্যে। প্রশ্নকর্তা নির্বাচনের সময় মোট কার্যকাল (Seniority), শিক্ষাদানে অভিজ্ঞতা (Teaching experience), বিষয় যোগ্যতা (Subject Competence প্রভৃতি বিচার করা হয়। তবুও দেখা গিয়েছে এদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই 'Valid and reliable test' এর জন্য প্রশ্ন রচনার অভিজ্ঞতা বা প্রশ্ন রচনার কৌশল জানা আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় বহিঃপরীক্ষার ত্রুটি

প্রশ্ন রচনার উন্নতির সাথে উত্তর পত্রের মূল্যায়ণ, নম্বর দেবার পদ্ধতি আরো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যুক্তি সিদ্ধ ও নির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে সব দিক থেকে বুঝতে হলে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের প্রথম বাধা বা অসুবিধা হচ্ছে স্কুলগুলি অতিরিক্ত নম্বর দেবে (Over assessment)। কমিশন বলেছেন, পরিদর্শকেরা আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতির উপর লক্ষ্য রাখবেন। বহিঃপরীক্ষা ও আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর তুলনা

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ

করে দেখা হবে। যে সব স্কুল অতিরিক্ত নম্বর দেবার দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে, মর্যাদা হ্রাস পাবে, বার বার অপরাধ করলে অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—আমাদের চেষ্টা করা উচিত একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে যে বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থা আছে তাকে বাতিল করে সে জায়গায় শিক্ষকদের দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করা।

পরীক্ষা থাকবেই

বর্তমানে তা সম্ভব নয়। পরীক্ষা **থাকবেই**। তাই বর্তমান অবস্থায় দু'টো ব্যবস্থা করা যেতে পারে—চূড়ান্ত পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য ঘন ঘন Periodical assessment এর ব্যবস্থা করতে হবে। বহিঃপরীক্ষার সাথে Periodical পরীক্ষার ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ ব্যবস্থার উপর কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কমিশন মূল্যায়ণ পদ্ধতির সংস্কারের (reform of evaluation) সুপারিশ করেছেন।

প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে তিনটি কমিশন

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে তিনটি কমিশনই বিশদ আলোচনা করেছেন। তাদের সুপারিশ-সমূহের মধ্যে 'লক্ষণীয় ঐক্য' রয়েছে। একটি মাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষায় ছাত্রদের ভাগ্য নির্ধারিত হবার ফলে স্কুলে কি কলেজে ছাত্ররা সারা বছর ক্লাশে কি পড়ান হ'ল সেদিকে মনোযোগ দেয় না। **পরীক্ষার কিছু দিন আগে মরীয়া হয়ে মুখস্থ করে পাশ করার চেষ্টায় লেগে যায়।** বহিঃপরীক্ষার অত্যধিক গুরুত্বের ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই পরীক্ষাকেন্দ্রীক হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার দিকে চোখ রেখেই ক্লাসে পড়ান হয়। কমিশনের আলোচনা এই সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সঙ্গে বহিঃপরীক্ষার সংমিশ্রণ

পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশ থেকে আর একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হচ্ছে Internal assessment এর উপর গুরুত্ব দেওয়া। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের কথা তিনটি কমিশনই অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন। অসুবিধার কথা মেনে নিয়েও বলা যায় এ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের তরফ থেকে আপত্তির কথা শুনেছি বেশী নম্বর দেওয়া হবে। এটা লজ্জার কথা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হবার সম্ভাবনা আছে। কোঠারী কমিশন যে সতর্কতার কথা বলেছেন সে পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি। Periodical পরীক্ষার সাথে যদি চূড়ান্ত বহিঃপরীক্ষাকে যুক্ত করে দেখা হয় তাহলে কিছু উন্নতি হতে বাধ্য। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ৩৩% মার্ক এজন্য রাখতে বলেছেন। অবিলম্বে ২০% বা ২৫% মার্ক দিয়ে

এ কাজ শুরু করা উচিত। স্কুল বা কলেজের সততার উপর নির্ভর করেই এ কাজ শুরু করতে হবে। কার্যক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পাঠক্রম শেষ করতে হবে

কলেজ বা স্কুলের কোর্স শেষ হয় না—এ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কোর্স শেষ হবে না অথচ পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে এটা অন্যায় অত্যাচার। কোর্স কেন শেষ হয় না এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। কোর্স অত্যন্ত ব্যাপক হলে কোর্স কমাতে হবে। স্কুল কলেজে কাজের দিনও বাড়াতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠ অভীক্ষাও নির্ভরযোগ্য নয়

রচনাত্মক পরীক্ষা নির্ভরশীলতার অভাব দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার কথা প্রায়ই বলা হয়। বর্তমানে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার যে রূপটির সাথে আমরা পরিচিত তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এদিক থেকে বাংলাদেশে কোন চেষ্টা চলছে বলে জানা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি ও পরীক্ষা বিষয়ক এক সেমিনারে 'Short answer type question নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিছু কাজ হয়েছে বলে শুনি নি। রচনাত্মক ও বস্তুধর্মী পরীক্ষার মাঝামাঝি একটা পথ খুঁজে নিতে হবে। ছোট ছোট প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ হবে সে ভাবে নীচের দিক থেকে চেষ্টা করা যেতে পারে।

A. B. T. A. ও W. B. C. U. T. A-র প্রচেষ্টা

পরীক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (A. B. T. A) ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি (W. B. C. U. T. A) অনেক আলোচনা করেছেন, অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট দাবী নিয়ে আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু সবই হয়েছে নিষ্ফল। এ ব্যাপারে সরকার ও কর্তৃপক্ষের অবহেলা বিস্ময়কর। কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অঙ্কই সরকারী শিক্ষানীতির চরিত্র প্রকাশ করে।

স্কুল কলেজের ভীড় কমান, Tutorial ক্লাসে লেখার অনুশীলন শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো এগুলি শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন রচয়িতাদের শৈথিল্য

প্রশ্ন রচয়িতা সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে, তাঁরা সবাই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে এমন সব অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার দেখা যায়, তখন মনে হয় এঁরা কোন্ কোর্সে, এবং কাদের জন্য প্রশ্ন করছেন তা বোধ হয় জানেন না। অনেক সময় বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রশ্নে বিদ্যা জাহির করেন। তাতে যে তরুণ বিদ্যার্থীদের প্রাণান্ত হয় এ কথা তাঁরা মনে রাখেন না। প্রশ্নে ত্রুটি থাকলে প্রশ্নকর্তাকে অবসর নিতে বলাতে হবে।

আজকাল বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ান হচ্ছে বাংলায় প্রশ্নের সময় ইংরেজী। এই অবাস্তব বুদ্ধি কেন? প্রশ্ন ইংরেজীতে যদি হয়, আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদ থাকবে। দেখতে হবে অনুবাদ যেন ঠিক হয়। অনেক সময় পরীক্ষার অনুবাদে অনেক ত্রুটি থাকে।

প্রশ্নের অনুবাদে ত্রুটি

অতি আধুনিক দু'টি রোগ সম্পর্কে উল্লেখ করছি; গ্রেস মার্ক ও পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন। পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে ডাঃ সত্যেন সেনের দৃঢ়তা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। গ্রেসমার্ক কি পরিমাণ দেওয়া হয় সঠিক জানা নেই তবে শুনেছি অনেক সময় গ্রেসের ধাক্কায় পরীক্ষা পাসটা অত্যন্ত ডিসগ্রেস ফুল হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রেস মার্ক ও পরীক্ষার তারিখ বদলানো

পরীক্ষার ত্রুটি কোথায় তা আমরা জানি—সংস্কারের জন্য কি করা উচিত সে সম্পর্কেও আমরা একেবারে অজ্ঞ না। তবে কিছু হচ্ছে না কেন? কোঠারী কমিশনের ভাষায় তার জবাব দিচ্ছি—"*As we said earlier, what is lacking is not knowledge, but will courage and perseverance to work out its implementation.*"

মূল্যায়ন

(Evaluation)

শিক্ষা আজ সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রীক। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাস করার জন্য। অনেক সময় তারা কোন রকমে পাস করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠে। তখন শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি ধুলিলুণ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রীক এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যথাযথ পরিমাপ অসম্ভব। গতানুগতিক এই ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষার কবলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আজ কবলিত। শিক্ষাকে পরীক্ষার শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দেখে বর্তমানে সকলে মূল্যায়ণের (Evaluation) কথা বলে থাকেন, 'পরীক্ষা' ও 'মূল্যায়ণ'—এই শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। মূল্যায়ণের পরিধি পরীক্ষার গণ্ডীর থেকে অনেক বেশী। বছরের কোন একটি দু'টি সময়ে শিক্ষার্থীকে যখন কোন বিষয়ের উপর ৪।৬টি প্রশ্নের উত্তর ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে দেওয়া হয় এবং তার মাধ্যমেই যখন তার শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করা হয় তখন তাকে পরীক্ষা বলে। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা সংস্কারের কথাও অনেকে বলেছেন। তাই পরীক্ষার পরিবর্তে আজ মূল্যায়ণের কথা বলা হয়। মূল্যায়ণ হ'ল এমন একটি বৈজ্ঞানিক পরিমাপ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, দক্ষতা, মানসিক প্রবণতা প্রভৃতি

শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ণ

যথাযথ মূল্যায়ণ সম্ভব হয়।) শিক্ষার্থীর সমস্ত শিক্ষাকর্মের সময় এই মূল্যায়ণ করা হয়। শিক্ষা একটি গতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে বিচিত্র সম্ভাবনার পথে বিকশিত হয়। শিক্ষা হ'ল শিক্ষার্থীর জীবনে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, বুদ্ধি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ঈপ্সিত পরিবর্তন সাধন করা এবং সেই পরিবর্তন যথাযথভাবে হয়েছে কি না তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষায় তা সম্ভব নয়। তাই মূল্যায়ণের কথা বলা হয়।

পুস্তকসর্বস্ব প্রচলিত শিক্ষার আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ পরিমাপ প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। প্রচলিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রতিফলিত হয় না। তাই প্রয়োজন হয় মূল্যায়ণের। মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত বিকাশের যথাযথ পরিমাপ করা যায়। C. M. Brown বলেন, *"Evaluation is essential in the never ending cycle of formulating goals, measuring progress towards them and determining the new goals which emerge as a result of new warning Evalution involves measurement which means objective quantitative evidence. But it is broader than measurement and implies that considerations have been given to certain values standards and that interpretation of the evidence has been made in the light of particular situation".* শুধু মাত্র পাঠক্রম (curriculum) ও তার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় (subjects) মধ্যে মূল্যায়ণ সীমাবদ্ধ নয়। মূল্যায়ণ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিমাপ। W. S. Manroe এর ভাষায়, *"In measurement the emphasis is upon single aspect of subjectmatter, achievement of specific skills and abilities where as in evaluation the emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational program".* কেবলমাত্র কৃতিত্বের (achivement) পরিমাপ নয়—সর্বাত্মক পরিমাপই হচ্ছে মূল্যায়ণ। এই মূল্যায়ণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের পরিমাপ সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী সম্বন্ধে এই পরিমাপ শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিশেষ সাহায্য করে।

মূল্যায়ণ কি ও কেন?

সার্থক মূল্যায়ণের বিভিন্ন কৌশল
(Different Devices of Evaluation)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মূল্যায়ণ একটি ধারাবাহিক ও চলিষ্ণু (continuous) প্রক্রিয়া। সার্থক মূল্যায়ণের কতকগুলি কৌশল আছে। সেগুলি হ'ল,—

॥ ১ ॥ **লিখিত পরীক্ষা (Written Examination)**ঃ শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষার জন্য বছরে সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা নিতে হবে। এই পরীক্ষা হবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সংমিশ্রণ। এতে রচনাত্মক প্রশ্ন (Essay type Questions), টীকাটিপ্পনী (Short notes), সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন (Short answer type questions), ও বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective tests) থাকবে। তবে এর জন্য প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে।

॥ ২ ॥ **মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test)**ঃ যথাযথ মূল্যায়ণের জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষাও গ্রহণ করতে হবে, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় সময়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে যথাযথ পরিমাপ ও মূল্যায়ণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, ভাষার দখল, উচ্চারণ ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, মনে রাখার ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব।

॥ ৩ ॥ **ব্যবহারিক পরীক্ষা (Practical Examinations)**ঃ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশল পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে হবে, এর উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পৃথক কক্ষ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

॥ ৪ ॥ **পর্যবেক্ষন (Observation)**ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণে থাকে। তারা শিক্ষক মহাশয়দের সামনে পড়াশুনা, কাজকর্ম ও খেলাধূলা ইত্যাদি করে। তাই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব। এই পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পর্যবেক্ষণ হবে সমস্ত শিক্ষকের ; তা না হলে তা পক্ষপাত দুষ্ট হবে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে রেকর্ড (Record) রাখতে হবে। এই সমস্ত তথ্যকে বাৎসরিক পরীক্ষা ও class promotion-এর সময় গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ ৫ ॥ **গৃহ পরিদর্শন (Home Visits)**ঃ শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন গড়ে ৩।৪ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে কাটায়। বাকী সময় তারা গৃহপরিবেশের মধ্যেই অতিবাহিত করে। কাজেই সেই পরিবেশে তাদের ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, প্রবণতা, ইত্যাদি কতখানি সাফল্য মণ্ডিত বা ব্যর্থ হয় তার মূল্যায়ণ গৃহ-পরিদর্শন ছাড়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া বহু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় পরিবেশে স্বাভাবিক হতে পারে না ; লজ্জা, ভয় বা সংশয় অনুভব করে। গৃহপরিবেশে যে ছাত্ররা বেপরোয়া সে আবার বিদ্যালয় পরিবেশে শান্ত হয়ে থাকে। কাজেই গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা, সামাজিক ব্যবহার, পরস্পর

সম্পর্ক, স্বাভাবিক প্রবণতা প্রভৃতি পরিমাপ করা যায়। এই পরিদর্শন বৈজ্ঞানিক করতে হবে এবং তথ্যগুলি রক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীর সম্পর্কে মূল্যায়ণের সময় গৃহপরিদর্শনের তথ্যগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ ৬ ॥ **অর্পিত দায়িত্বের পরীক্ষা (Assignment Test)**ঃ বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন Home task দিয়ে তার উপর প্রাপ্য score-এর ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করা যেতে পারে। এই সব score দ্বারা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রগতির graph সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে গৃহ-কাজের জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম অনেক ভেবে চিন্তে দিতে হবে।

॥ ৭ ॥ **সাক্ষাৎকার ও জিজ্ঞাসাবাদ (Interview and Questionaire)**ঃ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ Board-এর সামনে উপস্থিত করে বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারের পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশ এমন সহজ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে যে, শিক্ষার্থী যেন অকপটে তার মনের সব কথা (গোপন কথাও) প্রকাশ করে। Interview Board-এর বিশেষজ্ঞদের সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে, প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী ও মূল্যায়ণের রীতি সম্মত হবে।

॥ ৮ ॥ **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব (Importance of Co-curricular Activities)**ঃ মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব। তাই বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অবতারণা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা এগুলিতে অংশগ্রহণ করে তাদের অন্তর্নিহিত সত্বাকে বিকশিত করবে। এই সব কার্যাবলীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও ব্যর্থতাকে মূল্যায়ণের সময় গুরুত্ব দিতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও পারদর্শিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ণকে যথার্থ করতে হবে।

॥ ৯ ॥ **বিভিন্ন কর্মপন্থা (Different Activities)**ঃ শিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। কাজেই মূল্যায়ণের সময় সেগুলিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। Album, Collection book ও Scarp bookএ বিষয়ে খুবই মূল্যবান। সমাজ সেবা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, Field works, project প্রভৃতির মধ্যে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, মানসিক প্রবনতা, আগ্রহ, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। আবৃত্তি, অভিনয়, খেলাধূলা, সংগীত, ছবি-আঁকা প্রভৃতিকেও মূল্যায়ণের সময় গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ ১০ ॥ **বিভিন্ন মানসিক অভীক্ষা (Different Psychological Tests)**ঃ সম্পূর্ণ মনস্তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি,

আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন Psychological Tests-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণ করতে হবে। এ ব্যাপারে Intelligence Test, Interest Test, Personality Test, Aptitude Test, Attitude Test ইত্যাদির মাধ্যমে এ জাতীয় মূল্যায়ণ সম্ভব।

॥ ১১ ॥ **সর্বাত্মক পরিচয় লিপি** (Cumulative Record card): প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সম্পর্কে এক একটি সর্বাত্মক পরিচয় লিপি রক্ষা করে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ণ সম্ভব। এই জাতীয় পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য ও বিষয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। মূল্যায়ণের সময় এই পরিচয় লিপিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। (এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)।

মূল্যায়ণ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক বিকাশের যথাযথ ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ। এই পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সর্ব প্রকার বিবরণ জানা যায়। ফলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকেও যথাযথ করা সম্ভব হয়। মূল্যায়ণের সময় কতকগুলি কথা মনে রাখতে হবে। মূল্যায়ণ হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পথে। তথ্যগুলিকে যথাযথ ভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে চরম গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন Score দেওয়ার সময় A, B, C, D, E প্রভৃতি Five point Scale ব্যবহার করা ভাল। এ ব্যাপারে সমস্ত শিক্ষকের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যথাযথ মূল্যায়ণের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

মূল্যায়ণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র বিশৃংখলা এখন একটি জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা। এর জন্য সমস্ত দায় দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায় দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু তা বলে অন্যান্য বিষয়গুলি অবহেলা করলে চলবে না। **বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা।** কোন রকমে পাস করতে পারলেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় বলে মেনে নেওয়া হয়। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্বিক। পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিচালনা বহু দোষে দুষ্ট। শিক্ষা পরবর্তী জীবনে দুর্বিষহ বেকার জীবনের জ্বালা সমাজের এক ব্যাপক ও জটিল সমস্যা। সমাজজীবনে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে তার বিষময় প্রভাব অনিবার্য ভাবে ছাত্র সমাজের মধ্যে পড়েছে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যস্ত। **পরীক্ষায় ব্যাপক গণটোকাটুকি তারই অনিবার্য পরিণতি।** বর্তমানের পরীক্ষার বাস্তব চিত্র আমাদের সভ্যতার

পরীক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র বিশৃংখলা

মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এর দায়দায়িত্ব সকলেরই। ছাত্রসমাজকে এ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। কারণ এর ফলাফলের জন্য তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে সর্বাধিক। বিভিন্ন ছাত্র সংস্থাকেও সতর্ক হতে হবে। কিন্তু তারও পূর্বে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। **ছাত্র-স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে এই সংস্কার প্রয়োজন।** পাঠক্রমের সংস্কার, শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন, বিদ্যালয় পরিচালক ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে এই পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষাকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হতে বাধ্য। শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করতে হবে এবং **শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-অন্তে কাজ দিতে হবে।** ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষানুরাগী ও সরকারকে এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে, কারণ এ দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থীদের নয়। তাই আমূল শিক্ষা সংস্কার ও পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমেই ছাত্র বিশৃংখলার সমস্যার সমাধান সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between examination and evaluation. What are the modern methods of evaluation ? (C. U., B. Ed. 1971)
2. Point out the significance of 'evaluation' as a new concept in examination and consider some modern evaluative procedures. Show how evaluation favourable influences teaching as well. (C. U., B. Ed. 1969)
3. Distinguish between evaluation and examination. Show how the evaluation approach to teaching leads not only to the improvement of examination but also of education. (C. U. B. T. 1967)
4. What are the criteria of good test ? How far have they been fulfilled by the modern new type test ? (C. U., B. T. 1966)
5. In view of the fact that the Traditional examination system has been found to be infested with a large number of gross defects many new devices have been adapted for assessing pupils achievements. Describe a few such devices and evaluate their efficiency. (C. U., B. T. 1965)
6. Indicate the significance of evaluation as a new concept in examination. Discuss some of the recent trends in determining pupils progress and promotion and their usefulness. (N. B. U. B. T. 1968)
7. Give your suggestions for the better organisation of the examination programme in our education to day. How does examination measure in teaching efficiency ? (North Bengal University, B. T. 1967)

দশম অধ্যায়

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র

[CUMULATIVE RECORD CARD]

প্রগতি পত্র

(Progress Report)

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা জানবার জন্য বা পরিমাপের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক যান্মাসিক ও বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিধা ও প্রয়োজন মত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার ফলাফল অভিভাবকদের জানায়। বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় জ্ঞাপক এই পত্রিকাকে প্রগতিপত্র (Progress Report) বলা হয়। এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুখী বিদ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয় তা থেকে শিক্ষার্থীকে আমরা অতি সীমাবদ্ধ ভাবে জানতে পারি। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তা জেনেই আমাদের শিক্ষার্থীকে জানা হয় না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিপত্র পাঠান একটা প্রথা-রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে কোন ছেলে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় বা যান্মাসিক পরীক্ষায় ফল খারাপ করলে তার ক্রটি সংশোধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না। আর প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রগতি সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণা মাত্র হয়। প্রগতি পত্রের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানা যায় না। কয়েকটি বিষয়ে ২।৩ টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে মূল্যায়ণ করলে ভুল হবে। প্রচলিত প্রগতি পত্রের এই ক্রটিগুলি লক্ষ্যণীয়।

প্রগতি পত্রের ক্রটি

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র

(Cumulative Record Card)

আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে গড়ে তুলতে হলে তার প্রকৃতিকে জানা দরকার। শুধু জ্ঞানমূলক দিকের পরিমাপ নয় সামাজিক ও দৈহিক দিক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় গুণের ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জানা দরকার। যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল তার দেহ, মন ও বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোঁজ যদি না রাখা যায় তাহলে তার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জনকেই আমরা শিক্ষা বলি না। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু বিকাশ। এই বিকাশ কি

শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীকে যথাযথ ভাবে জানা প্রয়োজন

ভাবে হচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা হয় তাহলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের উন্নতির ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে—এই পত্রকে বলা হয় **সর্বাত্মক পরিচয়পত্র** (**Cumulative Record Card**)

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি কিভাবে রক্ষা করা হবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন বলছেন—"*For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term, year to year. Such a school record will present a school record will present a clear and continuous statement of the attainment of the child in different intellectual pursuits throughout the successive stages of his education. It will also contain a progressive evaluation of development in other directions of no less importance, such as the growth of his interest, aptitudes and personality traits his social adjustment, the practical and social activities in which he takes part. In other words it will gives a complete career, such records should be common feature of all schools all over the country." Report of the Secondary Education Commission. Page-121)*

maintenance of C.R.C. সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। তথ্যগুলি যথাযথভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীর ভিত্তিতে সংগৃহিত হয়। সর্বাত্মক পরিচয় পত্র রচনার দায়িত্ব থাকবে শ্রেণী শিক্ষকের (Class teacher) উপর। তিনি একবছর ধরে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকলের সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব বিরাট। তিনি সুবিবেচনা, সহানুভূতি, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নয়, তার বাইরেও শিক্ষার্থীদের বিকশিত ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য —প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করবেন। এক বছর পরে তিনি তাঁর দায়িত্ব অন্য কোন শিক্ষকের হাতে অর্পণ করবেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র দায়সারা কাজ করলে চলবে না। ব্যাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বাত্মক পরিচয় লিপির সংরক্ষণে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। এই পরিচয় পত্র শিক্ষককে শিক্ষাদানে ও শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে অনেক সাহায্য করবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণের অতিরিক্ত শিক্ষকগণ পালন করতে পারবেন কি না সে প্রশ্ন আসে। এই পরিচয় পত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণে

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণ

দশম অধ্যায়

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র

[CUMULATIVE RECORD CARD]

প্রগতি পত্র

(Progress Report)

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা জানবার জন্য বা পরিমাপের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিধা ও প্রয়োজন মত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার ফলাফল অভিভাবকদের জানায়। বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় জ্ঞাপক এই পত্রিকাকে প্রগতিপত্র (Progress Report) বলা হয়। এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমুখী বিদ্যার যে পরিচয় দেওয়া হয় তা থেকে শিক্ষার্থীকে আমরা অতি সীমাবদ্ধ ভাবে জানতে পারি। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তা জেনেই আমাদের শিক্ষার্থীকে জানা হয় না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিপত্র পাঠান একটা প্রথা-রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে কোন ছেলে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় বা ষান্মাসিক পরীক্ষায় ফল খারাপ করলে তার ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না। আর প্রগতিপত্রে শিক্ষার্থীদের প্রগতি সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণা মাত্র হয়। প্রগতি পত্রের মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানা যায় না। কয়েকটি বিষয়ে ২।৩ টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে মূল্যায়ণ করলে ভুল হবে। প্রচলিত প্রগতি পত্রের এই ত্রুটিগুলি লক্ষ্যণীয়।

প্রগতি পত্রের ত্রুটি

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র

(Cumulative Record Card)

আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে গড়ে তুলতে হলে তার প্রকৃতিকে জানা দরকার। শুধু জ্ঞানমূলক দিকের পরিমাপ নয় সামাজিক ও দৈহিক দিক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় গুণের ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জানা দরকার। যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল তার দেহ, মন ও বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোঁজ যদি না রাখা যায় তাহলে তার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জনকেই আমরা শিক্ষা বলি না। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু বিকাশ। এই বিকাশ কি

শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীকে যথাযথ ভাবে জানা প্রয়োজন

ভাবে হচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা হয় তাহলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের উন্নতির ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে—এই পত্রকে বলা হয় **সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card)**

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি কিভাবে রক্ষা করা হবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন বলছেন—"*For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term, year to year. Such a school record will present a school record will present a clear and continuous statement of the attainment of the child in different intellectual pursuits throughout the successive stages of his education. It will also contain a progressive evaluation of development in other directions of no less importance, such as the growth of his interest, aptitudes and personality traits his social adjustment, the practical and social activities in which he takes part. In other words it will gives a complete career, such records should be common feature of all schools all over the country." Report of the Secondary Education Commission. Page-121)*

maintenance of C.R.C. সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। তথ্যগুলি যথাযথভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীর ভিত্তিতে সংগৃহিত হয়। সর্বাত্মক পরিচয় পত্র রচনার দায়িত্ব থাকবে শ্রেণী শিক্ষকের (Class teacher) উপর। তিনি একবছর ধরে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সকলের সর্বাত্মক পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব বিরাট। তিনি সুবিবেচনা, সহানুভূতি, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতির ভিত্তিতে কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নয়, তার বাইরেও শিক্ষার্থীদের বিকশিত ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য —প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করবেন। এক বছর পরে তিনি তাঁর দায়িত্ব অন্য কোন শিক্ষকের হাতে অর্পণ করবেন। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র দায়সারা কাজ করলে চলবে না। ব্যাপারটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বাত্মক পরিচয় লিপির সংরক্ষণে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। এই পরিচয় পত্র শিক্ষককে শিক্ষাদানে ও শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে অনেক সাহায্য করবে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণের অতিরিক্ত শিক্ষকগণ পালন করতে পারবেন কি না সে প্রশ্ন আসে। এই পরিচয় পত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণে

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সংরক্ষণ

শিক্ষকগণের বিভিন্ন বিষয় জানবার প্রয়োজন আছে, ও দায়িত্ব পালন করবে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি (Teachers' Training Calleges)। সরকারকেও এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে এবং গবেষণা ইত্যাদির জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন ;—"*In order to maintain the cumulative records properly the teachers will have to use a number of tests of different kinds intelligence tests, attainment tests, aptitude tests and others. We expect that the State Bureau of Education which will devise the forms of cumulative records will also prepare these tests in collaboration with the Training colleges. There is need for continuous research in these fields. (Report of the Secondary Commission page 122)*। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করে আলমারী ইত্যাদিতে দায়িত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করতে হবে।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি শিক্ষার্থীর সর্বাধিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসবার পর থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি করেছে সেই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। বিদ্যার্থী তার সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কি অর্জন করল তার পরিচয় এই পত্র থেকে পাওয়া যাবে। শুধু মাত্র জ্ঞানমূলক বা বৌদ্ধিক বিকাশের তথ্যই নয় তার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের পরিচয়, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, বিভিন্ন সামাজিক কর্ম যাতে সে অংশ গ্রহণ করেছে সব কিছুর পরিচয় এই লিপি থেকে পাওয়া যাবে। যদি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে যায় তাহলে তার পরিচয় জ্ঞাপক পত্রটি সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পত্রটি হবে এখানে গোপনীয়। প্রগতিপত্র যেরূপ পরীক্ষার শেষে অভিভাবকের কাছে পাঠান হয় সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সে ভাবে পাঠান হবে না। অভিভাবক যদি বিদ্যালয়ে এসে ছেলের সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তিনি তা দেখতে পারেন। প্রধান শিক্ষক যদি কোন বিষয়ে জানান প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এই পত্রের অংশবিশেষ অভিভাবকের কাছে পাঠাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের উপদেষ্টা কমিটি ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীর জন্য একটি ও ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্রেণীর জন্য একটি কার্ডের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি রাখার উদ্দেশ্য
(Objectives of Maintaining C. R. C.):

প্রচলিত পরীক্ষা বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে সবদিক থেকেই বহু অভিযোগ উঠেছে। অথচ বহু দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

থেকে বহিঃপরীক্ষাকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা পরিমাপের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছেন। সর্বাত্মক পরিচয় লিপির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পরিমাপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভব। বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে যদি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের সহায়তা গ্রহণ করা যায় তাহলে বর্তমান প্রচলিত বহিঃপরীক্ষার ত্রুটি থেকে শিক্ষাকে কিছুটা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। Comulative record card অর্থাৎ সঞ্চয়মূলক পরিচয় পত্রের সিদ্ধান্ত যেহেতু একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে হয় না—ইহা বহু পরিমাপের সমষ্টি, তাই সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের উপর অধিকতর নির্ভর করা যায়।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপি প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করবে

বর্তমান বহিঃপরীক্ষার স্থানে বিদ্যালয়ের দেওয়া School leaving Certificate কে 'স্কুল শিক্ষা' শেষের চূড়ান্ত অভিজ্ঞান বলে গ্রহণ করার দাবী উঠেছে বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার মধ্যে যে মনের তারতম্য তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সম্ভব।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রই হবে শিক্ষার্থীদেব যোগ্য পরিমাপের চূড়ান্ত অভিজ্ঞান

এই পরিচয়পত্রে সাধারণ লেখাপড়ায় শিক্ষার্থী কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিল, শুধু তাই থাকবে না ; তাতে শিক্ষার্থীরা জীবনের বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে। বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক ভাবে জানা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কোন শিক্ষার্থী কি জাতীয় শিক্ষার বা বৃত্তির উপযোগী তা নির্দেশ করতে হলে ছেলেমেয়েদের ক্ষমতা আগে জানতে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা, প্রভৃতি বিষয় থাকার ফলে সে কোন শিক্ষা নিলে জীবনে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ করা সম্ভব হবে।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিচয় থাকবে

শিক্ষার্থীর সাধারণ পাঠে অবনতি ঘটলে তার কারণ অনুসন্ধান করে, তা দূর করা সহজ হবে। যদি দেখা যায় যে,—সে ক্লাসের পড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে ; তখন দেখতে হবে অন্যদিকে সে কিরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। যদি সর্বাত্মক পরিচয়-পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় অন্য সব দিক থেকেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যোগ্যতা থাকলেও সে তা পড়ার দিকে কাজে লাগাচ্ছে না। তখন যাতে সে পড়ায় মনোযোগী হয়ে সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র থেকে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় খবর এতে লিপিবদ্ধ থাকায় কোন ছাত্রদের যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা না যায় বা অবনতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে স্কুলের পক্ষ থেকে যা করণীয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বা অভিভাবককে জানান হবে যাতে তিনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করাই সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের উদ্দেশ্য

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রকে যেন উন্নত ধরনের প্রগতি পত্র বলে মনে না করা হয়। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার উন্নতি অবনতির খবর পিতামাতাকে জানান, বা তাদের পড়ায় উৎসাহিত করা, বা শিক্ষার্থীদের উপর বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা,—এর কোনটাই সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষক যে ছাত্রটিকে নানাভাবে, নানাদিক থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাকে জীবনের চলার পথে যাতে সাহায্য করতে পারেন, সঠিক পথ বেছে নেবার নির্দেশ দিতে পারেন সেইজন্যই ছাত্রের সর্বাঙ্গীন পরিচয়জ্ঞাপক এই লিপির প্রয়োজন।

শিশুর বিকাশের স্তরগুলি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে লিপিবদ্ধ থাকে

ক্রমবিকাশশীল শিশুজীবনের সাথে পরিচয় রাখতে হলে বছরের পর বছর শিশুর বিকাশের স্তরগুলি এতে লিপিবদ্ধ থাকায় শিশুর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে তার সম্পর্কে কি করা উচিত সে কর্তব্য নির্ধারণেও এই মন্তব্য-লিপি থেকে সাহায্য পাওয়া যায়।

কোন ব্যক্তিকে জানার জন্য সর্বাত্মক পরিচয় পত্র প্রয়োজন

বিদ্যালয়ে একশ্রেণী থেকে উর্ধ্বতম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর নতুন শ্রেণী-শিক্ষক এই পরিচয়-লিপি থেকে তাকে চিনে নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করতে পারেন। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক পরিচয় লিপিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের বিষয়বস্তু
(Subject matter of the C. R. C.)

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকবে না। ছেলেমেয়েদের সর্ববিধ পরিচয় যাতে জানা যাবে সেইভাবে এই পরিচয়-পত্র রাখা হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যকে (Individual Difference) স্বীকার করে নিয়ে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই পত্রে ব্যক্তির সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

সাধারণ তথ্য (General Information)

প্রথমেই ছাত্রের নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, বিদ্যালয়ের ভর্তি হ'বার তারিখ, শ্রেণী ইত্যাদি থাকবে। এরপর পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হবে।

অভিভাবকের পরিচয়—তাঁর আর্থিক অবস্থা শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে লেখা থাকবে।

স্বাস্থ্যের পরিচয় (Health Record)

উচ্চতা, শরীরের ওজন, কোন অসুখে ভুগছে কি না, দেহগত কোন ত্রুটি আছে কি না, বছরের পর বছর এগুলি লিপিবদ্ধ করে দৈহিক বিকাশ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের খবর রাখা হবে।

বুদ্ধির পরিচয় (Intelligence Record)

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে, আদর্শীকৃত পরিমাপের (Standardised Test) সাহায্যে তার পরিমাপ করতে হবে ও বুদ্ধ্যাঙ্ক (I Q) স্থির করতে হবে।

স্বভাব, উপস্থিত, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

পাঠোন্নতির বিবরণ (Educational Attainment)

বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কি নম্বর পেয়েছে এই অংশে তা লিপিবদ্ধ থাকবে, প্রচলিত প্রগতি-পত্রে যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে এই অংশে তার উল্লেখ থাকবে।

পাঠবর্হিভূত কার্যক্রম (**Performance on co-curricular Activities)**

শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন কার্যে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিল তা থেকে তার যে সব কার্যক্ষমতা, রুচি, প্রবণতার পরিমাপ করার জন্য নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

অভিনয়, সঙ্গীত (**Dramatic and Musical Performances)**

চিত্রকলা, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ, হাতে কলমে কাজ করায় দক্ষতা কতটা অর্জন করেছে সে সব লিপিবদ্ধ থাকবে।

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করে কি না, খেলাধুলায় ও স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার পরিচয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, সংগঠন ক্ষমতা প্রভৃতি জানতে হবে।

শ্রেণী-শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক কাজ থেকে খোঁজ নিয়ে ও আলোচনা করে বিভিন্ন সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি-অবনতির পরিমাপ গণিতের সংখ্যা দিয়ে স্থির না করে Five Point Scale দিয়ে ঠিক করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। A, B, C, D, E এই পাঁচটি প্রতীকের সাহায্যে গুণাগুণ বিচার ও একটি ছাত্রের থেকে অপর ছাত্রের মানের পার্থক্য বোঝান যেতে পারে। A—খুব ভাল, B—ভাল, C—সাধারণ, D—খারাপ, E—খুব খারাপ এইভাবে ছাত্রদের মান নির্ণয় করা হয়।

Five Point Scale

প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। এই পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই এর মূল্য স্বীকৃত হবে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে দায়সারা ভাবে average-কে, যে রকম টিক মারা হচ্ছে তাই যদি চলতে থাকে তাহলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র রাখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচয় পত্রিকার সঠিক ব্যবহারে শিক্ষকদের উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ছাত্রদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তায় শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। শিক্ষা যদি হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, তাহলে তার মূল্যায়ণ সাধারণ প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সামগ্রিক ভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার পরিমাপ সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের মাধ্যমেই রাখা সম্ভব।

সর্বাত্মক পরিচয় লিপির প্রয়োজনীয়তা

একটি সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের নমুনা পরের পাতায় দেওয়া হ'ল :—

গোপনীয় তারিখ……

প্রবর্তনের

শ্রেণী

নিম্ন / উচ্চ বিদ্যালয়

সর্বাত্মক বিবরণ পত্র

(Cumulative Record Card)

সাধারণ বিবরণ

(General Information)

ছাত্রের নাম (আগে পদবী) ………… ছাত্র, ছাত্রী ……………… ………

জন্ম তারিখ ……………………………… ……………………

পিতা/অভিভাবকের নাম ……………… …… ………………

ঠিকানা …………………… ………… ………………

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা ……………………………………

. ………………………………… ……

ভর্তি বহির নম্বর…………………… তারিখ……………………

বিদ্যালয় পরিবর্তন ………………………………… ………

……………………………………………………

ভর্তি বহির নম্বর…………………… তারিখ……………… ..

(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৎসরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হইবে)

১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (Health Record)

বৎসর	সাধারণ স্বাস্থ্যের মান			শারীরিক বিকৃতি	গুরুত অসুস্থত
	ভাল	সাধারণ	খারাপ		
১৯৭·					
১৯৭·					
১৯৭·					

২। দায়িত্বশীল পদ ও অর্জিত পুরস্কার প্রভৃতি
(Position of responsibility held in school and awards etc. obtained)

১৯৭…	
১৯৭…	
১৯৭…	

৩। আগ্রহ (Interest)

বিভিন্ন শ্রেণী	১৯৭…			১৯৭…			১৯৭…		
	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ
ক) ভাষাগত									
খ) বিজ্ঞান সম্পর্কিত									
গ) যান্ত্রিক									
ঘ) শিল্পকলা সম্পর্কিত									
ঙ) সঙ্গীত সম্বন্ধীয়									
চ) কৃষি সম্বন্ধীয়									
ছ) বাণিজ্যিক									
জ) গৃহকার্য এবং ব্যবস্থাপনা									

৪। বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব (School Achievement)

বিভাগ	বিষয় সমূহ	১৯৭...			১৯৭...			১৯৭...		
		সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা গড়	স্থান	মন্তব্য
ভাষা										
সাহিত্য										
অঙ্ক										
সমাজ বিদ্যা										
বিজ্ঞান										
কলা										
কারুশিল্প										
সঙ্গীত										
শরীর বিদ্যা										
কার্যকরী										
অন্যান্য বিষয়										

৫। সহ কার্যসূচীর কর্মাঙ্গ (Co-Curricular Activities)

বিভাগ	১৯৭...				১৯৭...				১৯৭...			
	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে		সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে		সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	
(ক) খেলাধূলা												
(খ) বুদ্ধিগত ও সাহিত্য সম্পর্কিত												
(গ) প্রমোদজনক												
(ঘ) সমাজ সেবা												
(ঙ) অন্যান্য (এন্. সি. সি. স্কাউট ইত্যাদি												

৬। ব্যক্তিত্ব (Personality)

বৃত্তি	১৯৭...			১৯৭...			১৯৭...		
	গড়ের ঊর্ধ্বে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের ঊর্ধ্বে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের ঊর্ধ্বে	সাধারণ	গড়ের নীচে
(ক) উদ্যোগ									
(খ) শ্রমশীলতা									
(গ) দায়িত্ব									
(ঘ) সহযোগিতা									
(ঙ) আবেগগত সাম্য									
(চ) আত্মবিশ্বাস									
(ছ) কাজে স্বভাব									

৭। অন্যান্য বিবরণ (Other Informations)

১। যদি আচরণগত সমস্যা থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করুন :

(১৯৭...)........................... ....

(১৯৭...)... ....

(১৯৭...).. ....,...

২। যদি ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমতা বা অক্ষমতা থাকে তাহার উল্লেখ করুন :

বৎসর	দক্ষতা	অক্ষমতা
১৯৭...		
১৯৭...		
১৯৭ ..		

৩। ছাত্রের কোন্ বিভাগে সুপারিশ করেন : সাধার/বৈজ্ঞানিক/যান্ত্রিক

৪। আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন ... .
... ...

৫। কোন্ ধরনের বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন
... ...

৬। সংক্ষেপে এই মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন... ...
... ...

৭। ছাত্রের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন... .

১৯৭...১৯৭...১৯৭...

প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষর

উপসংহার

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করে আজকে সকলেই সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বিকাশই কেবলমাত্র থাকে না, ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক প্রভৃতির সামগ্রিক বিকাশের কথা লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে তার মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বিশ্লেষণ আছে। এই পত্রকে কাজে লাগিয়ে class promotion দেওয়া যেতে পারে, শিক্ষক তার শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরূপণ করতে পারেন, বিদ্যালয় পরিচয় সুব্যবস্থা করা যেতে

পারে। এই পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে এর প্রচলন নেই। অবিলম্বে আমাদের দেশের বিদ্যালয়-গুলিতে এর প্রচলন করতে হবে। এমন কি চাকুরীতে নিয়োগের সময় ও সর্বাত্মক পরিচয় পত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Draw up a set of instructives for proper maintenance of cumulative Record cards in our schools. Show that it is not only a method of evaluation but a means towards improvements of the educational programme of the school as well. (Kalyani University, B. T. 1967)
2. What is a cumulative Record card ? Why is it called so ?
   Describe the content of a model C. R. C. and indicate how it should be maintained. What are its uses ? (Jadavpur University, B. Ed. 1970)
3. Write notes on :—
   (a) Cumulative Record card. (C. U., B. T. 1959, 1967, 1970)
   (b) Is it desirable to depend on cumulative Record card for class-promotion ? Give reasons. (P. G. B. T. 1971)

শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ

তৃতীয় পর্ব

স্বাস্থ্য-শিক্ষা

[HEALTH-EDUCATION]

Health education—Cardinal Principles as community Hygiene School health Service, Medical Inspection and treatment, follow-up service, School meal, School Sanitation.

স্বাস্থ্য-শিক্ষা

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কৃচ্ছসাধনই সবচেয়ে বড় কথা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন ত্যাগ, তিতীক্ষা, বৈরাগ্য ও শারীরিক কৃচ্ছসাধনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল মন্ত্র ছিল, শক্ত শরীর গড়ায়। প্রাচীন গ্রীস দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় Sound body-র কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শরীর চর্চা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি চিন্তাধারা ছিল। এই পরস্পর বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যে কোন পথটি সঠিক ছিল তা বলা খুবই কঠিন। তবে পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার এত অগ্রগতি প্রমাণ করে যে তাদের চিন্তাধারাই সঠিক ছিল।

স্বাস্থ্যচর্চা সম্বন্ধে প্রাচ্য দেশ ও পাশ্চাত্য দেশের পরস্পর বিপরীত চিন্তাধারা

তারপর ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যশিক্ষা সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না বলে সকলেই বলেছেন। শরীর ভাল না থাকলে মন ভাল থাকে না। আর মন ভাল না থাকলে শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেই স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করতে হয় তার মৌলিক নীতিগুলি সকলেরই জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

শরীর ও মন ভাল না থাকলে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়।

মানুষের জীবনের পথে বহু বাধা বিপত্তি আসে। মানুষের জীবনে চলে সেই সব প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে অবিশ্রাম সংগ্রাম। সভ্যতার উষালগ্ন সেই থেকেই মানুষ প্রকৃতি ও বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে করছে। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একদিনের অসভ্য-বর্বর মানুষ আজ নভোচারী সভ্য মানুষরূপে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রকৃতির এই প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে মানুষের বাহুবলের প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যতত্ত্ব তাই এখনও অপরিহার্য।

মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের ইতিহাস

✓স্বাস্থ্য কি ?

[What is Health ?]

আমরা ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা পেয়েছি স্বাস্থ্যই সম্পদ। কথাটা আমরা মুখস্থ করি কিন্তু যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এই সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কেও আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কোন একটি লোক নীরোগ অবস্থায় থাকলেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এক অমূল্য স্থায়ী সম্পদ। চেষ্টা ও নিয়মিত অভ্যাস করে এই সম্পদ লাভ করতে হয়। কোন লোককে স্বাস্থ্যবান বলতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে সে সম্পদ তার আছে কি না। স্বাস্থ্যের বিচারে প্রথমেই দেখতে হবে যে, যে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান তার দেহ ও মন সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরোগ কি না। দেহকে সুস্থ রাখলেই চলবে না, মন অসুস্থ থাকলে কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের দেহ হবে সবল, সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। দেহে রোগ প্রতিরোধের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকবে। সহজেই সে রোগাক্রান্ত হবে না। কিছুটা অনিয়ম সহ্য করবার মত শক্তি তার থাকবে। একরাত জাগলে, একটু জলে ভিজলে, একটু বেশী খেলে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। তার জীবনে সবদিক থেকেই একটা আনন্দ বোধ থাকবে। দেহে, মনে সুস্থ হলে সে স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। যার মধ্যে এসব লক্ষণ রয়েছে আমরা তাকেই স্বাস্থ্যবান বলতে পারি। স্বাস্থ্যের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। মানুষের দেহের কতকগুলি লক্ষণ বিচার করে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নির্দেশ করতে পারি। দেহে ও মনে সুস্থ, সবল, নীরোগ, কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করাকেই আমরা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে পারি। *Encyclopaedia of Education* "Health"-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"*Health is that state in which the individual is able to mobilize all his resources—intellectual, emotional and physical for optimum daily living.*" *W. H. O. (World Health Organization.)* সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, **স্বাস্থ্য হ'ল** "*A State of complete physical, mental and Social well-being, not merely the absence of disease or infirmity.*"

শরীর ও মন ভাল থাকলেই স্বাস্থ্যও ভাল থাকে

স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব
[Hygiene]

গ্রীস দেশের স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন "Hygeia", সেই থেকে গ্রীক শব্দ 'Hygieinas' শব্দটির সৃষ্টি। সেখান থেকেই ইংরেজী 'Hygiene' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। Hygiene হ'ল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানচর্চা করলে শরীরকে রোগমুক্ত রাখা যায় তাকেই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান

নিজেকে ও সমাজের অপর সকলকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার উপায় সমূহ নিয়ে যে বিজ্ঞান আমরা অধ্যয়ন করি তাকেই স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলে থাকি। সুস্থ, সবল, নীরোগ দেহ কি করে লাভ করা যায়, কি করে কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, কি করে প্রত্যেক মানুষ সমাজের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যতত্ত্বে আমরা সেই শিক্ষালাভ করি। স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। অন্য সব বিষয়ের মত শুধু জানার মধ্যেই এর কোন সার্থকতা নেই। বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার জন্য এই বিদ্যা শেখার প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান

একটি সুস্থ সবল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর জাতি গড়ে তুলতে হলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন হতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে অকালমৃত্যু, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব সমাজে দেখা দিবে। জাতীয় সংকট যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝে সুস্থ সবল মানুষ দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষায় ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নিজেকে সুস্থ রাখা ও নীরোগ রাখার চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তিস্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোযোগী হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দেখতে হবে আমাদের চার পাশের পরিবেশ, যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানেও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। Hygiene এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে যে, "*Hygiene is the science of preserving and promoting health*)[1]"

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সমাজস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব
[Importance of Health Education]

স্বাস্থ্যশিক্ষার গুরুত্ব আলোচনার পূর্বে 'স্বাস্থ্যশিক্ষা কি?' (What is Health Education?) সে সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। যে

1. School Health and Health Education Turner, Sellery, Smith.

পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া যায় তাকে স্বাস্থ্যশিক্ষা বলা হয়। **grant** স্বাস্থ্যশিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,—'*The translation of what is known about health into desirable individual and community behaviour patterns by means of educational process.*" **Turner-sellery-Smith** তাঁদের 'School Health and Health Education" গ্রন্থে বলেছেন,—"*Health education is the sum of experiences which favourably influence habits, attitudes, and knowledge relating to individual, community, and racial health,*"

স্বাস্থ্যশিক্ষা কি ?

স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygiene) ও স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health education) এই term দুটি সমার্থক হিসেবে প্রচলিত হলেও এদের অর্থ আলাদা ও ব্যাপক বিস্তৃত। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি স্বাস্থ্যতত্ত্বের মধ্যে আছে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হ'ল এমন একটি বিজ্ঞান যার মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি, নিয়ম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। আর স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিক যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তা '**স্বাস্থ্যশিক্ষা**' বলে বিখ্যাত। স্বাস্থ্য-শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার কলা কৌশলগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যশিক্ষা

আমরা বলে থাকি সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার। এই কথার মাধ্যমেই সুস্থ দেহের প্রয়োজনীয়তা ও দেহকে সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব নিহিত আছে। দেহ যদি স্বাস্থ্যবান হয় তা'হলে মনও হবে সতেজ ও সবল। শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে—অসুস্থ মন নিয়ে শিক্ষালাভ হয় না। আর সুস্থ সবল দেহ না হলে সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া যায় না। **হারবার্ট-স্পেন্সার** তাই বলেছেন—"*To be good animal is the first requisite to success in life, and to be a nation of good animals is the first condition of national prosperity.*"

সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার

পশুর একমাত্র সম্বল তার শক্তি। মানুষ আর পশুতে পার্থক্য হচ্ছে—মানুষ বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অধিকারী। বিচারশীলতা মনের বিশেষ শক্তি, এই বিচার বুদ্ধি কার্যে রূপদিতে প্রয়োজন শক্ত দেহের। সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সুস্বাস্থ্যের। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হ'বার জন্য জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্যই স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার প্রয়োজন।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের সাফল্যের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রয়োজন

মুদালিয়র কমিশন স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন—এটা আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যদি দৈহিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার

অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করা না হয় এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে না পারেন তাহলে আমাদের দেশের যুবশক্তি—যা দেশের অতিমূল্যবান সম্পদ—তারা জাতীয় কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারবে না। এতদিন কেতাবী শিক্ষার দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ছাত্রদের দেহ গঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে কোন চিন্তাই করা হয় নি।

মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য

["*It must be clear that unless physical education is accepted as an integral part of education and the educational authorities recognise its need in all schools, the youth of the country, which form its most valuable asset, will never be able to pull their full weight in national welfare. The emphasis so far has been move on the academic type of education without proper consideration being given to physical welfare and maintenance of proper standard of health of the pupils.*"]

কমিশন আরো বলেছেন—দৈহিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে খরচ বাঁচানোর চেষ্টা সুস্থ অর্থনীতি জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। দৈহিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য কোন সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ না করার ফলে রাষ্ট্রকে চিকিৎসা বিভাগের জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয়।

সারা বিশ্বের প্রগতিশীল দেশ সমূহে আজ স্বাস্থ্য শিক্ষার (Health education) গুরুত্ব স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য নিম্নরূপ বলে প্রায় সব দেশেই স্থির করেছে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশই স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন

॥ ১ ॥ ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সমুহ শিক্ষা দেওয়া।

॥ ২ ॥ ছাত্রদের বিভিন্ন রোগ ও দৈহিক অসুস্থতার কারণ সমুহ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

॥ ৩ ॥ ছাত্রদের স্বাস্থ্যের নিয়ম সমুহ শিক্ষা দেওয়া ও তা প্রতিপালনে উৎসাহিত করা।

॥ ৪ ॥ স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সমাজ ও পরিবারের সহযোগিতা প্রার্থনা করা।

স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিকল্পনা ও কার্যসূচী ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে। এই ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণের ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হবে।

ব্যক্তিস্বাস্থ্য
[Personal Health]

প্রত্যেকটি লোক যাতে নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে যত্নবান হয় ও আপন চেষ্টায় স্বাস্থ্য সম্পদ অর্জন ও রক্ষা করতে পারে তাকেই বলা যায় ব্যক্তিস্বাস্থ্য। প্রতিটি লোক একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে জীবনকে পরিচালিত করবে। ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে নিয়ম মেনে চলা। নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেতে হবে। খাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকবে। ঘুম সম্পর্কেও একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। খাওয়া ও ঘুমানো সম্পর্কে অনিয়ম স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে পায়খানা যাওয়া, দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া প্রভৃতি অভ্যাস করতে হবে। গরমের দেশে নিত্য স্নান করা অবশ্য কর্তব্য। চুল কাটা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা, নখ পরিষ্কার রাখা, চামড়ার যত্ন করা, কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা, এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। পরিশ্রম ও বিশ্রাম উভয়ই দেহের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। সব সময় ঘরের মধ্যে বসে না থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরের মুক্ত বাতাস গ্রহণ করা উচিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই সাধারণ নিয়মগুলি মেনে চললে সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে

জনস্বাস্থ্য
[Community Hygiene]

জনসাধারণকে সমষ্টিগত অসুস্থতার হাত থেকে মুক্ত রাখা, রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা জনস্বাস্থ্যের অন্তর্গত। ব্যক্তিগত ভাবে ছাড়াও সমবেত ভাবে সমাজের সবাই যাতে সুস্থ থাকে জনস্বাস্থের তাই আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ভাল হলেই সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ভাল হবে। একটি দেশের জনস্বাস্থ্য কিরূপ তার বিচার হবে সেখানের ব্যক্তিস্বাস্থ্য কিরূপ তা বিচার করে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য খারাপ হলে জনস্বাস্থ্য খারাপ হতে বাধ্য।

ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও ব্যক্তিস্বাস্থ্যের স্বার্থে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বস্তীর দূষিত পরিবেশে চেষ্টা করেও ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হলে কেবল নিজের দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির কথাও ভাবতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার জন্য আলো বাতাস যুক্ত বাসগৃহ নির্মাণ করতে হবে। নির্দোষ, ভেজালহীন নিরাপদ খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মলমূত্রাদি ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকবে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনা করতে হবে। সমাজের প্রতিটি লোক যদি পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলার সাথে অপরের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে তাহলেই গণস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে গণস্বাস্থ্যের সাফল্য ব্যক্তির নিজ নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। পারিপার্শিক অবস্থার উন্নতি ও জনসাধারণ সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকারের জনস্বাস্থ্যবিভাগ থেকে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বড় বড় শহরে কর্পোরেশনের ও ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য বিভাগ পৌর-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার রাখা ও সংস্কার করা, মলমূত্রাদি ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ভেজালহীন তাজা খাদ্য বিক্রয় হচ্ছে কি না দেখা, রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা ও ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করা, বস্তি অঞ্চলে সুস্বাস্থ্যের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের জনস্বাস্থ্য-বিভাগ ও পৌরকর্তৃপক্ষের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার উপায়

জনস্বাস্থ্যবিভাগের আর একটি কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষাদান ও প্রচার। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা অপরিহার্য, শুধুমাত্র আইন করে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা ও ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা আছে; তবু সাধারণ লোক অনেক সময় টীকা নেয় না। মহামারী দেখা দিলে আইন করে টীকা নিতে বাধ্য করা হয়; তবু লোক এড়িয়ে চলে। প্রচার করে যদি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে আর আইনের দরকার হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। আধুনিক বিজ্ঞান অপেক্ষা চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি তাদের আস্থা অনেক বেশী। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যদি লোকদের আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম পালন সম্পর্কে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করা সহজতর হবে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজ

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
[Need for Health Education in Schools]

সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটা বিরাট দায়িত্ব। বিদ্যালয় সমাজের একটা অংশ। এখানে যারা শিক্ষালাভ করছে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারাই জাতির মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য দেশসমূহ বুঝতে পেরেছে যে সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশুর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক। শিশু পরে ব্যক্তিতে পরিণত হবে। ছোটবেলার স্বাস্থ্যচর্চা পরবর্তীকালে ব্যক্তিকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলবে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য জাতীয় উৎপাদনে (National Production) জাতীয় সম্পদ (National wealth) সৃষ্টি করবে। শিশু ও ব্যক্তির স্বার্থ তাই রাষ্ট্রের পক্ষে কার্যকর। তাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক। এজন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা করছে। বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে নতুন করে গড়ে তোলা যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। স্কুল থেকেই যদি ছাত্রদের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন অভ্যাস করবার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষা করা তার পক্ষে কোন সমস্যার কারণ হয়ে উঠবে না। স্কুলের শিক্ষায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মগুলি পালন করতে শেখানো হবে। কি কি কারণে দৈহিক ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে। রোগ হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করে সম্ভব সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেবেলায় সাধারণতঃ অসুখ বিসুখ থাকবেই এ ধারণা থেকে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পিতামাতার কি কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলাও স্কুলের স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে।

ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের রাষ্ট্রীয় মূল্য

ব্যক্তিজীবনে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ রোগ-জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তবে মানুষের মধ্যে এইসব রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। অসুখ করলে তার প্রাথমিক অবস্থা শিক্ষার্থীরা ধরতে পারে না। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার ফলে তার এই রোগের আক্রমণ ধরা পড়বে। তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবান্বিত করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। কাজেই ব্যক্তির শরীর ও মনের জন্য স্বাস্থ্যচর্চা প্রয়োজন। শরীর ও মন ভাল না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। কাজেই বিদ্যালয়ে

ব্যক্তির দিক থেকে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

শিক্ষাকার্যকে সার্থক করতে হলে এবং শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষা দিতে হলে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বাস্থ্যশিক্ষা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতেও সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা তাদের অবসর সময় যাতে স্বাস্থ্যকর কোন অভ্যাসের মধ্যে বা শরীর চর্চার মধ্যে কাটায় তার জন্যও স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার্থীরা যে বয়সে বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে তা হ'ল শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সময়। এই বয়সে শরীর গড়ে উঠে, স্বাস্থ্য গড়ে উঠে। কাজেই এই সময়ে তাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ও তার মানসিক বিকাশের কাল। এই সময় তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়, চরিত্র গঠিত হয়, ব্যক্তিসত্বা সংগঠিত হয়। এ সময়ই তার বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের সমস্যার সময়। কাজেই এ সময় শিক্ষার্থীকে ভাল করে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে হবে। তা না হলে তার শরীর ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাই সাধারণভাবে দেখলে চলবে না ; একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

পরবর্তী কালে একটি সবল জাতি গঠিত হবে

ছাত্রদের স্বাস্থ্যশিক্ষায় আমাদের মনে রাখতে হবে ছেলেদের স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে তারা এ শিক্ষালাভ করে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির বিধান ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারবে। স্কুলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা এমন কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করবে যা তাদের পরবর্তী জীবনেও প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য যোগাবে। ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস শেখাবার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অভিভাবকদের মনে স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। ব্যক্তি-স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। স্কুলে যারা শিক্ষা পাবে তারাই পরবর্তীকালে একটা সুস্থ সবল শক্তিমান জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

সমাজের দিক থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সমাজের দিক থেকে বিচার করলেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় তখনই যখন ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য ভাল রাখে,—সকলেই স্বাস্থ্য রক্ষার নীতি ও রীতিগুলি যথাযথ ভাবে পালন করে তার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজকে রোগ মুক্ত করতে, সংক্রামক রোগ ও মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে, রোগ প্রতিরোধ করতে, রোগ হলে তার যথাযথ চিকিৎসা করতে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন। সমাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করতেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যশিক্ষার। সমাজের প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অভ্যাসগুলি ও নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে, তার জন্যও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন। বিভিন্ন দিক

থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমাজের দিক থেকেও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশ গরীব ও অশিক্ষিতের দেশ।, এখানের অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয় জানে না। অথচ স্বাস্থ্যশিক্ষা তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে না পারলে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষা করা মুশকিল, তাই বিদ্যালয়গুলিতেও অন্ততঃ স্বাস্থ্যশিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশে ধর্মসাধনার উপরে স্বাস্থ্য সাধনার স্থান দেওয়া হয়েছে। যার স্বাস্থ্য নেই তার জীবনে কোন সাধনাই নেই। দেহ ও মনে যে সুস্থ নয় তার জীবন বিষাদময়। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন তার কাছে ও সমাজের কাছে একটা বোঝার মত। দেহ সুস্থ না থাকলে মানসিক শান্তিও থাকে না, সুস্থ দেহ সুস্থ মনের আধার। যে স্বাস্থ্যহীন, চিররুগ্ন তার মনে শান্তি কোথায়? সবল সুস্থ যার দেহ প্রাণের প্রাচুর্যে সে সদা প্রফুল্ল। তার জীবনে নিরানন্দের স্থান নেই। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের শিক্ষায় শুধু সুস্থ সবল দেহের কথা ভাবলেই চলবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের আলোচনায় মানসিক স্বাস্থ্যের কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই

মানসিক স্বাস্থ্য
[Mental Hygiene]

স্বাস্থ্য বলতে সাধারণভাবে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাই বুঝি। শিক্ষা প্রচেষ্টা হচ্ছে বৌদ্ধিক, দৈহিক, ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস। তাই স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানতে হলে মনের কথা বাদ দিয়ে শুধু দেহের স্বাস্থ্য নিয়ে থাকলে সে জানা হবে আমাদের পূর্ণকে বাদ দিয়ে খণ্ডকে জানা। দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। মানসিক দিক থেকে সুস্থ না হলে শিশুর জীবনে বহু বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রদের জানতে হবে। দেহের ব্যাধি দেহকে কিছুক্ষণের জন্য অসুস্থ করে তোলে। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার ফল জীবনে সুদূর প্রসারী। মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Mental Hygiene) শিক্ষক শিক্ষণের একটি স্বতন্ত্র পত্র। তাই এখানে আমরা দু'চারটি কথায় দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব কাকে বলে?

আমরা জানি সুস্থ দেহই হচ্ছে সুস্থ মনের আধার। আবার মন খারাপ হলে তার প্রতিক্রিয়ায় দেহও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে যদি দুঃশ্চিন্তা থাকে,

কোন কারণে ত্রাসের সৃষ্টি হয় তাহলে ক্ষুধা নিদ্রা সব কিছু লোপ পেয়ে যায়। খুব ক্ষুধার মুখে যদি কোন দুঃসংবাদ আসে তাহলে মুহূর্ত মধ্যে ক্ষুধা লোপ পেয়ে যায়। পরীক্ষার সময় দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের আহারে রুচি থাকে না এটা সম্পূর্ণ মানসিক কারণে হয়। ভয় মানসিক ব্যাপার কিন্তু হঠাৎ ভয় পেলে মানুষ হার্টফেল পর্যন্ত করতে পারে। তাই দেহ ও মনের অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে হবে। জীবনে সুখী হতে হলে যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, তেমনি জীবন যাতে বিড়ম্বনাপূর্ণ না হয়ে ওঠে সেজন্য সুস্থ ও সবল মনের অধিকারী হতে হবে।

দেহ ও মনের সুস্থতা পরস্পর নির্ভরশীল

শিশুর মানসিক বিকাশের পথে যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে তার মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ স্বাভাবিক পথ না ধরে অবদমিত হয়ে বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়। ছাত্রদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের আবেগ ও প্রক্ষোভ সমূহ যাতে ঠিক পথে প্রকাশিত হয়ে জীবনের ধারাকে সুস্থ পথে পরিচালিত করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোন কারণে তার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শিক্ষা আজ শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে সবচেয়ে আগে তাকে জানতে হবে, তার মনের গতি প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে জেনে নিলেই তার জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। শিশুর মনের খোঁজ করতে হলে তার মন সুস্থ কি অসুস্থ দুই জানা দরকার। শিশুর বহু অসামাজিক আচরণের পিছনে রয়েছে তার অসুস্থ মনের প্রতিক্রিয়া। শিশুকাল থেকেই পিতামাতার উচিত ছেলেমেয়ের মানসিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রাখা। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন কিছু কখনও করা হবে না। শিশুকে খেলতে না দিয়ে ঘরকুনো করে রাখা, সব বিষয়ে ভয় দেখান বা সাবধান করা শিশুর চরিত্র গঠনে ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকর।

শিক্ষা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করবে না।

শিশুকে কখনও অতিরিক্ত আদর দেওয়া হবে না বা অতিরিক্ত শাসন করাও উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে, বাপ মায়ের আচরণ ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই ছেলেমেয়েদের সামনে মিথ্যাকথা বলা, ঝগড়া করা, ভীরুতা প্রকাশ করা, ভাই বোনের মধ্যে হিংসার ভাব জাগাতে পারে এমন কথা বলা বা কাজ করা উচিত নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সামঞ্জস্য-বিধানের শিক্ষা তাকে দিতে হবে। যদি সে সামঞ্জস্য-বিধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পেয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীদের সামনে বৈষম্যমূলক আচরণ করা ঠিক নয়

বাল্যে যেমন পারিবারিক জীবনে পিতামাতার প্রভাব বেশী তেমনি শিক্ষা-কালে শিক্ষকের প্রভাবে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্কুলে গিয়েই ছেলে-মেয়েরা পাঁচজনের সাথে মিশে এবং এর মধ্য দিয়েই সামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায়। পাঁচ জনের সাথে মিলে-মিশে যে শিক্ষা মানসিক সুস্থতার সৃষ্টি করে সেই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা।

শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের প্রভাব

ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময় মনে রাখতে হবে ছেলেদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-প্রবণতা সব কিছু জানা শিক্ষকের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ মানসিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত। মানসিক সুস্থতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষা বলতে দেহের স্বাস্থ্যের সাথে মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষকের মনে রাখতে হবে। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পারিপার্শ্বিকের সাথে সামঞ্জস্য-বিধান করে চলতে হবে। পরিবেশের সাথে মানসিক সামঞ্জস্য বিধান কিছুটা চেষ্টা ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে শিশুকাল থেকেই কতকগুলি প্রবণতা শিশুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে—যেমন স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা (desire for recognition) পরিবারের ছোট সীমার মধ্যে নিজেকে জাহির করতে চায়। পরিবারের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে যখন সে স্কুলে আসে তখন সে প্রথম সংঘাতের সম্মুখীন হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাথে সামাজিক বোধের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলেই এর প্রতিক্রিয়ায় সে হতাশ হয়ে পড়বে। নিজেকে প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসে আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ তার মনকে পীড়িত করে তুলবে। কখন কখন এই ব্যর্থতার ফলে ছেলেদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মধ্য দিয়ে তার অবচেতন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। কখনও ছাত্রেরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে। দুই ক্ষেত্রেই তার স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাওয়ায় তার মধ্যে সমাজ বিরোধী কাজের আগ্রহ দেখা দেয়। ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় কোন ছেলে অতি বিমর্ষ কারো সাথে মিশতে চায় না। কারো মধ্যে ভাঙাচুরার অভ্যাস দেখা যায়, কোন ছেলের মধ্যে চুরি করার প্রবণতা দেখা যায়, কেউ অপ্রয়োজনেও মিথ্যা বলে, কোন কোন ছেলে সমস্ত অন্যায় কাজের পিছনে একটা যুক্তি সৃষ্টি করে অন্যায়ের সমর্থনের চেষ্টা করে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয় চরিত্র গঠন তাহলে যে কোন রকম মানসিক অসুস্থতার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দেহের অসুস্থতা অল্প চেষ্টায় সারিয়ে তোলা যায় কিন্তু মনের অসুখের সব সময় সহজে প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এ জন্য

পরিবেশের সঙ্গে মানসিক সামঞ্জস্য বিধান

অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি

প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। মনের কোণে যদি একটি ব্যাধি বাসা বাঁধতে থাকে তাহলে তার বিষময় ফল সমস্ত জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা শুধু মাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না সে যাতে সুস্থ্য সুন্দর মনের অধিকারী হতে পারে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের মৌলিক নীতি
[Cardinal Principles for Health Education]

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেছেন। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের মৌলিক নীতিগুলির সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। সেগুলি হ'ল,—

॥ ১ ॥ স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন সু-অভ্যাসগুলিকে সকলের সঙ্গে একত্র করে দিতে হবে। এগুলি যেন পরবর্তীকালে সকলের স্বভাবে গিয়ে দাঁড়ায়।

॥ ২ ॥ স্বাস্থ্য রক্ষায় ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য চর্চা, খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম, পরিশ্রম, চিকিৎসা, অভ্যাস সবই ধারাবাহিক হবে।

॥ ৩ ॥ শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার কথা ভাবতে হবে।

॥ ৪ ॥ স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে স্বাস্থ্য হীনতার কুফলগুলি বেশী ব্যাখ্যা না করে সুস্বাস্থ্যের উপযোগিতার উপর বেশী জোর দিতে হবে। তাতে স্বাস্থ্যরক্ষায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহী ও উৎসাহী হয়।

॥ ৫ ॥ সমাজের সকলকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস-গুলির চর্চা সম্বন্ধে সব সময় পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোন ব্যাপার থাকা উচিত নয়। যে কক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেওয়া হবে তা অপরিষ্কার থাকবে ;—সে পথ ঠিক নয়। সকলকেই সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংক্রমিত হবে।

॥ ৬ ॥ স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শিক্ষার চেয়ে পরোক্ষ শিক্ষার উপর বেশী জোর দিতে হবে। তাতে শিক্ষার্থীর মনে দাগ কাটে বেশী। স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়ার সময় সব সময় এটা কর, ওটা কর,—এটা কর না, ওটা কর না ;— এই তথ্যগত নির্দেশ শিক্ষার্থীর মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু পরোক্ষভাবে যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যায় যাতে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিগুলি আপনিই শিক্ষালাভ করে তবে তা খুবই কার্যকরী হয়। তাই বিদ্যালয়গৃহ ও পরিবেশ, শিক্ষকদের জামা-কাপড়-নখ-চুল ইত্যাদি এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

রাখতে হবে যা শিক্ষার্থীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের এই পরোক্ষ পথ খুবই কার্যকরী।

॥ ৭ ॥ স্বাস্থ্য শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

॥ ৮ ॥ স্বাস্থ্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত করতে হবে।

॥ ৯ ॥ স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য শিক্ষা এখনও যথাযথভাবে প্রচলিত হয় নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্বকে কিন্তু সকলেই স্বীকার করেছেন। তাই আমাদের দেশেও তার প্রচলন করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চর্চা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এবং এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
[Aims and Objectives of Health Educations]

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেছেন। এখন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

National Education Society of America স্বাস্থ্য শিক্ষার তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত করেছেন, সেগুলি হ'ল—

॥ ১ ॥ শিক্ষার্থীদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে।

॥ ২ ॥ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচীতে অভিভাবক ও সমাজ যাতে অংশগ্রহণ করে তার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে।

॥ ৩ ॥ স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবার মত সুন্দর অভ্যাসগুলি যাতে শিক্ষার্থীরা রক্ষা করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

অধ্যাপক **Reader** স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ;—

॥ ১ ॥ স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও তার উন্নতি করা।

॥ ২ ॥ মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও তার উন্নতি করা।

॥ ৩ ॥ শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভজনিত সমস্যার সমাধান করা এবং প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করে তার জন্য চেষ্টা করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও শিক্ষক স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, তার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি নিরূপণ করা যেতে পারে। সেগুলি হ'ল ;—

॥ ১ ॥ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য তত্ত্ব ও তার নিয়মগুলি শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষার্থীরা যাতে সেগুলিকে জীবনে অনুসরণ করে তার জন্য উৎসাহিত করা।

॥ ২ ॥ বিভিন্ন রোগের কারণ ও চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

॥ ৩ ॥ শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভজনিত সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও উন্নতি করার বিভিন্ন বিধি নিয়ম শিক্ষা দেওয়া।

॥ ৪ ॥ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করবার শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

॥ ৫ ॥ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচীতে অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্য ও অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

॥ ৬ ॥ স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে। এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বংশধারা গঠিত হবে।

॥ ৭ ॥ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা।

॥ ৮ ॥ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার মত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা।

॥ ৯ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি করা।

এই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যক্তি স্বাস্থ্য
[Personal Hygiene]

এক একটি ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজ। ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনকে সৃষ্টি করে। কাজেই স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাস্থ্যকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ে যদিও শ্রেণী শিক্ষা (class teaching) ও গোষ্ঠি শিক্ষা (group teachings) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করা হয়েছে। আর যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানা প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষার্থীর দেহ যদি ভাল না থাকে, তবে তার মনও ভাল থাকে না। তাই স্বাস্থ্য ভাল না হলে যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব

ভূমিকা

নয়। বিদ্যালয়ে তাই স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং সেই স্বাস্থ্য শিক্ষা যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে উন্নত করে তার চেষ্টা করতে হবে।

বিদ্যালয়ে আমরা নানা বিষয়ে শিক্ষা দিই, কিন্তু সাধারণ বিষয়সমূহ শেখবার সাথে সাথে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার একটা পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় শুধু শিক্ষা দিলেই চলবে না, শিক্ষার্থীরা যাতে সে শিক্ষা তাদের জীবনে কার্যে রূপ দেয় তা দেখতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যের মূল নীতিগুলি শেখান হবে সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনে ছাত্রেরা সে নীতি যাতে মেনে চলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
[Common Elements of Personal Hygiene]

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল,—

।১। ভালো ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস :—ব্যক্তি যাতে স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি নিজ জীবনে অনুসরণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা সে বিষয়ে গুরুত্ব দেবে। জীবনের অভ্যাসের গুরুত্ব অনেক। কথায় বলে 'Habit is called the second nature of man.' স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি পরে মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে ব্যক্তিজীবন প্রভাবান্বিত হয়। স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি অনুশীলন করতে হবে, এবং খারাপ অভ্যাসগুলি দূর করতে হবে এ ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব অগাধ। তিনি নিজেও স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করবেন ও সেই অনুযায়ী আচরণ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সময় সহানুভূতি দিয়ে বিচার করতে হবে॥ শিক্ষার্থীদের খারাপ অভ্যাসগুলি দূর করবার সময় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে সংশোধন করতে হবে। অভ্যাসগুলি ছোট বেলা থেকে গড়ে উঠে। কাজেই সে সময় থেকেই এ ব্যাপারে যত্ন নিতে হবে। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, দাঁতে নখ কাটা, যখন তখন ঘুমানো, পায়খানার অনিয়মতা, দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর অভ্যাসগুলি দূর করতে হবে।

।২। ত্বকের যত্ন :—ত্বক হ'ল দেহের বাইরের আবরণ। এই আবরণ রোগের সংস্পর্শে আসে। কারণ রোগ জীবাণুগুলি আলো বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। তাই ত্বকের যত্ন নিতে হবে। দু'ভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া যায় :—

(ক) ধোওয়া ও স্নান :—ঠাণ্ডা জল ও গরম জলে প্রয়োজনমত স্নান করতে হবে। সাবান দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। ত্বকের উপর নিয়মিত সৌন্দর্য চর্চা করতে হবে। ত্বকের যত্ন নেওয়াকে প্রতিদিনের অভ্যেসে পরিণত

করতে হবে। খেলাধূলা, কাজকর্ম ইত্যাদি করার পর খাওয়ার আগে স্নান করতে হবে।

(খ) **সূর্য স্নান**—বিশেষ করে শীতপ্রধান দেশে সূর্যের আলোকে অধিকক্ষণ থাকা ত্বকের পক্ষে উপোযোগী। আমাদের দেশে শীতকালে সূর্যালোকে স্নান ত্বকের পক্ষে ভাল। সূর্যালোকে ভিটামিন D ও K আছে তা শরীরের পক্ষে উপকারী।

(৩) **চুল-চোখ-কান-দাঁত-নাক-নখ-আঙুল-গলার যত্ন**:—শরীরের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্যেই ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে। এগুলির যত্ন নিম্নলিখিতভাবে নেওয়া যেতে পারে—

চুল—নিয়মিত চুল কাটতে হবে, চুল পরিষ্কার রাখতে হবে, তাহলে চুলে কখনই খুস্‌কি পড়বে না।

চোখ—শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে চোখের গুরুত্ব অপরিসীম। ওই অঙ্গকে তাই যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। নিয়মিত চোখ ধুতে হবে। চোখ খারাপ হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। দুধ-মাখন-শাকসব্জী (যাতে ভিটামিন A, C থাকে) খেতে হবে।

কান—কানও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কানের যত্ন নিতে হবে। কানে ধূলো-ময়লা যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কানে পুঁজ পড়লে ডাক্তার দেখাতে হবে।

দাঁত—অনেকের দাঁত দুর্গন্ধ হয়, রক্ত পড়ে, দাঁতের জন্য হজমের গণ্ডগোল হয়। দাঁতের যত্ন নিতে হবে। রাতে খাওয়ার পর দাঁত মাজতে হবে। অনেকে দাঁতের জন্য ব্রাশ ও Tooth paste ব্যবহার করেন।

নাক—নাকও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উচ্চারণের ক্ষেত্রে নাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নাকে সর্দি জমলে তার অসুবিধা হয়। এ ব্যাপারে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।

নখ—নখে ময়লা জমে। তাই নিয়মিত নখ কাটা প্রয়োজন।

আঙুল—সাবান দিয়ে হাত ও আঙুল পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

গলা—উচ্চারণের জন্য গলার প্রয়োজন। গলায় কাশি ও ব্যথা ইত্যাদি অসুবিধা হলে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।

(৪) **পোষাক-পরিচ্ছদ ও জুতো**—ব্যক্তিকে সব সময় পরিষ্কার পোষাক পরতে হবে। পোষাক মানুষকে সৌন্দর্যশালী করে। ভেতরের জামাও পরিষ্কার রাখতে হবে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পোষাক পরলে ভাল হয়। পোষাক খুব tight হবে না। পোষাক শিশুরা নিজেরাই পরিষ্কার রাখবে। জুতো মাটির ধূলোবালি থেকে শরীরকে রক্ষা করে। জুতো পায়ের ঠিকমত মাপের হবে। পোষাক ও জুতো ব্যক্তিকে smart করবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবার সাথে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল্য বোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষায় ছাত্রদের কার্যকরী সহযোগিতার প্রয়োজন। ছাত্ররা বিদ্যালয় পরবর্তী জীবনে যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে সেজন্য তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া ও স্বাস্থ্যনীতি পালনে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। ছাত্ররা যদি স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ক নিয়মকানুন মেনে না চলে ও দেহ চর্চায় অংশ গ্রহণ না করে তাহলে স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যশিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করা

পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয়-সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়া সহজ। কারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বের নীতি সমূহ শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এনে তাকে বুঝতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ জন্মালেই তারা স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে। ছাত্রদের বোঝাতে হবে সমাজের একজন সভ্যরূপে সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার একটা নৈতিক দায়িত্ব তার রয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে, তার পারিবারিক কল্যাণে তাকে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে এ বোধ তার মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

পাঠক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা কতকগুলি অভ্যাস আয়ত্ব করবে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্পর্কে যে কথাগুলি ক্লাসে বলা হ'ল শিক্ষার্থীরা আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কাজে পরিণত করলেই স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমরা শিক্ষা দেই। দেখতে হবে ছাত্ররা অপরিষ্কার হয়ে স্নান না করে স্কুলে আসছে কি না। ছোট থাকতেই ছাত্রদের নানারকম অভ্যাস গঠন করান সহজ। বাপ-মা, শিক্ষকদের কর্তব্য ছেলেবেলায় কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাস আয়ত্ব করতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া ও কু-অভ্যাসগুলি থেকে বিরত রাখা।

স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করা

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠে পায়খানায় যাওয়া, রোজ দাঁত, মুখ পরিষ্কার করা, স্নান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, জামা কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সাধারণ অভ্যাসগুলি হয়তো একদিনে আয়ত্ব করতে চাইবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করিয়ে নিতে হবে। মুক্ত বায়ু ও আলোর উপকারিতা সম্পর্কেও দেহের পক্ষে কাজ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের রোজ ব্যায়ামের অভ্যাস করান দরকার। ড্রিল করা তাদের একটা ভাল ব্যায়াম। এছাড়া নানারকম খেলায় তাদের উৎসাহ দিতে হবে। দেহের অঙ্গ সমূহ

স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন সু-অভ্যাস

নিয়মিত চালনার সাথে খেলাধূলাও ড্রিলের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়। ছেলেরা স্কুলে কিভাবে বসবে, কিভাবে লিখবে, ক্লাসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের যে অভ্যাসগুলি তারা আয়ত্ব করবে কতকটা অভ্যাসের বশে কিছুটা প্রয়োজন বোধে সেই অভ্যাসগুলি পরবর্তী জীবনেও তারা ত্যাগ করবে না।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষায় ছাত্রদের নিজেদের দেহের যত্ন নেবার অভ্যাস আয়ত্ব করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উপায়, কি করে রোগ হয় ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। একজন থেকে কি করে আরেকজনের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হয় এবং সংক্রামিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাত্রদের জানা দরকার। প্রত্যেক রোগের কারণ বিভিন্ন জীবাণু, তাদের রোগ সঞ্চার প্রণালী বিভিন্ন। কি ভাবে চললে কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে ও সংক্রামক রোগ দেখা দিলে কি কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এগুলি প্রত্যেক ছাত্রের জানা দরকার।

রোগ প্রতিরোধ

ব্যক্তি স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়ার তিনটি Stage আছে। সেগুলি হ'ল,—

॥ ১ ॥ **Drill Stage :** খুব ছোট বয়সে ছেলেমেয়েরা অনুকরণ করে। একে Drill Stage বলে। এই সময় স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করতে শেখাতে হবে।

॥ ২ ॥ **The Stage of Social Development :** ভালো পোষাক পরলে মন ভাল থাকে, ভাল পোষাক অন্যান্য ব্যক্তির সপ্রশংস দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ;—এই বোধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়। তখন সে স্বাস্থ্য চর্চা সম্বন্ধে নিজেই সচেতন হয়ে ওঠে।

॥ ৩ ॥ **The Stage of self respect :** ক্রমশঃ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল অভ্যাসগুলির সঙ্গে রপ্ত হয়ে যায়। তখন সেটা তার স্বভাবে পরিণত হয়। সে সময় সে সামাজিক মর্যাদা পায়। তখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন না করলে তার নিজেরই ভাল লাগে না। এ সম্বন্ধে সে তখন নিজেই পূর্ণ সচেতন।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য হ'ল যাতে তারা তাদের জীবনও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে গড়ে তুলতে পারে। ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পড়াবার সময় শুধু কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ না করিয়ে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের নিয়ম মানার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে। কি ভাবে চললে ভাল ফল পাওয়া

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিক্ষাদান

যায় হাতে কলমে তা দেখাতে হবে। ছায়াচিত্র ও Magic lantern এর সাহায্যে চিত্তাকর্ষকভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে মনোজ্ঞ করে তুলতে পারলে বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের একটা আগ্রহের সৃষ্টি হবে ও ব্যবহারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়ম সমূহ মেনে চলার উৎসাহ দেখা দেবে।

ব্যক্তি স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিশ্রম, খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে। সেই পরিশ্রমের ফলে শরীরে যে ক্ষয় হবে তার জন্য যথাযথভাবে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। রাত্রে নিয়মিত বিশ্রামও শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পরিশ্রম, খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম—এই ত্রিবিধের সংমিশ্রণে সুস্থ ও সবল শরীর গড়ে উঠে। কর্মে যদি তৃপ্তি (Satisfaction) থাকে তবে পরিশ্রম কম অনুভূত হয়, মনও সতেজ হয়। ব্যক্তিস্বাস্থ্য শিক্ষাদানের সময় তাই পরিশ্রম, খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রামের উপর জোর দিতে হবে।

পরিশ্রম, খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম

স্বাস্থ্য শিক্ষা যদি যথাযথভাবে ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে তবে তার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান যথাযথ হয়, ব্যক্তি স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে জনস্বাস্থ্যও রক্ষিত হয়।

জন স্বাস্থ্য

[COMMUNITY HYGIENE]

ভূমিকা (Introduction): প্রাচীনকালে জনসংখ্যার এত প্রাবল্য ছিল না। নগর সভ্যতার তখনও পত্তন হয় নি। মানুষ তখন প্রকৃতির মুক্তঅঙ্গনে বসবাস করতো। খোলা বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত পরিশ্রম ও বিশ্রাম ইত্যাদির কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু নগর সভ্যতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। শহরের পরিবেশে মুক্ত বাতাস ও আলো পাওয়ার নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়। পুষ্টিকর খাদ্যও পাওয়া যায় না। খাদ্য সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফলে ভাল খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। খাদ্যে ভেজাল এখন আরো একটি সমস্যা বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচণ্ড বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসস্থান নির্মাণের স্বাচ্ছন্দ্য দূরে চলে গেছে। একটি জনবহুল শহরে স্বাস্থ্য রক্ষা করা একটি বিরাট সমস্যা। গ্রামের পরিবেশ ও বসতি ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাচীনকাল ও বর্তমান কাল

তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হওয়া সত্বেও আধুনিককালে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষা করা একটি বিরাট সমস্যা।

জনস্বাস্থ্য কি ? (What is community Hygiene) **:** জনস্বাস্থ্য কি ? জনস্বাস্থ্য হ'ল পরিকল্পনামাফিক এমন এক সুশৃঙ্খল অবস্থা যেখানে সমাজের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি দূর করা যায়, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা যায়, স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাসগুলি যথাযথভাবে পালন করা যায়, জীবনের আয়ু ও শরীরের ক্ষমতা বেড়ে যায়। জনস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *W. H. O.* (*World Health Organisation*) বলেছেন, —"*Public Health is the science and the art of preventing disease, prolonging life, and improving health and efficiency, through organized effort.*" যে শাস্ত্রে সমাজ সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার এইসব উপায় শিক্ষা দেয় তাই হ'ল Community Hygiene.

জনস্বাস্থ্য কাকে বলে ?

জন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাস্থ্য
[Community Hygiene and Personal Hygiene]

জন স্বাস্থ্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাস্থ্যের একটি বিরাট সম্পর্ক আছে। এক একটি ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ হয় না। কাজেই ব্যক্তিস্বাস্থ্য যদি ভাল রাখা যায় তবে সমাজের স্বাস্থ্যও ভাল থাকতে বাধ্য। আবার সমাজের সকলের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত বিধি ও উপায়গুলি যদি মেনে চলা যায় তাতে সমাজের সকলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সমাজে যদি স্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা না যায় তবে ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা করা মুশকিল। আবার ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্য রক্ষার আচরণগুলি মেনে না চলে তবে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব। জনস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাস্থ্য তাই পরস্পরের পরিপূরক।

জনস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাস্থ্য পরস্পরের পরিপূরক

জন স্বাস্থ্যের পরিধি
(Scope of Community Hygiene)

জন স্বাস্থ্যের পরিধি বিশাল। বহু বিষয় জন স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয়। সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। জন স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে হবে, এবং পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। জলই মানুষের জীবন। আবার জলের মাধ্যমে রোগ বিস্তার লাভ করে। মলমূত্র ও আবর্জনা সমাজের আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর করে। এর মাধ্যমে রোগ বিস্তারও হয়।

জনস্বাস্থ্যের পরিধি বিশাল

কাজেই মলমূত্র ও আবর্জনা পরিষ্কার জন স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। যথেষ্ট খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, ভেজালহীন খাদ্য, জন স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ (টীকা) ও নিরাময় (চিকিৎসা) জন স্বাস্থ্যের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। জন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Health centre) ও হাসপাতাল (Hospital) খুবই প্রয়োজন। মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রও জন স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। বাসগৃহ ও বাসগৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা জন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত। জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান জন স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। জন স্বাস্থ্য রক্ষার সবচেয়ে বড় দিক হ'ল,—জন স্বাস্থ্য বিষয়ক বা শিক্ষার প্রসার করা। কাজেই দেখা যায় যে, জন স্বাস্থ্যের পরিধি বিশাল। জন স্বাস্থ্য যথাযথভাবে রক্ষা করতে হলে ওই বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে কাজ করতে হবে।

জন স্বাস্থ্য সংরক্ষণ
[Preservation of Community Hygiene]

জন স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে ;—

(১) জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব সকলেই যেন উপলব্ধি করতে পারে।

(২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তি যদি স্বাস্থ্য রক্ষা করে, সকলে যদি স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিগুলি মেনে চলে তবে গণস্বাস্থ্য রক্ষা করা শক্ত হয় না।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়

(৩) ব্যাধিকালীন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ও রোগীর চিকিৎসার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করতে হবে। সংক্রামক ব্যাধির জন্য পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে দিতে হবে।

(৪) সর্বসাধারণের মধ্যে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে সমাজ এক ভিন্নরূপ ধারণ করে।

(৫) জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে সমাজে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ, মলমূত্রের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, খাদ্যের উপযুক্ত সরবরাহ, শ্রম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা, বাসস্থান ও বাসগৃহের ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

[State's Responsibility]

জন স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অসীম। রাষ্ট্রকেই জন স্বাস্থ্য রক্ষার সর্বাধিক দায়িত্ব বহন করতে হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্র নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করবে ;—

(১) স্বাস্থ্যকর খাদ্যের আয়োজন,
(২) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা,
(৩) স্বাস্থ্য সম্মত বাসগৃহ নির্বাচন,
(৪) আবর্জনা দূরীকরণ,
(৫) শৌচাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা,
(৬) জনগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করা,
(৭) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা,
(৮) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ,
(৯) স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান রক্ষা
(১০) স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইত্যাদি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক, রাষ্ট্র তাই এজন্য Public Health Department গঠন করেন। তাই সরকারী এই বিভাগ জন স্বাস্থ্য রক্ষার এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জনসাধারণের কর্তব্য

[Duties of the People]

জন স্বাস্থ্য রক্ষায় জনগণ ও তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব আছে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য যথাযথ-ভাবে রক্ষা করতে হবে। সকলেরই ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাসগুলির সকলকেই অনুসরণ করতে হবে। পানীয় জল, আবর্জনা, মলমূত্র পরিহার সংক্রান্ত বিষয়-গুলিকে প্রতিকারের জন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ব্যাপারে সকলেরই সহযোগিতা সমানভাবে প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলকেই সচেতন থাকতে হবে। নিজের কোন রোগ হলে তার জন্য যাতে অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় তার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হবে। সমাজে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সকলেরই; সকলকেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
[W. H. O. World Health Organisation]

জন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U N.O.) কর্তৃত্বাধীনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। তার তিনটি শাখা তিনভাবে কাজ করে ;— কাজের পরিধি বিশ্বজোড়া।

(১) Central Technical Service—বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, চিকিৎসা ও ঔষধ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এই সংস্থার কাজ।

(২) Direct Service—এই সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দান করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞ (Expert) পাঠিয়ে সে দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করা এই সংস্থার কাজ।

(৩) Education and Information Service—বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই শাখা বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এই বিভাগের কাজ।

জন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা
[Community Hygiene and Health Education]

জন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ সকলেরই দায়িত্ব আছে। এ ব্যাপারে সকলের দায়িত্বের সমন্বয় করতে হবে। রাষ্ট্র আইন করে স্বাস্থ্য রক্ষার কতকগুলি বিধি প্রচলিত করতে পারে। কিন্তু জন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে জনশিক্ষার প্রসারই সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জনশিক্ষার প্রসার করতে হবে। সুশিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১) **প্রদর্শনী** :—স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(২) **রেডিয়ো**—রেডিয়োর মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিসমূহ জনসাধারণের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

(৩) **চলচ্চিত্র**—বিভিন্ন তথ্য চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচার করা যেতে পারে।

(৪) **সংবাদপত্র**—বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে জনশিক্ষার প্রচার করা যেতে পারে।

(৫) **বিভিন্ন club**—বিভিন্ন club জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে।

(৬) **স্বাস্থ্য সপ্তাহ**—বছরের যে কোন একটি সপ্তাহকে স্বাস্থ্য সপ্তাহ হিসেবে সরকারী ঘোষণা করে এ বিষয়ে জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে।

(৭) **পরিচ্ছন্নতা অভিযান**—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে।

(৮) **বয়স্ক শিক্ষা**—বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তার মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভূ্ক্ত করতে হবে।

(৯) **Sex Education**—যৌন সমস্যা অনেক সময় জন স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই যথাযথভাবে Sex education-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যালয় ও জন স্বাস্থ্য

[School and Community Hygiene]

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিদ্যালয়েরও একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্রসংস্করণ। বিদ্যালয় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারে বিদ্যালয়ই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে জনশিক্ষা প্রসারে ও বিদ্যালয়কে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চার ব্যবস্থা করবে। তার মধ্য দিয়ে সমাজে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে স্বাস্থ্য রক্ষার আদর্শ পরিবেশ। সমাজ সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। সমাজ সেবা, পানীয় জল সংরক্ষণ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, মহামারীর সময় সেবাকার্য ইত্যাদির মাধ্যমেও বিদ্যালয় সমাজে জনস্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন অভ্যাসগঠনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সমাজ ও সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও একটি ভূমিকা আছে। শিক্ষকগণ হলেন সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাঁদের মাধ্যমে সমাজে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়গুলি প্রচারিত হবে ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।

জন স্বাস্থ্য রক্ষায় বিদ্যালয়ের একটি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে

খাদ্য

[FOOD]

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

[Necessity for Food]

আমাদের জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। মাতৃগর্ভে যেদিন জীবকোষ (cell) প্রথম সৃষ্টি হ'ল সেদিন থেকে জীবকোষ একের পর এক নিজেকে বাড়িয়ে চলতে থাকে। এর ফলেই হয় মানুষের বৃদ্ধি। মানুষের দৈহিক-বৃদ্ধি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। এই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খাদ্যের, যা আমাদের শরীর-বৃদ্ধি ও শরীর রক্ষার প্রয়োজনে লাগবে, যা থেকে আমাদের শরীরের শক্তি ও উত্তাপ জন্মাবে, শরীর গড়ে উঠবে তাকেই বলবো খাদ্য। খাদ্যের সাথে ইঞ্জিনের কয়লার সাথে তুলনা করা হয়, তুলনাটা আংশিক সত্য। খাদ্য হচ্ছে দেহের জ্বালানী। এই জ্বালানী পুড়িয়েই আমরা দেহের তাপ রক্ষা ও কর্মশক্তির যোগান পাই। যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে আমাদের দেহ দুর্বল, রুগ্ন ও রোগপ্রবণ হয়। মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও শক্তির অভাব ঘটে। কোন খাদ্য গ্রহণ না করে আমরা কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য অত্যাবশ্যক। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্য আমাদের দেহের কি কি অভাব পূরণ করে তা বিচার করে দেখা যাচ্ছে খাদ্য :—

খাদ্য কাকে বলে ?

॥ ১ ॥ দেহের পুষ্টি সাধন করে, বাল্যকাল থেকে আমাদের দেহ বেড়েই চলছে এই বৃদ্ধির কাজে খাদ্য সহায়তা করে। প্রতিনিয়ত মানব দেহের ভিতরে ও বাইরে যে কাজ চলছে তার ফলে যে ক্ষয় হচ্ছে সেই ক্ষয় পূরণ খাদ্য দ্বারা সাধিত হচ্ছে।

॥ ২ ॥ দেহকে কর্মক্ষম রাখতে হলে ও দেহের তাপ রক্ষা করতে খাদ্যের প্রয়োজন। ইঞ্জিন চালু রাখতে জল, কয়লা যে কাজটি করে এই দেহ যন্ত্রটি চালু রাখতে খাদ্য সেই কাজ করে। খাদ্যের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে দেহের তাপ রক্ষা ও কর্মশক্তি যোগান।

॥ ৩ ॥ দেহকে বলা হয় ব্যাধিমন্দির। খাদ্য শুধু দেহই গড়ে তোলে না দেহে যাতে কোন রোগ দেখা না দেয় ও রোগ সৃষ্টি হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলাও খাদ্যের কাজ। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দেহ দুর্বল হলে মানুষ অসুস্থ হয়, নানান রোগ দেখা দেয়। খাদ্যের তৃতীয় কাজ হ'ল দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করে দেহকে সুস্থ রাখা।

খাদ্যের উপাদান (Elements of Food): দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে আমরা খাদ্যগ্রহণ করি। কোন একটি খাদ্য দ্বারাই দেহের সব প্রয়োজন মেটান যায় না। বিভিন্ন রকম খাদ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে। আমাদের দেহের জন্য শ্বেতসারের প্রয়োজন। ভাত এই প্রয়োজন মেটাতে পারে বলে আমরা ভাত খাই। তাই শ্বেতসার ভাতের উপাদান। এমনি এক একটি খাদ্যের মধ্যে এক একটি উপাদান রয়েছে। এই উপাদানের বিচারে কোন খাদ্য দ্রব্যের **খাদ্য মূল্য** (Food value) স্থির হয়। দেহের নানারূপ প্রয়োজন মেটাতে খাদ্য-মূল্য বিচার করে আমরা নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ করি। যে সব খাদ্য পরিমিতভাবে গ্রহণ করলে দেহের সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব, আমরা তাকে **সুষম খাদ্য** (Balanced diet) বলি।

খাদ্যমূল্য ও সুষম খাদ্য

ক্যালোরি (Calorie): দেহের পুষ্টির জন্য সবদিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে তাহা খাদ্যের পুষ্টিমূল্য অনুসারে করা হয়। অর্থাৎ, কোন খাদ্যের কতটা ইন্ধন-শক্তি আছে তা দেখতে হয়। খাদ্যের এই ইন্ধন শক্তি বা মূল্যকে বলা হয় **ক্যালোরি** (Calorie)। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কোন খাদ্য কি পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতে পারে তা থেকে ক্যালরির পরিমাণ স্থির করতে হয়। এক গ্রাম জলের উষ্ণতা ১° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে ১ ক্যালোরি তাপ বলা হয়। আমরা যা কিছু খাই তার তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী ক্যালোরি মূল্য মাপা হয়। যেমন:—

খাদ্যের ক্যালোরি মূল্য

১ গ্রাম প্রোটিন	৪.১ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে।
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট	৪.১ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে।
১ গ্রাম চর্বি	৯.৩ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করে।

খাদ্য থেকে তাপ উৎপাদন ছাড়াও আমাদের চলাফেরার মধ্য দিয়ে যে অঙ্গ সঞ্চালন হয় তার মাধ্যমেও কিছু তাপ সৃষ্টি হয়।

দেহের ক্যালোরির প্রয়োজন অনুসারে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে একটি শিশুর ১ বছর বয়সে তার দেহের ওজন অনুসারে প্রতি পাউণ্ডের জন্য প্রতিদিন ৪৫ ক্যালোরি প্রয়োজন। বয়স বাড়তে থাকলে এই প্রয়োজন কমতে থাকে।

৩ বছর পর্যন্ত	প্রতি পাউণ্ড ওজনে	৪০	ক্যালোরি তাপ দরকার
১৪ বছর	" "	২৪	" " "
পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির	"	১৬	" " "

সাধারণ হিসেবে দেখা গিয়েছে আমাদের দেহের জন্য রোজ প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি প্রয়োজন। অলস ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন ১৪৪০ ক্যালোরি। যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাদের প্রয়োজন ৩৫০০ ক্যালোরি।

জৈব ও অজৈব খাদ্য :—আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি গুণ অনুসারে সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, জৈব খাদ্য ও অজৈব খাদ্য। জৈব খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন ও তাপ উৎপাদনে সহায়তা করে। অজৈব খাদ্য জীবনীশক্তি দানে ও সংরক্ষণের শক্তি জোগায়।

খাদ্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়

খাদ্যের ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুসারে সমস্ত খাদ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :—

(ক) **দেহের পরিপোষক খাদ্য :**—

১। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য।
২। কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।
৩। চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য।

(খ) **জীবন শক্তিদায়ক ও সংরক্ষক খাদ্য :**—

১। বিভিন্ন ধাতব লবণ।
২। জল।
৩। ভাইটামিন।

প্রোটিন
[Proteins]

প্রোটিনের কাজ হচ্ছে দেহের যাবতীয় ক্ষয়পূরণ, দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন, দেহের যাবতীয় রস উৎপাদন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রোটিন কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে ও কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, দৈহিক উত্তাপ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আমাদের দেহের জীবকোষ গঠনে প্রধান উপাদান প্রোটিন। এ জন্য একে Body building brick বলা হয়।

Body building briok

প্রোটিনকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলা হয়েছে। প্রোটিন উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় জগৎ থেকেই পাওয়া যায়। এজন্য **প্রোটিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে**—

প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (Vegetable Protein) **:** উদ্ভিদ থেকে এই প্রোটিন পাওয়া যায় যেমন, ডাল, বাদাম, বীট, শালগম, সোয়াবিন প্রভৃতি।

প্রাণীজ প্রোটিন (Animal Protein) **:** প্রাণী জগৎ থেকে এই প্রোটিন পাওয়া যায় যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, দুধ, পনীর প্রভৃতি।

দুই জাতীয় প্রোটিনের মধ্যে আমাদের দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড সমূহ প্রাণীজ প্রোটিন থেকে পাওয়া যায়। একে সম্পূর্ণ (Complete)

বা প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলা হয়। সবুজ শাক সবজি ও সোয়াবিন থেকে সামান্য পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। আমরা দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই খাদ্যের শতকরা দশ ভাগ প্রোটিন। যতদিন আমাদের শরীর বৃদ্ধি হতে থাকে ততদিন দেহ গঠনের মূল উপাদানরূপে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব বেশী।

শরীরের বৃদ্ধিতে প্রোটিন প্রয়োজন

আমাদের শরীরের বৃদ্ধিকাল ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময় পর্যন্ত প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এর পর থেকে প্রোটিনের প্রয়োজন কমতে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কের তুলনায় কিশোর ও যুবকের প্রোটিনের প্রয়োজন বেশী। শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে দেহের পুষ্টি হয় না। ওজন কমে যায় ও মেজাজ খিট খিটে হয়। প্রোটিনের অভাবে দেহের রোগ প্রতি-রোধের ক্ষমতা কমে যায়। রক্তাল্পতা ও পেটের গণ্ডগোল প্রভৃতি দেখা যায়।

যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করা যায় তাহাও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে বাত রোগের সৃষ্টি করতে পারে এ ছাড়া মাথা ধরা, অবসাদ প্রভৃতি দেখা যায়।

বিভিন্ন বয়সে নিম্নরূপ প্রোটিন গ্রহণ করা প্রয়োজন :—

শিশু	২।৬ বছর দৈনিক	৪০।৫০ গ্রাম
শিশু	৬।৯ বছর দৈনিক	৬০ গ্রাম
বালক	১০।১৭ বছর দৈনিক	৮০ গ্রাম
বালিকা	১০।১৭ বছর দৈনিক	৭০ গ্রাম
পুরুষ	১৮।৬০ বছর দৈনিক	৬৫ গ্রাম
নারী	১৮।৬০ বছর দৈনিক	৫০ গ্রাম।

কার্বোহাইড্রেট
[Carbohydrate]

জমি থেকে আমরা যত রকম শস্য বা শস্য বীজ পেয়ে থাকি তা সমস্ত এ জাতীয় খাদ্য। আমরা রোজ যে খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। এ জাতীয় খাদ্য দামেও সস্তা। চর্বি জাতীয় খাদ্যের পর এই জাতীয় খাদ্য থেকেই আমরা বেশী শক্তি ও তাপ লাভ করি। যে যত বেশী পরিশ্রম করে তার তত বেশী কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **শর্করা**—যথা গ্লুকোজ, ইক্ষু, দুগ্ধ, মধু, ইত্যাদি শর্করা জলে দ্রবনীয় ও মিষ্টি স্বাদ যুক্ত।

২। **শ্বেতসার**—চাল, গম, বার্লি, আলু প্রভৃতি। আমরা রোজ যে কার্বোহাইড্রেট খাই তার বেশীর ভাগ শ্বেতসার জাতীয়। উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার ছাড়া প্রাণীদেহে বিশেষ করে লিভারে এক জাতীয় শ্বেতসার পাওয়া যায় একে প্রাণীজ শ্বেতসার বলে। ধান, যব, গম আলু প্রভৃতির মধ্যে যে শ্বেতসার আছে তা রান্না করলে সহজ পাচ্য হয়।

৩। **সেল্যুলোজ**—ঘাস, তুলা, কাগজ, কাপড়, পাট ও শাক সবজি। খাদ্য হিসেবে এর মূল্য খুব কম।

আমাদের রোজকার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ থেকে আসে। **এই জাতীয় খাদ্য সস্তা বলে আমাদের এই গরীব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তাদের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা ৮০ ভাগ এই জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করে।**

খাদ্যে যদি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহলে পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। দাঁতের ক্ষয় রোগ ও এই জাতীয় খাদ্যের আধিক্যের ফল। দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট চর্বিরূপে জমে, দেহকে মেদ বহুল করে তুলে।

চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য

[Fat]

দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি এই জাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। ঘি, মাখন, তেল, বনস্পতি জাতীয় খাদ্য প্রভৃতির মধ্যে ইহা পাওয়া যায়।

স্নেহ জাতীয় খাদ্য উৎপত্তি অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত :—

১। **উদ্ভিজ্জ স্নেহ** (Vegetable Fat) ২। **প্রাণীজ স্নেহ** (Animal Fat)।

উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায় বলে সরিসার তৈল, নারিকেল তৈল, বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ। প্রাণী জগৎ থেকে পাই বলে ঘি, মাখন, মাছের তেল চর্বি প্রভৃতি প্রাণীজ স্নেহ পদার্থ।

স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমাদের রোজ কিছু গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে দেহের পক্ষে কতটুকু স্নেহ জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। এই জাতীয় খাদ্য শ্বেতসার অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় তাপ উৎপাদন করে বলে শীত প্রধান দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে এ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। একজন বয়স্ক ও কর্মক্ষম ব্যক্তির রোজ ৭০।৮০ গ্রাম স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্যে স্নেহ জাতীয় দ্রব্যের অভাব হলে শরীরের চামড়া শুষ্ক ও খস্ খসে হয়, ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে এর অভাব ঘটে। দেহে একজিমা জাতীয় রোগ দেখা দিতে পারে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্যের উপর দেহের মসৃণতা ও সৌন্দর্য অনেকটা নির্ভর করে। আবার এর আধিক্য হলে অজীর্ণ ও কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগের সৃষ্টি হয়। দেহের অতিরিক্ত মেদ সৃষ্টি করে দেহকে কুৎসিৎ ও অকর্মণ্য করে তোলে। অত্যধিক প্রাণীজ স্নেহে বহুমূত্র ও হৃদরোগের সৃষ্টি হয়।

ধাতব লবণ
[Mineral Salt]

সাধারণ লবণ ছাড়া আরো কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ আমাদের দেহে প্রয়োজন হয়। আমাদের দেহের প্রায় ছয় ভাগ ধাতব লবণ। আমাদের দেহে বিভিন্ন লবণের মধ্যে প্রায় কুড়িটি মৌলিক পদার্থ দেখা যায়। আমাদের দেহ থেকে নানা ভাবে যেমন মল, মূত্র, ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছু লবণ রোজ বের হয়ে যায়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য রোজ খাদ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতব লবণ গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লৌহঘটিত লবণই প্রধান। ক্যালসিয়াম লবণের অভাব ঘটলে হাড় ও দাঁতের ক্ষতি হয়। এ দু'টি গঠনে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য। গর্ভবতী নারী ও স্তন্য দানকারী মায়ের এবং শিশুর খাদ্য এজাতীয় লবণের অভাবে হাড় অপুষ্ট ও দুর্বল হয়। পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের অভাব ঘটলে হৃৎপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত ও পেশী সমূহের দৌর্বল্য, পরিপাক শক্তি হ্রাস ও চর্মরোগের সম্ভাবনা থাকে। লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। ফস্‌ফরাস দেহের সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য প্রয়োজন।

খাদ্যের লবণের জন্য বিশেষ কোন খাদ্যের প্রয়োজন নাই। যদি খাদ্যের মধ্য থেকে অন্যান্য উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা যায় তাহলে এর মধ্যে থেকে লবণ জাতীয় খাদ্যের অভাবও পূর্ণ হয়ে যায়। কোন একটি খাদ্যে সব রকম লবণ পাওয়া যায় না তাই দেহের লবণের অভাব পূরণের জন্য মিশ্রখাদ্য খাওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণ প্রচুর পাওয়া যায়;

ক্যালসিয়াম :—দুধ, দই, পনীর. ডিমের কুসুম, বাদাম, বিভিন্ন প্রকার ডাল ফল, সবুজ শাক সবজি, শ্রেষ্ঠ দুধ।

ফস্‌ফরাস—দুধ, দই, ডিম, সয়াবিন, জল, বাদাম, গম, জোয়ার, বাজরা রাগী, পাল, মুলা, গাজর, ফুলকপি, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

লৌহ—মাংস, মাছ, ডিম, লিভার, জল, ঢেঁকিছাটা চাল। আটা, বাজরা, পালং শাক, পেঁয়াজ, মূলা, তরমুজ, শশা, শালগম, টমেটো, সয়াবীন, পান, লালশাক, নটেশাক, করলা, তালমিছরি ইত্যাদি।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

[Vitamins]

খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি ছাড়াও এক বিশেষ প্রকারের সূক্ষ্ম জাতীয় উপাদান আছে যা আমাদের জীবন ধারণ ও দেহকে সুস্থ রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সূক্ষ্ম উপাদানটির অভাব হলে বেরি বেরি, স্কার্ভি, রিকেটস্ প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দেয়। এই সূক্ষ্ম দ্রব্যটিই ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ। যদি দেখা যায় উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করেও শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাবে সে যে খাদ্য গ্রহণ করছে তার মধ্যে খাদ্য-প্রাণের অভাব ঘটেছে। নীরোগ থাকতে হলে আমাদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন চাই। টাটকা খাদ্যেই বেশী পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ থাকে। অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় খাদ্যে ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট হলে পরিমাণে খুব কমই দরকার। ভিটামিন প্রত্যক্ষভাবে দেহ-গঠনের কাজে অংশ নেয় না। কিন্তু, এর অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন বা দেহে তাপশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কাজগুলি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। ভিটামিন এক প্রকারের নয়। দেহের মধ্যে ভিটামিনের কাজ-কর্মের তারতম্য অনুসারে ভিটামিনকে নানা নাম দেওয়া হয়েছে। বহু প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ছয় রকম ভিটামিন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়।

ভিটামিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) জলে দ্রবীভূত হয় ভিটামিন বি, বি-কমপ্লেক্স, সি, (২) জলে দ্রবীভূত হয় না ভিটামিন এ, ডি, ই, কে।

ভিটামিন 'এ'—দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে, রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে শরীর সুস্থ রাখতে, খাদ্যের পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেককে সহায়তা করতে, দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে 'ভিটামিন এ'র সহায়তা প্রয়োজন।

'এ' ভিটামিনের অভাব হলে চক্ষুরোগ হয়। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগ দেখা দিতে পারে, এছাড়া দেহের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে।

কড মাছ ও শার্ক মাছের তেল, তৈল জাতীয় মাছ, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, লিভার, চর্বি, দুধ, সবুজ শাক-সবজি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি', বি১, বি২, পনেরোটি ভিটামিনের সমন্বয়ে গঠিত বলে একে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলে।

এই ভিটামিন স্নায়ুকে সতেজ ও সবল রাখে। বেরিবেরি রোগের হাত থেকে রক্ষা করে, পরিপাকের সহায়তা করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। নারীর স্তনে দুধ বৃদ্ধি করে।

খাদ্যে ভিটামিন 'বি'র অভাব ঘটলে বেরিবেরি হয়। লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী আকার ও আয়তনে বেড়ে যায়। জিহ্বায় প্রদাহ ও মুখের কোণে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। এছাড়া অবসাদ দেখা দেয়।

ডিম, লিভার, টমেটো, শালগম, মূলা, লেটুস প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে 'বি' ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়া আটা, সোয়াবিন, ডাল, ছোলা, সিম, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, দুধ প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে 'বি' ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'সি'—খাদ্যে 'সি' ভিটামিন স্কার্ভি রোগ নিবারণ করে। দাঁত ও হাড়ের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে। রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পাকস্থলী সুস্থ রাখে ও রোগ বীজাণুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

'সি', ভিটামিনের অভাব হলে অলসতা, ক্ষুধার অভাব হাত ও পায়ের গাঁটে ব্যথা হওয়া, ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। মেজাজ খিটখিটে হয়, ওজন কমে যায়, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি দেখা যায়, অনেক দিন এই ভিটামিনের অভাব হলে দাঁতের মাড়ি ফুলে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

বাঁধাকপি, পালংশাক, অঙ্কুরিত ছোলা, কমলালেবু, লেবু, টমেটো প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। এছাড়া গাজর, লেটুস, আলু, শালগম, আনারস, ন্যাসপাতি প্রভৃতিতে এই ভিটামিন কিছু পাওয়া যায়। আগুনের তাপে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। টাটকা দুধে এই ভিটামিন আছে কিন্তু আগুনের তাপে দুধ থেকে 'সি' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

ভিটামিন 'ডি'—এই ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের কাজে সাহায্য করে। চামড়ায় সূর্যের আলো লাগলে এই ভিটামিন সৃষ্টি হয় ও রিকেট রোগ নিবারণ করে। আমাদের দেশে প্রচুর সূর্যালোকের ফলে পাশ্চাত্য দেশ থেকে রিকেট রোগ অনেক কম দেখা যায়। এই ভিটামিন শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিশুদের এই ভিটামিনের অভাব হলে শিশু ভীরু ও অস্থির-চিত্ত হয়। হাড়ের পুষ্টির অভাবে হাঁটতে অনেক দেরী হয়। বয়স্কদের দেহে 'ডি' ভিটামিনের অভাব হলে পা দুর্বল হয়ে যায়, কোমরে ও পায়ে বাতের ব্যথার মত ব্যথা হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মেয়েদের জন্য এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন।

কড মাছের তেল, ও শার্ক মাছের তেলে এই ভিটামিন সবচেয়েবেশী পাওয়া যায়। মাখন, ঘি, দুধ, ডিমের কুসুম, বিভিন্ন প্রকার মাছের তেলে 'ডি' ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই'—এই ভিটামিনের অভাব হলে স্ত্রীলোকের সন্তান ধারনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। 'ই' ভিটামিনের ব্যবহারের ফলে মৃত বৎসা নারীরা সুস্থ সবল সন্তানের জননী হতে পারেন। পুরুষের দেহে এই ভিটামিনের অভাব হলে শুক্রাশয় ছোট হয়ে আসে। এই ভিটামিনের ব্যবহারে রক্তে জমাট বাঁধা ও করনারী থ্রম্বোসিসের উপকার হয়। যাঁরা চশমা না হলে দূরের জিনিস দেখতে পান না এই ভিটামিনের ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়। অপরিণত মন ও বুদ্ধির শিশুরা এই ভিটামিন ব্যবহার করলে উপকার পায়। অকাল বার্দ্ধক্যে দেহ ও মন নিস্তেজ হয়ে পড়লে এই ভিটামিনের ব্যবহারে আনন্দ ও উৎসাহ ফিরে আসে।

সয়াবীন, লেটুস, টাটকা শাক-সবজি, গম, ডিমের কুসুম, লিভার, বাদাম, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'কে'—রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে এই ভিটামিনটি অতি কার্যকরী। গর্ভবতী নারীকে গর্ভের শেষ মাসে ভিটামিন 'কে' দিলে অতিরিক্ত রক্তপাতের ভয় থাকে না। পালংশাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদিতে 'কে' ভিটামিন প্রচুর আছে। চাল, আটা, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতিতে ইহা কিছু পরিমাণ আছে।

ভিটামিন 'পি'—আম, জাম, কমলালেবু, টমেটো প্রভৃতিতে 'সি' ভিটামিনের আনুষঙ্গিক ভিটামিন বলা যেতে পারে। আমরা ফল খেয়ে যে ছিবড়া ফেলে দেই সেই ছিবড়ার মধ্যেই থাকে 'পি' ভিটামিন। ছিবড়া সমেত ফল খেলে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। থ্রম্বোসিসের প্রথম অবস্থায় 'পি' ও 'ই' ভিটামিন খেলে সুফল পাওয়া যায়।

টাটকা সব রকম খাদ্যেই কিছু না কিছু ভিটামিন আছে। বাসি হলে বা বেশী দিন রাখলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আগুনে জাল দিলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে কৃত্রিম ভাবে নানা ভিটামিন তৈরী ও নানা রোগের প্রতিরোধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুষম খাদ্য
[Balanced diet]

দেহের পুষ্টি, ক্ষয়পূরণ, তাপ রক্ষা ও কর্ম শক্তি যোগানের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। সেই সব উপাদান গ্রহণ করে আমরা দেহের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাই। যে সব উপাদান আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় তার হ্রাস-বৃদ্ধি দুইই আমাদের ক্ষতির কারণ

হতে পারে। আনুপাতিক হারে প্রতিটি দ্রব্যই যাতে আমরা খাদ্যের মাধ্যমে পেতে পারি সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তির জন্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ ক্যালোরী তাপ উৎপাদনকারী খাদ্যের প্রয়োজন। শুধু একজাতীয় খাদ্য থেকেই হয়ত সেই পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তার ফল ভাল হবে না। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান তার মধ্যে নেই। পেট ভরে খেলেই সব সময় স্বাস্থ্য ভাল হয় না। দেহের গঠনকারী ও তাপশক্তি রক্ষাকারী সমস্ত উপাদান থাকলেই দেহের পুষ্টি হবে ও দেহ সুস্থ-সবল থাকবে।

বয়স ও বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ কম বেশী হবে। একজন শ্রমিকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের দরকার, একজন কেরাণীর জন্য সেই পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন নেই। যার যতটুকু পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন সে ততটুকু পরিমাণ তাপশক্তি যোগাবার উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবে।

খাদ্য তালিকা স্থির করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যেন তার মধ্যে থাকে। দেহের পুষ্টির জন্য যে উপাদান যতটা খাদ্যের মধ্যে থাকা উচিত তা থাকলেই আমরা তাকে সুষম খাদ্য বলব।

আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনের তারতম্য আছে। তবু একজন সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রয়োজন নিম্নরূপ হবে—

প্রোটিন—১০০ গ্রাম   স্নেহ—১০০ গ্রাম

কার্বোহাইড্রেট—৪০০-৫০০ গ্রাম   ধাতব লবণ—৩০ গ্রাম

জল—৪—৪½ পাইন্ট।

খাদ্যের এই উপাদানগুলি পেতে হলে আমাদের রোজ কোন জিনিস কতকটা খেতে হবে তার একটা তালিকা দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশের অবস্থা বিচার করে ন্যাশান্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটারী এই তালিকা প্রস্তুত করেছে।

চাল—	১৪ আউন্স
ডাল—	
মাছ বা মাংস—	
সবরকম তরকারী ও টাটকা সব্জী—	১০
তেল, ঘি—	২
দুধ—	১০
চিনি, গুড়—	২
ফল—	৩
ডিম—	১টি।

যে খাদ্য তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল এই তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ খুব কম বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে সম্ভব। বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রধান উপাদান কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন যেটুকু পাই তা বেশীর ভাগ উদ্ভিদ থেকেই পাই। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, আহারের তালিকা থেকে প্রায় বাদই থাকে। সাধারণ ভাবে ছাত্রদের দিকে তাকালেই দেখা যায় তারা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। উপরের তালিকা অনুসারে খাদ্য যোগান সম্ভব না হলে খাদ্য যাতে যথাসম্ভব সুষম হয়ে ওঠে সে চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

খাদ্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে আমাদের কি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন তা আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের রোজকার খাদ্য তালিকায় কি কি দ্রব্য স্থান পেলে দেহের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানের অভাব পূরণ সম্ভব সেই তালিকা আলোচনায় আমরা দেখেছি সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের পক্ষে তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। নানাদিক থেকে অনেক অসুবিধা আছে স্বীকার করে নিয়েও যদি আমরা আমাদের খাদ্য প্রস্তুত ও গ্রহণ সম্পর্কে কয়েকটি অতি সাধারণ নিয়মকে মেনে চলি তাহলে আমাদের খাদ্যকে কিছুটা উন্নত করা ও দেহকে সুস্থ রাখা সম্ভব।

সারা ভারতে বাঙ্গালী রান্নাঘরে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করে অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসীরা তা করে না। এর ফলে আমরা মুখরোচক খাবার তৈরী করি। কিন্তু তা দেহের পুষ্টি সাধনে কতটুকু কাজে লাগে তা চিন্তা করি না। অতিরিক্ত তেল মসলা বাদ দিয়ে রান্না করতে হবে। সে খাবার সহজ পাচ্য হবে ও সে খাবারে খাদ্যের গুণও বজায় থাকবে। অতিরিক্ত সেদ্ধ ও বেশী ভাজা দুইই খাদ্যের খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করে দেয়। তরকারির খোসা ফেলে দিলে তার সাথে খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণ দুই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কলছাটা চালে বিশেষ করে থাকে না; ফেন ফেলে দিয়ে যেটুকু থাকে তাও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রান্নার প্রণালীটা বদল করতে পারলে বর্তমান অবস্থায়ও খাদ্যের উন্নতি করা সম্ভব।

দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু অতি ভোজন বা অসময়ে ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। খেতে হবে পরিমিত ও রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে। এর সাথে মনে রাখতে হবে বাসি, ঠাণ্ডা, খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

যেখানে সেখানে বিশেষ করে হোটেল রেস্টুরেণ্টে খাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। এসব জায়গা থেকে অনেক সময় রোগ ছড়ায়।

খোলা বা আঢাকা খাবার বাড়ীতে, দোকানে রেস্টুরেণ্টে কোথাও খাওয়া উচিত নয়। বাড়ীতে এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, কিন্তু দোকান

থেকে খোলা খাবার ছাত্রেরা সব সময় কিনছে। আইসক্রীম, সোডা প্রভৃতি বাজার থেকে ছাত্রেরা যা কিনে খায় তা প্রায়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

পাতের খাবার বা মুখের খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এভাবে রোগ ছড়ায়। হাত দিয়ে খাদ্য পরিবেশনও ক্ষতিকর। এসব পরিহার করে চলতে হবে।

পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহে অনেকেই অক্ষম হতে পারেন, কিন্তু এই নিয়মগুলি পালন করা কঠিন নয়। পারিবারিক জীবনে এই অভ্যাসগুলি করতে ছেলেমেয়েদের অল্পবয়স থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। নিয়মগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা সচেতন হলে পরবর্তী জীবনে এসব নিয়ম মেনে চলা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না।

বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা

জলখাবারের প্রয়োজনীয়তা (Need for Tiffin) :

ছাত্র-ছাত্রীরা যে বয়সে স্কুলে আসে সে বয়সটা হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়। ছেলেমেয়েদের দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাব হলে দেহ দুর্বল হয় ও দেহে রোগ প্রবণতা দেখা দেয়। দৈহিক পুষ্টির অভাবে মানসিক শক্তির ও সম্যক বিকাশ লাভ ঘটে না। দেহকে কর্মক্ষম রাখতে, দৈহিক পুষ্টির জন্য, দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য দেহের তাপ-রক্ষা ও রোগ-প্রতিরোধের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ইঞ্জিনের যেমন জল ও কয়লার প্রয়োজন দেহের পক্ষেও কর্মশক্তি অর্জনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বাল্যে ও কৈশোরে যদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে তাহলে দেহ সুগঠিত হবে না, তারা চিররুগ্ন হবে, জীবন হবে তাদের কাছে একটা বোঝা, সমাজও তাদের গলগ্রহ মনে করবে।

শিক্ষার্থীরা বাল্যে ও কৈশোরে খাদ্য না পেলে তাদের স্বাস্থ্য সুগঠিত হয় না।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ১০টার মধ্যে স্কুলের দিকে রওনা হয়। স্কুলে ৪টা থেকে ৪-৩০টায় বাড়ী ফেরে। স্কুলে তারা কিছুটা ছুটোছুটি করে, খেলা করে ফলে তাদের পরিশ্রম হয়, দেহের ক্ষয় সাধিত হয়। সকাল ১০টার মধ্যে যারা খেয়ে আসে ১টার মধ্যে তাদের খিদে পায়। দেহের পুষ্টি ও তাপ রক্ষার প্রয়োজনেই তখন তাদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলের সময় তালিকায় এজন্য বিরতির ব্যবস্থা আছে। বিরতির ঘণ্টাকে বলা হয় টিফিন পিরিয়ড (tiffin period) বা জল খাবারের ঘণ্টা। ধরে নেওয়া হয় যে, ছাত্রেরা এ সময়ে কিছু খাবে। কোন কোন শহরাঞ্চলের ছেলে হয়তো বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসে। গ্রামের

বিদ্যালয়ের পরিশ্রমে শরীরের ক্ষয় সাধন হতে পূরণের জন্য জলযোগের প্রয়োজন

খবর যারা রাখেন তাঁরা জানেন বছরে একটা সময়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কিছু না খেয়েই স্কুলে আসে। তাদের পক্ষে টিফিন নিয়ে আসা বা কিছু কিনে খাবার জন্য পয়সা নিয়ে আসা কল্পনার বাইরে। অথচ ৪টা বা ৪॥টা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা এই অল্প বয়সের ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দেহের ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা না হলে স্বাভাবিক ভাবেই অপুষ্টি দেখা দিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ছাত্রদের জন্য Mid day meal এর ব্যবস্থা আছে। সে অসম্ভব চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতার হাত থেকে ছাত্র সমাজকে রক্ষা করতে হলে বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় কিছু খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ছাত্রেরা নিজেরা কিছু কিনে খাবে এ ভরসা থাকলে চলবে না। ছাত্রদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে তাদের দেহ-মন পড়ার উপযোগী রাখতে, ছাত্রেরা স্কুলে থাকাকালীন কিছু খাবার যাতে পায় সে চিন্তা স্কুল কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। প্রগতিশীল দেশ-সমূহে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা তাদের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে। শিক্ষা শুধু পড়ান নয় দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও শিক্ষার একটি অঙ্গ।

অনেক ছেলেমেয়েরেই কিছু না খেয়ে বিদ্যালয়ে আসে

জলযোগের ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের কর্তব্য

বিদ্যালয়ের বহু ছেলেমেয়ে ৩।৪ মাইল দূর থেকে আসে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ গরীব বাড়ীর ছেলেমেয়ে। আমাদের দেশের শতকরা ৯০জন লোকই গরীব। ঠিকমত না খেয়ে ৩।৪ মাইল হেঁটে এসে বিদ্যালয়ে ৫।৬ ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা আমাদের মর্মমূলে বসে সব কিছুর কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাও তার থেকে রেহাই পায় নাই। তাছাড়া চঞ্চলমতি ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে এসে দৌড় ঝাঁপ করে। তাতে তাদের শরীর ক্ষয় হয়। তা পূরণের জন্য খাওয়া প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বিদ্যালয়ের জলযোগ ব্যবস্থা

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে অনেক ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে মেয়েরা পড়ে। বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা না থাকলে তারা টিফিন সঙ্গে আনে, অথবা বাড়ী থেকে পয়সা নিয়ে এসে খাবার কিনে খায়। কিন্তু গরীব বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়ে মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। তা রোধ করবার জন্যে বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য

বিভ নয়ে জলযোগের ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যালয় একটি পরিবারে পরিণত হয়। খাওয়ার সময়ের আনন্দ, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশ শিক্ষা ও সমাজজীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে তার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞান অর্জন

খাদ্য নির্বাচন (Selection of Food) ঃ

ছাত্রদের জলখাবারের ব্যবস্থার সময় প্রথমেই দেখতে হবে, যে খাবার ছাত্রদের দেওয়া হবে তা যেন পুষ্টিকর হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দিলেও হয়ত দেখা যাবে ছাত্রদের মধ্যে পুষ্টির অভাব জন্মাচ্ছে। খাদ্য প্রচুর হলেই হবে না—পুষ্টিকর খাদ্য বেছে নিতে হবে। স্কুলের টিফিনে পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাই পুষ্টিকর খাবার তারা যাতে পায় সে চিন্তা করে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য পুষ্টিকর হলেই চলবে না সেই সাথে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে হবে। একই রকম খাদ্য যত পুষ্টিকরই হোক না কেন ছাত্রদের রুচির সাথে সঙ্গতি রেখে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। খাদ্যের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রসনাতৃপ্তির দিকটিও দেখতে হবে। খাদ্য যেন খেতে ভাল লাগে, খেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন তৃপ্তি পায়। আঞ্চলিক অবস্থা ও অর্থ এ-দুয়ের সমন্বয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করে খাদ্য নির্বাচন করা উচিত।

পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ খাদ্য

আর্থিক দায়িত্ব (Financial Responsibility) :

স্কুলে টিফিনের সাথে যে প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তা হচ্ছে টিফিনের ব্যয় ভার বহন করবে কে ? আমাদের দেশের স্কুলগুলির পক্ষে এই ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র অর্থের সন্ধান করতে হবে। তারপর অভিভাবকদের উপর এই ব্যয় ভার চাপান যায় কি না সে কথা ভাবতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অতি কষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করে। পল্লী অঞ্চলে স্কুলের মাইনে কম তবু দেখা যাবে মাসের পর মাস ছাত্রেরা স্কুলের মাইনে দিতে পারছে না। তার উপর যদি টিফিনের খরচ বাবদ অতিরিক্ত বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারবে না। সবদিক বিবেচনা করে এই ব্যয় ভার বহন করবার দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান স্কুল থেকে অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হলে বাকী অর্ধেক সরকার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে অর্ধেক খরচ দেবার মত শক্তি অধিকাংশ স্কুলের নেই। যে নীতি সরকার অনুসরণ করছে এভাবে চললে অধিকাংশ স্কুলে কোনদিনই টিফিনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে না। দীর্ঘসময় ব্যাপী কিছু না খেয়ে ছাত্রেরা দিনের পর দিন স্কুলে থাকলে

ছাত্রদের মধ্যে যে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেবে সেটা জাতীয় ক্ষতি। এই ক্ষতি রোধ করতে হলে সরকারকে নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা পল্লী অঞ্চলের থেকে কিছু ভাল। স্কুল টিফিনের ব্যয় ভার থেকে গ্রামের স্কুলগুলিকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া উচিত। শহরের অভিভাবকদের অর্ধেক ব্যয় ভার বহন করার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের স্কুলেও গরীব ছাত্রদের জন্য ফ্রি টিফিন দিতে হবে।

সরকারী দায়িত্ব

ছুটির দিন ও শনিবার বাদ দিলে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ১৬৫ (৫২ রবিবার+৫২ শনিবার+৯৬ অন্যান্য ছুটি=২০০ দিন) দিনের বেশী টিফিনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। যদি দৈনিক প্রতি ছাত্রের জন্য কুড়ি পয়সার মধ্যে টিফিনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বছরে মাথা পিছু তেত্রিশ টাকার প্রয়োজন। মাসে প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য দেড় টাকা যদি সরকার থেকে দেয় তাহলে বাকী অর্থ অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। শহরের শিক্ষিত অভিভাবকেরা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে রাজী হবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু গ্রামের স্কুলের ছেলেদের জন্য টিফিনের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও সমাজ কল্যাণ বিভাগেরও এ সম্পর্কে একটা দায়িত্ব রয়েছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগ যদি আংশিক ব্যয় ভার বহন করে তাহলে সমস্যার সমাধান সহজতর হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেরা জলযোগ প্রস্তুত ও বিতরণ করে কিছু অর্থের সাশ্রয় করতে পারে।

টাকা আসবে কোথা থেকে ?

খাদ্য তালিকা (Menu):—

স্কুল টিফিনে কি খাবার দেওয়া হবে এ সম্পর্কে একটা পূর্ণ নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা করে দেওয়া সম্ভব নয়। আর্থিক সামর্থ্যে কুলালে দুধ, ডিম, ফল, মাংসের স্যাণ্ডউইচ, রুটি মাংস প্রভৃতির একটা খাদ্য তালিকা করে দেওয়া কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গরীব দেশের ছাত্রদের অল্প খরচে যাতে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় অবস্থা বিচার করে ঋতু ভেদে খাদ্য তালিকা বিভিন্ন প্রকার হবে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির যুগে একটা নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে কিছু ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। স্থানীয় বাজারে কি পাওয়া যায় ও দর সীমার মধ্যে কি না, তা বিচার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ দৈনিক টিফিনের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিস সর্বত্র অল্প খরচে ব্যবহার করা যায়। চিড়ে ভাজা ও নারকেল,

জলযোগের বিভিন্ন খাদ্য

আটার রুটি ও আলুর তরকারী, অঙ্কুরিত ছোলা বা চিনে বাদামের সাথে মুড়ি, সময় উপযোগী ফল, বিশেষ করে কলা ও কমলা, নিয়মিত দুধ দিতে পারলে ভাল হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন মাঝে মাঝে দুধ ও ডিমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে চার ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে,—(১) Bread (2) Butter, (3) Fruits (4) Drinks আমাদের দেশেও পুষ্টিকর উপাদান, রসনাতৃপ্তি, বৈচিত্র্য ইত্যাদি মেনে নিয়েও উল্লিখিত চারটি শ্রেণীর খাদ্যের সংমিশ্রণে বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করা যায় কি না তা ভেবে দেখা উচিত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) :—

টিফিনের ব্যাপারে যথা সম্ভব বাজারের খাবার বাদ দিয়ে চলতে হবে। বর্তমান ভেজালের যুগে ছাত্রদের খাঁটি পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে স্কুলেই শিক্ষকদের তত্ত্বাধানে টিফিন প্রস্তুত করা হবে। টিফিন তৈরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। টিফিন তৈরীর জন্য বিভিন্ন লোক থাকবে। প্রতিদিন একজন শিক্ষকের উপর ভার থাকবে তিনি তদারক করবেন। স্কুলের স্বাস্থ্য পরিদর্শক থাকলে তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য ছাত্রদের দেওয়া হয়। খাবার তৈরী হলে সেগুলি ধূলো মাছি প্রভৃতির থেকে রক্ষার জন্য আলমারীতে আটক রাখা হবে। যে খাবারই দেওয়া হোক না কেন তা যেন বিশুদ্ধ ও টাটকা হয়।

খাদ্য প্রস্তুত

পরিবেশন (Distribution) :—

টিফিন দেওয়া যাতে সুশৃংখল হয় সেজন্য শিক্ষকেরা টিফিন দেবার সময় উপস্থিত থাকবেন। ছাত্রেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, প্রতি ক্লাসের দু'একটি বড় ছাত্রের সাহায্যে খাবার ভাগ করে দেওয়া হবে। পাতা কি অন্যান্য আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলতে দেওয়া হবে না। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাতা বা খাবার ঠোঙা ফেলা হবে সেখান থেকে ঝাড়ুদার সেগুলি পরিষ্কার করবে। খাওয়ার আগে শিক্ষার্থীরা হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে নেবে, paper plate-এ খাবার দেওয়া যেতে পারে, তবে তাতে খরচ বেশী। পানীয় জল সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিবেশনে সতর্কতা

উপসংহার (Conclusion) :—

আমাদের মত গরীব দেশে বিদ্যালয়গুলিতে জলযোগের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশেই এর প্রচলন খুব কম। খুব কম বিদ্যালয়েই এ ধরনের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যাপারে সরকার, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে। সকলে এই সমস্যা বুঝতে চান না। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভবিষ্যৎ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক

কতকগুলি সংস্থা বিদ্যালয়ে জলযোগের বিভিন্ন খাদ্য ইত্যাদি দেওয়ার দায়িত্ব নেন। তবে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে খাদ্যের নামে যে বস্তু ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তা বিস্ময়ের ব্যাপার। গরীব দেশের অন্নহীন, বুভুক্ষু ছেলেমেয়ে তাই পরমানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু যে মহান সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশ থেকে এই জাতীয় খাদ্য আমাদের দেশের শিশুকল্যাণের জন্য আনীত হয় সে দেশে এই খাদ্য পশুরা-ও গ্রহণ করে না। সমাজকল্যাণের নামে এমন বিস্ময়কর অবমাননা আধুনিক সভ্যজগতে দৃষ্টান্তবিহীন। এ সমস্ত ভিক্ষাবৃত্তি বাদ দিয়ে সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বিদ্যালয়ে জলযোগ দেওয়ার আর্থিক দায়িত্ব ও সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের সরকার তার দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য এটুকু করবেন,—তা কি আশা করা অন্যায়?

কয়েকটি সংক্রামক রোগ

[Some Common Infectious Diseases]

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রামক ও অসংক্রামক দু'রকম রোগই দেখা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে হাম, হুপিং, কাশি, জলবসন্ত, বসন্ত, মাম্‌স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষা ও নানারকম চর্মরোগ যেমন দাদ, খোসপাঁচড়া, একজিমা প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রেরা আক্রান্ত হয়। সংক্রামক রোগ মাত্রই বীজাণু ঘটিত। উদ্ভিদ, জল ও প্রাণীদেহে বীজাণুগুলি সৃষ্টি হয় এবং কোন বাহকের মাধ্যমে এরা সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে। মানুষের দেহ রোগ বীজাণুর পক্ষে অনুকূল আশ্রয়স্থল। সংক্রামক ব্যাধি কি করে সারানো যায় তা জানার আগে আমাদের জানা দরকার যে, এই রোগের কি করে প্রসার হয়। মানুষের দেহে যতক্ষণ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ সে কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। শরীর কোন কারণে দুর্বল হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। কিন্তু জীবাণু তো আপনা আপনি আসতে পারে না কেউ তাদের বহন করে নিয়ে আসে। আর তা কোন একটা পথ ধরে আসে। তাহলে দেখা যাচ্ছে (১) রোগ সংক্রমণের পথ (Channel of infection) ও (২) সংক্রমণ রীতি (Mode of infection) দুটি বিষয়ই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

রোগ সংক্রমণের পথ:—(১) নাক—সব রকম বায়ুবাহি ও ব্যাধি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নাক দিয়ে প্রবেশ করে। মুখ—খাদ্য ও পানীয়ের সাথে জলবাহিত ব্যাধির জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। (৩) চর্ম—চামড়ার ক্ষত পথে আমাদের দেহ রোগাক্রান্ত হয়।

রোগ সংক্রমণের রীতি :—(১) রোগী থেকে, (২) তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রাণীর সহায়তায়।

রোগী থেকে—রোগী থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাবেই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে বসন্ত, দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতির রস সুস্থ ব্যক্তির চামড়ার ক্ষতের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে এই রোগ হয়। এসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করতে নেই। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, এমনকি করমর্দনের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।

পরোক্ষ ভাবেও রোগ ছড়ায়। রোগীর মলমূত্র ও ভুক্ত বিশেষ খাদ্য ও পানীয়ের সাথে রোগ জীবাণু থাকে। এগুলি ধরলে ভাল করে হাত না ধুয়ে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে বা অপরকে দিলে সুস্থ ব্যক্তির রোগ হতে পারে। রোগীর থুথুর মধ্যে রোগ জীবাণু থাকে। যেখানে সেখানে থুথু ফেললে তা ধূলি-কণার সাথে মিশে বাতাসের সাথে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। একে—**droplet infection** বলে। যক্ষা, নিউমোনিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা থুথু ও কাশির সাথে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয় জলবাহিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে।

আমরা জানি অসুস্থব্যক্তির সাহায্যেই রোগ সংক্রামিত হয়। সুস্থ ব্যক্তির দ্বারাও রোগ সংক্রামিত হতে পারে। যাদের দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে কিন্তু তখনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নি তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়। আরেক শ্রেণীর রোগী আছেন তারা নিজেরা সুস্থ হয়েছেন কিন্তু তাদের দেহে রোগজীবাণু আছে—না জেনে সবার সাথে মেলামেশা করে তারা রোগ ছড়ান। ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস, টাইফয়েড, কলেরা প্লেগ, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া বক্রকৃমি প্রভৃতি রোগ-বাহক (carrier) মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে।

প্রাণীবাহিত হয়ে রোগ বিস্তার—মশা মাছিরা রোগজীবাণু বহন করে আমাদের খাদ্যে বসে ও আমাদের দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়। এইভাবে আমাদের দেহে অনেক রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে।

সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায়
[Protection against Infectious Diseases]

সংক্রামক রোগ সম্পর্কে শুরুতেই সতর্ক না হলে এ রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়ে বহুলোকের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। সংক্রামক রোগের প্রতি-রোধের চারটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে— ১। **প্রজ্ঞাপন (Notification)** ২। **স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation)** ৩। **অনাক্রম্যতা (Immunity)** ৪। **জনশিক্ষার প্রসার (Spread of Education)**

॥ ১ ॥ **প্রজ্ঞাপন** (Notification) :

কোন একটি রোগ সংক্রামক স্থির হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা পরিবারের লোকদের প্রথম কাজ হ'ল স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে এই খবর দেওয়া। খবর দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংক্রামক রোগটি যেন প্রসার লাভ করতে না পারে সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সংক্রমণের প্রধান উৎস যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে সেখান থেকে জীবাণু ছড়িয়ে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না। স্বাস্থ্য বিভাগ খবর পেলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ও তাকে আলাদা রাখা নির্বীজনের ব্যবস্থা প্রভৃতি করবে।

॥ ২ ॥ **স্বতন্ত্রীকরণ** (Isolation) :

কোন ব্যক্তি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে বোঝা গেলে অবিলম্বে তাকে আলাদা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ীর একটি স্বতন্ত্র ঘরে তাকে রাখা হবে। শুশ্রূষাকারীণী (Nurse) ছাড়া কেউ সে ঘরে যাওয়া আসা করবে না। রোগীর ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। রোগীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র বাইরে আনা হবে না। ঘর সবসময় বন্ধ রাখা হবে—না হয় দরজায় নির্বীজিত পর্দা দেওয়া হবে। মশা-মাছি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তার মল, মূত্র জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে ঘরের বাইরে আনা হবে। সর্বোপরি শুশ্রূষাকারীকে সতর্ক হতে হবে। সব সময় সে রোগ-জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে হাত পা ধুয়ে বাইরে আসবে, নিজের ব্যবহার করা কাপড় জামা ফুটিয়ে নেবে, কাউকে রোগীর ঘরে যেতে দেবে না, তারপর রোগী সুস্থ হলে রোগ সংক্রমণের সময় পার হয়ে যাবার পর তাকে স্নান করিয়ে বাইরে আসতে দেওয়া হবে। রোগীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র নির্বীজিত করে নিতে হবে।

বাড়ীতে সব সময়ে রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব হয় না। যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তাও হয়ে ওঠে না। এজন্য মারাত্মক সংক্রামক রোগে রোগীকে হাসপাতালে পাঠান উচিত। বড় বড় শহরে সংক্রামক রোগের জন্য ভিন্ন হাসপাতাল আছে।

॥ ৩ ॥ **সরোধন** (Quarantine) :

এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা রূপে বহিরাগত রোগাক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বন্দরে সরাসরি প্রবেশ করতে না দিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। এরূপ স্বতন্ত্রীকরণ সব দেশের বড় বড় বন্দরে আছে। এ ব্যবস্থায় যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয় বলে যাত্রীরা নিজ দেশ ত্যাগ করবার আগে সংক্রামক রোগের টিকা বা ইন্‌জেকশন নিয়ে তার সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন।

॥ ৪ ॥ **অনাক্রম্যতা (Immunity) :**

আমাদের রক্তে রোগ প্রতিরোধের একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা আছে বলেই সহসা আমাদের কাবু করতে পারে না। এই সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আবার কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তোলা যায়। অনেক সময় দেহে রোগের আক্রমণ হলে স্বাভাবিক ভাবে প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়। আক্রমণকারীর শক্তি যদি প্রতিরোধকারীর শক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয় তাহলেই আমরা রোগাক্রান্ত হই। দেহের রোগ প্রতিরোধের জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতাকে অনাক্রম্যতা বলে। এই শক্তি দুই প্রকার—(১) **সহজাত** (Natural) ও (২) **অর্জিত** (Acquired)

সহজাত—স্বাভাবিক ভাবে বা জন্মসূত্রে আমাদের দেহে যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি জন্মায় তাকে সহজাত অনাক্রম্যতা বলা হয়। দেশ, জাতি ও জন্মগত ভাবে এ শক্তির পার্থক্য হয়।

অর্জিত—দেহে রোগের বীজ প্রবেশ করিয়ে যখন স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করা হয় তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। টীকা ও ইনজেকশন দুইভাবেই কৃত্রিম অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও আপনা থেকে টাইফয়েড, হাম, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির জীবাণু দেহে প্রবেশ করে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। একে স্বাভাবিক অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে।

॥ ৫ ॥ **জনশিক্ষার প্রসার (Spread of Education) :**

সংক্রামক রোগ এভাবে ছড়ায় না। কি করে রোগ ছড়ায়, কি করে প্রতিকার করা যায় এ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে। কলেরা ও ম্যালেরিয়া দুইই সংক্রামক রোগ। একটির বাহন মশা, অপরটির বাহন মাছি। তাই দুই রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা দুই রকম হবে। ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়ায়। কি করে কোন রোগ সংক্রামিত হচ্ছে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে রোগের প্রসার বন্ধ করা যায় না। জনসাধারণ রোগের কারণ সম্পর্কে সচেতন না থাকায় ফলে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে না। অনেক সময় গ্রামবাসীরা নিজেদের অজ্ঞতার জন্য না বুঝে রোগ প্রসারে সহায়তা করে। গ্রামে যখন নলকূপের ব্যবস্থা ছিল না তখন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে তা মহামারী রূপ ধারণ করত। খোঁজ করে দেখা গিয়েছে কোন অজ্ঞ গ্রামবাসী না বুঝে পুকুরের জলে রোগীর নোংরা কাপড় চোপড় ধুয়ে রোগ প্রসারে সহায়তা করেছে। মানুষ যাতে সচেতন হয় সেজন্য প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে গ্রামে সিনেমা বা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিতে হবে, কি করে রোগের প্রসার হয়, কি করে এই প্রসার রোধ করা যায়। মানুষ এখনও টীকা নিতে বা ইনজেকশন

নিতে ভয় পায়। ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিলে প্রচার করে লোকদের প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর করে তুলতে হবে। সমগ্র দেশ যদি এ বিষয়ে সচেতন না হয় তাহলে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ভাবে ও সামাজিক ভাবে সবাই সচেতন হলে সংক্রামক ব্যাধির প্রসার অনেকটা রোধ করা সম্ভব।

সংক্রামক রোগের চারটি অবস্থা
[Four stages of Infection]

মানুষ দেহে রোগ সংক্রমণ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে—যেমন, **পরস্পর মেলামেশার দ্বারা** হাম, বসন্ত, মাম্পস, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগ ছড়ায়। **খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে**—যেমন কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি। **কীটপতঙ্গ বাহিত হয়** যেমন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া। **জীব-জন্তুর দ্বারা** ধনুষ্টঙ্কার, কৃমি। **বায়ুবাহিত হয়ে**—সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি।

রোগ জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করবার পর থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত অবস্থাটাকে চারটি ভাগ করা চলে :—

১। **উপ্তিকাল** (Incubation period)। ২। **রোগ লক্ষণাবলীর প্রকাশ** (Symptoms) ৩। **রোগের উপশম** (Cure) ৪। **সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পূর্বাবস্থা** (Convealescence)

রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই রোগ হয় না। দেহের যদি যথেষ্ট প্রতিরোধ শক্তি থাকে তাহলে আক্রমণকারী জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়—দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে না। দেহ দুর্বল হলে জীবাণু দেহে বংশ বৃদ্ধি করে। এদের সংখ্যা যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি হলে এরা এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে। তখনি দেহে রোগ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করা থেকে রোগ সমূহ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় **রোগের উপ্তিকাল**। এরপরের অবস্থায় রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। রোগী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাকে বলা হয় রোগের আক্রমণকাল। এর পর রোগীর দেহ থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে গেলে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসে এবং রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোগের এই চারটি অবস্থাতেই সংক্রমণের সম্ভাবনা কমবেশী থাকে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় রোগ সংক্রমণ সম্ভাবনা সর্বাধিক। এ অবস্থায় রোগী সেরে উঠতে থাকে, কিন্তু সে তখন রোগ বিস্তারের প্রধান বাহক হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্রদের মধ্যে যে কোন রকম সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে তখনি তাকে অন্য ছাত্রদের থেকে পৃথক করতে হবে, যাতে তার ছোঁয়াচে এসে অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। যতদিন পর্যন্ত না সে সম্পূর্ণ

নীরোগ হয় ততদিন তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মরশুমে এসব রোগের প্রতিষেধক টীকা ও ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা স্কুল থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে করা প্রয়োজন।

কয়েকটি সংক্রামক রোগ
[Some Infectious Diseases]

হাম (Measles) :

অত্যন্ত মারাত্মক রকমের এই সংক্রামক রোগটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ সময় মত সাবধান না হলে এতে রোগীর প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। জ্বরের সাথে সারা গায়ে rash দেখা দেয়। নাক চোখ দিয়ে জল পড়া, মাথার যন্ত্রণা, শীত শীত ভাব হামের প্রথম উপসর্গ। অনেক সময় গলায় ক্ষত ও কাশি দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় জ্বর খুব বেশী হয়। ফুসকুড়ি (rash) কমে গেলে জ্বর কমে যায়।

ছোট ছেলেদের এই রোগ বেশী হয়। এক জায়গায় হাম শুরু হলে অতি অল্প সময়ে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের উপ্তিকাল ৭—১৪ দিন। এই উপ্তিকালেই এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেই রোগ সংক্রমিত হয়। জনবহুল জায়গায় এই রোগ সহজে ছড়ায়। রক্ত, কফ ও চর্মে হামের জীবাণু থাকে। হাম সেরে যাবার পর নিউমোনিয়া, কাশি, পেটের গণ্ডোগোল প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

এ রোগের প্রসার রোধ করা কঠিন। কারণ রোগ হয়েছে টের পাবার আগেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তবু কারো হাম হয়েছে জানা গেলেই তাকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। রোগীকে মশারির নীচে রাখাই নিরাপদ। রোগ-মুক্ত হবার পর রোগীর ব্যবহৃত জিনিস নির্বীজিত করে ঘরের বাইরে আনতে হবে। রোগীর বাড়ীতে অন্য কোন লোকের আসা-যাওয়া উচিত নয়। এবং রোগীর বাড়ীর লোকদেরও বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। রোগীকে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পৃথক করে রাখতে হবে।

হাম হলে এ রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা নাই। এ রোগের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। ভ্যাকসিন দিয়ে যাতে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেজন্য গবেষণা চলছে।

জল বসন্ত (Chicken Pox) :

এক প্রকার সূক্ষ্ম ভাইরাস থেকে জল বসন্ত রোগ হয়। রোগের উপ্তিকাল ২।৩ সপ্তাহ। প্রথমেই জ্বর হয়। পিঠে ও গায়ে বেদনা দেখা দেয়। জ্বরের ২।১ দিনের মধ্যেই ফোসকার মত জল নিয়ে গুটি বের হয়। বুক, পিঠ, হাতের

দিকে বেশী হয়। মুখেও কপালে কয়েকটি গুটি বের হয়। ফোস্কাগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। জল বসন্তের খোসা পাতলা হয় ও উঠতে দেরী হয় না। জল বসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে তবে কখনও মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে ওঠে না। এই রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। লেবু, পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে দিতে হয়। ফোসকাগুলি কখনও চুলকোতে নেই। পাত্র অয়েল বা বরিক অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহার করলে ফোসকাগুলি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

অত্যন্ত ছেঁায়াছে রোগ বলে এ রোগ অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। টিকা নিয়ে জল বসন্ত রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। যাদের একবার জলবসন্ত হয়েছে তাদের আর এ রোগ হয় না। তাদের দেহে স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়। এ রোগ হলে রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে। রোগী সারাক্ষণ মশারির নীচে থাকবে। শুশ্রূষাকারী ভিন্ন কেহ রোগীর ঘরে যাবে না। রোগীর ব্যবহার করা জিনিস নির্বীজিত না করে বাইরে আনা হবে না।

ইচ্ছা বসন্ত (Small Pox) :

ইচ্ছা বসন্ত জলবসন্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এক -সময় প্রতি বছর হাজারে হাজারে লোক এই রোগে মারা যেত। এখন ব্যাপক ভাবে টীকা দেবার ফলে এই রোগের প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। জল-বসন্তের মত একবার রোগ হলে তার আর এই রোগ হবার ভয় থাকে না।

বসন্তের সূক্ষ্ম ভাইরাস থেকে এ রোগ সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ এ রোগের উপ্তিকাল ১২ দিন। যে কোন বয়সে এ রোগ হতে পারে। প্রথমেই প্রবল জর হয়। সারা শরীরে ব্যথা ও মাথার যন্ত্রণা হয়। মুখ ফোলে ও চোখ লাল হয়। জরের চারদিনের দিন প্রথম গুটি বের হয়। প্রথমে মুখে, পরে হাতের বাইরের দিকে ও গায়ে বুকে শক্ত গুটি বের হয়। পরে পুঁজে ভরে যায়। গুটি সেরে গেলেও দাগ থাকে। চোখে বসন্ত হলে অন্ধ হয়ে যাবার ভয় থাকে।

ইচ্ছা বসন্তের প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে টিকা নেওয়া। টিকা নেবার পরও যদি বসন্ত হয় তাহলে তা খুব মারাত্মক হতে পারে না। বসন্তের জীবাণু নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তাই গরম জলে নির্বীজক ওষুধ দিয়ে গার্গেল করা ভাল।

বসন্ত হয়েছে বোঝা মাত্র আলাদা ঘরে মশারির মধ্যে রোগীকে রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস বের করে ফেলতে হবে। শুশ্রূষাকারী ভিন্ন রোগীর ঘরে কেউ যাবে না। বাড়ীতে অসুবিধা থাকলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা ভাল। মশা, মাছি প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। তাই মশা, মাছি যাতে রোগীর গায়ে কি মলমূত্রে বসতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আরোগ্য লাভ করবার সময়ও এ রোগ ছড়ায়। তাই গুটি

গুলির খোসা সম্পূর্ণ উঠে না যাওয়া পর্যন্ত রোগীকে কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত নয়।

মামপস্ (Mumps) :

অত্যন্ত ছোঁয়াচে ধরনের রোগ। ছোট ছেলেমেয়েদের এই রোগ খুব বেশী হয়। এই রোগের বীজাণু গলার মধ্যকার লালাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। কানের নীচে থেকে চোয়াল গলা পর্যন্ত ফুলে ওঠে। এ রোগের উপ্তিকাল ১৪।২১ দিন। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর পনের দিনের মধ্যে রোগের উপশম হয়। যেহেতু রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে তাই রোগীকে সাবধানে রাখতে হবে যাতে সে অন্যের রোগের কারণ না হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেদের রোগ সেরে গেলেও অন্ততঃ পনের দিন স্কুলে আসতে দেওয়া উচিত নয়। যে বাড়ীতে রোগ হয়েছে সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে বিস্তার হতে পারে তাই সে বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

ডিপথেরিয়া (Dipthoria) :

স্রাবনী ফার্স ব্যাসিলাস নামক জীবাণু থেকে এ রোগ হয়। এ রোগের উপ্তিকাল ২-১০ দিন। জ্বরের সাথে কাশি হয়। কোন কিছু গিলে খাওয়ার অসুবিধা দেখা দেয়। রোগীর টন্‌সিল বা কণ্ঠনালীর উপর এবং কখন কখন নাসারন্ধ্রে একটা সাদাটে বা ছাই রংয়ের পর্দা পড়ে। এরপর রোগীর শ্বাসরোধ হয়, ও মুখ নীল হয়ে যায়। শেষে শ্বাসরোধে রোগীর মৃত্যু হয়।

মুখের লালা থেকে এ রোগ ছড়ায়। এই রোগের অনেক রোগ বাহক আছে। তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েদের চুষি কাঠি, কলম, আইসক্রীম, ফলক, পেন্সিল প্রভৃতি মুখে দেবার অভ্যাস আছে। তা থেকে অনেক সময় রোগ ছড়ায়। স্কুলে একই গ্লাস থেকে জল খাবার ব্যবস্থায় এ রোগের প্রসার ঘটে।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রসার অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। খুব ছোঁয়াছে বলে রোগীকে পৃথক রাখা উচিত, এ রোগের প্রতিষেধক ডিপথেরিয়া সিরামের টিকা সব ছেলেমেয়েকে দেওয়া উচিত।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) :

বায়ু বাহিত এই রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াছে। আমাদের দেশে এ রোগকে খুব সাধারণ বলে মনে করে এর সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা গ্রহণ করা হয় না। শীতের দেশে এটি মারাত্মক ব্যাধি; নিউমোনিয়া এর সাথে দেখা দিলে প্রাণ বাঁচান কঠিন হয়। ব্যাসিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এই রোগের উপ্তিকাল কয়েকঘণ্টা থেকে কয়েকদিন।

জ্বর, সারা গায়ে ব্যথা, খুব মাথা ধরা, সর্দি, হাঁচি প্রভৃতি এই রোগের প্রধান উপসর্গ। এই রোগে প্রায়ই শ্বাস নালীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এ রোগে রোগীকে অত্যন্ত দুর্বল করে। রোগের উপসমের পরও কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন।

রোগীর থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এ রোগ সংক্রামিত হয়। সিনেমা, থিয়েটার ও ভীড়ের মধ্য থেকে ও এ রোগ ছড়ায়। হাঁচি ও কাশির সাথে বীজাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেটই এ রোগের ওষুধ। রোগ লক্ষণ সামান্য প্রকাশ পেলেই ওষুধ খেলে অনেক সময় রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই রোগীকে আলাদা করে পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর কাছে বসলেও এই রোগ হতে পারে। এজন্য যতদূর সম্ভব রোগীর সংস্রব এড়িয়ে চলা ভাল। আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে রোগীকে রাখা হবে; কিন্তু ঠাণ্ডা যাতে না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাপক আকারে দেখা দিলে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তখন যথা-সম্ভব ভীড় এড়িয়ে চলতে হবে।

হুপিং কাশি (Whooping Cough):

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ রোগটি খুব দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় সর্দির পরবর্তী কাশির মত থাকে। এ রোগের উপ্তিকাল ৬ থেকে ১৮ দিন, প্রথম অবস্থায় ঠিক বোঝা যায় না। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে কাশতে কাশতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। কখনও কখনও কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে। রোগটি ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। রাতে দু'তিন বার কাশির উদ্রেক হলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, বাচ্চারা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এ রোগ সারতে বেশ সময় নেয়। ২।৩ মাস পর্যন্ত রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তাও দেখা যায়। এ রোগে প্রাণহানি হয় না, কিন্তু ফুস ফুস দুর্বল হয়ে যায় বলে অন্য ব্যাধির আক্রমণ হতে পারে। রোগ থাকা-কালীন রোগীকে স্কুলে আসতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যক্ষভাবে রোগীর থেকে অন্য দেহে এ রোগ সংক্রামিত হয়।

যক্ষ্মা (Tuberculosis):

যে কয়েকটি মারাত্মক রোগের ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয় যক্ষ্মা তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৩০ জন যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব কলকারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চাকুরী, আলো বাতাস শূন্য ঘন

বসতি পূর্ণ স্থানে বাস প্রভৃতির ফলে মারাত্মক ভাবে যক্ষ্মা রোগ এদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস নামে এক প্রকার সূক্ষ্ম বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এ রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে সাধারণতঃ ফুস-ফুসকে আক্রমণ করে। এ রোগের কোন নির্দিষ্ট উপ্তিকাল নেই। রোগ বীজাণু বহুদিন পর্যন্ত শরীরে গোপনে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে রোগ বীজাণু দেহে রয়েছে অথচ কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। সাধারণ লোকের ধারণা যক্ষ্মা হলেই থুথুর সাথে রক্ত উঠবে। ইহা একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহাই একমাত্র লক্ষণ নয়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, যক্ষ্মা হয়েছে কিন্তু কোনদিনই রক্ত পড়েনি।

সাধারণতঃ, ক্ষয় রোগের বীজাণু ধূলির সাথে মিশে বায়ু বাহিত হয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে ফুসফুসে, অন্ত্রে কি হাড়ে বাসা বাঁধে। রোগীর সাথে কথা কইবার সময়, হাঁচি বা কাশির মধ্য দিয়ে যক্ষ্মার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে। রোগী থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ছাড়াও রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে এই রোগ হতে পারে।

শুধু বাতাসের মধ্য দিয়ে ছাড়াও আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের ভিতর দিয়েও যক্ষ্মার বীজাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে।

ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আলোবিহীন জায়গায় যক্ষ্মার বীজাণু বহু দিন বেঁচে থাকে। এ রূপ জায়গায় বাস করলেও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে।

রোগ দেহে বাসা বাঁধলে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসে, ওজন কমতে থাকে, বিকেলের দিকে অল্প অল্প জ্বর হয়, সহজেই ক্লান্তি বোধ হয়। রাতে ঘাম হয়, প্রথমে অল্প অল্প কাশি থাকে, পরে কাশির সাথে যে গয়ের বের হয় তার সাথে রক্ত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত বমি হতে থাকে। যক্ষ্মা গলায় কি অন্ত্রেও হতে পারে।

যক্ষ্মা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। অন্য মারাত্মক রোগ থেকে এর তফাৎ হচ্ছে কলেরা, ইচ্ছাবসন্ত প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে যে রোগী সেরে উঠবার অল্পদিন পরেই সে ভাল হয়ে যায়। যক্ষ্মারোগ দীর্ঘদিন ধরে রোগীর দেহে বাসা বেঁধে থাকে। সহজে রোগ সারতে চায় না। অনেক সময় রোগীর অজ্ঞাতে রোগ ছড়ায়। যক্ষ্মা-রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় যক্ষ্মা হাসপাতাল সমূহে শয্যা সংখ্যা অনেক কম। তাই অধিকাংশ রোগীকে বাড়ীতে রেখেই চিকিৎসা করতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা অনিশ্চিতভাবে চলত। বর্তমানে সম্পূর্ণ আরোগ্য করবার মত ওষুধ আবিষ্কৃত

হওয়ার দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার-ফলে বহু রোগী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পাচ্ছে। এখনও এই রোগের চিকিৎসা ও পথ্য অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য বলে গরীব লোকের পক্ষে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়ে ওঠে না।

যক্ষার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অনাক্রান্ত লোকদের পরীক্ষা করে B. C. G-টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি শিশুর B. C. G দেবার ব্যবস্থা হলে রোগের প্রকোপ অনেকটা কমতে পারে। যক্ষার বহু কারণের মধ্যে অপুষ্টি সর্ব প্রধান। পুষ্টিকর সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। এছাড়া প্রচুর আলো হাওয়া যুক্ত পরিবেশে যক্ষার বীজাণু বাঁচতে পারে না। রৌদ্রের মধ্যে যক্ষার বীজাণু কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যায়। শহরাঞ্চলে যেখানে অল্প জায়গায় বহুলোক বাস করে এবং যেখানে মুক্ত বাতাসের অভাব, সর্বদা ধূলার উৎপাত, সে সব জায়গায় যক্ষা রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

কলেরা (Cholera) :

কলেরা এক মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সারা ভারতে প্রতি বছর সহস্র সহস্র লোক এই রোগে প্রাণ হারায়। Vibrio Cholera নামে এক প্রকার বীজাণু আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়। এই রোগের বীজাণু দেখতে কমার মত বলে একে 'কমা ব্যাসিলি' বলে। কলেরা বীজাণু রৌদ্র ও ফুটন্ত জলে সহজেই মরে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডায় এদের ক্ষতি হয় না, বরফের মধ্যে পর্যন্ত কলেরার বীজাণু বেঁচে থাকতে পারে।

খাদ্যে ও পানীয়ের সাথে মিশে কলেরার বীজাণু মুখের মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। দূষিত জল, দুধ ও অন্যান্য পানীয়কে আশ্রয় করে কলেরার বীজাণু বংশ বৃদ্ধি করে।

কলেরায় আক্রান্ত হলে রোগীর ভেদবমি, হাত পায়ের খিঁচুনি, প্রস্রাব বন্ধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ দেখা দেয়। ঘন ঘন পায়খানা ও বমির জন্য রোগীর পিপাসা মিটতে চায় না। রোগী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে পড়ে। সময় মত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

কলেরা রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে কলেরার ইনোকুলেশন নেওয়াই একমাত্র পথ। তবে এই ইনোকুলেশনের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তাই প্রতি বছর এই এনোকুলেশন নিতে হয়। খাবার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক সময় এই রোগ হয় না। যে সব খাদ্য পেটের পীড়া ঘটাতে পারে তা খেতে নেই। বেশী পাকা কি বেশী কাঁচা ফল, বাসি পচা খাবার কখনও খেতে নেই। পেট কখনও খালি রাখতে নেই। পথে যেখানে সেখানে জল, আইসক্রীম, ঠাণ্ডাপুডিং প্রভৃতি খেতে নেই। দুধ সর্বদা ফুটিয়ে খেতে হবে। বাসন-পত্র ধোবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আমাশয় (Dysentery) :

আমাশয় একপ্রকার পেটের রোগ। আমাদের দেশে এই রোগটি একটি মারাত্মক ব্যাধি বলে পরিচিত। প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ লোক এই রোগে প্রাণ হারায়।

আমাশয় দুই প্রকারের—ব্যাসিলি ঘটিত (Bacillary) ও এমিবা ঘটিত (Amaebic)

ব্যাসিলি জনিত আমাশয়ের উপ্তিকাল ১ থেকে ৭ দিন, এমিবা জনিত আমাশয়ের উপ্তিকাল ৩ থেকে ১১ দিন।

দুই রোগেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মলের সঙ্গে মিউকসে ও রক্ত পড়া, পেট কামড়ান, ঘন ঘন পায়খানার ইচ্ছা, দৌর্বল্য ও তৃষ্ণা আমাশয়ের প্রধান লক্ষণ। এমিবিক জনিত আমাশয় হলে রক্ত একটু কম পড়ে। জ্বরের তাপ-ও খুব বেশী হয় না।

আমাশয় অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। ছোট ছেলেমেয়েদের এ রোগ খুব বেশী দেখা যায়। এই রোগের বীজাণু খাদ্য ও পানীয়ের সাথে প্রধানতঃ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। আমাশয় রোগ-বিস্তারের একটি বাহন মাছি। ধূলাবালির সাথে অনেক সময় আমাশয়ের বীজাণু থাকে। এই ধূলা খাদ্যে উড়ে পড়লে সে খাদ্য বীজাণু-দুষ্ট হয়। আমাশয় রোগীর মাধ্যমেও রোগ বিস্তার হয়।

সালফা ও এন্টিবায়েনটিক ওষুধের কল্যাণে আমাশয় রোগের চিকিৎসা বর্তমানে সহজ সাধ্য হয়েছে।

খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই রোগ প্রধানতঃ প্রসার লাভ করে। তাই এই রোগের প্রসার রোধ করতে জল ও খাদ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মাছি ও ধূলাবালির সম্পর্কেও সাবধান হতে হবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য সম্পর্কে সময়ে সতর্কতা অবলম্বন না করলে পরিণামে আমাশয় দেখা দিতে পারে।

কয়েকটি চর্মরোগ

খোস পাঁচড়া (Scabies) :

বহু প্রকারের চর্মরোগ আছে। বিভিন্ন চর্মরোগের মধ্যে খোস, পাঁচড়া প্রধান। অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার মত এক জাতীয় কীটাণু থেকে পাঁচড়া হয়। এই কীটাণুর গায়ের রং সাদা এবং এর আটটি পা। এগুলি এক ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। খালি চোখেও এগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রীকীটগুলি ডিম পাড়বার জন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে, কব্জির ভাঁজে, চামড়ার নীচে অতি ছোট গর্ত করে বংশ বিস্তার করে। প্রায় ২।৩ সপ্তাহ বেঁচে থেকে চামড়ার ভিতরে প্রায় ৩০টি ডিম পাড়ে। ৩।৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং আরও এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কীটে পরিণত হয়। কীটগুলি দেহের

চামড়া ফুঁড়ে যখন বাসা করে তখন দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। চুলকানির ফলে সেখানে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। তারপর সেখানে পুঁজ জন্মে। চুলকানির ফলে রোগের বিস্তার ঘটে সারা গায়ে ঘা ছড়িয়ে যায়।

রোগের শুরুতেই সাবধান না হলে অতি অল্পদিনেই সারা দেহে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের সংক্রমণ প্রত্যক্ষ ভাবেই হয়। রোগীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র থেকে ও সুস্থ দেহে বিস্তার লাভ করে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রসার অতি দ্রুত ঘটে। এই রোগ প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। নোংরা লোকেরই এই রোগ হয়। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে সংক্রমণ সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলা তুই প্রয়োজন।

খোস পাঁচড়ার জন্য বাজারে নানা প্রকার মলম পাওয়া যায়। আগে সালফার জাতীয় মলম ব্যবহার করা হ'ত। এখন বেনজিল, বেনজায়েস এসে এর স্থান দখল করেছে। গরমজলে নির্বীজক সাবান দিয়ে পাঁচড়ার ক্ষতগুলি পরিষ্কার করে নিয়ে মলম ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

দাদ (Ringworm):

পাঁচড়ার মতই দাদ একটি চর্মরোগ। রোগটি ছোঁয়াচে ও দেহের যে কোন জায়গায় হতে পারে। দৃত্রক জাতীয় এক প্রকার ফাঙ্গাস (Funges) চামড়া, চুল, নখ প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ করলে দাদ রোগের সৃষ্টি হয়। ফাঙ্গাসের শ্রেণীভেদ অনুসারে দাদ নানা রকমের হয়—কুচকির দাদ, দেহের দাদ, মাথার দাদ। এক এক জাতীয় ফাঙ্গাস এক এক জাতীয় দাদের সৃষ্টি করে।

দাদ সাধারণতঃ অপরিষ্কার থাকলে হয়। শরীর সর্বদা ভিজা থাকলেও এই ব্যাধি হতে পারে। মাথায় দাদ হলে মাথা খুস্‌কিতে ভরে যায়, চুল উঠতে থাকে। নখের দাদে নখের বৃদ্ধি রোধ হয় ও ক্ষয়ে যেতে থাকে। শরীরের দাদ পয়সার মত গোল হয়ে দেখা দেয়। উহা বাড়তে বাড়তে দেহের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দাদের চুলকানি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। গায়ে রোদ লাগলে রোগের যন্ত্রনা বেড়ে যায়।

বাজারে প্রচলিত দাদের মলমেই দাদ সাধারণতঃ কমে। দাদের জন্য অঞ্জন রশ্মির সাহায্যও লওয়া হয়ে থাকে মাথায় দাদ হলে চুল কামিয়ে ফেলা উচিত।

দাদ প্রত্যক্ষভাবে সংক্রামিত হয়, রোগীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র থেকে হয়, অপরিষ্কার থাকলে হয়। তাই একটু সাবধান থাকলেই এ রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচী
[School Health Service]

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। শিক্ষাদানের সঙ্গে এর একটা, বিশেষ সম্পর্ক আছে, কারণ শিক্ষার্থীর শরীর ও মন যদি খারাপ থাকে তবে শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীর শরীর ও মনকে ভাল রাখতে হবে। তার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশই অভিভাবকই অত্যন্ত গরীব। শিক্ষার্থীদের যথাযথ খাদ্য দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মত আর্থিক সামর্থ তাঁদের নেই, দেশের হাসপাতাল ইত্যাদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কাজেই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়কে নিতে হবে। চিকিৎসা করে, স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে, নানা বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যেতে পারে। তা না হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে বাধ্য। এ ব্যাপারে সরকারের একটি দায়িত্ব আছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনও এ ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যালয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান নিয়ে একটি School Health Service বা বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে যথাযথভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে।

School Health Service-এর গুরুত্ব

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সূচী রূপায়ণের জন্য একটি পরিচালক সমিতি (Executive Committee) থাকবে। School Medical Officer, Physical Instructor, Headmaster; বিদ্যালয় সম্পাদক, (Secretary, Managing Committee), শিক্ষক সভার সম্পাদক (Secretary, Teachers Council), ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary, Student Union), অভিভাবকদের একজন প্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধিকে নিয়ে এই পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতির স্বায়ত্বশাসনের মত অধিকার থাকবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার এর পরিচালনার জন্য যথেষ্ট অর্থ দেবেন। বিদ্যালয়ের ২।৩টি উপযুক্ত room নিয়ে এই কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলকেই সক্রিয় ও আন্তরিক সহ-যোগিতা করতে হবে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিচালনা

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর পরিধি বিকাশ। স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শরীর চর্চা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, স্বাস্থ্য সম্মত বিভিন্ন অভ্যাস

গঠন, যৌন সমস্যার সমাধান, খাদ্য গ্রহণ, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভূ‍ক্ত। এই বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শরীর ও মন ভাল রাখতে গেলে যে বিষয়গুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন সেগুলিই হ'ল বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সূচীর অন্তর্ভূ‍ক্ত।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর পরিধি

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষাদানকে (Health education) এই কর্মসূচীর অন্তর্গত করতে হবে। এ ব্যাপারে School Medical officer অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। তাঁকে সময় তালিকায় (Time table) নির্দিষ্ট class দিতে হবে স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয় পাঠক্রমে সে ধরনের ব্যবস্থার সংস্থান নাই। তাই পাঠক্রমকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জন স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শরীর চর্চা, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজগুলি অবশ্যই করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষকও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

স্বাস্থ্যশিক্ষা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্যতম অংগ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দু'প্রকার—ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয়ের। প্রত্যেক ব্যক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তারা প্রত্যেকেই পরিষ্কার জামা কাপড় পরবে, নখ-চুল নিয়মিত কাটবে, সাবান মাখবে। দাঁত, কান, চোখ, প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, শরীরকে সংক্রামক রোগ মুক্ত রাখা, নিয়মিত হাত পা ধোওয়া ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে। বিদ্যালয়কে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন, বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, আসবাব পত্র তৈরী প্রভৃতির সময় স্বাস্থ্য রক্ষার বিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে ;—কক্ষগুলি নিয়মিত পরিষ্কৃত করা হবে, আশে পাশে ঝোপ জঙ্গল থাকবে না, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা হবে না। বিদ্যালয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্ম সূচীর অন্তর্গত। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে অনেকখানি সাহায্য করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে শরীর শিক্ষাকে (Physical Education) অন্তর্ভূ‍ক্ত করতে হবে। এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবেন Physical Instructor। সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্যই বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এমন সব খেলাধূলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকবে যে, সমস্ত ছাত্রই তাদের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী তাতে

শরীর শিক্ষা

অংশ গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে বড় খেলার মাঠ, একটি বড় পুকুর ও Swimming pool, একটি ঘর ও Indoor games, ব্যায়াম ও gymnasium ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও সাজ সরঞ্জাম থাকবে। এর জন্ম যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় শরীর চর্চাকে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান দিতে হবে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ণের সময়ও শরীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাসগুলি (Healthful Habits) গঠন করার জন্ম চেষ্টা করা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্তর্গত। যথা সময় ঘুমানো, খাওয়া, দাঁত মাজা, স্নান করা, নির্দিষ্ট জায়গায় থুথু ফেলা, হাত পা মুখ ধোওয়া, নখ ও চুল কাটা ও পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলি অভ্যাসের অন্তর্গত। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কু-অভ্যাসগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দূর করতে হবে, আর নতুন নতুন অভ্যাস গুলি যাতে তারা গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভালো অভ্যাসগুলি পরবর্তীকালে তাদের জীবন ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবের সঙ্গে মিলে গিয়ে স্বভাবে পরিণত হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভালো অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করে তার চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো স্বাস্থ্যগত অভ্যাস গঠন

শিক্ষার্থীদের **স্বাস্থ্য সংরক্ষণের** (Health Preservation) ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে থাকবে। রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়, Medical Inspection, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জন স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরামর্শদান, চিকিৎসা, যৌনশিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কোন শিক্ষার্থী কোন রকম অসুস্থ হলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

School Health service বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের (Health promotion) ব্যবস্থা করবে। খাদ্য গ্রহণ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম এর জন্ম খুবই প্রয়োজন; আমাদের দেশের গরীব অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভাল ও পুষ্টিকর খাবার দিতে পারেন না। বিদ্যালয়ে জলযোগের (Tiffin) ব্যবস্থা করে তা পরিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি শরীর চর্চার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকে উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রের সাহায্যেও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা যায়। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে এই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সংশোধনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা (Remedial measures) থাকবে।

School Health Clinic. এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। এই clinicএ শিক্ষার্থীদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ের child guidance clinic-এ শিক্ষার্থীদের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ও মানসিক জটিলতার সমাধান করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু কিছু remedial exercises-এর ব্যবস্থা ও তাদের শরীরকে সুস্থ করতে পারে।

School Health service-এর কাজকর্মের মধ্যে ধারাবাহিকতা (Frequency) থাকবে। স্বাস্থ্য রক্ষা একটি নিয়মিত প্রচেষ্টার ফল। কাজেই মাঝে মাঝে কোন কিছু ব্যবস্থা নিয়ে এ কাজ করা যায় না। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে Fallow-up-service-এর একটি বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্ম সূচীতে যত বড় বড় কথা বলা হোক, যত বড় বড় পরিকল্পনা নেওয়া হোক না কেন যদি তার নীতি ও পন্থাগুলিকে অনুসরণ না করা হয় তবে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাই স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে fallow-up-service বিশেষ প্রয়োজন।

Follow-up-service

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে।

১॥ বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ক্লিনিক [School Health Clinic]

ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যতে সমাজের নাগরিকদের সম্পর্কে যদি আমরা যথাযথ কর্তব্য পালন করতে চাই তাহলে প্রতি স্কুলের ছাত্রদের ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা আইন করে অবিশ্যিক করা উচিত। ছাত্রদের পরীক্ষা করে ডাক্তারের রিপোর্ট অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বা আনুসঙ্গিক উপদেশ দিয়েই স্কুলের কর্তব্য শেষ হ'ল বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ অভিভাবক যদি ডাক্তারের নির্দেশ মত ছেলের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে স্কুলের ডাক্তারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা সম্পর্কে উপদেশ নেওয়া অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। স্কুল থেকে দেখা উচিত কোন ছাত্রের কোন রকম অসুখ থাকলে বা দেহগত কোন ত্রুটি থাকলে তা যেন চিকিৎসা করে ভাল করার ব্যবস্থা করা হয়। কোন ছাত্রের সংক্রামক ব্যাধি থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্কুলে আসতে

ডাক্তারী পরীক্ষা করে তার বিবরণ অভিভাবকদের কাছে পাঠাতে হবে, এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেওয়া হবে না এবং কিভাবে তার চিকিৎসা করা দরকার স্কুল ডাক্তার সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও চোখের দোষ, দাঁতের পোকা, কান পাকা প্রভৃতি যে কোন রোগ থাকলে স্কুল ডাক্তার সে সম্পর্কে অভিভাবককে জানাবেন। অভিভাবক ডাক্তারের উপদেশ পেয়ে কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন বা হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাদের গরীব দেশের অভিভাবকরা সহজে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যেতে চান না; কারণ অর্থাভাব। আবার সব জায়গায় হাসপাতালের সুবিধা নেই, থাকলেও স্থানাভাব ও অসম্ভব ভীড়। সুচিকিৎসার ভরসা সেখানে খুব কম। এ অসুবিধা দূর হতে পারে যদি স্কুলে স্কুল-ক্লিনিক খোলা যায়। ইউরোপে-আমেরিকায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয় তাই সাধারণ অসুখের চিকিৎসা যাতে স্কুলেই করা সম্ভব হয় সেজন্য স্কুল ক্লিনিক আছে। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে যেখানে একাধিক স্কুল আছে সেখানে কয়েকটি স্কুল মিলে একটি স্কুল-ক্লিনিক খোলা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি থানায় একটি করে স্কুল-ক্লিনিক খোলা হলে থানার মধ্যে যতগুলি স্কুল আছে সেই স্কুলগুলির ছাত্রেরা এই ক্লিনিকে চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

School Health Clinic-এর কাজকর্ম ও পরিচালন ব্যবস্থা

School Medical Officer, School Nurse, Compounder ইত্যাদি নিয়ে School Health Clinic গঠিত হবে। একে ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ সাহায্য করবেন। এই সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা একটি স্বায়ত্ত শাসিত কমিটির হাতে থাকবে। এই জাতীয় clinic-এর জন্য সরকারকে আর্থিক অনুদান দিতে হবে, School Health clinic একটি Hospital-এর মত। এর out-door বিভাগ রোগীদের দেখা শুনা, ঔষধ দেওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid), সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় দেখা শুনা করা হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীকেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে ডাক্তারী পরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎস্মার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদা এক; এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। School Health Clinic-এর Indoor-এ কয়েকটি শয্যা (Bed) থাকবে। শয্যা সংখ্যা ছাত্র সংখ্যার উপযোগী হবে। সেখানে অপেক্ষাকৃত কঠিন রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। কয়েকটি সাধারণ অপারেশন (Operation), রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা চক্ষু পরীক্ষা X-ray প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশ জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এ ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। বিভিন্ন case-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। School Health Clinic-এর জন্য একজন School Medical officer থাকবেন।

কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন Specialist ডাক্তার (যেমন—Dentist, eyes Specialist ইত্যাদি) বিভিন্ন সময় এসে তাঁদের Part-time Service দিবেন ; —তার ব্যবস্থা থাকবে। School Health clinic-এর কাজকর্ম পুরোপুরি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পরিচালিত হবে, যাতে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক অসুস্থতা ও অসুখ সারানোর জন্য যেমন School Health Clinic থাকবে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তেমনি বিদ্যালয়ে child guidance clinic-এর ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল শরীর ভাল থাকলেই চলবে না, মনকেও ভাল রাখতে হবে। শরীর ভাল থাকলে যেমন মন ভাল থাকে, মন ভাল থাকলে তেমনি শরীর ভাল থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য যথাযথভাবে রক্ষা করবার জন্য child guidance clinic-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পথেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ের child guidance clinic-এর দায়িত্ব থাকবে একজন মনস্তাত্ত্বিক (Psychologist) ও একজন মনোচিকিৎসকের (Psychiatrist) উপর। School Nurse, কমপাউণ্ডার তাঁদের সাহায্য করবেন। শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থীদের মনোব্যাধির যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতাও প্রয়োজন। **শিক্ষার্থীদের মানসিক জটিলতা, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা, যৌন অপরাধ ও সমস্যা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত সমস্যা, Maladjusted students, স্কুল পালানো ছাত্র, অপরাধ প্রবণতা, বিভিন্ন complex-এর সমস্যা, ইত্যাদি মানসিক ব্যাধি ও জটিলতার যথাযথ সমাধান ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের child guidance clinic-এ করতে হবে।** কঠিন কঠিন case-গুলিকে উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য যথাযথ পরিচালনা ও অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক জটিলতার সমাধান করে ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করে তাদের মনকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করতে ; এবং সেই সঙ্গে সমাজের কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের child guidance clinic ও শিক্ষার্থীদের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের সাহায্যের উপর একটা গোটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকে যথাযথ করতে হলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের কাছে নয় ;—এর উপর জাতির জীবন ও

বাস্তব অবস্থা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিক্ষা নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে তাই সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। School Health clinic-এর মাধ্যমে শরীর রক্ষা ও child guidance clinic-এর মাধ্যমে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করে এ কাজ সমাধা করা যেতে পারে। শরীর ও মন—পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এ দুটিকে যথাযথ করে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রায় অবহেলিত হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে যথাযথ চিকিৎসা একটা বিলাসিতা মাত্র। যেখানে ৭০% থেকে ৮০% লোকের প্রত্যহ দু'বেলা আহার জুটে না তাদের ছেলে-মেয়েদের যথাযথ চিকিৎসা ও শিক্ষা অবাস্তব ব্যাপার। **আমাদের Socio economic conditions-ই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার উপযোগী নয়।** জাতীয় সরকারের এই জাতীয় সমস্যার প্রতি অবহেলা বিস্ময়ের ব্যাপার। যেখানে রাজ্য ভিত্তিক মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সেখানে স্কুলে স্কুলে child guidance clinic আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকেও এ ব্যাপারে রক্ষা করা হচ্ছে না। আর **এই অব্যবস্থার বলি হচ্ছে ছোট ছোট নিরীহ শিশু ;—যাদের ভবিষ্যৎ ছিল এবং যাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল জাতির আগামী ভবিষ্যৎ।**

(২) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

পরিদর্শন
[Medical Inspection]

স্বাস্থ্য ভগবানের দান। কাজেই সব কিছুর বিনিময়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয়। স্বাস্থ্য রক্ষা সমাজ ও জাতির কাম্য। স্বাস্থ্য রক্ষা সরকারের জাতীয় কর্তব্য। কারণ স্বাস্থ্য ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। স্বাস্থ্য রক্ষা করা বিদ্যালয়ের কাজ। বিদ্যালয় তার স্বাস্থ্য-গত পরিবেশ রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাস্থ্যও রক্ষা করবে।

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথাযথ রাখতে হলে Medical Inspection-এর ব্যবস্থা করতে হবে। Medical Inspection না থাকলে সংক্রামক ব্যাধি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়তে পারে। Medical Inspection-এর কাজ প্রধানতঃ তিন ধরনের,—প্রতিরোধ (নিরাময় ও সংক্রমণ), উপদেশ ও শিক্ষা। সারিয়ে ফেলা বা চিকিৎসা করা Medical Inspection-এর কাজ নয়,

Medical Inspection-এর কাজ

কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের বিভিন্ন defects ধরিয়ে দিতে হবে, তার পর House Physician বা ডাক্তার তার চিকিৎসা করবে।

স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনের গুরুত্ব

[Importance of Medical Inspection]

বিদ্যালয়ে Medical Inspection-এর গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। এগুলি হ'ল,—

॥ ১ ॥ কতকগুলি রোগ প্রথমে সাধারণ। এই অবস্থায় তাদের সহজে ও কম খরচায় সারিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু পরে সেগুলি সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তখন তার চিকিৎসা বহু ব্যয় সাধ্য হয়। স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন এই জাতীয় রোগ গুলিকে প্রথম অবস্থায় ধরিয়ে দিয়ে যথাযথ চিকিৎসার পরামর্শ দেয়।

॥ ২ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ফলে শিক্ষার্থীর শারীরিক সামর্থ্য সম্বন্ধে জানা যায়। শিক্ষক ও অভিভাবক তখন তার শরীর ভাল করার চেষ্টা করেন, রোগ ইত্যাদি থাকলে সারিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেন।

॥ ৩ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সুবিধা হয়। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন ভাল থাকে না। তখন যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাজেই শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য অনুসারে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরিচালন ব্যবস্থা রূপায়িত করতে হয়। দৃষ্টি শক্তির ত্রুটি থাকলে সেই ছাত্রকে class-এ সামনের বেঞ্চিতে বসতে দিতে হয়।

॥ ৪ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ফলে সংক্রামক রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়।

॥ ৫ ॥ Medical Inspection-এর ফলে শিক্ষার্থীদের গুপ্ত রোগ ও বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

॥ ৬ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে অনেকখানি নিয়মিত করে। শরীর ভাল থাকলে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসে।

॥ ৭ ॥ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ফলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক সামর্থ্য সম্বন্ধে জানা যায়। তখন তাদের নিয়ে Educational Experiments করা সহজ হয়।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের পরিধি
[Scope of Medical Inspection]

Medical Inspection পরিধিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় ;—

॥ ১ ॥ School Sanitation, Building ও পরিবেশের স্বাস্থ্য সম্মত উন্নয়ন।

॥ ২ ॥ রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দান।

॥ ৩ ॥ সমস্ত ছাত্রকে Medical check-up করা। Medical check-up-এর সময় নিম্নলিখিত শারীরিক বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়,—গঠন, চোখ, কান, চুল, ত্বক, স্নায়ু, পেশী, দেহভঙ্গী, হাড় ও joints, উদর ও তলপেট, হৃদ্‌পিণ্ড, বিশ্রামের সময় নাড়ীর গতি, পরিশ্রমের পর নাড়ীর গতি, ফুসফুস-নাক, গলা, দাঁত ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনের কাজ।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের লক্ষ্য
[Aims of Medical Inspection]

Medical Inspection-এর লক্ষ্য হ'ল,—

॥ ১ ॥ শিক্ষার্থীর শরীরের সামর্থ্যকে যথাযথ রাখা ও শিক্ষার্থীকে পাঠে যোগ্য রাখা।

॥ ২ ॥ শিক্ষার্থীর মনকে ভাল রাখা। যাতে সে পাঠে মনোযোগ রাখতে পারে।

॥ ৩ ॥ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দোষ ত্রুটি দূর করা এবং তার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন।

॥ ৪ ॥ শিক্ষার্থীর মন সম্বন্ধে জানা। ফলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিকল্পনা করার সুবিধা হবে। এবং সে অনুযায়ী মাতাপিতা ও অভিভাবককে সতর্ক করে দেওয়া যাবে।

॥ ৫ ॥ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিবেশ রক্ষা।

॥ ৬ ॥ ভাল স্বাস্থ্য ও সুন্দর মন নৈতিক চরিত্রকে দৃঢ় করে। কাজেই নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করা Medical Inspection-এর পরোক্ষ লক্ষ্য।

॥ ৭ ॥ ছাত্রদের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য চর্চার গুণ গুলি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

॥ ৮ ॥ Handicapped Students খুঁজে বের করা ও সে অনুসারে তাদের শিক্ষাদানের পৃথক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

॥ ৯ ॥ শিক্ষকের স্বাস্থ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান উন্নত করা।

বিদ্যালয়ে Medical Inspection-এর লক্ষ্য হ'ল সুস্বাস্থ্যের উপর ভিত্তি করে পড়াশুনার একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ধারাবাহিকতা
[Frequency of Medical Inspection]

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগের সময়, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় বয়ঃসন্ধিকালে ও বিদ্যালয় ত্যাগের সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেই হবে। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যতদিন থাকবে ততদিন স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে না। স্বাস্থ্য রক্ষা এক-দু'দিনের প্রচেষ্টার ফল নয়। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। বিদ্যালয়ে Medical Inspection-এর ধারাবাহিকতা তাই রক্ষা করতে হবে। প্রতিবছর অন্ততঃ একবার প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন
[Daily Medical Inspection]

বিদ্যালয়ে প্রত্যহ স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন করতে পারলে ভাল হয়। শিক্ষার্থীর শরীর ও মন ভাল না থাকলে শিক্ষাদান কার্যকরী হয় না। তাই তাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে। আকস্মিক জ্বর-জ্বালা, গলা, দাঁত, কানের অসুখ, পোষাক ইত্যাদির অপরিচ্ছন্নতা, Smartness-এর অভাব, মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি সম্পর্কে প্রত্যহই অনুসন্ধান করা উচিত। কোন অঞ্চলে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে তখন প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন প্রত্যহই করা উচিত।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ
[Persons involved in Medical Inspection]

একজন whole time ডাক্তার বা Medical officer বিদ্যালয়ে থাকলে ভাল হয়। তিনি ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ দিবেন। বিদ্যালয়ের First Aid Room ও Dispensary তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে। District Inspector of Schools-এর মত জেলা পর্যায়ে Medical officer নিয়োগ করা যেতে পারে। Medical officer বিদ্যালয় ও Hostel পরিদর্শন করবেন। বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী Hospital-এ বিদ্যালয়ের জন্য কয়েকটি seat সংরক্ষিত থাকবে। বিদ্যালয়ের Physical

Instructor-ও Medical Inspection Team-এর অন্তর্গত হবেন। অন্যান্যদের মধ্যে থাকবেন, Nurse cum attendant, Dentist, Eye specialist, Part-time experts, Teachers ইত্যাদি। এঁদের সকলকে নিয়েই বিদ্যালয়ের Medical Inspection Team হবে; এবং তাঁরাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন করবেন।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন
[Medical Inspection]

Medical Inspection রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুপ্তরোগ প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরিয়ে দেবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করাও স্বাস্থ্যগত পরিদর্শনের অংশ। শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ, দৈর্ঘের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের ওজন, শরীরের উচ্চতা, ওজনের তুলনায় বক্ষের পরিমাপ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গলা, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া Medical Inspection-এর কাজ। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা, পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া Medical Inspection-এর কাজ।

এই সবের ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে ব্যক্তিগত Medical Record card রক্ষা করতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিবরণ থাকবে। বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও Medical Inspection-এ ঐ card-গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য
[Remarks of the Mudaliar Commission]

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। কমিশন সুপারিশ করেছেন ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে কি না, দৈহিক পুষ্টি ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখবার জন্য প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে। কমিশনের অভিমত হচ্ছে,—যদিও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা আছে, তবে সে ব্যবস্থা নামেমাত্র চালু আছে, সেখানে সন্তোষজনক কাজ হচ্ছে না। কোন কোন স্কুলে নামে-মাত্র ব্যবস্থাও নেই। স্কুলের কমিটিতে একজন ডাক্তার রাখবার ব্যবস্থা আছে। তিনি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা ছাড়া ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ করার কোন সময় পান না। মুদালিয়র কমিশন বর্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

It is necessary······to subject all students to a medical examination, to ascertain whether they are normal in health and standards of physical development. Although the system of school medical inspection has been in existence for a number of years in many states. We are of opinion the results have not been satisfactory for the following reasons—

(i) *The medical inspection has been done in a perfunctory manner.*

(ii) *The defects that have been brought out even by this type of examination have not been remedied because the remedial measures suggested are often not carried out.*

(iii) *There is no follow-up not even in the case of those who have been declared as defective.*

(iv) *Effective co-operation has not been established between the school authorities and the parents, and either through ignorance or through lack of financial resources or both, the parents have taken little interest in the reports of the school medical officer.*

We feel therefore that unless the present system is improved considerably, it would be a mere waste of time and money to continue it. To bring about necessary improvements we recommend that—

(i) *Health examination should be thorough and complete. If a choice is to be made between frequent and cursory examinations and more thorough exnminations at longer intervals, the latter are greatly to be prefered. Every pupil in the school should undergo at least one examination every year while in school and one just prior to leaving the school.*

(ii) *Pupils with serious defects and those who suffer from severe illness should be examined more frequently.*

(iii) *Much more should be done to assure prompt and effective or follow-up whenever examination reveals the need for corrective or remedial measures.*

(iv) *One copy of the health report should be kept by the school medical officer, another copy should go to the parent, and a third copy to the teacher incharge of particular group……the health and safety entire school and activities for promoting and safeguarding health will find a place throughout the school programme.*

(৩) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
(SCHOOL SANITATION)

বিস্তালয় সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। বহু জায়গা থেকে বহু শিক্ষার্থী এসে বিস্তালয়ে একটি ছোট্ট সমাজজীবন গড়ে তুলে। জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা এই বিস্তালয় থেকে শুরু হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষাও শিক্ষার্থীরা এখান থেকেই শিক্ষা লাভ করবে। ভাল স্বাস্থ্য ছাড়া যথাযথ শিক্ষা সম্ভব নয়। বিস্তালয় তাই স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়গুলি শিক্ষা দিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্তালয় তার নিজস্ব এলাকা ও গণ্ডীর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বিস্তালয়ের এই স্বাস্থ্যসম্মত আদর্শ পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য রক্ষার বহু বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। বিস্তালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদেরও একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে; এবং সে কাজে তাদের ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতা গড়ে উঠবে।

বিস্তালয়ে স্বাস্থ্য সম্মত আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে,

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ
(Clean Environment)

বিস্তালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিস্তালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাইরের পরিবেশ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে সেখানে যারা থাকবে তারাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করবে। নোংরা পরিবেশে বাস করলে দেহ ও মন দুই নোংরা হয়। শিশুর মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগাতে হলে তাকে ছেলে বেলা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলিতে যাতে অভ্যস্ত

দেহ ও মনের উপর পরিবেশের প্রভাব অসীম

হয় সে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি বই পড়ে মুখস্থ করলেই কারো স্বাস্থ্য রক্ষা হবে না। শিশু নিয়ম গুলি পালন করছে কি না দেখতে হবে। সেই সাথে দেখতে হবে স্কুলের পরিবেশটি যাতে স্বাস্থ্য সম্মত হয়। বিদ্যালয়ের সামনের বা চারপাশের ঝোপ জঙ্গল, আগাছা, আবর্জনাস্তূপ, দূষিত পুকুর ইত্যাদি যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় গৃহ
(Healthful School Buildings)

স্কুলের মধ্যে যদি আলোবাতাসের ব্যবস্থা না থাকে, স্যাঁৎসেতে অন্ধকার ঘরে তাদের বসতে দেওয়া হয়, স্কুল যদি নোংরা বস্তি এলাকায় হয়, ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা না থাকে এবং যদি উপযুক্ত পরিবেশে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মপালনে অভ্যাস না করান হয়, তাহলে শুধু স্বাস্থ্য বই পড়লে কি লাভ হবে? বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কুলের ঘর, দুয়ার, মেজে যদি সর্বদা পরিষ্কার ও আবর্জনা শূন্য থাকে, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার, প্রভৃতি কোথাও ধূলা জমতে দেওয়া না হয়, তাহলে সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে ছেলেমেয়েরাও বুঝবে তাদের পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকা লজ্জার বিষয়। পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় পরিবেশে ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ বারান্দা প্রাঙ্গনকে পরিচ্ছন্ন রাখা

ছেলেমেয়েদের দৈহিক মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আলো হাওয়া যুক্ত খোলা জায়গায় বিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে যাতে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য বড় বড় দরজা জানালা থাকবে। ঘরগুলি যাতে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য রোজ ভাল করে সাফ করতে হবে। কোথায়ও কোনরূপ ময়লা বা আবর্জনা জমতে দেওয়া হবে না। দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা বা কালির দাগ দিয়ে যাতে নোংরা না করে তা দেখতে হবে। প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়ের ঘরগুলি চুনকাম করা দরকার। বিদ্যালয় পরিবেশে প্রচুর আলো বাতাস থাকবে। লোকালয়ের অনতিদূরে একটি খোলা জায়গায় বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন করতে পারলে ভাল হয়।

বিদ্যালয়ের কক্ষগুলিতে প্রচুর আলোবাতাস যাতায়াত করবে

স্বাস্থ্য সম্মত কয়েকটি অভ্যাস
[Some Healthful Habits]

ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে ছেড়া কাগজ, খাবারের ঠোঙা এসব ফেলবে না; এজন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি থাকবে। এই কাগজগুলিকে পরে দূরবর্তী কোন ফাঁকা জায়গায় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা আর একটি বদ্ অভ্যাস। এই অভ্যাসটি যাতে ছেলেমেয়েরা ত্যাগ করে সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় থুথু ফেলবার পাত্র রাখা হবে; ছেলেমেয়েরা সেখানে থুথু ফেলবে। স্কুলে উপযুক্ত সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবাগার থাকবে। প্রতিদিন ঐগুলি পরিষ্কার করা হবে। অনেক সময় কোন কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বদ অভ্যাস দেখা যায়। তারা পায়খানা ও প্রস্রাবখানার দেওয়ালে নোংরা কথা লিখে রাখে। এটা কিশোরদের অবদমিত যৌন চেতনার বিকৃত প্রকাশ। এ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে স্কুলে জমায়েত করে বলা যেতে পারে "এ অভ্যাসটি খারাপ; বাইরের লোকেরা কেউ এলে দু'একটি ছাত্রের জন্ম সমস্ত স্কুলের সম্পর্কে তাঁরা একটা খারাপ ধারণা নিয়ে ফেলবেন। আশা করি শিক্ষার্থীরা নিজেরাই-এর প্রতিবিধান করবে।" এ কথায় সুফল ফলবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ছেঁড়া কাগজ থুথু ইত্যাদি আবর্জনা ও নোংরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবার অভ্যাস গঠন করতে হবে

বিদ্যালয়ে জলের ব্যবস্থা
[School water Supply]

শিক্ষার্থীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে নির্দোষ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। পল্লী অঞ্চলে স্কুলে একটি কূয়া বা নলকূপ থাকা উচিত। জল রাখবার পাত্র রোজ পরিষ্কার করা হবে ও ঢাকা রাখবার ব্যবস্থা থাকবে। ড্রামে জল রাখবার ব্যবস্থা হলে অনেক সময় ছাত্রেরা তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে জল নেয় বা গ্লাস ভাল করে না ধুয়ে ডুবিয়ে দেয়,—এ অভ্যাসটি খারাপ। গ্লাসে জল খাবার ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। সারা স্কুলের ছাত্রদের জল খাবার জন্ম দুটি মাত্র গ্লাস থাকবে আর সবাই এসে মুখ লাগিয়ে জল খাবে। প্রায়ই দেখা যাবে ব্যবহারের আগে গ্লাসটি ভালকরে ধুয়ে নিচ্ছে না বা গ্লাসটি কয়দিন মাজা হয় নি। এর চেয়ে ট্যাপ (Tap) লাগান জলের পাত্র থাকাই ভাল। ছাত্রেরা হাত ধুয়ে হাত পেতে সেখান থেকে জল খেতে পারবে। পানীয় জলের মাধ্যমে যাতে রোগ বিস্তার করতে না পারে

পানীয় জল

সেদিকে দেখতে হবে। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পানীয় জলের বড় অভাব। তাই বিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যান্য কাজের জন্য জল

পানীয় জল ছাড়াও বিদ্যালয়ে আরো জল লাগে। হাত মুখ ধোওয়া, স্নান করা, পায়খানা ইত্যাদির জন্যও জল প্রয়োজন। স্নান করার জন্য একটি সংরক্ষিত পুকুরে Swimming pool থাকতে পারে। নতুবা একটি স্নানের ঘরের ব্যবস্থা থাকতে পারে। সাবান ইত্যাদি দিয়ে হাত মুখ-ধোওয়া একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। তার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা চাই। খাওয়ার আগে ও খেলাধূলার পর হাত-পা-মুখ ধোওয়া ও পরিষ্কার করতে হবে। পায়খানা ও প্রস্রাবখানার জন্যও যথেষ্ট জল প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে এর সুবন্দোবস্ত থাকবে, ব্যবহৃত জল যথাযথ নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন-এর ব্যবস্থা থাকবে।

টিফিন
[Tiffin]

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য পরিবেশন

ছাত্রদের যদি স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে যেখানে খাবার তৈরী হবে সে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। মাছির উপদ্রব যাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হবে। খাবার তৈরী হয়ে গেলে ধূলো ও মাছির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খাবার ঢাকার ব্যবস্থা থাকবে বা খাবার রাখার আলমারী থাকবে।

বসিবার ব্যবস্থা
[Seating Arrangements]

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত বসার ব্যবস্থা থাকবে

ছাত্রদের বসার বেঞ্চ ও সামনের ডেস্ক বা হাই বেঞ্চ এমনভাবে তৈরী হবে যাতে ছেলেমেয়েদের বসে লিখতে অসুবিধা না হয়। বেঞ্চগুলি মজবুত হবে। সামনের বেঞ্চের নীচে স্বতন্ত্র কাঠ লাগানো থাকবে যাতে ছাত্রেরা পা রাখতে পারে। শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ ও ডেস্কগুলি তাদের দেহের অনুপাত অনুসারে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে প্রস্তুত হবে। বেঞ্চগুলিতে ছাত্রেরা ছুরি দিয়ে ঘবে খোদাই করে যাতে নষ্ট না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই খারাপ অভ্যাসটি সম্পর্কে তাদের পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হবে।

শৌচাগার
[Latrine and Lavatory]

বিদ্যালয়ে মলমূত্র ত্যাগের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু

অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস দেখা যায়। তা দূর করতে হবে। শৌচাগারে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকবে। মাঝে মাঝে ফিনাইল প্রভৃতি দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করতে হবে। শৌচাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্নানাগার থাকতে পারে। Co-educational school গুলিতে বা girls school গুলিতে মেয়েদের শৌচাগারে গরম জলের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস স্বাস্থ্য-সম্মত নয়।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
[Personal cleanliness]

স্কুল পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার সাথে ছাত্রেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয় পরিচ্ছন্নতা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ছাত্রেরা যাতে পরিষ্কার কাপড় জামা পরে স্কুলে আসে শিক্ষকগণ সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখলেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ছাত্রেরা রোজ স্নান করে কি না, দাঁত মাজে কি না, নিয়মিত নখ কাটে কি না, নখের গোড়ায় মাটি জমে আছে কি না প্রভৃতি বিষয় শিক্ষক দেখবেন। ক্লাসে কয়েক দিন যদি একটু খোঁজ খবর করা যায় তা হলেই ছাত্রদের অভ্যাসের পরিবর্তন হবে। শুধু উপদেশে কোন কাজ হবে না, অভ্যাসগুলি ছেলেমেয়েদের আয়ত্ব করিয়ে দিতে হবে। মুখে নোংরা হাত দেওয়া, পেন্সিল মুখে দেওয়া, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, মুখে হাত বা রুমাল চাপা না দিয়ে হাঁচি দেওয়া বা কাশতে থাকা প্রভৃতি খারাপ অভ্যাসগুলির দোষ সম্পর্কে ছাত্রদের বলা হবে। যদি পর পর কয়েক দিন শিক্ষক এ সম্পর্কে বলেন তাহলে ছাত্রদের এ অভ্যাসগুলি পরিবর্তন হয়।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

(৪) শরীর শিক্ষা
(PHYSICAL EDUCATION)

আমাদের দেহ একটি যন্ত্রের মত। যন্ত্রকে চালু রাখতে হলে তেল, জল, কয়লা ইত্যাদি দরকার। মাঝে মাঝে যন্ত্রকে বিশ্রাম দিতে হয়। পরিষ্কার করতে হয়। যন্ত্রটি চালু রাখতে দরকার অনেক মেহনতের, অনেক সতর্কতার। যন্ত্রকে অচল রাখলে ধীরে ধীরে যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাবে। মানুষের দেহ অনেকটা এইরকম। দেহ যন্ত্র চালু রাখতে হলে নিয়মিত খেতে ও পরিশ্রম করতে হবে। দেহের প্রয়োজনীয়

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা

উপাদান দেহ খাদ্য থেকে আহরণ করবে। শুধু খেলেই হবে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গকে চালু রাখতে হলে নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে। কোন একটি দিককে বসিয়ে রাখলে চলবে না। কোন একটি দিককে বেশী খাটিয়ে নিয়ে আর একটি দিককে বসিয়ে রাখলে তা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। যারা শুধু মস্তিষ্কের কাজ করেন তাঁরা যদি শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কোন কাজ না করেন তাহলে দেহ অথর্ব হয়ে পড়বে। এজন্য সামগ্রিকভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য অবশ্য মনকে অবহেলা করলে চলবে না। চিন্তার মধ্য দিয়ে মানসিক-বৃত্তি-সমূহের বিকাশ ঘটবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার। তাই দৈহিক পরিশ্রম করে সুস্থ সবল দেহকে গড়ে তুলতেই হবে।

শরীর শিক্ষা কি?
[What is Physical Education]

রোগ-দুর্বল মানুষের জীবনে কোন আনন্দ নেই, নেই কর্মে উদ্দীপনা আর উৎসাহ। জীবনটা তার কাছে একটা বোঝা। জীবনকে আনন্দ মুখর করে তুলতে হলে দেহকে সুস্থ রাখতে হবে। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত মাংস-পেশীর মধ্যে একটি ছন্দ ও সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে যে আচরণ শিক্ষা ও অনুশীলন করতে হয় তাই হ'ল শরীর শিক্ষা। আমাদের প্রতিদিনের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন যে অঙ্গ সঞ্চালন হয় তাতে দৈহিক পরিশ্রম হয় কিন্তু তাতে দেহের সমস্ত অঙ্গের সুসঙ্গত পরিচালনা হয় না। যাতে প্রতিটি অঙ্গ ও মাংস-পেশীর সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন হয়, সেজন্য শরীর শিক্ষার প্রয়োজন। ক্লাসের পড়া তৈরী করা যেমন প্রয়োজন শরীর শিক্ষারও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। শিক্ষা যদি হয় দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীন ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ, তাহলে দেহের বিকাশের জন্য প্রয়োজন শরীর শিক্ষার। যে শিক্ষা ও অনুশীলন শরীর ও দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে ও তার বিকাশ সাধন করতে সাহায্য করে তাকেই বলে শরীর শিক্ষা। এ বিষয়ে মুদালিয়র কমিশন বলেছেন—"*Its various activities should be so planned as to develop the physical and mental health of the students, cultivate recreational interests and skills and promote the spirit of team work, sportsmenship and respect for others······It includes all forms of physical activities and games which promote the development of the body and the mind.*

দেহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের শিক্ষা ও অনুশীলনী হ'ল শরীর শিক্ষা

শরীর শিক্ষার সুবিধা
[Advantages of Physical Educations]

শরীর শিক্ষার সুবিধা অনেক, সেগুলি হ'ল :—

॥ ১ ॥ **শারীরিক উন্নতি** (Physical Development) :—শরীর শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যচর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারে। যাদের স্বাস্থ্য ভাল তারা তা রক্ষা করতে বা আরো উন্নতি করতে পারে। যাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল নয় শরীর শিক্ষার ফলে তারা সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে। শরীর চর্চার ফলে পেশী সমূহ শক্ত, ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে বিকশিত হয়। শরীরের অন্যান্য অংশও যথাযথভাবে বিকশিত হয়। শরীর চর্চা ও অনুশীলনের ফলে শরীরে সুষ্ঠুভাবে রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হয়, ফলে হজম ভাল হয়। তখন শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। শরীর চর্চার ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যথাযথভাবে কাজ করে। শরীর চর্চার ফলে শরীরের মধ্যেকার দূষিত পদার্থগুলি ঘাম ইত্যাদির আকারে বেরিয়ে এসে শরীরকে সুস্থ করে। শরীর চর্চা, পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদিতে সাহায্য করে ; তাতে শরীর অনেক ধরনের অসুখ ও অসুবিধার হাত থেকে বাঁচে। শরীর চর্চা শরীরকে সুস্থ ও সবল করে ;—ব্যক্তি কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী হয়।

শরীরের উন্নতি কর্মক্ষমতা উন্নত করে

॥ ২ ॥ **সংশোধক সুবিধা** (Corrective Benefits) : শরীর চর্চা শরীরের অনেক অসুবিধা দূর করে এবং শরীরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ রোধ করে। শরীর চর্চা মনকে সতেজ করে, শরীকে সুস্থ ও সবল করে, অনেকগুলি শারীরিক ত্রুটি শরীর চর্চার ফলে অপসারিত হয়। অতিরিক্ত মেদ ইত্যাদি শারীরিক অসুবিধাগুলি শরীর চর্চার ফলে প্রশমিত হয়। ডাক্তাররা রোগীর শরীর পরীক্ষা করে তার চিকিৎসা হিসেবে বিভিন্ন রকম শরীর চর্চার নির্দেশ দেন।

শরীরের অনেক অসুবিধা শরীর চর্চার ফলে বিদূরীত হয়

॥ ৩ ॥ **মানসিক সুবিধা** (Mental Benefits) :—সুস্থ শরীর মনকে সুস্থ করে। শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। শরীর চর্চার ফলে কতকগুলি মানসিক গুণ বিকশিত করে। ধৈর্য (Tolerance), দৃঢ় সংকল্প (Determination), বিচার ক্ষমতা (Pawer of Judgement) ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী শরীর চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

মানসিক গুণের বিকাশ

॥ ৪ ॥ **নৈতিক সুবিধা** (Moral Benefits) :—শরীর চর্চার অঙ্গ

এক ধরনের শিক্ষাগত মূল্য আছে। অনেকগুলি নৈতিক গুণ শরীর চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। সেগুলি হ'ল,—সাহস (Courage), দক্ষতা (Skill), শৃংখলা (Discipline), আত্মসংযম (Self-control), আত্মপ্রত্যয় (Self-confidence), সমদলীয় মনোভাব (Team spirit), সহযোগিতা (Co-operation), পারস্পরিক বোঝাপড়া (Mutual understandings) ইত্যাদি।

নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ

শরীর চর্চা ও অনুশীলনের আরো কতকগুলি সুবিধা আছে। শরীর চর্চার মাধ্যমে সুন্দরভাবে অবসর যাপন করা যায়। বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা, ব্যায়াম, সাঁতার প্রভৃতির মাধ্যমে অবসর সময় কেটে যায়। তাতে শরীরও ভাল থাকে, মনও ভাল থাকে।

অবসর যাপন

শরীর চর্চা মনকে এক অনাবিল আনন্দ দেয়। খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে যে পরিশ্রম হয় তাতে মনে তৃপ্তি (satisfaction) হয়। মানবিক তৃপ্তিই জীবনের সর্ববিধ সুখের আগার।

শরীর চর্চা ও মানসিক তৃপ্তি

শরীর চর্চা ও শরীর শিক্ষা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষার উপর তাই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শরীর শিক্ষা ব্যায়াম (Exercise) ও খেলাধূলার (Games and sports) দেওয়া হয়।

ব্যায়াম
[Exercise]

দেহকে সুস্থ সবল রাখতে ও সুগঠিত করে গড়ে তুলতে ব্যায়াম বহুদিন থেকে চলে আসছে। নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম করলে মাংশ-পেশী গুলি সবল ও দৃঢ় হয়, শরীর সুস্থ থাকে মনে প্রফুল্লত' আসে।

ব্যায়ামের গুরুত্ব

ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে। অনিয়মিত ব্যায়ামে বা ব্যায়াম করতে করতে ছেড়ে দিলে দেহ মেদবহুল হয় ও মাংস-পেশী-সমূহ শিথিল হয়ে পড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম দেহের অতিরিক্ত মেদ কমিয়ে দেহকে সুশ্রী করে তোলে। ব্যায়ামের দ্বারা রোগা লোকের মাংসপেশী দৃঢ় ও পুষ্ট হয় ও তাদের কর্মক্ষমতা ও শক্তি বেড়ে যায়।

ব্যায়ামের সুফল

ব্যায়ামের সময় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে শরীর প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিজেন খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও ক্ষুধা বাড়ায়। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত উত্থান পতনের ফলে দেহের সর্বত্র অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন হয়। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে অনেক রোগ দূর হয়। ব্যায়াম মানুষকে দীর্ঘজীবন দান করে। ব্যায়ামে দেহ সুগঠিত

নিয়মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যকে উন্নত করে

হওয়া ছাড়া মেধাও তীক্ষ্ণ করে, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও সংযম শক্তি বাড়িয়ে তোলে।

ব্যায়ামে যেমন মানুষকে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান করে তোলে তেমনি অতিরিক্ত ব্যায়াম দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম করলে মাংস পেশী ও নার্ভগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরীরে ক্লান্তি আসে, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখা দেয়। দেহ রুগ্ন হয় ও চিন্তার ক্ষমতা কমে যায়।

অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল

বয়স ভেদে ব্যায়াম
[Exercise according to Age]

দেহের পক্ষে ব্যায়ামের প্রয়োজন, তবে সব বয়সে ও সব ঋতুতে একই রকম ব্যায়াম করা উচিত কি সম্ভবও নয়। বয়স ভেদে ও ঋতুভেদে ব্যায়ামের রীতি পদ্ধতি ও সময়ের পার্থক্য হবে। বাল্যে ও যৌবনে মানুষ যেমন কর্ম ক্ষম থাকে তার পক্ষে যে পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ সম্ভব একজন প্রবীন কি বৃদ্ধ লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিদ্ ও ডাক্তারের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে।

বয়সভেদে ও ঋতুভেদে ব্যায়ামের পার্থক্য

জন্মের পর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত খেলাধূলা দৌড়ঝাঁপই উপযুক্ত ব্যায়াম। এ সময় দেহের বৃদ্ধির সময় প্রত্যিটি অঙ্গের সঞ্চালন না হলে দৈহিক বৃদ্ধি বা পুষ্টি এ সময়ে হয় না। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা করতে দিতে হবে।

ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যায়াম

ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খেলার সাথে নিয়মিত দেহ চর্চ্চার ব্যবস্থা থাকবে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ড্রিলের (Drill) ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রিলের মাধ্যমে যে অঙ্গ সঞ্চালন হয় তাতে দেহ পুষ্ট হয়। ড্রিলের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়ের শৃংখলাবোধ জন্মে। ড্রিল ছাড়াও ডন-বৈঠক দেওয়া, সাঁতার দেওয়া ভাল ব্যায়াম। মেয়েদের পক্ষে স্কিপিং করা ও সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত ব্যায়াম। এ ছাড়া নাচও ভাল ব্যায়াম। নাচ ছেড়ে দিলে অবশ্য দেহ মেদ বহুল হয়ে দাঁড়ায়।

কিশোরদের জন্য ব্যায়াম

চৌদ্দ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ডন, বৈঠক দেওয়া, ডাম্বেল, মুগুর ব্যায়াম করা চলতে পারে। এই সময়ে আসন একটি ভাল ব্যায়াম।

যৌবনের ব্যায়াম

চল্লিশের পর কঠিন পরিশ্রমের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। তবে শীত প্রধান দেশে আরো বেশ কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করা চলে। পঞ্চাশের পর বেড়ানই একমাত্র ব্যায়াম। কারণ তখন শরীরের পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকে না।

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের জন্য ব্যায়াম

স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
[Importance of Exercise in Schools]

স্কুলে যে বয়সে ছেলেমেয়েরা পড়ে সেটা তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির সময়। এই সময়ে খেলাধূলা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা দরকার। শহরে অনেক সময় মাঠের অভাবে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আবার যেখানে বহু ছেলেমেয়ে সেখানে সবার জন্যে খেলাধূলার আয়োজন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া, বহু ছেলেমেয়ে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে চায় না। স্কুলে ড্রিলের মাধ্যমে প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম করানো চলতে পারে। সীমাবদ্ধ শ্রেণীকক্ষে বসে থেকে যখন তাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে তখন স্কুলের খেলারমাঠে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যায়াম তাদের দেহ মন উভয়ের পক্ষেই উপকারী। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ের মস্তিষ্কের কাজ হয়, সেই সাথে দেহের কাজ না হলে মস্তিষ্কের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাবে না। দেহ-চর্চ্চার ফলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কের কাজও অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ হলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য স্কুলে ব্যায়ামের প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের মাধ্যমে অনেক গুলি শিক্ষার্থীর শরীর চর্চা সম্ভব হয়

খেলাধূলা
[Games and Sports]

খেলাধূলার ব্যবস্থা সব বিদ্যালয়েই থাকবে, এটাই হ'ল নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কতটা পালন করা সম্ভব হয় তা বিচার্য। শহরে, এমনকি গ্রামে পর্যন্ত খেলার মাঠের অভাবে out door games এর যথোচিত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। খেলাধূলা দেহ-চর্চ্চার অতি প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ। অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে। ব্যায়ামের সাথে খেলাধূলার একটা পার্থক্য হচ্ছে, ব্যায়ামের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দেহ চর্চা, খেলার মধ্যে দেহ চর্চা ছাড়াও একটা আনন্দের ছোঁয়াচ রয়েছে। এই অনাবিল আনন্দের অংশীদার শিক্ষার্থীরা সহজেই হতে চায়। খেলাধূলার ব্যবস্থা সবার জন্য করতে পারলে খেলাধূলা শারীরিক শিক্ষার প্রধান উপায় বলে গৃহীত হবে।

খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ সঞ্চারিত হয়।

খেলার মাধ্যমে শুধু দেহ চর্চাই হয় না সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রেরণা, নিয়ম শৃংখলার প্রতি নিষ্ঠা, দলনেতার নির্দেশ মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা, নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষমতা প্রভৃতি জন্মায়। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শারীরিক ও মানসিক ;—দুয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হয়।

খেলাধূলার সুফল

বিভিন্ন প্রকার শরীর চর্চা
[Kinds of Physical Activities]

শরীর চর্চার জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা যায়। সেগুলি হ'ল :—

॥ ১ ॥ **খেলাধুলা** (Sports) :—

খেলাধূলা অনেক প্রকার হতে পারে। ফুটবল (Foot ball), ভলিবল (Volley ball), ক্রিকেট (Cricket) প্রভৃতি কতকগুলি খেলা খুবই আকর্ষণীয়। এই জাতীয় খেলাধূলার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও গুরুত্ব আছে। দলগত এই সব খেলাধূলার মাধ্যমে দলগত সংহতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও স্থান পায়। ব্যাড মিণ্টন (Badminton), টেনিস (Tenis) প্রভৃতি খেলা হ'ল একার বা দু'জনের। Relay প্রভৃতি খেলাধূলার মাধ্যমে চারজনের দলগত প্রতিযোগিতা হয়। Athletics এর বিভিন্ন বিষয়ও (Race, Throw, Jump ইত্যাদি) খেলাধূলার পর্যায়ে পড়ে। এই সব খেলাধূলার প্রত্যেকটির বিভিন্ন নিয়ম আছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এই সব নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতিযোগিতা এই সব খেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই সব খেলাধূলার মধ্যে একটি বিশেষ thrill আছে। এই জাতীয় খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে; সহযোগিতা, সমন্বয়, নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সামর্থ, ধৈর্য, সহ্যশক্তি, খেলোয়াড়চিত মনোবৃত্তি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণাবলী বিকশিত হয়।

প্রতিযোগিতা খেলাধূলাকে আকর্ষণীয় করে

॥ ২ ॥ **সাঁতার** (Aquatics) :—

শরীর চর্চার পক্ষে সাঁতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাঁতারের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথভাবে বিকশিত হয়। সাঁতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নিয়মিত সাঁতার শরীর চর্চার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। সাঁতারে ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের প্রচলন আছে;—প্রতিযোগিতাও ব্যক্তিগত। তবে ওয়াটার পোলো (Waterpolo), relay প্রভৃতি দলগত বিষয়ও সাঁতারের অন্তর্গত, শারীরিক অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাঁতার একটি ভাল ব্যায়াম।

সাঁতারে শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ হয়

॥ ৩ ॥ **ব্যায়াম** (Exercise) :—

নিয়মিত ব্যায়াম যে কোন বয়সের যে কোন ব্যক্তির শরীর চর্চার পক্ষে খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের যৌগিক ব্যায়াম শুধুমাত্র শরীরের উন্নতি করে না। অনেক প্রকার শারীরিক অক্ষমতা ও ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করে। gymnastics, Body building activities, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম বিশেষ জনপ্রিয়। ব্যায়াম শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও সবল রাখে,—পেশীগুলিকে শক্ত করে বিভিন্ন ব্যায়াম ছাড়া শরীরকে fit রাখা যায় না। ব্যায়াম তাই অন্যান্য খেলাধূলারও পরিপূরক।

ব্যায়াম শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও সবল রাখে

॥ ৪ ॥ **ছন্দমূলক শরীর চর্চা** (Rhythmical Exercises) :—

শরীর চর্চার অনেকগুলি বিষয় আছে ছন্দ-ইকার প্রাণ। পৃথিবীর সব কিছুরই মধ্যে ছন্দ আছে। ছন্দচেতনা তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। ছন্দমূলক ব্যায়ামগুলি শরীর চর্চার পক্ষে প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে মনকে তৃপ্ত করার জন্যও কার্যকরী। ছন্দমূলক ব্যায়ামগুলি হ'ল :—

নৃত্য ও Drill

(১) Walkings, Running, skipping ইত্যাদি
(২) ব্রতচারী (নাচ ও গানের মাধ্যমে শরীর চর্চা)
(৩) লোক নৃত্য (Folk dances)
(৪) অন্যান্য নৃত্য (Other dances)
(৫) Mass Drill ইত্যাদি।

নাচ ও গান একটি ভাল ব্যায়াম। একক নৃত্য, দ্বৈত নৃত্য, সমবেত নৃত্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচলিত আছে। এগুলিকে আরো ব্যাপক করতে হবে যাতে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

॥ ৫ ॥ **বিদ্যালয় ক্যাম্প** (School Camping) :—

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প করে শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। N. C. C.-র Camp শরীর চর্চার পক্ষে উপযোগী। বনভোজনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ, উনুন জ্বালানো, আয়োজন পত্র করা, রান্না, পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমেও যথেষ্ট শরীর চর্চা হয়, শিক্ষামূলক ভ্রমণও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়। তবে এ ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজকর্ম করতে হবে, বিদ্যালয় থেকে সমাজের মধ্যে গিয়ে সেবামূলক কাজের মধ্যেও শরীর চর্চা সম্ভব।

N. C. C.-র camp ও বনভোজন ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর চর্চা হয়

॥ ৬ ॥ **আত্মপরীক্ষামূলক কার্যাবলী** (Self-testing Activites)

এই ধরনের কার্যাবলীতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে পরীক্ষা করতে পারে।

ব্যক্তি নিজে নিজে এইভাবে শরীর চর্চা করে পরবর্তী সময়ে নিজেকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। পেশী নিয়ন্ত্রণ, শরীর দক্ষতা, শক্তি সামর্থ্য, শক্তির সঙ্গে শারীরিক নমনীয়তা (Flexibility) প্রভৃতি আত্ম-পরীক্ষামূলক শরীর চর্চার ফল। এর ফলে শরীর যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ভালভাবেই চলে। Stunts, tumblings, apparatus games, weight liftings, rope jumping ইত্যাদি আত্মপরীক্ষা-মূলক কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

শারীরিক শক্তি ও নমনীয়তা

মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য
[Report of the Mudaliar Commission]

১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের Report-এ Physical Education সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা শরীর শিক্ষাকে জাতীয় কর্তব্য হিসেবে ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের শরীরকে অবহেলা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কমিশন তাঁদের Report-এর chapter X-এর II নম্বর অনুচ্ছেদে (page-114) শরীর শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিদ্যালয়ে তা কার্যকরী করার জন্য বলেছেন ;—"*If it (Physical Education) is to be given properly, teachers of physical education should evolve a comprehensive plan to be followed by the students and it should be based on the results of the health examination. Most of these activities are group activities, but they should be made to suit the individual as well, taking due note of his capacity for physical endurance. Physical education group games, and individual physical exercise should be given, no daubt, in the school under* the *Supervision at the Director of Physical Education, but there is one aspect of physical education which should not be forgotten. The school should 'go to community' and seek the assistance in the furtherance of physical education. There are various types of physical exercises that can be taken up by students with the necessary aptitudes outside the school under the auspices of other agencies in the community interested in physical education, e. g., swimming, boating, and group games that may be locally popular. Where such facilities are available, special arrangements should be made for school children to avail of them under proper guidance and special hours may be fixed for them in some cases, e. g. in swimming baths and Akhadas, etc.*"

শরীর শিক্ষা সম্পর্কে ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনার অভিমত

শরীর শিক্ষা সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের অভিমত
[Report of the Kothari Commission]

সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনায় দৈহিক শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শরীর শিক্ষার এই গুরুত্বের কথা অনুভব করেই কোঠারী কমিশন পাঠ্য সূচীর প্রতিটি স্তরে শরীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। শরীর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন :—

শরীর শিক্ষার গুরুত্ব ও রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে ১৯৬৪-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য

'শরীর শিক্ষা সম্পর্কীয় সরকারী পরিকল্পনা সমূহে দেখা যায় সেখানে শুধুমাত্র দৈহিক যোগ্যতা বা উপযুক্ততার (physical fitness) বিচারে শরীর শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শরীর শিক্ষার শিক্ষাগত মূল্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। শরীর শিক্ষা শুধুমাত্র দৈহিক যোগ্যতা বৃদ্ধিরই সহায়ক নয়, দেহের কর্মশক্তি বৃদ্ধির সাথে মানসিক কতকগুলি দিকেরও বিকাশ লাভ ঘটে। শরীর শিক্ষার মধ্য দিয়ে অধ্যবসায়, দলগত মনোভাব, নেতৃত্ব, ও নিয়ম শৃংখলার প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ লাভ ঘটে।

শরীর শিক্ষার একটি উপযুক্ত কার্যসূচী শুধুমাত্র নিম্ন নীতিগুলির ভিত্তি করে রচিত হতে পারে :—

॥ ১ ॥ শরীর শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে হলে পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারীদের যোগ্যতা ও উৎসাহ বিচার করে কার্যসূচী রচনা করতে হবে।

॥ ২ ॥ দেশে বহু দিন ধরে যে সব খেলাধূলা ও দেহ চর্চার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ ৩ ॥ কার্যসূচী রূপায়ণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশুর মনে নিজের সম্পর্কে একটা মূল্যবোধ ও গৌরব বোধ জন্মাবে।

॥ ৪ ॥ ব্যায়ামাগার ও খেলার মাঠের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সহযোগিতার ও দায়িত্ব সমভাবে পালন করার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

॥ ৫ ॥ কার্যসূচী যেন আমাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী হয়।

॥ ৬ ॥ বিশেষ যোগ্যতা বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ ৭ ॥ দৈহিক শিক্ষা সূচীতে ব্যায়াম, ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকবে। এর দুটি স্তর থাকবে সাধারণ ও অগ্রবর্তী স্তর। নীচের শ্রেণীতে সাধারণ স্তরের সহজ কার্যাবলী অনুসরণ করা হবে। ছাত্রেরা বড় হবার সাথে উন্নততর ব্যবস্থা হবে।

॥ ৮ ॥ যারা খুব ছোট তারা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কঠিন পরিশ্রম সাধ্য কাজ করার উপযুক্ত নয়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের খেলাই হচ্ছে উপযুক্ত দৈহিক শিক্ষা। ঠিকমত হাঁটতে, দৌড়াতে, লুকোচুরি খেলতে তারা শিখবে। এর চেয়ে উচ্চস্তরের খেলা বা আয়ত্ত করতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা পরের স্তরে আসবে।

॥ ৯ ॥ বাল্য ও কৈশোরের মাঝামাঝি অবস্থায় ছাত্রদের শক্তি বৃদ্ধি পায় নতুন বিষয় সম্পর্কেও তাদের উৎসাহ ও কৌতূহল দেখা যায়। খেলাধূলা বিষয়ে তারা আরো বেশী নৈপুণ্যের অধিকারী হয়। এই সময় দলগতভাবে বা সমষ্টিবদ্ধভাবে খেলার ব্যবস্থা করতে হবে যা আয়ত্ব করতে অধিকতর কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন এই বয়সে তারা তাই শিখবে। এরপর বয়ঃসন্ধিকালে মাধ্যমিক স্তরে তারা বড়দের অনুকরণ করতে চায় এই বয়সের ছাত্রদের জন্য তাদের উপযোগী খেলাধূলার নানা আয়োজন (যেমন games, sports, atheletics) থাকবে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নৈপুণ্যের অধিকারী হতে চায়। দৈহিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নততর কলা-কৌশল শিক্ষা ও বিভিন্ন বিভাগে তাদের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ দিতে হবে।

॥ ১০ ॥ প্রাথমিক স্তরের প্রথম পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের শরীর শিক্ষা একই রকম হবে। এর পর থেকে তাদের দৈহিক যোগ্যতা ও উৎসাহ বিচার করে ভিন্ন কার্যসূচী নেওয়া হবে। ছন্দময় সুসংবদ্ধ কার্যপ্রণালী মেয়েদের আকৃষ্ট করে, এছাড়া কম পরিশ্রমসাধ্য খেলা তারা পছন্দ করবে। পরবর্তী স্তরে বাস্কেট বল, ভলি বল ও হকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে, মেয়েদের শরীর শিক্ষায় atheletic বিষয় থাকবে।”

(Report of the Education Comnission 1964-66 page No :—205)

শরীর শিক্ষার কার্যসূচী রচনায় কি প্রয়োজন তাই বিচার করলে হবে না ; আর্থিক সঙ্গতি, সীমাবদ্ধ সুযোগ ও শিক্ষকের দিকটাও বিচার করতে হবে। কমিশন সতর্ক করে দিয়েছেন শুধু দৈহিক যোগ্যতা নয় দৈহিক শিক্ষার শিক্ষাগত মূল্যের দিকটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

শরীর চর্চা এবং ক্লান্তি
(Physical Exercise Fatigue)

শরীরচর্চা ও অনুশীলন বিশেষ পরিশ্রম সাপেক্ষ। কতকগুলি খেলাধূলার জন্য রীতিমত শ্রমের প্রয়োজন হয়। পরিশ্রম ক্লান্তি আনে, অতিরিক্ত পরিশ্রম মানসিক ও শরীরিক অবসাদ আনে, ফলে কর্মবিমুখতা দেখা দেয়। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ক্লান্তি অল্প পরিশ্রমে আসে। পরিশ্রমের ফলে ঘাম বেরোয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অবসন্ন হয়ে আসে, কখনও কখনও অল্প পরিশ্রমে আলস্য দেখা দেয়। এই ক্লান্তি সাময়িক হলে খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রামের ফলে সেরে যায়। কিন্তু ক্লান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা রোগে পরিণত হয়। অবস্থা তখন বিপদজ্জনক স্তরে পৌছায়।

সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি

খাদ্য
(Food)

খেলাধূলা, ব্যায়াম ও অন্যান্য কাজকর্মের ফলে শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, তা পূরণের জন্য খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের মত গরীব দেশে খাদ্য একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই যথাযথভাবে খাদ্যগ্রহণ না করে বিদ্যালয়ে আসার বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেই তারা বিশেষভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার উপর খেলাধূলার মত পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজকর্ম করার মত শরীরের অবস্থা তখন আর থাকে না, শিক্ষার্থীদের যথাযথ খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা অধিকাংশ অভিভাবকেরই নাই। বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার কর্মগুলি রূপায়ণের সময় এই সমস্যার প্রতি সচেতন থাকতে হবে। খাদ্যের ব্যবস্থা না করে শরীর চর্চার ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের তাতে ক্ষতিই হয় বেশী। খাদ্য প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর ও পরিশ্রম অনুযায়ী হবে। সুষম খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এ ব্যাপারে বিশেষ কাজ হয়। শরীরচর্চার আগে ও পরে খাওয়ার প্রয়োজন হয়।

শরীর চর্চার ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের মূল্য অসীম

বিশ্রাম ও নিদ্রা
(Rest and Sleep)

শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য শুধুমাত্র খাদ্য গ্রহণ যথেষ্ট নয়;—প্রয়োজন বিশ্রাম ও নিদ্রার। খেলাধূলা, ব্যায়াম, কাজকর্ম ইত্যাদির মধ্যে শরীরের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, খাদ্যগ্রহণ করে উপযুক্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা হলে তার পূরণ হয়, তাছাড়া তাতে শরীরের বিকাশও হয়, শরীর শক্ত ও বলিষ্ঠ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রতিদিন যথেষ্ট বিশ্রামের প্রয়োজন, তাতে mental relaxation ও হয়। সুষ্ঠু নিদ্রা শরীর ও স্বাস্থ্যের অনেক উপকার করে। নিদ্রাও বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট আলোবাতাস যুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর ও বিছানা প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়সের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ নিদ্রা প্রয়োজন—

বিশ্রাম ও নিদ্রা শরীরের ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে

বয়স	প্রতিদিন নিদ্রার প্রয়োজন
চার বছরের কম শিশুদের জন্য	২০ ঘণ্টা
চার বছর থেকে আট বছরের বালকদের জন্য	১২ ঘণ্টা
আট বছর থেকে বারো বছরের কিশোরদের জন্য	১১ ঘণ্টা
বারো বছর থেকে চৌদ্দ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য	১০ ঘণ্টা
চৌদ্দ বছর থেকে কুড়ি বছরের বালক-বালিকাদের জন্য	৯ ঘণ্টা
পরবর্তী বয়সের ব্যক্তিদের জন্য	৭ থেকে ৮ ঘণ্টা

অনিদ্রা (Insomnia) একটি মারাত্মক রোগ। কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই রোগ দেখা দিলে তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসা
(First Aid and other Treatments)

খেলাধূলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রায়ই ছোট-খাটো আঘাত ও দুর্ঘটনা ঘটে। তার জন্যে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে সব সময় First Aid Box রাখতে হবে;—ডেটল, তুলা, আয়োডিন প্রভৃতি ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম রাখতে হবে। অন্যান্য অসুখ ও জটিল রোগের জন্য আরো উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অসুস্থ শরীরে শরীর চর্চা, সম্ভব নয়।

দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার সময় চিকিৎসার প্রয়োজন

ব্যক্তিগত বৈষম্যের সুযোগ
(Provision for Individual Differences)

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ একটি খেলার মাঠ থাকে। সেখানে ফুটবল ও ভলিবল খেলার ব্যবস্থা থাকে। তাতে বিদ্যালয়ের ৩০০।৪০০ শিক্ষার্থীর শরীর চর্চা সম্ভব নয়। **বিদ্যালয়ে শরীর চর্চাকে তাই ব্যাপক করতে হবে।** পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র একাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্রের সঙ্গে ফুটবল খেলতে পারে না। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে বিদ্যালয়ে একটি ছাত্র অন্য একটি ছাত্র থেকে ভিন্ন। সকলের শারীরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা সমান নয়। দৈহিক উচ্চতার বিচারে ও বৈষম্য দেখা যায়। অনেক ছাত্র থাকে যাদের শারীরিক অক্ষমতা আছে। কাজেই শরীরের বিচারেও বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য আছে। এই বৈষম্যের কথা মনে রেখে বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার সংগঠন ও ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সমস্ত শিক্ষার্থীই শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের শরীরকে যথাযথ বিকশিত করতে পারে এবং শারীরিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এজন্য শরীর চর্চার পরিধিকে বহু বিস্তৃত করতে হবে, শরীর চর্চার নানারকম ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীই সেগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীকে সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী শরীর চর্চার সুযোগ দিতে হবে

বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষার সংগঠন
[Organisation of Physical Education in schools]

শরীর শিক্ষা কেবলমাত্র উপদেশ ও মৌখিক শিক্ষা দিয়ে হয় না। শরীর শিক্ষা শরীর চর্চা ও শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমেই সফল হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে একজন **Physical Instructor** থাকবেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার কর্মসূচী যথাযথভাবে রূপায়িত হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত শিক্ষকেরই সক্রিয় সহযোগিতা থাকবে, কারণ এ ব্যাপারে তাঁদের একটা

বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষা রূপায়ণের সুবিধা অসুবিধা

বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব আছে। বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, ছাত্রদের common room, সাঁতারের পুকুর প্রভৃতি স্থান যথাযথভাবে নির্দিষ্ট থাকবে। বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার জন্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও উপকরণ থাকবে। এ জন্য সরকার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করতে হবে। **খেলাধুলার প্রতি অভিভাবকদের একটা অনীহা আছে।** বিদ্যালয়ের সময় তালিকা (Time table) ও পরীক্ষায় শরীর চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে অভিভাবকদের এই মনোভাব দূর করতে হবে। বিদ্যালয়ে শরীর চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে পূর্বপরিকল্পনার মাধ্যমে তার বিভিন্ন কর্মসূচীকে রূপদান করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার (fair competition) ব্যবস্থা থাকলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়। তাই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। শরীর চর্চাকে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে।

শরীর চর্চার শিক্ষাগত মূল্য
(Education value of Physical Exercises)

বিদ্যালয়ে শরীর শিক্ষা ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র শরীর ও মনকেই সুস্থ রাখে না তার শিক্ষাগত মূল্যও আছে। শরীর চর্চা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে তাতে সমস্ত শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপদানের সুবিধা হয়। শরীর চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলী বিকশিত হয়। এগুলি হ'ল,—সহযোগিতা, সহানুভূতি, ধৈর্য, দক্ষতা, সংঘচেতনা, দলগতচেতনা, নেতৃত্ব খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি, উদ্যম, উৎসাহ, আত্মপ্রত্যয়, শৃংখলা, সংযম, সাহস, আনুগত্য, তিতিক্ষা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি চরিত্রের এই গুণগুলির শিক্ষাগত ও সামাজিক মূল্য অনাস্বীকার্য।

শরীর শিক্ষা চরিত্রের গুণাবলীকে বিকশিত করে

শরীর শিক্ষা ও বিনোদন
(Physical Education and Recreation)

মানুষের জীবনে আনন্দের প্রয়োজন আছে। জীবনকে আনন্দমুখর করে রাখতে পারলে জীবনের জটিল যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র যন্ত্রের মত পরিশ্রম করে গেলেই শরীর ও মন ভাল থাকে না। তাই প্রয়োজন হয় আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তির (Mental satisfaction)। আমাদের দেশে সমাজের মধ্যে recreation-এর ব্যবস্থা নাই। মানুষের জীবন তাই দুর্বিষহ। community recreation-এর কথা তাই অনেকে বলে থাকে। বিদ্যালয়ে চিত্তবিনোদনের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় শরীর

শরীর শিক্ষা ও শরীর চর্চা চিত্তবিনোদনের একটি বড় মাধ্যম

চর্চা তাদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন খেলাধূলা, ব্যায়াম ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে চাঞ্চল্যের বন্যা এনে দেয়। খেলাধূলার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত thrill ও উত্তেজনা আছে শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতে হবে। শরীর চর্চার এই আনন্দের আসরে যদি নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা যোগ দেন তবে তাঁরাও এই আনন্দ, চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার অংশীদার হতে পারেন। তাই চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেও শরীর চর্চার মূল্য অসীম।

বাস্তব অবস্থা
(Practical Situation)

তত্ত্বগত বিচারে ও পদ্ধতির আলোচনায় আমরা যতই বড় বড় কথা বলি না কেন বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে শরীর চর্চার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ও আসবাবপত্র নেই; Physical Instructor-ও নাই। এর ফলে আমাদের দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজ বিরাট এক সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পরিকল্পনা ও অর্থের অভাব এর প্রধান কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সরকারকে অনেক অর্থ সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়কে শরীর চর্চার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে শারীরিক দক্ষ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শরীর চর্চার ব্যাপারে সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে আগামী দিনের অনন্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে।

আমাদের দেশে শরীর শিক্ষায় বাস্তব অবস্থা

প্রশ্নাবলী

1. Discuss briefly the importance of physical education in the scheme of education for the whole child. Draw a comprehensive programme for training your pupils in the essential facts of community and personal hygiene. [C. U. '65]
2. Describe the significance of 'School Health Service' and child Guidance Clinic and educational programme of the school, what ways do they contribute to the development of a balanced personality of the child.
3. Discuss the role of Community Hygiene in the building of healthy citizens and show its relation to the personal well being of the child.
   Or, Draw a constructive programme of the essential measures, 'preventive and curative' that a school authority should follow for satisfactory unkeeping of the pupils health. [C. U. '66]
4. Distinguish between Health Education and physical education. Offer your suggestions for the proper organisation of health education in our schools.
   Write notes on any *three* of the following:
   (a) Personal hygiene; (b) School health service; (c) Compulsory physical training; (d) School sanitations. [C. U. '61]

5. prepare a practical scheme of health service for your school. Discuss the responsibility of teachers in this connection.

   Write notes on *any three* of the following :

   (*a*) Responsibility of the school regarding community hygiene (*b*) Schools meals. (*c*) Medical inspection in the schools. (*d*) School measures for the prevention of infectious disease. [C. U. 1968]

6. Describe the school health service in its essential features indicating its aims, the persons involved and their duties, with special mention of the teachers' role in it.

   Or, Write short notes on *any three* of the following :

   (*a*) General principles of health education. (*b*) School sanitation—its structural and functional aspects. (*c*) School clinics. (*d*) Follow-up service. (*e*) Personal hygiene in relation to community hygiene. [C. U. 1969]

7. What is the responsibility of teachers in regard to the health of the school children ? Psepare a practical scheme of health service for your school.

   Or, Write short notes on *any three* of the following :

   (*a*) School meals. (*b*) Compulsory physical training. (*c*) an ideal health education programme. (*d*) Medical inspection in schools. [C. U. 1970]

8. Indicate the place and importance of health education in the school curriculum. What measures are to be adopted for effective health education of our school children ?

9. Write notes on :—(*a*) Mid-day Tiffin.

10. Why should medical inspection of school children be regarded as a 'must' in school organisation ? Discuss the principles of effective medical inspection and the best that could be done in our schools under the prevailing circumstances. [N. B. U. 1961]

11. Discuss the scope of personal and community Hygiene in relation to the health of children, within the school campus and out side it, and show how the two areas of hygiene interdependent.

12. Consider the duties end responsibilities of the school medical officer in the matter of healthy development of children in schools. [N. B. U. 1968]

13. Why should health of the school child be regarded as a responsibility of the educational authorities ? Define 'Health' and show how it is influenced by all the factors in the life of the child at school and at home ?

14. What are the objects and functions of 'School Medical Service' ? Show how the concept of 'Schood Health Service' is more comprehensive and more in keeping with the principles of sound health education.

   [K. U. B. T. 1966]